# চেনা মুর্শিদাবাদ : অচেনা ইতিবৃত্ত

সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত

অমৃতা প্রকাশনী

প্রযত্নে : প্রিন্টকো, ইন্দ্রপ্রস্থ, খাগড়া, পিনকোড-৭৪২১০৩

# উৎসর্গ

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের বঞ্চিত শোষিত এবং সংগ্রামী কৃষকদের উদ্দেশ্যে

# বিষয়-বিন্যাস

# গোড়ার কথা

মুর্শিদাবাদ জেলাব ছেলে বলেই সম্ভবত কিশোব বয়স থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাব ইতিহাসেব প্রতি বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, এ সম্পর্কে চর্চাব এবং কিছু লেখাব স্বপ্ন মনেব মধ্যে সঞ্চাবিত ও লালিত হয়েছিল। এই গ্রন্থেব প্রকাশনাব মধ্যে দিয়ে তা এক ধবনেব পবিণতিতে পৌঁছল। ইতিহাসেব প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত এক ছাত্র হিসাবে প্রায় পাঁচদশক ধবে মাধুকবীবৃত্তিব সাহায্যে যাঁদেব কাছ থেকে প্রেবণা, উৎসাহ, সাহায্য, তথ্য, বিশ্লেষণ, মতামত ও আত্মপ্রকাশেব সুযোগ পেয়েছি তাঁদেব কাছে ঋণ-স্বীকাবেব এ সুযোগ হাবাতে চাই না। এই ঋণ স্বীকাবেব সুযোগ যে কবে দিয়েছে, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু লেখাকে গ্রন্থনাব উদ্যোগ যে গ্রহণ কবেছে, যাব উদ্যোগ ছাড়া লেখাগুলি কোনদিনই গ্রন্থকপ পেত না, সেই সুজন, সুভদ্র ও প্রীতিভাজন ছাত্র শ্রীমান সুকান্ত বাংকে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

অশেষ ঋণ স্বীকাব কবি আমাব শ্রদ্ধেয় সেইসকল শিক্ষকদেব কাছে যাঁদেব পাঠদান প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ ভাবে আমাব ইতিহাস-বোধ ও ইতিহাস-চেতনাকে কিশোব বয়স থেকে পবিপুষ্ট কবেছে। এঁবা হলেন : ৺কার্তিকচন্দ্র ঘোষ ও ৺মিহিব কুমাব বায় (ভগবানগোলা উচ্চ ইংবাজী বিদ্যালয়) ; অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সবকাব, ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী ও ডঃ এ. ডব্লু. মামুদ (প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা) ; ডঃ জহব সেন ও অধ্যাপক দিলীপ কুমাব বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহবমপুব)। এঁদেব পাশাপাশি দুটি বচনাব গভীব ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবেব কথাও অস্বীকাব কবতে পাবি না : কবিগুরুব "ছাত্রদেব প্রতি সম্ভাষণ" ("স্বাধীন শিক্ষা" নামে বিদ্যালয় পাঠ্য) এবং অমিত সেন বচিত "ইতিহাসেব ধাবা।"

ষাটেব দশকেব মাঝামাঝি থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাব জনজীবনেব বিভিন্ন দিক নিয়ে যে সকল বন্ধু-সহকর্মী-অনুজদেব মনন-চর্চাব কাছে এই গ্রন্থ বচনাব ক্ষেত্রে আমাব ঋণ সবচেয়ে বেশী তাঁবা হলেন : অধ্যাপক দীপংকব চক্রবর্তী, ডঃ বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শক্তিনাথ ঝা, গবেষক মৈত্রেয় ঘটক, ডঃ বিষাণ গুপ্ত, অধ্যাপক অভিজিৎ ভট্ট, ডঃ মুজিবব বহমান, জিজ্ঞাসু প্রাবন্ধিক খাজিম আহমদ ও অধ্যাপক কিশোব বায় চৌধুবী। এঁদেব পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ চর্চায় সহায়ক কিছু চিন্তা-ভাবনা যাঁদেব কাছ থেকে পেয়েছি তাঁবা হলেন ডঃ মনোজ সান্যাল, ডঃ বাজকৃষ্ণ মাল ও অধ্যাপক আবুল হাসনাত।

এই সঙ্গে স্মবণ কবি সেই সকল শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজদেব কাছে আমাব ঋণ যাঁবা তাঁদেব আলাপ-আলোচনা-বিশ্লেষণ এবং বচিত সম্পাদিত পত্রিকা-পুস্তকাদিব সাহায্যে সত্তবেব দশকেব শেষার্ধ থেকেই মুর্শিদাবাদেব অতীত ও সমকালীন জীবনেব সামগ্রিক চর্চাব একটা পবিমণ্ডল এ-জেলায় গড়ে তুলেছিলেন এবং আমাকেও আত্মপ্রকাশেব নানা সুযোগ কবে দিয়েছিলেন : বাধাবঞ্জন গুপ্ত, ঈপ্সিতা গুপ্ত অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা বঞ্জন মৈত্র, প্রাণবঞ্জন চৌধুবী এবং অবশ্যই কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল গুপ্ত, চিত্ত দাস এবং পুলকেন্দু সিংহ।

পাবিবাবিক মণ্ডলীতে আমি সর্বাধিক ঋণী আমাব স্ত্রী স্মৃতিবেখাব কাছে, যাব নিবলস সেবা, শ্রম ও স্বার্থত্যাগেব জন্যই সংসাবেব নানা ঝড়-ঝাপটাব মধ্যেও আমাব পক্ষে পড়াশোনাব চর্চা চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপব হয়েছে। অন্যান্যদেব মধ্যে ৺শান্তিময় চৌধুবী, অনিরুদ্ধ গুপ্ত-মঞ্জুগুপ্ত, দুর্গাপদ গুপ্ত,

দেবাশীষ চৌধুবী এবং পুত্রকন্যাদ্বয় শঙ্খ ও সোনালীব নিকট থেকে আমাব পড়াশোনাব এই চর্চা ও অভ্যাসকে বাঁচিয়ে বাখতে উষ্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি পেয়েছি।

আন্তবিক ধন্যবাদ জানাই ছাত্র শ্রীমান অমিতাভ বাহাকে সযত্নে শ্রমসাধ্য প্রুফ দেখাব জন্য। প্রচ্ছদশিল্পী এবং মানচিত্রশিল্পীকে ধন্যবাদ তাঁবা বইটিব অলংকবণে হাত বাড়িয়ে দেওয়ায়। আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মুদ্রণেব সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীকেই। আবও অসংখ্যজন যাঁবা আমাকে নানা ভাবে এই লেখাগুলিব ব্যাপাবে সাহায্য কবেছেন তাঁদেব কাছেও কৃতজ্ঞতাব শেষ নেই।

এঁদেব সকলেব ভালবাসা ও সাহায্য ছাড়া এই প্রচেষ্টা সম্ভবই হত না। কিন্তু এই গ্রন্থে প্রকাশিত নানা মতামত ও মন্তব্যেব গ্রন্থকাব হিসাবে কেবলমাত্র আমিই দায়ী, অন্য কেউ নন।

যে-সকল পুস্তক-পুস্তিকা-পত্রিকাদিতে প্রবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ত রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং এখানে পবিবর্তিত ও পবিবর্ধিত রূপ লাভ কবেছে সেগুলি হল: "চেনা মুর্শিদাবাদ: অচেনা ইতিবৃত্ত" ("মুর্শিদাবাদ উৎসব-১৯৯১ স্মাবক পত্রিকা"— স্মাবকপত্রিকা উপসমিতি, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত), "মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক রূপান্তব (১৫৭৫-১৭৫৭)— একটি অবিন্যস্ত বেখাচিত্র" (প্রতি– বঞ্জন মৈত্র সম্পাদিত এবং ১৩৯৫ সালে বহবমপুবে প্রকাশিত "মুর্শিদাবাদ চর্চা" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত); "মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল চাষ ও নীল বিক্ষোভ" (বাধাবঞ্জন গুপ্ত সম্পাদিত "শাবদীয় জনমত" পত্রিকায় ১৩৯২ সালে প্রকাশিত); "চিবস্থায়ী বন্দোবস্তে মুর্শিদাবাদেব ভূমিব্যবস্থা" (দীপংকব চক্রবর্তী সম্পাদিত "বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ" পত্রিকায় ১৯৯২ সালে প্রকাশিত); "বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বঙ্গদেশেব কৃষক'— উৎসেব সন্ধানে" (দীপংকব চক্রবর্তী সম্পাদিত "বঙ্কিম মূল্যায়ন সংখ্যা" "অনীক" পত্রিকায় ফেব্রুয়াবী-মার্চ ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)। গ্রন্থাকাবে পুনর্মুদ্রণেব জন্য উপবোক্ত সম্পাদকগণেব নিকট আন্তবিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবছি।

৫/১, জম্বু ডাক্তাবেব গলি
পোঃ বহবমপুব
জেলা: মুর্শিদাবাদ

অং পক সৌমেন্দ্র কুমাব গুপ্ত
২১/২/১৯৯৬

# অনধিকারীর কৈফিয়ৎ

আকৈশোব মুর্শিদাবাদেব ইতিহাসে আগ্রহী হলেও এবং এ-সম্পর্কে কিছু লেখাব ইচ্ছা মনে মনে পোষণ কবলেও সর্বোচ্চ স্তব পর্যন্ত ইতিহাসবিদ্যাব প্রাতিষ্ঠানিক চর্চাব অভাবে অনেকটাই ইতিহাসেব এক সৌখিন ও অনধিকাবী অনুবাগী বয়ে যেতে হয়েছে। সুতবাং প্রাতিষ্ঠানিক চর্চাব ফলে যে মানসিক শৃঙ্খলা জন্মে, ইতিহাস-বিদ্যা-সম্মত পন্থা-পদ্ধতিব যে পবিচয় লাভ ঘটে এবং কোনও চিন্তা-গোষ্ঠীব যে ভাব-সান্নিধ্য অর্জিত হয় এই বই এব প্রবন্ধগুলিতে সে-সবেব একান্ত অভাবেব জন্যই এই কৈফিয়ৎ জরুবী।

এই গ্রন্থ প্রকাশেব দুঃসাহসেব পক্ষে গ্রন্থকাবেব কৈফিয়ৎটি হচ্ছে এই যে মুর্শিদাবাদ জেলাব একজন অধিবাসী হিসাবে গ্রামে শহবে পাঁচ দশকেবও বেশী সময় জুড়ে নানামুখী বৈষম্য, বঞ্চনা ও দাবিদ্রোব যে পবিচয় লাভ ঘটেছে তাব একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাব প্রয়োজন আছে মনে হযেছে। এই বিশ্বাস ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে যে বাজা শশাঙ্কেব সময় থেকে নবাবী আমলেব শেষ পর্যন্ত বাজকীয় তুবীয়লোক থেকে এ জেলাঞ্চলেব ইতিহাসকে বাস্তবতাব ভূমিতে নামিয়ে আনতে হলে, আদিমতম যুগ থেকে বর্তমান মুর্শিদাবাদেব জীবন-যন্ত্রণাব সঙ্গে এই ইতিহাসের যোগসাধন কবতে হলে, বিগত শতকগুলিতে এ অঞ্চলেব সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বাজনৈতিক জীবনেব অর্থপূর্ণ উপলব্ধি ও মূল্যায়ন কবতে হলে, এ-জেলাব অর্থনৈতিক সামাজিক ইতিহাসেব একটি রূপবেখা বচনা কবা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থেব প্রবন্ধাবলীব সীমিত, অবিন্যস্ত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আধাবে এই ইতিহাসেব একটি রূপবেখাকে ধবে দেওয়াব চেষ্টা কবেছি। ভালভাবেই জানি নানা সময়ে নানা উপলক্ষে প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধেব সাহায্যে এই রূপবেখাব উপস্থাপনা প্রায় অসম্ভব একধবনেব ধৃষ্টতা। এই দুঃসাহসী চেষ্টাকে সার্থক বলে গণ্য কবব যদি এব তথ্যাবলী, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত বা মন্তব্যগুলি আলোচনাব এই ক্ষেত্রটিতে যোগ্য অধিকাবীদেব উত্তেজিত কবে বিতর্কে টেনে আনতে পাবে, কোনও বিকল্প ব্যাখ্যা বা রূপবেখাব সন্ধান দিতে পাবে অথবা এ-বিষয়ে তাঁদেব পূর্ণতব গবেষণায় আগ্রহী কবে তুলতে পাবে। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে এখনও পর্যন্ত বাংলাব অর্থনৈতিক সামাজিক ইতিহাসেব ছাত্রেবা মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক সামাজিক রূপান্তবেব মত অপবিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিব দিকে নজব ফেবালেন না। যাঁবাও মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক সামাজিক রূপান্তব সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা কবেছেন তাঁদেব কেউই এক একটি নির্দ্দিষ্ট কালপর্বেব বাইবে তাঁদেব গবেষণাকে প্রসাবিত কবেননি। তাঁবা এই জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক সামাজিক রূপান্তবেব উষাকাল থেকে স্বাধীনোত্তব বর্তমান কাল পর্যন্ত পবিবর্তনেব পথবেখাকে চিহ্নিত কবেননি, উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কেব টানাপোড়েনে এই রূপান্তবকে বিশ্লেষণ কবে দেখাননি বৈষম্য ও বঞ্চনা কি ভাবে শ্রেণী-বিন্যাস ও জাতি-বিন্যাসেব বিবর্তনেব মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। সর্বোপবি, এই জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক সামাজিক রূপান্তব আধুনিক বাংলাব সামগ্রিক পবিবর্তনেব সঙ্গে কেমনভাবে সম্পর্কিত তা-ও তুলে ধবা হয়নি। নানা জেলাব স্থানীয় ইতিহাসেব উপব দাঁড় কবিয়েই যদি বাংলাব সামগ্রিক ইতিহাসেব অবয়ব বচনা কবতে হয় তাহলে সেদিক থেকেও মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব দাবি অন্য কোনও অঞ্চলেব চাইতে পিছনে নয়।

একদিকে এই অঞ্চলেব ইতিহাসেব গুরুত্ব এবং অন্যদিকে এই ইতিহাসেব প্রতি উপেক্ষা আমাব মত একজন অনধিকাবীকে দুঃসাহস জুগিয়েছে এই প্রচেষ্টায়। এ অঞ্চলে বেশম শিল্পেব আড়াই হাজাব বছবেব বিবর্তন এবং জমিদাবী বিলোপেব পব থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত শ্রেণী-তথা-জাতি বিন্যাসেব রূপান্তব,— এই দুই ক্ষেত্রে উদ্যোগেব অসম্পূর্ণতা দূব কবাব প্রবল ইচ্ছা বয়ে গেল। অন্যদিকে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বঙ্কিমচন্দ্রেব উপব প্রবন্ধটি গ্রন্থভুক্ত হয়েছে গ্রন্থেব বিষয়বস্তুব সঙ্গে এক ধবণেব আত্মিক সম্পর্কেব জন্যই।

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক সামাজিক ইতিহাসেব রূপবেখা বচনা কবতে গিয়ে প্রাথমিক উৎস ব্যবহাবে গ্রন্থকাবেব অসামর্থ্য হেতু মূলত মাধ্যমিক উৎসেব উপবই নির্ভব কবতে হয়েছে। কিন্তু এই ধবণেব ইতিহাস বচনায় মাধ্যমিক উৎস যথেষ্ট নয়, কেননা, সংখ্যাতথ্যগত প্রমাণেব অভাবে পবিস্থিতিগত এবং বিপবীতঘটনাত্মক যুক্তিনির্ভব সিদ্ধান্ত অপবিহার্য হয়ে পড়েছে। তা ছাড়াও, বর্তমান থেকে অতীতেব দিকে ফিবে যাওয়াব পদ্ধতি অনুসবণ কবেও কিছু কিছু শূন্যস্থান পূবণেব চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য মনে কবি। আব বর্তমান সময়ে তথ্যাবলীব বিন্যাস, সম্পর্ক-সন্ধান ও বিশ্লেষণেব ক্ষেত্রে পবোক্ষভাবে হলেও আদর্শ বা মডেলেব ব্যবহাব বর্জন কবাও সম্ভব নয়। বিশেষত সামন্ত সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তবেব মার্ক্সীয় মডেল বিগত পাঁচটি শতকে জেলাঞ্চলেব ইতিহাস সম্পর্কে আমাদেব সুনিশ্চিত অথচ কিছুটা সীমাবদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি জোগাতে পাবে। সমাজবিজ্ঞানেব নানা বিদ্যায় ব্যবহৃত ধাবণা ও বিশ্লেষণেব সাহায্য গ্রহণ ছাড়াও গত্যন্তব ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাগোষ্ঠীগত ছুৎমার্গও বর্জনীয় মনে হয়েছে। অবশ্য সমগ্র প্রচেষ্টাটিই একজন সৌখিন অনধিকাবীব নড়বড়ে অবস্থান থেকেই নেওয়া হয়েছে।

**সংলগ্ন এলাকা ও মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল—ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে**

মানচিত্রের নির্দেশিকা : (১) "The Changing Face of Bengal" by Dr. Radha Kamal Mukherjee. C.U. Publication. (২) "Rivers of the Bengal delta" by S. C. Mazumder. Calcutta University Publication and (৩) বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব, ১ম খণ্ড) ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, [পঃবঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি ] (৪) ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার ভূমিকা, গৌড়ের কথা—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৩৯০), (৫) শিবরাম বেরা—হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন কি অসম্ভব ? (জ্ঞান ও বিজ্ঞান,-এপ্রিল, ১৯৮০), বাংলার নদনদীর কথা (ঐ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮০), (৬) কপিল ভট্টাচার্য—বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা (১৯৫৯)। 1764 সাল থেকে 1777 সাল পর্যন্ত মেজর রেনেল পূর্বভারতের নদনদীর সার্ভে করেন এবং রেনেলের মানচিত্রই প্রথম প্রামাণিক মানচিত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়।

**মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল—অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে**

নির্দেশিকা—কানন গোপাল বাগচী সম্পাদিত "দি ভাগিরথী-হুগলী বেসিন" (কলকাতা—১৯৭২)।

খান মহম্মদ মোহসিন রচিত "এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন ট্রানজিশন : মুর্শিদাবাদ ১৭৬৫-১৭৯৩" (ঢাকা, ১৯৭৩)

# চেনা মুর্শিদাবাদ : অচেনা ইতিবৃত্ত

॥ এক ॥

বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কাছে 'মুর্শিদাবাদ' নামটি যে তাৎক্ষণিক অনুষঙ্গ বয়ে নিয়ে আসে তা হল সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর আর পলাশীর যুদ্ধের, তা হল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজধানীর। অনুষঙ্গ একটু দীর্ঘায়ত হলে মুর্শিদকুলী, আলিবর্দী, বর্গীর হাঙ্গামা থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত নবাবী আমলের জলছবি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। বাংলার সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' আর নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', বাংলার নাট্যশালায় ক্ষিরোদপ্রসাদের 'সিরাজদ্দৌল্লা', বাংলার শিক্ষায়তনে নিখিল নাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'— এই সবের প্রভাবে বিগত শতাধিক বছরের মধ্যেই বাংলার শিক্ষিত সাধারণের মনে মুর্শিদাবাদের একটা ভাবমূর্তি, একটা চেহারা গড়ে উঠেছে। এই মূর্তিকে আরো স্পষ্টতর করেছে খাগড়াই কাঁসার বাসন এবং সোনার গহনা, হাতির দাঁতের শিল্প, মুর্শিদাবাদের নানা স্বাদের আম আর সর্বোপরি মুর্শিদাবাদের সিল্কের চিত্তচমৎকারী অভিজ্ঞতা। এই মুর্শিদাবাদই হচ্ছে আমাদের সব চাইতে চেনা মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদাবাদের এই ভাবমূর্তি যখন থেকে গড়ে উঠছিল সেই সময় থেকেই কিছু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাসকে তথ্যের নিরিখে যাচাই করে নেওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে শুরু করলেন, যাতে মুর্শিদাবাদকে আরো ভালভাবে জানা যায়, আরো অন্তরঙ্গভাবে চেনা যায়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুর থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল শ্যামধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'মুরশিদাবাদের ইতিহাস'— এটি ছিল মুর্শিদাবাদের প্রথম ইতিহাস তো বটেই, সারা বাংলারও প্রথম আঞ্চলিক ইতিহাস।[১] এই বইটিতে সংক্ষেপে প্রধানত নবাবী আমলের ইতিহাস যেমন স্থান পেয়েছিল, সেই রকম জায়গা করে নিয়েছিল মুর্শিদাবাদ 'নগর ও জেলার স্থান-সন্নিবেশ ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয়।' তারপর প্রায় আধা শতাব্দী ধরে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-চর্চা মূলত নবাবী আমলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে চলল এবং ১৯০১ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে একে একে প্রকাশিত হল কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, নিখিল নাথ রায়, টুল্ ওয়াল্শ এবং পূর্ণচন্দ্র মজুমদারের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্পর্কিত বিখ্যাত বইগুলি।[২] আর এই বইগুলির অপ্রতিরোধ্য প্রভাবেই সম্ভবত পরবর্তী আধা শতাব্দী ধরেও নবাবী আমলের গোলক- ধাঁধাতেই ঘুরপাক খেতে থাকল মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের সন্ধান।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস যে শুধু এই নামের শহরেরই ইতিহাস নয়, শুধু নবাবী আমলেরই ইতিহাস নয়, নবাবী আমলের পূর্বেও যে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের একটা উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ ইতিহাস ছিল এই সত্যটি ক্রমশ পাকাপাকি ভাবে ধরা পড়তে থাকল এই শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে —প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে পাথুরে প্রমাণের দ্বারা বহরমপুর শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে নিকটেই প্রসিদ্ধ চীনা ভ্রমনকারী হিউয়েন সাঙ্-বর্ণিত "কর্ণসুবর্ণ" নগরীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'লো।[৩] মুর্শিদাবাদের ইতিহাসকে তার প্রসারিত দিগন্তে রেখে এইভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল বিশ্বেশ্বর রায় ও প্রণব রঞ্জন রায় রচিত সরকারী প্রকাশনার

দুটি বইয়ের অন্তর্ভুক্ত দুটি অধ্যায়ে।[৪] প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের একটি রূপরেখা রচনার প্রশংসনীয় প্রয়াস এখানে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরে আশির দশকে মুর্শিদাবাদের পূর্ণতর ইতিহাসের রূপরেখা রচনায় এগিয়ে এলেন বিজয় বন্দোপাধ্যায়, কমল বন্দোপাধ্যায়, খাজিম আহমেদ এবং অধ্যাপক অশোক কুমার সরকার।[৫]মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার এই সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্যই ছিল ভারতের ইতিহাসে মগধ রাষ্ট্রের উত্থানের সমকাল থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের বিভিন্ন পর্য্যায়ের ইতিহাসকে চিনিয়ে দেওয়া এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের বাইরে সাংস্কৃতিক ইতিহাসকেও তুলে ধরা। এক কথায় বলা যায় বিগত তিন দশকে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-চর্চা যে পথে অগ্রসর হয়েছে তাতে মুর্শিদাবাদ আর নবাবী আমলের মুর্শিদাবাদই থাকছে না। অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের এতদিনের চেনা রূপের জায়গায় আমরা গত তিন দশকে মুর্শিদাবাদকে আবার নতুন ভাবে নতুন রূপে চিনতে শুরু করেছি। এই চেনা এখনও চলছে ; বলা যায়, এই চেনা এখনও পূর্ণতা পায়নি। শিক্ষিত সাধারণের কাছে শতবর্ষে মুর্শিদাবাদের যে ভাবমূর্তি, ইতিহাস-চর্চার প্রথম একশো বছরে গড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদের যে চেহারা অর্থাৎ মুর্শিদাবাদকে যে-ভাবে এতদিন চেনা গিয়েছিল এবং অতি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদকে যে-রকম নতুন ভাবে চেনা যাচ্ছে আমরা সেই পুরণো আর নতুন-চেনা মুর্শিদাবাদের আড়ালে অন্তঃসলিলা প্রবাহের মতো বিদ্যমান অচেনা এক মুর্শিদাবাদের ইতিবৃত্তকে ধরার চেষ্টা করতে পারি।

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের[৬] ইতিহাস বলতে সম্প্রতি ঐতিহাসিকেরা নন্দ-মৌর্য-সুঙ্গ-কুষাণ-গুপ্ত যুগের আলো-আঁধারি কাল, গৌড় নগরীর উত্থান, রাজা শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণের খ্যাতি, পাল-সেন-সুলতানী আমল ও গৌড়ের কাহিনী, মোগল যুগে মানসিংহের সময়ে বা পরে নবাবী আমলে সুবা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের গৌরবগাথা অথবা বৃটিশ আমলের জেলা মুর্শিদাবাদের বিবর্তন— এই সব কিছুকেই বোঝাতে চান। ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে এ-জেলার এই ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার খৃষ্ট জন্মের পাঁচশো বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে প্রবহমান। কিন্তু একটু নজর করে দেখলেই বোঝা যায় ঐতিহাসিকেরা যাকে এ-জেলাঞ্চলের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বলছেন তা আসলে এখানে রাজবৃত্তের উত্থান পতনের কাহিনী, মূলত শহর-কেন্দ্রিক জীবন প্রবাহের ইতিকথা, প্রধানত: সমাজের পরোপজীবি উচ্চবর্গের নানা রকম কাজকর্মের চালচিত্র। এই তথাকথিত উত্তরাধিকারের প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে এবং তারও পূর্বের কয়েক হাজার বছর ধরে এই জেলাঞ্চলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই এ জেলার ছড়ানো ছিটানো গ্রামগুলোতে বসবাস করে এসেছে, তাদের বহুমুখী জীবনযাত্রা নির্বাহিত করে চলেছে। এই সকল গ্রামীণ মানুষ এবং শ্রমজীবী মানুষ রাজনৈতিক উত্থান পতনের আবর্ত থেকে দূরে নিযুক্ত থেকেছে সামাজিক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাজে। মুর্শিদাবাদ জেলার যথার্থ ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বলতে এই সকল গ্রামীণ ও শ্রমজীবি মানুষের উত্তরাধিকারকেই আমরা বুঝব।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে একদিন মুর্শিদাবাদের বহরমপুর শহরে বসেই বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন"- মাধ্যমে সকল বাঙালীকে ডাক দিয়েছিলেন বাংলার ইতিহাস লেখার জন্য এগিয়ে আসতে। কিন্তু এই 'ইতিহাস' বলতে বঙ্কিমচন্দ্র রাজারাজড়াদের নাম ও যুদ্ধের তালিকা বোঝেননি, বুঝেছিলেন বাংলার 'প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস'। সামাজিক ইতিহাসের এই ধারণা আরো পরিপুষ্ট হয়েছিল কবিগুরুর ইতিহাস-চেতনায়, ইতিহাস হয়ে উঠেছিল গ্রামীণ এবং শ্রমজীবি

মানুষেব ইতিহাস : "ওবা চিবকাল টানে দাঁড, ধবে থাকে হাল। ওবা মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে। * * * শত শত সাম্রাজ্যেব ভগ্নশেষ 'পবে ওবা কাজ কবে।।" ইতিহাস-দৃষ্টিব এই আলোক-বর্তিকাব সাহায্যেই চেনা মুর্শিদাবাদেব অচেনা ইতিবৃত্তকে খোঁজাব চেষ্টা কবা যেতে পাবে।[৭]

এইভাবে প্রচলিত ইতিহাসে উপেক্ষিত গ্রামীণ মুর্শিদাবাদেব এবং প্রধানত শ্রমজীবি মানুষেব কর্মপ্রবাহেব গতিপ্রকৃতিব পবিচয মিল্‌লে তাবপবই কেবলমাত্র বাজ্য-সাম্রাজ্যেব ওঠা পডাব বহস্য এবং তাব বর্ণাঢ্য ইতিহাসেব অর্থ ও তাৎপর্য আমাদেব বোধগম্য হবে। মুর্শিদাবাদেব ইতিহাসেব এই স্বল্পালোকিত এবং উপেক্ষিত অথচ দীর্ঘতব-কাল-ব্যাপী মূলধাবাটিব পাশে বাজবৃত্তেব ধাবাটি ও তাব অনুষঙ্গগুলিকে বাখলে তবেই মুর্শিদাবাদেব সঠিক ইতিহাসেব নাগাল আমবা পাব।

## ।। দুই ।।

মুর্শিদাবাদেব গ্রামীণ ও শ্রমজীবি মানুষেব এই ঐতিহাসিক উত্তবাধিকাব কতদিনেব পুবাণো ? এ সম্পর্কে আমবা কতটুকু জানি ? গত ত্রিশ বছবে পশ্চিমবাংলাব নব্য-প্রস্তব যুগ এবং তাম্র-প্রস্তব যুগ সম্পর্কে যে-সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ আবিষ্কৃত হযেছে, ইতিহাসেব অলিখিত যুগেব যে-সকল পাথুবে প্রমাণ পাওযা গেছে তাব উপবে দাঁডিযে মুর্শিদাবাদেব অচেনা ইতিহাসটিকে চেনাব চেষ্টা কবা যায। সেই চেষ্টায আমাদেব শুধুমাত্র ইতিহাস বিদ্যাব সাহায্য নিলে চল্‌বে না, আমাদেব সাহায্য নিতে হবে ভূতত্ত্ব, প্রত্নজীববিদ্যা, প্রাগৈতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বেব। এই সব বিদ্যাব অনুসৃত পদ্ধতি এবং যুক্তিক্রমেব উপব নির্ভব কবে সংগৃহীত তথ্যাবলীব বিন্যাস ও বিশ্লেষণেব সাহায্যে এ-জেলাব সংখ্যাগবিষ্ঠ মানুষেব ঐতিহাসিক উত্তবাধিকাবেব একটি রূপবেখা বচনা কবতে আমবা অগ্রসব হতে পাবি।

মুর্শিদাবাদ জেলায কৃষিকাজেব প্রবর্তন এবং কৃষি-নির্ভব গ্রাম সমূহেব পত্তন কতদিন পূর্বে হযেছিল ? প্রাগৈতিহাসেব ছাত্রেবা তাদেব সংগৃহীত পাথবেব, তামাব, লোহাব অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতিব বিকাশ ও কাল-পর্য্যায এবং জীবাশ্ম, কঙ্কাল ও পুবাতন শস্যাদিব বেডিও-কার্বন-১৪ পদ্ধতিতে পবীক্ষাব সাহায্যে অনুমান কবেছেন যে সাবা পশ্চিমবঙ্গেব মতো মুর্শিদাবাদেও নব্য-প্রস্তব যুগেব শুরু হযেছিল আজ থেকে প্রায দশ হাজাব বছব আগে অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মেবও প্রায আট হাজাব বছব পূর্বে। ঐ সমযেব আগে হাজাব হাজাব বছব ধবে যে প্রত্নপ্রস্তব যুগ চলেছিল সেই সমযেও মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে মানুষেব আনাগোনা চলত। কিন্তু সে সব মানুষ ছিল যাযাবব খাদ্যসংগ্রাহক মানুষ। তাবা প্রধানত শিকাব ও ফলমূল আহবণ কবেই জীবন ধাবণ কবত, এক জাযগাব শিকাবযোগ্য পশু বা আহবণীয ফলমূল শেষ হযে গেলে অন্য জাযগায যেত। এই অবস্থাব পবিবর্তন ঘটেছিল নব্যপ্রস্তব যুগেব শুরু থেকে। এই যুগেই মানুষ কৃষিকাজ ও পশুপালন কবতে শিখেছিল। আব কৃষিকাজ অল্পদিনেই মানুষকে বাধ্য কবেছিল স্থাযী বসতি স্থাপন কবতে। এ-ভাবেই মুর্শিদাবাদেও পত্তন ঘটেছিল গ্রাম-সমাজেব। এই বিষযেব ছাত্রেবা অনুমান কবেছেন যে সাবা পশ্চিমবঙ্গেব মতো মুর্শিদাবাদেবও নব্য-প্রস্তব যুগেব উদ্ভবেব চাবিকাঠি লুকিযে আছে ছোটনাগপুবেব মালভূমিতে।[৮] ছোটনাগপুব মালভূমিব লোকেবাই প্রথমে নব্য-প্রস্তব যুগেব অর্থনীতি জেলাঞ্চলে নিয়ে আসে বৎসবান্তিক সাময়িক

বসতিব মধ্যে দিযে। পবে ধীবে ধীবে এই বসতিগুলি স্থাযী হযে ওঠে। মুর্শিদাবাদ জেলাব পশ্চিমাঞ্চলে গুমানী, বাঁশলই, পাগলা, দ্বাবকা, ব্রাহ্মণী, মযুবাক্ষী, অজয ছোটনাগপুব সাঁওতাল পবগণাব বাজমহল পর্বতমালা থেকে প্রবাহিত হযে গঙ্গা ভাগিবথীতে পডেছে। ভূতাত্ত্বিকভাবে গঙ্গা-ভাগিবথীব চাইতেও প্রাচীনতব এই নদীগুলি শীত গ্রীষ্মে শুষ্ক শীর্ণ থাকলেও বর্ষায নিযে আসে বন্যা আব পলি। কৃষিকাজেব পক্ষে সবচাইতে উপযোগী হচ্ছে সেইসব জমি যেখানে প্রতিবৎসব বন্যাব ফলে পলিমাটি এসে জমা হয। সহজেই অনুমান কবা যায যে এ জেলাব প্রাচীনতম গ্রামসমাজগুলিব পত্তন এই সকল নদীব ধাবে ধাবেই হযেছিল। এখনও এলাকাব বিচ্ছিন্ন এবং দূববর্তী গ্রামগুলিতে সেই সুদূব অতীতেব জীবিকা-বিন্যাস প্রবাহিত হযে চলেছে।[৯] এব পব নব্য-প্রস্তব যুগেব নানা পর্বে প্রথমে জেলাব পশ্চিমাঞ্চলে গ্রাম-সমাজগুলি প্রসাবিত হযেছিল। মুর্শিদাবাদেব জলা-জঙ্গল-শ্বাপদ সমাকীর্ণ ভাগিবথীব পূর্বাঞ্চলেব পলিগঠিত এলাকায গ্রাম-সমাজেব পত্তন ঘটেছিল বহুদিন পবে, সম্ভবত তাম্র-প্রস্তব যুগে। কৃষি আবিষ্কাবেব সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তাব খাদ্য সংগ্রহেব অভ্যাসকে ছেডে দেযনি। ববং বলা যায খাদ্যসংগ্রহেব অন্যতম আনুষঙ্গিক কাজ হিসাবেই কৃষিব আবিষ্কাব হযেছিল এবং ক্রমে ক্রমে তা নব্যপ্রস্তব যুগে এসে স্বতন্ত্র এবং প্রধান বৃত্তিতে পবিণত হযেছিল। কৃষিব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবাব ফলে মানুষ নিজেব খাদ্য যোগানেব ব্যাপাবে অনেকখানি স্ব-নির্ভব হযে উঠতে পেবেছিল। কৃষিব প্রবর্তন খাদ্য উৎপাদক অর্থনীতিব শুরু কবলেও খাদ্য-সংগ্রহেব স্তব থেকে অনুসৃত কিছু পেশাও টিকে থেকেছিল গৌণ ভূমিকায। এব মধ্যে সবচেযে উল্লেখযোগ্য ছিল মাছ ধবা। যেখানেই কৃষি-কেন্দ্রিক বসতিব পবিচয মিলেছে সেখানেই প্রমাণ পাওযা গেছে পশুপালনেব অস্তিত্বেবও। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও প্রায দশ হাজাব বছব আগে একটি দুটি কবে যে-সকল গ্রাম-সমাজেব পত্তন শুরু হযেছিল সে-গুলিতে মুখ্যজীবিকা কৃষিকাজেব পাশাপাশি মাছধবা এবং পশুপালন খাদ্যেব যোগানকে কবে তুলেছিল অনেক বেশী সুনিশ্চিত। নব্য-প্রস্তব যুগেব প্রধানত কৃষিনির্ভব খাদ্যেব-যোগান সমৃদ্ধ অর্থনীতিব কতকগুলি অনিবার্য ফলশ্রুতি দেখা গিযেছিল। প্রথমত কৃষিব উপযোগী নানাবকম যন্ত্রপাতিব প্রযোজন দেখা দিযেছিল। পাথব, হাড এবং অবশেষে কাঠেব ব্যবহাবেব মধ্যে দিযে কাষ্ঠশিল্পেব শুরু হযেছিল। দ্বিতীযত, পর্যাপ্ত খাদ্যেব যোগান মানুষকে বাধ্য কবেছিল সঞ্চযেব পন্থা-পদ্ধতি সন্ধান কবতে। এই ভাবেই উদ্ভব ঘটেছিল মৃৎশিল্পেব— তৈবী হযেছিল নানান জাতেব মৃৎপাত্র। তৃতীযত, জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও পশুপালন অনিবার্য কবে তুলেছিল ঘব বাডি তৈবী কবা। প্রথমে ছেঁচা বেড়াব মাটিব ঘব, তাবপব মাটিব দেওযালেব ঘব তৈবী শুরু কবেছিল। চতুর্থত সবল খাদ্য উৎপাদক অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভব। বাইবে থেকে কোন কিছুই আমদানী হত না, ছিল না কোনও প্রকাব বিনিময। প্রযোজনীয যন্ত্রপাতিও তৈবী হত স্থানীয উপাদান দিযেই। কৃষিকাজ, মাছধবা, পশুপালন হস্তশিল্প কোন কিছুই পেশা হিসাবে পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠীব মধ্যে ভাগ হযে যাযনি, এক একটি বসতিব সকলেই এই সকল কাজকর্ম কবত। খাদ্য-উৎপাদক অর্থনীতিব প্রবর্তন জনসংখ্যাবৃদ্ধিব সহাযক হযেছিল এবং জনসংখ্যাব বৃদ্ধি আবাব ঘটিযেছিল কৃষি ও অন্যান্য পেশাব সম্প্রসাবণ।[১০]

নব্য-প্রস্তব যুগেব আদিপর্বে কৃষিকাজও গ্রামীণ বসতিকে কেন্দ্র কবে যে সবল ও স্ব-নির্ভব অর্থনীতিব পত্তন হয়েছিল, নব্য-প্রস্তব যুগেব অন্ত্যপর্বে তা হযে উঠল বেশ জটিল। বয়ন শিল্প, চাকাযুক্ত গাডী এবং নৌকাব আবিষ্কাব বিভিন্ন গ্রামীণ বসতি কেন্দ্রগুলিব মধ্যে যোগাযোগ

ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা শ্রম বিভাজনের তাগিদে এক একটি পেশাকে সীমাবদ্ধ করে দিতে শুরু করেছিল এক একটি গোষ্ঠীর মধ্যে। কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই এই ধরনের পেশার গোষ্ঠীগত বিশেষীকরণ কৃষিজাত দ্রব্যাদির সঙ্গে অন্যান্য পেশাজাত দ্রব্যাদির বিনিময়কে চালু করেছিল। এই ভাবেই গড়ে উঠেছিল গ্রামের আভ্যন্তরীণ বিনিময়-ব্যবস্থা যা পরবর্তীকালে পূর্ণ-বিকশিত হয়েছিল যজমানি প্রথায়। অন্যদিকে এক গ্রামের সঙ্গে অন্যগ্রামের যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্য -বিনিময়ের এলাকাও সম্প্রসারিত হয়েছিল অনেকখানি। নব্য-প্রস্তর যুগের অন্ত পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল কৃষিজাত উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করে গ্রাম-সমাজের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দুটিস্তরের ক্ষীণ আবির্ভাব।[১১]

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ছকটি আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর পূর্বে শুরু হয়ে প্রায় ছয় হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে পূর্ণ রূপ লাভ করেছিল। পরবর্তী প্রায় চার হাজার বছর ধরে অর্থাৎ আজ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ অর্থনীতির মূল কাঠামোটি একই রকম থেকে গেছে। এই চার হাজার বছরের মধ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে-সকল পরিবর্তন ঘটেছে সেগুলি প্রধানত একটি ব্যাপারের সঙ্গেই জড়িত: মুর্শিদাবাদ জেলায় নাগরিক অর্থনীতির উদ্ভব, ধারাবাহিক অস্তিত্ব এবং এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর সৃষ্ট চাপ ও শোষণ। আশ্চর্যের কথা এটাই যে এই দীর্ঘস্থায়ী চাপ ও শোষণ সত্ত্বেও গ্রামীণ অর্থনীতির মূল কাঠামোর বিশেষ কোনই পরিবর্তন আজও পর্যন্ত হয়নি। শুধু অর্থনৈতিক কাঠামোই নয়, গ্রামীণ জীবনের বস্তুগত ও মানসিক সংস্কৃতির দিকেও যদি আমরা তাকাই তাহলেও নব্য-প্রস্তর যুগের অনেক কিছুকেই এখনও পর্যন্ত টিকে থাকতে দেখা যাবে।[১২]

ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের অনুসরণ করে বলা যায় সারা উত্তর-ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের মত মুর্শিদাবাদেও নব্য-প্রস্তর যুগে কৃষি-কেন্দ্রিক গ্রামীণ বসতিগুলির পত্তন করেছিল অস্ট্রিক বা কোল ভাষাভাষি লোকেরা যাদের নব-গোষ্ঠীগত পরিচয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে আদি-অস্ত্রাল নামে। ছিটানো কৃষি থেকে অস্ট্রিকরাই প্রথম জমি চাষ করে কৃষির প্রবর্তন করে। চাষের জন্য তীক্ষ্ণ মুখ যে কাষ্ঠদণ্ড তারা ব্যবহার করত তারই নাম অস্ট্রিক ভাষাতে ছিল লাঙ্গল। অস্ট্রিকরাই প্রথম ধান চাষ, কলা এবং আখ চাষ এ জেলাঞ্চলে প্রবর্তন করে। পান, বেগুন, লাউ চাষও তাদেরই অবদান। অস্ট্রিক ভষীরাই মাছ ধরা ও মাছ খাওয়ার ব্যাপক চলন ঘটিয়েছিল এ অঞ্চলে। সরষে এবং সরষের তেলের ব্যবহার তারাই চালু করেছিল। পূর্ববর্তী কালের নেগ্রিটো ভাষাভাষী এবং পরবর্তী কালের দ্রাবিড় ভাষাভষীদের কিছু কিছু প্রভাব পড়লেও মূলত অস্ট্রিক ভাষাভাষীরাই এ জেলাঞ্চলের লোকেদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মূল কাঠামোগুলো রচনা করে দিয়েছিল ; কৃষিকাজ, পশুপালন, মাছধরা এবং হস্তশিল্পের প্রবর্তন এদের দ্বারাই ঘটেছিল। শুধু বাস্তব-সংস্কৃতির উপাদানগুলিই নয়, এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, উৎসবাদি যেমন অস্ট্রিকরা গড়ে দিয়েছিল, সেইরকমই গ্রামীণ মানুষের ধর্ম-চেতনা ও বিজ্ঞান-চেতনারও পত্তন ঘটিয়েছিল 'সদৃশ-বিধানী' ও 'সংস্পর্শ-বিধানী' যাদু-বিশ্বাস ও ক্রিয়ার মাধ্যমে। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, মাতৃকা পুজো, লিঙ্গ পুজো, গ্রাম, নদী, বৃক্ষ অরণ্য, ভূমি পুজো এগুলি নিয়েই গঠিত হয়েছিল অস্ট্রিকদের ধর্ম-বিশ্বাস। নবান্ন, পৌষপার্বন, হোলি, চড়ক, গাজন এবং আনুষ্ঠানিক কাজে চাল, কলা, পান, সুপারি,

নাবকেল, সিঁদুব, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোববেব ব্যবহাব এ-সবই অস্ট্রিকদেব অবদান। মানুষেব ব্যধি ও দুর্ঘটনা সমূহ দুষ্টশক্তি বা ভূতপ্রেত দ্বাবা সংগঠিত বলে' বিশ্বাস এবং এ-সবেব প্রতিষেধক হিসাবে 'বোজা', 'গুণিন' ইত্যাদি সাহায্য গ্রহণ, মন্ত্রোচ্চাবণ বা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদিব ব্যবস্থা যেমন অস্ট্রিকদেব অবদান, ঠিক সেইবকমই বাস্তব অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণেব উপব নির্ভব কবে বহুবকম গাছ-গাছড়াব ওষুধ (herbal medicine) এবং 'টোটকা'-ব প্রচলনও কবেছিল এই অস্ট্রিক ভাষা-ভাষীবাই নব্য-প্রস্তব যুগে। আজ পর্যন্ত এ জেলাঞ্চলেব সংখ্যাগবিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষেব বাস্তব ও মানসিক সংস্কৃতিব মূলধাবাটিই সেই নব্য প্রস্তব যুগে গড়ে ওঠা ছক বা প্যাটার্নকে অনুসবণ কবেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নব্য-প্রস্তব যুগেব যে-উত্তবাধিকাব গ্রামীণ মানুষ আজও বহন কবে চলেছে তাব সঠিক এবং পূর্ণ পবিচয় পেতে হলে ঐ সময়েব সমাজ-বিন্যাসেব রূপবেখাটিও আমাদেব জেনে নিতে হবে।

প্রধানত অস্ট্রিক-ভাষা-ভাষী যে জনগোষ্ঠী জেলাঞ্চলে গ্রামীণ জীবনচর্যাব পত্তন ঘটিয়েছিল তাবা বিভক্ত ছিল অনেকগুলি 'কৌম' বা Tribe-এ। প্রতিটি 'কৌম' আবাব বিভক্ত ছিল কয়েকটি 'গোত্র' বা clan-এ। বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত এই কৌমগুলি যে যেখানে বসতি কবেছে— সেই সেই অঞ্চলে তাদেব হাতে গড়ে উঠেছে গ্রাম-সমাজ। গোষ্ঠী-প্রতীক বা 'টোটেম' এবং গোষ্ঠী-নিষেধ বা 'ট্যাবু' এইসকল কৌম ও গোত্রেব আভ্যন্তব ও বাহ্য সম্পর্ক নির্ধাবণ কবেছে। আজকেব দিনেব সাঁওতাল, মুন্ডা নামেব উপজাতিদেব পূর্ব-পুরুষেবা এবং আজকেব দিনেব মধ্য ও নিম্ন বর্ণেব জাত্ (caste)- গোষ্ঠীভুক্ত বাগদি, বাউবী, পোদ, হাড়ি, ডোম, মাল, কৈবর্ত ইত্যাদিব পূর্ব-পুরুষেবা ছিল এই সকল কৌমেব সদস্য। নব্য-প্রস্তব যুগেব আদি পর্বে এই সকল কৌমেব মধ্যে এক ধবণেব পাবস্পবিক সমতা বিদ্যমান ছিল, অন্তত একটি কৌম অন্য কৌমেব অধীন বা প্রভু এবকম অবস্থায় ছিল না। কিন্তু নব্য-প্রস্তব যুগেব অন্ত্য পর্বে পেশাগুলিব গোষ্ঠীগত বিশেষীকবণ ও কৃষিকাজেব অবিসম্বাদি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াব ফলে কৃষিজীবি কৌমগুলিব সঙ্গে অন্যান্য পেশাব অনুসবণকাবী কৌমগুলিব সামাজিক মর্যাদাব তাবতম্য দেখা দিতে শুরু কবে। ভবিষ্যতেব জাতিভেদ-প্রথাব সূচনা এই ভাবেই হয়।[১৩]

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে নব্য-প্রস্তব যুগেব শেষ নাগাদ এই জেলাঞ্চলে মূলত বাঢ় এলাকাতেই গ্রাম সমাজগুলি সুগঠিত রূপ লাভ কবেছিল এবং তখনও পর্যন্ত জেলায় নগবেব উদ্ভব না ঘটায় নাগবিক অর্থনীতি ও সমাজেব বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল, যদিও গ্রামগুলিব জনসাধাবণেব মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যেব উদ্ভব খুব ক্ষীণ ভাবে হলেও সেই যুগেই দেখা দিতে শুরু কবেছিল। আজকেব মুর্শিদাবাদেব গ্রামীণ ও নাগবিক আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোব পূর্ণ রূপবেখাটি আত্মপ্রকাশ কবেছিল এই নব্য-প্রস্তব যুগেব পববর্তী তাম্র-প্রস্তব যুগে।

## ।। তিন ।।

বর্তমান শতাব্দীব ষাটেব দশকেব পব থেকে পশ্চিমবঙ্গেব নানা এলাকা সহ মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব ফবাক্কা, সাগবদিঘী ও চিকটী অঞ্চলে তাম্র-প্রস্তব যুগেব বসতি ও নানা দ্রব্যাদিব পবিচয মিলেছে।[১৪] প্রত্নতাত্ত্বিকেবা অনুমান কবেছেন যে খ্রীষ্টজন্মেব প্রায দুই হাজাব বছব আগে থেকে তাম্র-প্রস্তব যুগ শুরু হযে প্রায দেড় হাজাব বছব ধবে প্রচলিত ছিল খ্রীষ্টজন্মেব প্রায চাবপাঁচশো বছব আগে পর্যন্ত। নব্য-প্রস্তব যুগেব গ্রামীণ সভ্যতাব ভিত্তিব উপবেই বিকশিত হযেছিল পববর্তীকালেব তাম্র-প্রস্তব যুগেব প্রাথমিক নগব সভ্যতা (Proto-urban culture)। তামাব ব্যবহাব শেখাব ফলে এই যুগে সুনিশ্চিতভাবে পূর্বাপেক্ষা উন্নততব যন্ত্রপাতিব ব্যবহাব চালু হযেছিল। এই যুগেই ইঁটেব সাহায্যে গৃহাদি নির্ম্মান কবতে দেখা যায, প্রস্তব শিল্পেবও বৈচিত্র বৃদ্ধি ঘটে। সুপবিকল্পিত শহব ও বাস্তাঘাটেব পত্তন হতে থাকে। মুর্শিদাবাদে গুমাণী ও ভাগিবথী নদীব সংযোগস্থলে বর্তমানে ফাবাক্কাব কাছে একটি প্রাথমিক নগবাঞ্চলেব উদ্ভব ঘটেছিল বলে প্রত্নউৎখননেব ফলে প্রমাণ পাওযা গেছে। অনুমিত হযেছে ফাবাক্কাব কাছেব এই নগবাঞ্চলটি বর্ধমান জেলায উৎখনিত পাণ্ডুবাজাব ঢিবিব এবং বীবভূম জেলাব মহিষদলেব অনুরূপ এবং প্রায সমকালীন। চিকটী অঞ্চলে তাম্র-প্রস্তব যুগেব বসতিব ও দ্রব্যাদিব নিদর্শন মিললেও এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক নগবোদ্ভবেব কোন প্রমাণ মেলেনি, যদিও এ অঞ্চলেব পববর্তী কালেব ইতিহাস এ-সম্পর্কে ব্যাপকতব অনুসন্ধানেব প্রযোজনীযতাকে তুলে ধবে।

এ কথা মনে কবাব সঙ্গত কাবণ আছে যে জেলাঞ্চলেব দক্ষিণ দিক থেকেই অস্ট্রিক-ভাষা-ভাষী কৌমগুলিব মাধ্যমে তামাব ব্যবহাবেব প্রচলন এখানে হযেছিল। তাম্র-প্রস্তব যুগেব শেষ দিকে জেলাঞ্চলে বৌপ্যেবও প্রচলন হযেছিল। তাম্র-প্রস্তব যুগে জেলাঞ্চলে প্রাথমিক নগবাযনেব যে প্রমাণ মিলেছে তাব উদ্ভবেব পিছনে কিছুটা আভ্যন্তবীণ ও অনেকটাই বাহ্য এই দুই প্রকাব চাপেব ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য। নব্য-প্রস্তব যুগেব শেষ দিকেই গ্রামীণ জীবনেব আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যেব যে চিহ্নগুলি পবিস্ফুট হতে থাকে তাম্র-প্রস্তব যুগে এসে সেগুলি আবো বিকশিত হয। মূলত খাদ্যশস্যেব উৎপাদন তামাব যন্ত্রপাতি ব্যবহাবেব ফলে ক্রমশ বৃদ্ধিব জন্যই নাগবিক জীবনে খাদ্যেব যোগান সম্ভবপব হযে ওঠে। গ্রাম সমাজ থেকে শহবেব জন্য উদ্বৃত্ত নিষ্কাষণ,— তা যত অল্প পবিমাণেই হোক, সুনিশ্চিতভাবে গ্রামেব মধ্যেকাব শ্রম-বিভাজন এবং আর্থিক সামাজিক বৈষম্যকে বাডিযে দিযেছিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম আব শহবেব বৈষম্যেব সূচনাব মধ্যে দিযে আর্থ-সামাজিক জীবন এক নতুন পর্যাযে প্রবেশ কবেছিল। নাগবিক জীবনেব আবির্ভাব খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানেব উপকবণগুলিকে আবো উন্নততব কবে তোলে। বিনিময বাণিজ্য উন্নততব রূপ নেয, সম্ভবত কডি জাতীয বিনিময় মাধ্যমেব প্রচলন হতে শুরু হয। নব্য-প্রস্তব যুগেব অন্ত্য পর্বে গ্রামীণ জীবনে বৈষম্যেব যে উদ্ভব ঘটেছিল নাগবিক জীবনেব উদ্ভবেব ফলে তাম্র-প্রস্তব যুগে তাকে দেখা গেল বহুগুণিত হতে। নব্য-প্রস্তব যুগ তামাব ব্যবহাব প্রচলনেব মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিকভাবে তাম্র-প্রস্তব যুগে বিকশিত হলেও এবং এব ফলে নগবেব উদ্ভবেব সূচনা ঘটলেও এই আভ্যন্তবীণ চাপেব ফলে নাগবিক বিকাশ ত্ববান্বিত বা বিস্তৃত হওয়াব সম্ভাবনা ছিল কমই। কেননা, গ্রামগুলি ছিল দূবে দূবে ছড়ানো ছিটানো, গ্রামগুলিব মধ্যে যোগাযোগেব ব্যবস্থা ছিল নামে মাত্র এবং বর্ষাকালে জেলাব পশ্চিমাঞ্চলেব এই গ্রামগুলি হয়ে যেত পবস্পব থেকে বিচ্ছিন্ন।[১৫] এই পবিস্থিতিতে কেবলমাত্র

নিকটবর্তী কযেকটি গ্রামেব উদ্বৃত্ত গ্রামীণ খাদ্যশস্যাদিব ভিত্তিতেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও প্রাথমিক নগবাযণেব সম্ভাবনামাত্রই ছিল। তাম্র-প্রস্তব যুগে নব্য-প্রস্তব যুগেব আভ্যন্তবীণ বিকাশ ও পবিবর্তনেব এই ধাবাব সঙ্গে এসে যুক্ত হযেছিল বহিবাগত এবং সদ্য-সমাগত দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী লোকেদেব উন্নত নাগবিক অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-চেতনা। হবপ্পা-মহেঞ্জোদড়োব দ্রাবিড়-ভাষা-ভাষী নাগবিক জনগোষ্ঠীগুলো আর্য-ভাষীদেব আক্রমণেব ফলে ভাবতেব উত্তব পশ্চিমাঞ্চল থেকে ক্রমশ পূর্বাঞ্চলে সবে আসতে শুরু কবে। তাম্র-প্রস্তব যুগেব শুরু হওযাব অব্যবহিত পবেই পশ্চিম দিক থেকে এই দ্রাবিড়-ভাষী জনগোষ্ঠীবা জেলাঞ্চলে আসতে থাকে এবং এখানকাব অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সুদূবপ্রসাবী পবিবর্তন নিযে আনে। এই দ্রাবিড়-ভাষী গোষ্ঠীবা এখানে আর্থ-সামাজিক জীবনে নগবাযনেব প্রবণতাকে যথেষ্ট জোবালো কবে তোলে, যাতাযাত যোগাযোগেব ব্যবস্থাকে— বিশেষত নদীপথে— পূর্বাপেক্ষা উন্নত কবে তোলে এবং বিনিময ও বাণিজ্যবৃদ্ধিও কিছুটা ঘটায। সম্ভবত এই বাণিজ্য-সূত্রেই অকৃষি উৎপাদন, বিশেষত রূপোব মত ধাতু-নিষ্কাষণ ও বেশমী বস্ত্রশিল্প উন্নত হযে ওঠে। দ্রাবিড়-ভাষী গোষ্ঠীবা যে তাদেব কৌম-সমাজেব বিকাশেব দিক দিযে জেলাঞ্চলেব প্রাচীনতব অস্ট্রিক-ভাষী কৌমগুলি অপেক্ষা উন্নততব পর্যাযে ছিল তা তাদেব অর্থনৈতিক কাজকর্মেব উন্নত মান থেকেই বোঝা যায। ফলে জেলাঞ্চলে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীব মিলনে মিশ্রণে সামাজিক গোষ্ঠী বিন্যাসেও দেখা গিযেছিল জটিলতাব প্রসাব ও বৃদ্ধি। তাম্র-প্রস্তব যুগে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব পূর্বে-থেকে-চলে-আসা গ্রামীণ জীবনে ও নবোদ্ভূত নাগবিক জীবনে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্যেব যে ক্রমবৃদ্ধি লক্ষ্য কবা যাচ্ছিল তাব ফলে কৌম-ভিত্তিক সামাজিক সংগঠনেব সাহায্যে নতুন আর্থ-সামাজিক জীবনকে সুশৃঙ্খল বাখা হযে উঠেছিল কঠিন।[১৬] ফলে এক ধবনেব কর্তৃত্বেব বিকাশ ঘটেছিল যাকে বলা যায প্রাক্-বাষ্ট্রীয কর্তৃত্ব (Proto-state authority)। মোট কথা, তাম্র-প্রস্তব যুগেই প্রাচীন কৌম সমাজ ভাঙতে শুরু কবেছিল এবং তাব জাযগায আঞ্চলিক সমাজেব উদ্ভব শুরু হযেছিল— আর্থিক অবস্থাব পার্থক্য ও কৌম-ভিত্তিক সামাজিক পার্থক্যেব উপব নির্ভবশীল শ্রেণী তথা জাত্ ব্যবস্থাব রূপবেখা পূর্বাপেক্ষা স্পষ্টতব হযে উঠেছিল। তাম্র-প্রস্তব যুগে জেলাঞ্চলে দ্রাবিড়-ভাষী অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্কৃতি-যুক্ত কৌম গোষ্ঠীগুলিব আগমন ও তাব ফলে জেলাঞ্চলেব আর্থ-সামাজিক জীবনেব বহুদিকে উল্লেখযোগ্য পবিবর্তনেব সূচনা হলেও এই গোষ্ঠীগুলো সংখ্যা ও বিস্তৃতিব দিক দিযে পূর্বতন অস্ট্রিক-ভাষী কৌমগোষ্ঠীগুলিব তুলনায ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু উদীযমান নগবকেন্দ্র, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা জাযমান প্রাক্-বাষ্ট্রীয কর্তৃত্বেব সঙ্গে যুক্ত থাকায এদেব বাস্তব ও মানসিক সংস্কৃতিব প্রভাবে জেলাঞ্চলেব মানুষেব মধ্যে উচ্চবর্গেবই সংখ্যা ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল।[১৭] তাম্র-প্রস্তব যুগেব এইসকল পবিবর্তনেব পবিপ্রেক্ষিতেই জেলাঞ্চলেব বিভিন্ন অংশ তাদেব আঞ্চলিক পবিচিতি অর্জন কবেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতকেব মধ্যে আর্য-ভাষীদেব বচনাবলীতে জেলাঞ্চলেব যে-সকল অংশ বাঢ়, গৌড়, কুড্য এই আখ্যা পেযেছে তাবা যে এই সমযেব পূর্বে তাম্র-প্রস্তব যুগেই এই ধবনেব আঞ্চলিক পবিচিতি লাভ কবেছিল সে-বিষযে সন্দেহেব অবকাশ নেই। দ্রাবিড়-ভাষী বিভিন্ন কৌম-গোষ্ঠী স্থাযী-ভাবে বসবাসেব মধ্যে দিযেই যে এই ধবনেব জনপদ-পবিচিতি গড়ে তুলেছিল তাব কিছু ইঙ্গিত বযে গেছে জনপদগুলিব নামান্তে দ্রাবিড়-ভাষা সুলভ ঢ, ড, ড্য শব্দাংশেব ব্যবহাব। কৌম জনগোষ্ঠীব নাম থেকে আঞ্চলিক জনপদেব নামকবণই ছিল সেযুগেব বীতি। এইজন্য, প্রাক্-আর্য দ্রাবিড় ভাষী 'গোন্ড'

কৌমগোষ্ঠী থেকেই 'গোঁড'— 'গৌড' এই ৰূপান্তব ঘটেছে এই যুক্তি 'গৌড' নামেব উৎপত্তিব অন্যান্য ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতব গ্রহণযোগ্য। জেলাঞ্চলেব অন্যদুটি অংশেব 'বাঢ' ও 'কুড্য' অ্যাখ্যা ও একইভাবে ভাষা-গোষ্ঠীগত বা নৃগোষ্ঠীগত কাবণে ঘটেছিল বলেই অনুমান কবা যায। জেলাঞ্চলে বর্তমান ফাবাক্কা এবং খুবই সম্ভবত বর্তমান চিকটী অঞ্চলে তাম্র-প্রস্তব যুগেই দুটি প্রাথমিক নগবকেন্দ্রেব উদ্ভব ঘটলেও সে সমযে তাবা কোনও নাম-পবিচিতি লাভ কবেছিল কীনা তাব প্রমাণভাব। তবে জনপদেব নাম থেকেই নগবকেন্দ্র-দুটিব নামকবণেব সম্ভাবনাই বেশী।[১৮]

এইভাবে খ্রীষ্টজন্মেব প্রায পাঁচ ছযশো বছব পূর্বে প্রায সাড়ে সাত হাজাব বছব ধবে বিকশিত বিবর্তিত গ্রাম-সমাজ এবং প্রায হাজাব বছবেবও বেশী সময ধবে উদীযমান প্রাথমিক স্তবেব নাগবিক সমাজেব ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদেব জনগণ ইতিহাসেব আলোকিত প্রাঙ্গণে তাদেব যাত্রা শুরু কবেছিল, জেলাঞ্চলে আর্য-ভাষাভাষী লোকেদেব পদসঞ্চাবেব সঙ্গে সঙ্গে লৌহযুগে প্রবেশেব মধ্যে দিযে আমাদেব চেনা মুর্শিদাবাদেব বিবর্তন শুরু হযেছিল। সেই সময থেকে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে আজ পর্যন্ত গত প্রায আড়াই হাজাব বছবে এ জেলাঞ্চলেব উপব বহিবাগত তিনটি জনগোষ্ঠীব বহুমুখী প্রভাব দীর্ঘকালেব ব্যবধানে ঢেউ-এব মত এসে পড়েছে। কিন্তু এ-জেলাব অর্থনৈতিক জীবনেব ভিত্তিতে এব ফলে কোন মৌলিক ৰূপান্তব ঘটেনি, এখনও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল গ্রাম-প্রধান কৃষি-প্রধান একটি এলাকাই বযে গেছে। ববং বলা যায এই তিনবাবেব প্রভাবেব ঢেউ-এ জেলাব জনগণেব জীবনেব সামাজিক সাংস্কৃতিক উপবিতলেব আযতন, বিন্যাস, বৈচিত্র্য এবং শক্তি-সামর্থ্যেব ৰূপান্তব ঘটেছে।

চাব ॥

জেলাঞ্চলে ঐতিহাসিক কালে বহিবাগত প্রভাবেব প্রথম ঢেউটি আর্য-ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীব। অনুমিত হযেছে যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টীয ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত প্রায বাবশো বছব ধবে সাবা বাংলাব মত মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেবও চলেছিল জোবদাব আর্যীকবণ। ঐ সমযেব পূর্বেও এ অঞ্চলে আর্যভাষীদেব আনাগোনা থাকলেও অনার্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড-ভাষীদেবই ছিল আর্থিক-সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রাধান্য। কিন্তু আনাগোনা থাকলেও আর্য-ভাষীবা খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠশতকেব পূর্বে কেন এ অঞ্চলে আর্যীকবণ শুরু কবতে পাবেনি? একথা মনে কবাব কাবণ আছে যে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতকে আর্যভাষীবা লৌহেব ব্যবহাব শেখাব ফলেই আর্যভাষী সমাজে একপ্রকাব দ্বিমুখী প্রযুক্তিগত ও সামাজিক বিপ্লব ঘটে যায: কৃষিকার্যেব অভূতপূর্ব উন্নতি ও প্রসাব ঘটে এবং বলপ্রযোগেব প্রযুক্তিব বিকাশ ঘটায বাষ্ট্রীয কর্তৃত্বেবও উদ্ভব ঘটতে থাকে। উপবোক্ত দুই শতকে পাঞ্জাব থেকে বর্তমান বিহাব পর্যন্ত বিস্তৃত আর্যভাষীদেব সমাজ-সংস্কৃতিতে আবো কিছু আলোড়ন লক্ষ্যণীয হযে ওঠে: দ্রাবিড ও অস্ট্রিক ভাষা ভাষীদেব সঙ্গে আর্যভাষীদেব উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক লেন-দেন ও মিলন-মিশ্রণ ঘট্তে থাকে এবং তাব ফলে একদিকে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষীবা আর্যভাষা গ্রহণ কবতে শুরু কবে এবং অন্যদিকে আর্যভাষীবা অস্ট্রো-দ্রাবিড় সামাজিক ও ধর্মীয চিন্তাভাবনাব দ্বাবা প্রভাবিত হয। আর্য-ভাষীবা দ্রাবিড় নাগবিক সংস্কৃতি ও জীবনচর্যাকে স্বীকাব কবে নিযে নতুনভাবে নাগবিক সংস্কৃতিব শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে শুরু কবে। তাবা পাঞ্জাব থেকে পূর্বাভিমুখে অগ্রসব হতে

থাকলেও পাঞ্জাব অঞ্চলের সঙ্গে সুগম যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা এবং অশ্ব, লবণ ও সোমরসের জন্য বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখে এবং এই বাণিজ্যের সবিশেষ বৃদ্ধিও ঘটাতে থাকে।

এই সকল গতিশীল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আর্যভাষীরা যখন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে জেলাঞ্চলের আর্যীকরণ শুরু করে তখন খুব অল্পদিনের মধ্যেই নানা ক্ষেত্রে জোরালো পরিবর্তন দেখা দেয়। আর্যীকরণের এই সমগ্র পর্যায়টির মধ্যে আমরা কয়েকটি পর্ব লক্ষ্য করি।[১৯]

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রচারের মধ্যে দিয়েই এ অঞ্চলের আর্যীকরণের প্রথম পর্বটি অতিক্রান্ত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকের মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসারও আর্যীকরণকে সাহায্য করেছিল। আর্যীকরণের প্রসার সামাজিক প্রয়োজনে ব্রাহ্মণদের ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের এ অঞ্চলে আগমনের পথও প্রশস্ত করেছিল। প্রথম পর্যায়ের এই আর্যীকরণ ছিল প্রধানতই ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগে। স্বভাবতই দ্রাবিড়-ভাষীদের নিয়ন্ত্রিত প্রাক্-রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এবং তার অধীন অস্ট্রো-দ্রাবিড় কৌমগুলির উপর এই প্রাথমিক আর্যীকরণের প্রভাব প্রাধান্যের জায়গায় পৌঁছতে পারেনি।[২০]

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেই জেলাঞ্চল মগধ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে আর্যীকরণের দ্বিতীয়পর্ব অতি দ্রুত ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং মৌর্যযুগের শুরুর প্রায় সমকালীন সময় থেকে এই পর্বটি মোটামুটি চারশো বছর অব্যাহত ছিল। জেলাঞ্চলে প্রাক্-রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের জায়গায় মগধের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্বতন অধিবাসীদের মধ্যেকার প্রাথমিক নগরকেন্দ্রগুলির ও নিকটবর্তী গ্রামবাসী উচ্চবর্গের উপরই সর্ব প্রথম রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্রশক্তির পশ্চাদ্‌বর্তী অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের এবং আর্য-ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়তে শুরু করল, যেমন অনুরূপ পরিস্থিতিতে অন্যত্রও দেখা গিয়ে থাকে।[২১] অন্যভাবে বলা যায় যে প্রাক্-আর্য সমাজের উচ্চবর্গীয়রা জেলাঞ্চলে উচ্চবর্গ হিসাবে নব-প্রতিষ্ঠিত আর্যদের অনুগামী ও সহযোগী ভূমিকা গ্রহণ করল। ব্যাপক সাধারণ মানুষের উপর এই পর্বে আর্যীকরণের পরোক্ষ প্রভাব পড়ল— তারা অধিকতর অত্যাচার ও শোষণের শিকার হল। এই আর্যীকরণ একদিকে যেমন কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটাল অন্যদিকে সেইরকম রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে নগর ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবি জনগণ রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ব্যবস্থার মুখোমুখি হল, উদ্বৃত্তের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অংশ ত্যাগ করতে এবং রাষ্ট্রকে রাজস্ব প্রদান করতে বাধ্য হল। তা ছাড়া, বহিরাগত আর্য-ভাষীরা গ্রাম-সমাজের উচ্চস্তরে বসতি বিস্তার করতে এবং প্রতিষ্ঠা পেতে থাকল। গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের বসতি-বিস্তার ঘটেছিল ধর্মপ্রচার ও ভূমিদান সূত্রে। এর ফলে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন থেকে উদ্বৃত্ত-নিষ্কাষণ, শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটে— জমির উপর সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত মালিকানার সৃষ্টি হয়। তাম্র-প্রস্তর যুগে উপজাতীয় কৌমগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলি ছিল অঞ্চল (territory) সম্পত্তি (Property) নয়।[২২] প্রাক্-রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উদ্ভব এই পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন ঘটালেও তাম্র-প্রস্তর যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটেনি। কিন্তু জেলাঞ্চল মগধের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে আসায় সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিগত মালিকানা ও চাষ-যুক্ত জমি থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তন ঘটে, এই মালিকানা নগর কেন্দ্রগুলি থেকে ক্রমশ দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর্যভাষীরা লৌহের ব্যবহার চালু করায় কৃষি-প্রযুক্তির এবং বসতি বিস্তারের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে এবং কৃষি

তথা অকৃষি উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায। কিন্তু কৃষিব উন্নতি উদ্বৃত্ত সৃষ্টিব মাধ্যমে গ্রাম-সমাজেব অভ্যন্তবে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে তীব্রতব কবে তোলে। ফলে কৃষি-সম্পর্কিত স্থাবব ও অস্থাবব ব্যক্তিগত সম্পত্তিব সুস্পষ্ট আবির্ভাব লক্ষ্য কবা যায— নব্য-প্রস্তব যুগেব অন্ত্য পর্ব থেকে ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্য অবশেষে প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ কবে। অন্যদিকে, বিপুল পবিমাণ গ্রামীণ উদ্ধৃত্ত-নিষ্কাষণ সমান্তবাল নগবাযণেব অন্যতম পূর্বশর্তও বচনা কবে চলে।[২৩]

বাজগৃহ পাটলিপুত্রেব মত নগবকেন্দ্রিক মগধবাজ্যেব অঙ্গীভবন এবং গ্রামাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যবৃদ্ধিব ফলে উদ্বৃত্ত আহবণেব পবিমাণবৃদ্ধি জেলাঞ্চলে জোবদাব নগবাযণেব প্রবণতা সৃষ্টি কবে। এব ফলে, তাম্র-প্রস্তব যুগেই জেলাঞ্চলেব উত্তবে ও দক্ষিণে যে-দুটি এলাকায প্রাথমিক নগবাযনেব শুরু হযেছিল সে দুটি এলাকাব প্রভাব বলযেব মধ্যেই নদীতীবে অপেক্ষাকৃত বিশালতব দুটি নগবেব উদ্ভব ঘটেছিল— প্রথমে গৌড় ও অব্যবহিত পবে সুবর্ণকুড্য বা পববর্তী কালেব কর্ণ সুবর্ণ।[২৪] তাম্র-প্রস্তব যুগেব প্রাথমিক নগবাযণেব ধাবাবাহিকতায এই দুটি নগবেব উদ্ভব ঘটলেও এবা সুনিশ্চিতভাবে লোকসংখ্যা, নগব বিন্যাস ও নগব-প্রকৃতিব দিক থেকে নগব-সভ্যতাব বৈশিষ্ট্য অর্জন কবেছিল এই পর্বেই। এই দুই নগবেব মধ্যে গৌড় অল্পদিনেই প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে বিপুল খ্যাতি-প্রতিষ্ঠাব অধিকাবী হযেছিল। সম্ভবত আবো দুটি কাবণে গৌড়েব গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল— গঙ্গাব অপব তীববর্তী পৌণ্ড্র দেশেব ও পুণ্ড্রনগবেব সঙ্গে মগধেব যোগাযোগেব পথে সামবিক দিক দিযে গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গাতীবে অবস্থিত হওযাব জন্য এবং বর্তমান গুমাণী-বাঁশলই-পাগলা ইত্যাদি নদীব পশ্চিমাংশে বৌপ্য এবং সম্ভবত লৌহেব উৎস অবিষ্কৃত হওযায। পববর্তী কালে কর্ণ সুবর্ণ আখ্যাযিত সুবর্ণকুড্যেব প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠেছিল আভ্যন্তবীণ নদী বন্দব এবং বেশমী বস্ত্র-শিল্পেব কেন্দ্র হিসাবে। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীব মধ্যভাগে পাটলিপুত্র মগধেব বাজধানী হওযাব পব গৌড় ও সুবর্ণকুড্যেব দ্রুত বৃদ্ধি ও সম্প্রসাবণ ঘট্‌তে থাকে। যদিও গৌড় ও সুবর্ণকুড্য বা কর্ণসুবর্ণেব নগব-কাঠামো বা নগব-বিন্যাস সম্পর্কে পুণ্ড্রনগবেব মত কোনই প্রত্ন-প্রমাণ এখনো পর্যন্ত মেলেনি, তাহলেও পবিস্থিতিগত কাবণে অনুমান কবা যায যে মগধ বাজ্যেব কর্তৃত্বাধীনে এই নগবগুলিও বাজধানী পাটলিপুত্রেব আদলেই গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্যবৃদ্ধি, প্রশাসনিক ও সামবিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠা ইত্যাদি নানা কাবণে গৌড় ও সুবর্ণকুড্য তাদেব সমৃদ্ধিব জন্য প্রধানত গ্রামীণ কৃষি উদ্বৃত্তেব উপবেই একান্তভাবে নির্ভবশীল ছিল একথা বলা যায না। বিশেষত মৌর্য শাসনকাল থেকেই যে বহির্বাণিজ্যেব প্রসাব ঘটতে শুরু কবেছিল সে বিষযে সন্দেহ নেই।[২৫] জেলাঞ্চলেব আর্যীকবণ এক ধবনেব যোগাযোগ বিপ্লবও ঘটিযে দিযেছিল। তাম্র-প্রস্তব যুগে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হযেছিল ঠিকই, কিন্তু আর্যীকবণেব কালেই নৌ-পথই জেলাব যোগাযোগ ব্যবস্থাব প্রধান ধাবায পবিণত হয এবং বিংশ শতাব্দীতে জেলাঞ্চলে বেলপথ আসাব পূর্ব পর্যন্ত জলপথেব এই প্রাধান্য বজায় থাকে। আভ্যন্তবীণ ও বহির্বাণিজ্যেব ক্রমবৃদ্ধি এবং মগধবাষ্ট্রেব নৌ-বাহিনী গঠন নদীতীবে সামবিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জাযগায গৌড় ও সুবর্ণকুড্যেব অবস্থান সুনিশ্চিতভাবে এই যোগাযোগ-বিপ্লব সম্ভব কবে তুলেছিল এবং গৌড় জনপদেব খ্যাতিকে দূবপ্রসাবিত কবেছিল।

জেলাঞ্চলেব বাষ্ট্রভুক্তি, নগবায়ণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাব উন্নতি এখানে যে অকৃষি উৎপাদন, বিশেষত নাগবিক হস্তশিল্পেব উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল তা বোঝা যায জেলাঞ্চলেব 'পত্রোর্ণা' বেশমী বস্ত্র, 'দুকূল' বস্ত্র 'গৌড়ক' বৌপ্য এবং 'গুড়' বাণিজ্য দ্রব্য হিসাবে বাহিবে বপ্তানি

হতে শুরু করায়। বাণিজ্যবৃদ্ধি এবং রাজস্বের প্রয়োজন বিনিময় ব্যবস্থায় কড়ির পাশাপাশি মুদ্রারও প্রচলন ঘটিয়েছিল এই সময়ে। এই বাণিজ্য-বৃদ্ধিই নাগরিক সমৃদ্ধি, বিলাস ব্যসন ও উন্নততর সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিবেশ রচনা করেছিল। ফলে মগধের অভিজাত শ্রেণীরও অনেকে গৌড়ে বসতি স্থাপনে আকৃষ্ট হয়েছিল।[২৬]

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি আর্যীকরণের ফলে সামাজিক পরিবর্তনও ত্বরান্বিত হয়েছিল—জেলাঞ্চলে আর্যভাষী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বণিকদের বসতি পূর্বতন অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় কৌমগুলির মধ্যেকার বিভেদকে বাড়িয়ে তুলে তাদেরকে আরো গভীর ভাবে স্তর-বিন্যস্ত জাত্-কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে চলেছিল। দ্বিতীয়-পর্বের এই আর্যীকরণ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অত্যন্ত ধীর ভাবে ব্রাহ্মণদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ও সামাজিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রাক্ আর্যদের সঙ্গে আর্যভাষীদের রক্ত-সম্পর্ক এবং পেশাগত পার্থক্যকে আশ্রয় করে শূদ্রদেরও স্তর-বিন্যাস শুরু হয় এবং জাত্-কাঠামো ক্রমশ আঁটো সাঁটো স্থায়ী হয়ে উঠতে থাকে। ফলে জেলাঞ্চলের আদি অধিবাসীরা বর্ণ-ব্যবস্থায় বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের স্তরে নিপতিত হতে থাকে এবং বাকীরা বর্ণ-কাঠামোর বাইরে 'পঞ্চম' গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়ে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সামাজিক ব্যাপারে বর্ণ-ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়ায় রাজপুরুষেরা প্রধানত এই দুই ধর্মের অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও বর্ণ-ব্যবস্থা প্রসারিত হতে পেরেছিল। এইভাবে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই দ্বিতীয় পর্বের আর্যীকরণ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল তখন জেলাঞ্চলের আর্থিক-সামাজিক জীবনে বর্ণ-ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে তা নিরঙ্কুশ নির্ধারকের জায়গায় পৌঁছতে অবশ্যই সক্ষম হয়নি।[২৭]

জেলাঞ্চলের আর্যীকরণের তৃতীয় পর্বটি খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত প্রসারিত। এই সময়ের দুটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমত এই পর্বেও কৃষির প্রসার ও উন্নতি শুধু যে অব্যাহত থাকে তাই নয়, কৃষিজ উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে এই সময়েই জেলাঞ্চলের ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে— উদ্ভব ঘটে ভূ-স্বামী ব্যবস্থার (landlordism)। আর্য-ভাষীরা জমির উপর মালিকানা তথা মালিকানা-বহির্ভূত নানা সূত্রে কৃষি-শ্রম-জীবি অনার্যদের কাছ থেকে কৃষির উদ্বৃত্ত-নিষ্কাষণ ও শোষণ এবং বিনাশ্রমে অনর্জিত আয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে গ্রাম-সমাজের সমৃদ্ধ উচ্চতর স্তরে, ভূ-স্বামী হিসাবে। প্রায় দু'হাজার বছর পরে আজও এই ভূ-স্বামী ব্যবস্থা জেলার গ্রামাঞ্চলে যথারীতি অব্যাহত। এই ভূ-স্বামী ব্যবস্থার উদ্ভব, ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা এবং বর্ণ-ব্যবস্থার সুদৃঢ়করণ ছিল এই পর্বের পরস্পর-সংযুক্ত প্রক্রিয়া।[২৮] দ্বিতীয়ত বহির্বাণিজ্যের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি-সূত্রে জেলাঞ্চল থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অভিমুখে এই সময়ে জন-নিষ্ক্রমণ ঘটতে থাকে। লক্ষ্মীর প্রসাদ-ধন্য বণিকেরা এই জন-নিষ্ক্রমণে উদ্যোগী হলেও অন্যান্য নানা জাত্-ভুক্ত লোকেরাও যে ভাগ্য ফেরানোর জন্য তাদের অনুগামী হয়েছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে নগরকেন্দ্রগুলি ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকেই এই বহির্গমনের সম্ভাবনা ছিল অধিকতর। প্রধানত উপনিবেশের আকর্ষণ এই বহির্গমনের কারণ হলেও জেলাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের ধীরগতি পদসঞ্চারেরও কিছু ভূমিকা এ-ব্যাপারে থাকা অসম্ভব নয়।[২৯] আর্যীকরণের তৃতীয় পর্বের এই চারশো বছরেই সামাজিক দিক দিয়ে ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্য এবং বর্ণ-ব্যবস্থা এক গতিশীল প্রভাব-প্রবাহ সৃষ্টি করে ক্রমশ নির্ধারক জায়গায় চলে যেতে থাকে। তা ছাড়া এই পর্বেই পূর্ববর্তী ছশো বছরে প্রসরমান আর্যীকরণ ব্যাপক জনসাধারণকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও প্রভাবিত

কবতে থাকে। আর্যীকবণ শব্দটিব মধ্যেই যে ইঙ্গিত বিদ্যমান তাতে দেখা যায় যে আর্যীকবণেব সমগ্র পর্যায জুড়ে জেলাঞ্চলেব সংখ্যাগবিষ্ঠ অস্ট্রিক-দ্রাবিড-ভাষা-ভাষী জনগণ নিজেদেব ভাষা ছেড়ে দিযে ক্রমশ আর্যভাষীদেব ভাষা গ্রহণ কবেছিল। এই সময়ে শুধু জেলাঞ্চলই নয সমগ্র বাংলাদেশই আর্য-ভাষী হযে উঠেছিল। আর্যভাষাব কোন্ বিশেষ রূপটি বাংলাদেশে প্রথম প্রচলিত হযেছিল সে-সম্পর্কে ভাষা-বিজ্ঞানীবা এক সময়ে সিদ্ধান্ত কবেছিলেন যে 'মাগধী প্রাকৃতই' সাবা বাংলাদেশে ছড়িযে পড়েছিল। পববর্তীকালে লব্ধ প্রমাণাদি থেকে মনে কবাব কাবণ আছে যে মাগধী প্রাকৃত ছাড়াও বাংলাদেশে অর্ধ-মাগধী প্রাকৃত এবং শৌবসেনী প্রাকৃতও প্রভাব ফেলেছিল আর্যীকবণেব প্রথম ছশো বছবে। পববর্তী ছশো বছবে এই সকল বিভিন্ন প্রকাব প্রাকৃতেব ক্রিযা-প্রতিক্রিযা, মিলন-মিশ্রণ এবং অস্ট্রিক-দ্রাবিড ভাষাগুলিব নানা উপাদানেব স্বীকবণেব ফলেই উদ্ভূত হযেছিল যে-ভাষাটি তা ছিল এইসকল প্রাকৃত ভাষা থেকে খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতিব। মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টীয প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দীব মধ্যেই জেলাঞ্চলেও সাবা বাংলাব মতই আর্য-ভাষাব এই বিশেষ রূপটিব অবযব বা কাঠামো পবিণতি লাভ কবেছিল। এবং সাবা বাংলায প্রচলিত এই ভাষারূপটিই প্রায সমকালেই ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ বিশিষ্টতা-সূচক 'গৌড়ী প্রাকৃত' আখ্যা অর্জন কবেছিল।[৩০]

জেলাঞ্চলেব আর্যীকবণেব চতুর্থ ও শেষ পর্বটি প্রসাবিত ছিল খ্রীষ্ট-পববর্তী পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী জুড়ে। এই দুশো বছবেই মগধবাষ্ট্রে গুপ্তবংশেব শাসনকালেই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে প্রবহমান আর্যীকবণেব ধাবাটি পবিপূর্ণতা লাভ কবে। এই সময়েই জেলাঞ্চল একধবনেব সাংস্কৃতিক প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন কবেছিল যাব ফলে সমগ্র বাংলাদেশেব ভাষাকেই 'গৌড়ী প্রাকৃত' আখ্যাযিত কবা সম্ভব হযেছিল, সম্ভব হযেছিল বাংলাদেশেব বিশেষ ধবণেব সংস্কৃত সাহিত্য-বীতিকে 'গৌড়ী-বীতি' আখ্যা দেওযা। শুধুমাত্র এই দুটি আখ্যাব মাধ্যমেই জেলাঞ্চলেব যে সাংস্কৃতিক প্রাধান্য সূচিত হযেছিল সুনিশ্চিতভাবেই তাব বাজনৈতিক ভিত্তি বিদ্যমান থাকাব কথা। গৌড়েব এই প্রকাব সাংস্কৃতিক প্রভাব-ছটাব কাবণ ছিল সম্ভবত এই যে মগধ-বাষ্ট্রেব অঙ্গীভূত হওযাব পব সাবা বাংলাদেশই মূলত ঐ বাষ্ট্রেব একটি প্রদেশ হিসাবে গৌড় শহব থেকেই শাসিত হত। তা ছাড়া এই সময়েব পূর্ব হতেই মগধাঞ্চল থেকে সমাগত এবং গৌড় ও কর্ণসুবর্ণ (নবনামাঙ্কিত অতীতেব সুবর্ণকুড্য) শহবকে কেন্দ্র কবে জেলাঞ্চলে প্রোথিত আর্যভাষী উচ্চবর্ণ ও উচ্চ শ্রেণীব লোকেবাই এক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল এবং এই ঐতিহ্যকে সমগ্র বাংলাদেশেই ছড়িযে দিযেছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যেব প্রভাব শিথিল হতে শুরু কবলে এই উচ্চবর্গীয লোকেবাই উদ্যোগী হয জেলাঞ্চলে এক স্বাধীন বাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তুলতে। আর্যীকবণেব শেষপর্বেব এই বাজনৈতিক পবিপ্রেক্ষিত জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে কেমনভাবে প্রভাবিত কবেছিল এবং সাংস্কৃতিক জীবনেই বা অন্যাবিধ কোন কোম ধবনেব প্রভাব ফেলেছিল তা দেখা যেতে পাবে।[৩১]

আর্যীকবণেব এই শেষ দুশো বছবেই জেলাঞ্চলেব সামাজিক বিন্যাসেব কাঠামোটি বর্ণ-ব্যবস্থাব দিক থেকে সুস্থিতি লাভ কবেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য শাসনকাল থেকেই ব্রহ্মদেয ও অগ্রহাব গ্রামসমূহ প্রতিষ্ঠাব মাধ্যমে বহিবাগত ব্রাহ্মণদেব জেলাব গ্রামাঞ্চলে নিষ্কব ভূমিদানেব সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত কবাব যে বীতি গড়ে উঠেছিল এই দুশো বছবে তা সুনিশ্চিতভাবে দ্রুতগতি ও ব্যাপকতা এবং তাম্রলেখসমূহেব মাধ্যমে স্থাযিত্ব লাভ কবে। এই বীতিব ফলশ্রুতি হিসাবেই উদ্ভূত ভূস্বামী-ব্যবস্থাব মধ্যে দিযে ভূমি-সম্পর্কেব বিবর্তনে যে

নতুন অধ্যায়ের সূচনা আর্যীকরণের তৃতীয় পর্ব থেকে শুরু হয়েছিল এই দুই শতকে তা আরো ছড়িয়ে পড়তে ও জোরদার হয়ে উঠতে পেরেছিল। গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য নিরঙ্কুশ ও নির্ধারক জায়গায় উপনীত হওয়ার ফলে বর্ণ ও জাত্-ব্যবস্থা সুনিশ্চিতভাবে স্থায়ী ও সুকঠোর হয়ে উঠেছিল এবং এই ব্যবস্থার বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাসে ব্রাহ্মণদের কার্যকরী ভূমিকা দৃশ্যমান হয়ে উঠতে শুরু করেছিল।[৩২]

শেষপর্বের আর্যীকরণ তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের চাইতেও অর্থনৈতিক ফলশ্রুতির বিচারে ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে জেলাঞ্চলের আর্যীকরণ পরিসমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই এখানকার ভূমি-সম্পর্কের বিবর্তনে আরো একটি নতুন পর্যায়ের শুরু হয়েছিল। পঞ্চম শতকে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে শুরু করলে ইতিপূর্বেই উদ্ভূত ভূস্বামী ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল। রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ক্রমবর্ধমান শিথিলতার ফলেই ভূস্বামী শ্রেণীর একাংশের উপর রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পিত হতে থাকলো এবং এইভাবেই ভূস্বামী শ্রেণীর মধ্যে থেকে অথচ ভূস্বামী শ্রেণীর উপরে অবস্থিত রাজস্ব-সংগ্রাহক একটি শ্রেণী উদ্ভূত হতে শুরু করল। এই নতুন শ্রেণীটিকে বোঝাতেই জেলাঞ্চলে 'সামন্ত' শব্দটির ব্যবহার ষষ্ঠ শতাব্দীতেই লক্ষ্য করা গেল ; এই শ্রেণীটিকেই বোঝানোর জন্যই চৌদ্দশতক থেকে 'জমিদার' এই পারসি শব্দটির ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।[৩৩] পূর্ব থেকে প্রচলিত ভূস্বামী ব্যবস্থা এবং নবোদ্ভূত সামন্ত ব্যবস্থা বা জমিদার-তন্ত্র এই দুই ব্যাপার আলাদা হলেও ছিল পরস্পর-সংযুক্ত। বলা যায় সামন্ত-ব্যবস্থা বা জমিদার-তন্ত্র ভূস্বামী-ব্যবস্থারই প্রকারভেদ বিশেষ। সামন্ত বা জমিদার মাত্রেই ভূস্বামী, কিন্তু ভূস্বামী মাত্রেই সামন্ত বা জমিদার নয়। ভূমির অধিকারী ভূস্বামীরা বিনাশ্রমে অনর্জিত আয় হিসাবে কৃষিজ উদ্বৃত্ত ভোগ করে থাকে। অন্যদিকে সামন্ত বা জমিদার সরকারের ভূমি রাজস্ব আদায়কারী, তারা খাজনা হিসাবেই কৃষিজ উদ্বৃত্ত আহরণ করে থাকে এবং এই খাজনার একাংশ নিজেদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য রেখে বাকী অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে সরকারে জমা দেয়। অর্থাৎ অন্য ভূস্বামীদের মতোই সামন্ত বা জমিদারও বিনাশ্রমে অনর্জিত আয় হিসাবে কৃষিজ উদ্বৃত্ত ভোগ করে থাকে। তবে ভূস্বামী ও সামন্ত এই দুই ব্যবস্থার সাদৃশ্য অপেক্ষা পার্থক্যই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ভূস্বামী-ব্যবস্থা প্রাচীনতর এবং তার আয়ুষ্কালও সামন্ত-ব্যবস্থা বা জমিদার-তন্ত্রের চাইতে দীর্ঘতর, সম্প্রতি জমিদার-তন্ত্র বিলুপ্ত হলেও ভূস্বামী-ব্যবস্থা এখনও অব্যাহত। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল এই যে রাষ্ট্র ভূস্বামী ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল না, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবেই নির্ভরশীল ছিল সামন্ত-ব্যবস্থা বা জমিদার-তন্ত্রের উপর। সুতরাং সারা বাংলাদেশের মতোই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও মোটামুটি পঞ্চম ষষ্ঠ শতক থেকেই, অর্থাৎ আর্যীকরণের শেষ পর্বেই, ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামন্ত-নির্ভর সেই ব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছিল যা বাংলার গ্রাম-সমাজ ও কৃষি-ব্যবস্থার মূল কাঠামোটিকে মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিয়েছিল।[৩৪] রাজা শশাঙ্কর আমল, পাল-সেন যুগ, সুলতানী আমল, মোগল যুগ, নবাবী আমল, ইংরেজ রাজত্ব অতিক্রম করে স্বাধীনোত্তর কাল পর্যন্ত এই কাঠামোটিরই ধারাবাহিকতা নজরে আসছে, এই দীর্ঘ সময়ে এই কাঠামোর উপরের স্তরেই কেবলমাত্র কিছু প্রান্তিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। প্রসঙ্গত ভূস্বামী ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক সামন্ত-ব্যবস্থা বা জমিদারতন্ত্র এই দুটি পর্বেই যারা প্রত্যক্ষভাবে দৈহিক শ্রমের মাধ্যমে কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিল সেই কৃষকদের অবস্থা কেমন ছিল তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। ভূস্বামী-ব্যবস্থায়

ভূস্বামীবা যেহেতু দান বা ক্রয়সূত্রে জমিব অধিকাবী হলেও কৃষিউৎপাদনে হাত লাগাতো না, সেইজন্য তাদেব জমিতে চাষ হত ভাগচাষ বা দিনমজুবীব মাধ্যমে। শস্যভাগ বা শস্যমজুবীই ছিল প্রচলিত। গ্রামীণ অর্থনীতিতে যজমানী প্রথাব ক্রমপ্রচলনেব ফলেও ভূস্বামী শ্রেণীব অনেকে শস্যভাগেব অংশীদাব হত। অবশ্য ভাগচাষী ব দিনমজুবদেব পৃথক শ্রেণী হিসাবে দেখা দেওযাব সম্ভাবনা সে-যুগে ছিল না— জমিব মালিক চাষীবাই নিজেদেব জমি চাষ কবাব সঙ্গে সঙ্গে ভাগচাষী বা দিনমজুবেব কাজ কবত। মালিক চাষীদেব মধ্যে সুস্পষ্ট স্তববিভাজনও এই পর্যাযে লক্ষ্য কবা যায না। এক কথায ভূস্বামী শ্রেণী ছিল বিনাশ্রমে কৃষকদেব উৎপাদিত উদ্বৃত্ত ভোগকাবী এক পবগাছা শ্রেণী। এব পবে সামন্ত-ব্যবস্থাব উদ্ভব প্রকৃত কৃষকেব অবস্থাকে কবে তুলেছিল আবো শোচনীয। বাষ্ট্রেব জন্য বাজস্ব আদাযেব সুবাদে সামন্ত বা জমিদাব শ্রেণী ভূস্বামী শ্রেণীব বাকি অংশেব দ্বাবা প্রকৃত কৃষকদেব উপব চাপানো বোঝাকে 'খাজনা' রূপে আবো বহুগুণে বাডিযে দিযেছিল, কৃষি থেকে উদ্বৃত্ত নিষ্কাষণ জমিদাব-তন্ত্রেব এই আদি পর্বেই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেযেছিল।[৩৫] সুতবাং দেখা যাচ্ছে আর্যীকবণেব শেষ পর্বটি জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ইতিহাসে দীর্ঘস্থাযী ও গভীব প্রভাব ফেলতে সক্ষম হযেছিল।

আর্যীকবণেব শেষপর্বে জেলাঞ্চলে যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পবিবর্তন দেখা গিযেছিল সেগুলি মানুষেব ধর্মবিশ্বাসকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাব ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তব এনেছিল। প্রাক্ আর্য যুগেব জনসাধাবণেব ধর্মবিশ্বাসেব উপব আর্যীকবণেব সূচনা থেকে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মেব প্রভাব পডতে শুরু কবে এবং জেলাঞ্চল মগধ বাষ্ট্রেব অন্তর্ভূক্ত হওযাব পব বৌদ্ধ ধর্ম বাজকীয ধর্ম হিসাবে বিপুল প্রভাবেব অধিকাবী হযে ওঠে এবং কযেক শতাব্দী জুডে জেলাঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মেব এই প্রভাব বিদ্যমান থাকে। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মেব বিবোধী হলেও ব্রাহ্মণ-প্রধান বর্ণ বা জাত্-ব্যবস্থাব বিবোধী ছিল না। ফলে আর্যীকবণেব শুরু থেকেই জেলাঞ্চলে ব্রাহ্মণদেব সংখ্যা ও বসতি-বিস্তাব বাষ্ট্রীয সমর্থনেই অব্যাহত ছিল এবং তাব ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাষ্ট্রানুকূল্য ছাড়াই জেলাঞ্চলে ক্রমশ ধীবে ধীবে শক্তিশালী হযে উঠতে থাকে। অবশেষে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত শাসনকাল থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম বাষ্ট্রানুকূল্য লাভ কবায যথেষ্ট প্রভাবশালী হযে ওঠে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্যীকবণ সমাপ্ত হলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম জেলাঞ্চলে গ্রামীণ ও নাগবিক উচ্চবর্গীয মানুষদেব মধ্যে প্রাধান্যেব জাযগায উপনীত হয। কিন্তু ধর্মেব ক্ষেত্রে আর্যীকবণেব এই সকল প্রভাব সত্ত্বেও প্রাক্-আর্য ধর্মীয ও সাংস্কৃতিক ধ্যানধাবণা ও আচাব অনুষ্ঠানগুলি বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠ মানুষেব মধ্যে নিজস্ব ধাবাবাহিকতা বজায বাখতেই শুধু যে সমর্থ হয তাই নয, নবাগত ধর্মগুলিকে অর্থাৎ জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে লক্ষ্যণীযভাবে রূপান্তবিত কবতেও শুরু কবে।[৩৬]

সুদীর্ঘ বাবশো বছব ধবে জেলাঞ্চলেব মানুষেব যে আর্যীকবণ চলেছিল তাব সামগ্রিক ফলশ্রুতি বিচাব কবলে দেখা যায যে এব ফলে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদনেব অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটে, বিনিময ও বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থা গডে ওঠে, গ্রামীণ ও নাগবিক বসতি-বিন্যাস গঠনগত সুস্পষ্টতা লাভ কবে, বিপুল উদ্বৃত্তেব সৃষ্টি গ্রামীণ ও নাগবিক উচ্চবর্গেব পবিপোষণ সম্ভব কবে তোলে, সুবিন্যস্ত জাত্-ব্যবস্থা প্রায অনমনীয রূপ লাভ কবে এবং এ-সবেব ফলে বাষ্ট্রীয কর্তৃত্বেব প্রসাব অনিবার্য হযে ওঠে, সে কর্তৃত্ব একটি কেন্দ্র থেকে প্রযুক্ত হোক, অথবা বহুতব কেন্দ্র থেকে। কিন্তু এই সকল উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন সত্ত্বেও আর্যীকবণেব প্রভাব শ্রেণীস্তর ও জাতি-স্তব বিন্যস্ত জেলাঞ্চলেব উচ্চবর্গীয় মানুষদেব বাস্তব ও মানসিক

সংস্কৃতিকে যতখানি ও যত গভীবভাবে স্পর্শ ও প্রভাবিত কবেছিল সংখ্যাগবিষ্ঠজনেব, মূলত প্রাক্-আর্য অস্ট্রিক-দ্রাবিড় বংশজ নিম্নবর্গেব মানুষদেব, শ্রম-নির্ভব গ্রামীণ ও নাগবিক জীবনকে সে-ভাবে স্পর্শই কবতে পাবেনি।[৩৭]

আর্যীকবণ পবিসমাপ্তিব পববর্তী ছশো বছবে জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসেব গতিপ্রকৃতি আর্যীকবণেব দ্বাবা নির্ধাবিত কাঠামোগত রূপবেখাব মধ্যেই আবর্তিত হযেছিল। অবশ্য এই ছশো বছবে জেলাঞ্চলেব ইতিহাসেব এই মূল প্রবাহ-পথ সত্ত্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ কবাব মত কিছু আলোড়ন ও পবিবর্তনেব পবিচযও মেলে। প্রথমত এই সমযেই বাষ্ট্রীয ভবকেন্দ্র মগধ থেকে জেলাঞ্চলে সবে আসে এবং এখানে এক স্বতন্ত্র বাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলাব প্রক্রিযা শুরু হয। এই প্রক্রিযাব সমান্তবালেই এক স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে সামন্তশ্রেণীব বিকাশ ঘটেছিল। সপ্তম থেকে ত্রযোদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাজা শশাঙ্ক থেকে পাল-সেন যুগে কর্ণ সুবর্ণ ও গৌড়কে কেন্দ্র কবে যে শক্তিশালী বাষ্ট্রকর্তৃত্ব জেলাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয তাব ফলে একদিকে যেমন সামন্তশ্রেণীব আযতন বৃদ্ধি পায অন্য দিকে সেইবকম এই শ্রেণীটি ক্রমশ স্থানীয ও ক্ষুদ্রতব এবং ব্যপক ও বৃহত্তব দুটি স্তবে বিন্যস্ত হযে ওঠে। এইভাবেই নীচুতলা থেকে গ্রাম ও ভূমি কেন্দ্রিক একটি শক্তিব উদ্ভব ঘটেছিল, যাব উপব অর্পিত হযেছিল প্রাথমিক উৎপাদকদেব কাছ থেকে বাজস্ব সংগ্রহেব ভাব এবং নবোদ্ভূত বাষ্ট্রীয কাঠামোকে পবিপুষ্ট কবাব দাযিত্ব।[৩৮] দ্বিতীয়ত এই সমযে ভাবত মহাসাগবে আবব বণিকদেব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওযায জেলাঞ্চলেব বণিক-ব্যবসাযীদেব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব ক্রমাবনতি ঘটে এবং তাবফলে জেলাঞ্চলেব দুটি নগবকেন্দ্রেব মধ্যে নদী-বন্দব কর্ণসুবর্ণেব পতন অনিবার্য হযে ওঠে, যেমন অনিবার্য হয়ে ওঠে দক্ষিণবঙ্গেব সমুদ্র-বন্দব তাম্রলিপ্তেব পতনও। বাজনীতি ও প্রশাসনেব ভবকেন্দ্র কর্ণ সুবর্ণ থেকে গৌড়ে স্থানান্তবিত হওযায গৌড় এই পবিণতিব হাত থেকে অনেকটাই বেহাই পায। এই প্রকাব অবনগবাযণেব ফলে জেলাব অর্থনৈতিক জীবনে গ্রাম ও কৃষিব নিবঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয এবং কৃষিব উন্নতি উদ্বৃত্ত-সৃষ্টিব মাধ্যমে বাষ্ট্র কর্তৃত্বকে দৃঢতব কবে।[৩৯] তৃতীয়ত, অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীব মধ্যেই 'গৌড়ী প্রাকৃত' ক্রমশ বিবর্তিত হযে বাংলা ভাষাব উদ্ভব ঘটে এবং বাংলা সাহিত্যেব প্রাথমিক পবিচয মিল্‌তে থাকে।[৪০]

সামগ্রিক ফল বিচাবে একথা স্বীকাব কবতেই হয যে আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীব প্রভাব মুর্শিদাবাদেব জনজীবনেব কৃষি ও কুটিব-শিল্পেব শ্রম-নির্ভব গ্রামীণ মূলধাবায কাঠামোগত দিক থেকে প্রান্তিক পবিবর্তনই আন্‌তে পেবেছিল। কিন্তু এই কাঠামোব মধ্যেই যে সুদূব প্রসাবী পবিবর্তন এনেছিল— জেলাঞ্চলেব জনগণেব মধ্যে শ্রেণী ও জাত্ বৈষম্য শোষণকে যে বকম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিযেছিল, সমাজকে প্রভু এবং দাস এই দুই ভাগে যে-ভাবে বিভক্ত কবে দিযেছিল— তাব বহুমুখী ফলাফল থেকে আমবা আজও মুক্ত হতে পাবিনি। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব গ্রামীণ মানুষ এই সময থেকে যে অসংখ্য ছোটবড় বঞ্চনা, অত্যাচাব আব শোষণেব শিকাব হযে এসেছে সেগুলি কি তাবা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিযেছিল? ইতিহাসেব শিক্ষা থেকে আমবা জানি যে শোষক শ্রেণী বা শ্রেণীগুলিব বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীগুলিব সংগ্রাম কখনোই থেমে থাকে না— কখনো তা গোপনে মানসিক প্রতিবোধেব মধ্যে দিযে প্রবাহিত হয, কখনো বা তা রূপ নেয প্রকাশ্য বিবোধ ও সংঘর্ষেব। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব শোষিত মানুষেবা যে এইপর্বে শোষক শ্রেণীগুলিব বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত

হযেছিল তাব একান্তই প্রমাণাভাব। ববং কিছু পবোক্ষ প্রমাণাদি আমাদেব এগিযে দেয অন্যতব সিদ্ধান্তেব দিকে। প্রাচীন বাংলাব ইতিহাসে পাল বাজবংশেব বিরুদ্ধে ববেন্দ্রভূমিব কৈবর্ত বিদ্রোহ অসাধাবণ উল্লেখযোগ্য এক ঘটনা। এই বিদ্রোহেব নাযক দিব্য ও ভীম ববেন্দ্রেব 'অনন্ত-সামন্ত-চক্র'-এব সমর্থন-পুষ্ট হযে অত্যাচাবী পালবাজা মহীপালকে হত্যা কবে বাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল কবেছিল। দিব্য ও ভীমেব পিছনে ববেন্দ্রেব সামন্তবাই শুধু নয, ববেন্দ্রেব ব্যাপক জনসাধাবণও সমর্থন যুগিযেছিল। মহীপালেব ভাই বামপাল বাষ্ট্র-ক্ষমতা পুনর্দখলেব জন্য মগধ, দক্ষিণ বাঢ উত্তব বাঢেব যে সকল ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-যুক্ত সমাজেব সমর্থক সামন্ত নৃপতিদেব যুদ্ধেব প্রযোজনে একত্রিত কবেছিল সুনিশ্চিতভাবে তাদেব মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিযেছিল মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামন্ত বৃন্দ। কেননা, বামপাল 'অসৎ শূদ্র' কৈবর্তবাজ ভীমকে পবাজিত ও নিহত কবাব পব এই জেলাঞ্চলেই গৌড়েব নিকটেই বাজধানী বামাবতী নগব প্রতিষ্ঠা কবেছিল। সহজেই বোঝা যায মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে কৃষি-শ্রমজীবি গ্রামীণ মানুষেব উপব এখানকাব সামন্তবৃন্দেব ছিল নিবঙ্কুশ প্রাধান্য ও নিযন্ত্রণ এবং তাব ফলেই তাবা সমর্থ হযেছিল বামপালকে তাদেব সমর্থন যোগাতে। সত্য কথা বল্‌তে কী মৌর্যযুগ, গুপ্ত যুগ, বাজা শশাঙ্কেব আমল, অথবা পাল-সেন যুগ—এই সমস্ত সময জুড়েই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল গৌড় ও কর্ণসুবর্ণ নগবকে আশ্রয কবে হযে উঠেছিল বাজনৈতিক তথা সামবিক ক্ষমতাব এক কেন্দ্রীয এলাকা এবং এব সঙ্গে এসে যুক্ত হযেছিল সামাজিকভাবে ক্রমবর্দ্ধমান ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য। এ জেলাঞ্চলেব বঞ্চিত ও অত্যাচাবিত শ্রমজীবি মানুষেবা যে প্রকাশ্য বিদ্রোহে কৈবর্ত বিদ্রোহেব মত ফেটে পড়তে পাবেনি তাব কাবণ এখানেই খুঁজে পাওযা যাবে। গ্রাম সমাজেব গড়ন বা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যেব প্রসাব অপেক্ষাও বিপুল সামবিক শক্তিব সমাবেশই যে জেলাঞ্চলেব কৃষক-বিক্ষোভকে প্রকাশ্য রূপ পেতে দেযনি এ বিষযে সন্দেহেব অবকাশ নেই।[১০]

## ।। পাঁচ ।।

জেলাঞ্চলে বহিবাগত জনগোষ্ঠীব দ্বিতীয ঢেউটি ছিল আববী-ফার্সী-তুর্কী ভাষাভাষী ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্ক-আফগান-মোগলদেব। পাঁচশতাধিক বছব ধবে এই জনগোষ্ঠীগুলিব প্রভাব জেলাঞ্চলে ক্রিযাশীল থাকাব ফলে এখানকাব সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনচর্য্যায যেমন এব প্রভাব পড়ে সেইবকম জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক জীবনেও এই বহিবাগত উপাদান তাব ছাপ বেখে যায। অবশ্য আর্যীকবণেব তুলনায তুর্ক-আফগান-মোগলদেব প্রভাব ছিল যথেষ্টই কম। এই প্রভাবেব বিভিন্ন দিকেব আলোচনা কবলেই একথা বোঝা যাবে।

জেলাঞ্চলে তুর্ক আফগান-মোগল জনগোষ্ঠীব প্রভাব বিশ্লেষণেব সমযে আমাদেব মনে বাখতে হবে যে দুটি পর্বে এই তুর্ক-আফগান ও মোগল প্রভাব জেলাঞ্চলে পড়েছিল, এবং পড়েছিল মূলত বাষ্ট্রশক্তি দখল কবে সে শক্তিব ব্যবহাবেব মাধ্যমে। ত্রযোদশ শতাব্দীতে তুর্ক-আফগানবা যখন বাষ্ট্রক্ষমতা দখল কবে সুলতানী পর্বেব সূচনা কবেছিল তখন তাবা জেলাঞ্চলে বিদ্যমান ভূমি-সম্পর্কেব কাঠামোটিকেই সামান্য পবিবর্তন-সহ গ্রহণ কবেছিল।[১১] কেবলমাত্র সামবিক কাজকর্মেই সক্ষম ও আগ্রহী এবং মূলত শহববাসী ও অপবিচিতি অঞ্চলে আগত এই জনগোষ্ঠীব সুলতানেদেব প্রথম দিকে সামন্ত বা জমিদাব শ্রেণীব কাছে থেকে নির্দ্দিষ্ট বাজস্ব পেযেই সন্তুষ্ট থাকতে হযেছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সুলতানী ও মোগল আমলে

জেলাঞ্চলের ভূমি-সম্পর্ক বিবর্তনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল একদিকে রাষ্ট্রের দ্বারা অধিকতর সুশৃঙ্খলভাবে কৃষিজ উদ্বৃত্ত নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করা এবং অন্যদিকে এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই কৃষকদের মালিকানা স্বত্বকে আরো স্পষ্টতর রূপ দেওয়া। সুলতানী আমল থেকে জায়গীরদারী প্রথার মাধ্যমে রাষ্ট্র যেমন কৃষিজ উদ্বৃত্তের ব্যবহারের সাহায্যে সামরিক সেবা লাভের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছিল, সেইরকম এই প্রথার প্রবর্তনে সম্ভাবনা ছিল রাজস্ব কমে যাওয়ার। ফলে রাজস্বের ঘাটতি যাতে না হয়, সেইজন্য উৎপাদিত ফসলের এক ষষ্ঠাংশের বদলে এক চতুর্থাংশ/ এক তৃতীয়াংশ রাজস্ব সংগ্রহের নীতি চালু হয়েছিল— আরো বেশী পরিমাণে কৃষিজ উদ্বৃত্ত আহরণ সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। আবার জায়গীরদারেরাও নিরুদ্বেগ আয়ের জন্য তাদের জায়গীর ইজারা দিতে থাকে সামন্ত বা জমিদারদের। ফলে সরকার ও জায়গীরদার উভয় দিক থেকেই জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী মোগল আমলে তালুকদারী প্রথার প্রসারও কৃষক শোষণের এই ব্যবস্থাকে পরিপুষ্ট করে। এক কথায় উপর থেকে আসা রাষ্ট্রশক্তি নীচুতলা থেকে উঠে আসা সামন্ত ব্যবস্থা বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতির সামগ্রিক ফলশ্রুতি দাঁড়ায় এই যে আলোচ্য পর্বের গোটা সময়টা জুড়েই জমিদারতন্ত্র ক্রমশ আরো বেশী করে উদ্বৃত্ত নিষ্কাষণ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। এই পর্বেই জমিদারদের অধিকারগুলোও সুস্পষ্ট রূপ লাভ করায় অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তাদের পার্থক্যগুলিও পরিষ্কার হয়ে ওঠে। জমিদারী স্বত্ব সুনিশ্চিতভাবেই জমির উপর জমিদারদের সম্পত্তির অধিকার বা মালিকানা বোঝাতো না। জমিদারদের দুটি অধিকার ছিল— রাষ্ট্রের জন্য রাজস্ব-সংগ্রহের অধিকার এবং রাজস্ব-সংগ্রাহক হিসাবে কৃষিজ উদ্বৃত্তের একটি অংশ লাভের অধিকার। জমিদারদের এই অধিকারদুটি ছিল বিক্রয়যোগ্য এবং বংশানুক্রমিক অবশ্য জমিদারী সংক্রান্ত সব অধিকারই ছিল রাজস্ব যোগানোর সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল, সুদীর্ঘকাল রাজস্ব জোগাতে ব্যর্থ হলে জমিদারী হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। সামন্ত-ব্যবস্থা বা জমিদারতন্ত্রের পাশাপাশি সুলতানী ও মোগল দুই যুগেই পূর্ববর্তী সময়ের মতই ধর্মীয়, শিক্ষাগত ও সমাজ-সেবামূলক উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র-কর্তৃক ভূমিদানের ঐতিহ্য অব্যাহত ছিল— ফলে কলেবর বৃদ্ধি হয়ে চলেছিল পরশ্রমজীবি ভূস্বামী শ্রেণীরও।[১৩] এবিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই যে ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে জেলাঞ্চলে একদিকে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, চাষের জমির এলাকা ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়েছিল, কৃষির শস্য-বিন্যাসে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল, পণ্য শস্যের চাষাবাদ বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং সামাগ্রিকভাবে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে সেইরকম ভূস্বামী ও সামন্ত বা জমিদার এই উভয় প্রকার পরগাছা শ্রেণীর লোকেরও সুনিশ্চিত সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল। কৃষিজ উদ্বৃত্ত ভোগী শ্রেণীদুটির আয়তন বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রের দ্বারা ক্রমশ রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি কৃষি উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত কৃষকদের জীবনযাত্রাকে শোচনীয়ভাবে নিম্নমুখী করেছিল।[১৪]

সুলতানী ও মোগল আমলে প্রত্যক্ষ কৃষি উৎপাদকদের দিকে নজর দিলে দেখা যায় যে, উপর থেকে কৃষিজ উদ্বৃত্ত নিষ্কাষণ করে নেওয়ার জন্য চাপ যেমন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনই সরাসরি কৃষিকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে স্তর-বিভাজনও বাড়তে শুরু করেছে। শের শাহের শাসনকালে প্রবর্তিত 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়ৎ' ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে কৃষকদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের যে চেষ্টা শুরু হয় তার ফলশ্রুতিতে এই স্তর-বিভাজন ত্বরান্বিত

হযেছিল। প্রত্যক্ষ উৎপাদকদেব মধ্যে যাবা গ্রামেব প্রধান বা মণ্ডল ইত্যাদি ছিল এবং অন্যদেব তুলনায বেশী জমি-জমাব মালিক ছিল, তাবা আবাব বাজস্বেব বোঝাকে প্রত্যক্ষ উৎপাদকদেব দুর্বলতব অংশটিব ঘাডে চালান কবে দিতে সচেষ্ট থাকত। ফলে এই আমলেব শেষ দিক থেকেই ভূমিহীন এক কৃষিমজুব শ্রেণীব উদ্ভবেব সূচনা ঘটেছিল,— যাদেব একাংশকেই এই পর্বেব শেষদিকে জেলাঞ্চলেব জাযমান মুখসুদাবাদ-কাশিমবাজাব নগব-কেন্দ্রটিব দিকে জীবিকাব সন্ধানে আকৃষ্ট হতে দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে মালিক কৃষকদেব নিজেদেব মধ্যে সবচাইতে অবস্থাপন্নদেব সঙ্গে অন্যান্যদেব স্বার্থেব বিবোধ স্পষ্টতব হযে উঠতে থাকলেও, এই অন্যান্যদেব মধ্যে সুস্পষ্ট স্তব-বিভাজনেব সূচনা এই পর্বেও ঘটেনি।[১৫]

সুতবাং দেখা যাচ্ছে যে তুর্ক-আফগান-মোগল যুগে জেলাঞ্চলেব ভূমি-ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা অধিকতব সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত হযে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু এব ফলে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল কৃষিজ উদ্বৃত্তেব আহবণ এবং তা সুস্পষ্ট হ্রাস ঘটাতে শুরু কবেছিল প্রত্যক্ষ উৎপাদক কৃষকদেব জীবনমান তথা জীবন-সম্ভাবনাব।

জেলাঞ্চলেব জীবনে তুর্ক-আফগান-মোগল যুগে দ্বিতীয যে প্রভাব প্রবাহটি সহজেই আমাদেব দৃষ্টি আর্কষণ কবে তাহল পুনবায নগবাযন প্রক্রিযাব বৃদ্ধি ঘটতে থাকা।[১৬] সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকেব মধ্যে জেলাঞ্চলে যে নাগবিক অবক্ষয লক্ষ্য কবা গেছিল এবং যাব ফলেই কর্ণসুবর্ণ নগবেব পতন ঘটেছিল ত্রযোদশ শতকেব শুরু থেকেই তা রুদ্ধ হযে নগবাযণেব প্রবণতা জোবদাব হযে ওঠে। মূলত পূর্বেব গৌড নগবকে কেন্দ্র কবেই জেলাঞ্চলেব নগবাযণ অগ্রসব হযে চলে ; পববর্তীকালে মোগল আমলে গৌডেব পতনেব পব মুর্শিদাবাদে জেলাঞ্চলেব নতুন নগবকেন্দ্র গডে ওঠে।

পূর্বতন গৌড নগবেব প্রসাবণ, উন্নযন, পুনর্বিন্যাস ও রূপান্তবেব মধ্যে দিযেই সুলতানী আমলেব গৌড তাব বিশিষ্ট চবিত্র অর্জন কবে। প্রাক্-সুলতানী নগব জীবনেব অবক্ষযেব এক প্রধান কাবণ ছিল বর্ণভেদ ও জাত-বৈষম্য, দৈহিক পেশাজীবি নিম্নবর্গেব মানুষদেব বসতি ছিল নগব-প্রাচীবেব বাহিবে, তাদেব নগববাস ছিল নিষিদ্ধ। সুলতানী আমলেব নগবে এই ব্যবস্থাব আমূল পবিবর্তন হযেছিল, নগবেব দবজা সকলেব জন্য অবাবিত ছিল। ফলে সমাজেব সকল শ্রেণীব অজস্র লোকেব সমাবেশ সম্ভব হযেছিল এই নগবে। গৌডেব লোকসংখ্যা ছিল কাবোব মতে দুই লক্ষ, কাবোব মতে বাবো লক্ষ ; সম্ভবত প্রথম মতটিই ছিল বাস্তবেব নিকটবর্তী। অবাবিত প্রবেশাধিকাব এবং বাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হওযা ছাডাও গৌডেব বিপুল জনসংখ্যাব কাবণ ছিল : সুলতানী আমলে নানা নাগবিক হস্তশিল্পেব, প্রধানত বাজাব ও উচ্চবর্গেব চাহিদানুগ সুতী ও বেশমী বস্ত্র-শিল্পেব প্রসাব ; সামুদ্রিক বন্দব সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামেব সঙ্গে আভ্যন্তবীণ নদী-বন্দব হিসাবে গৌডেব সংযোগেব ফলে আভ্যন্তবীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ; বাণিজ্যেব জন্য প্রযোজনীয মুদ্রা-অর্থনীতি ও টাঁকশালেব কেন্দ্র হযে ওঠা। ধর্মীয সৌধ মস্‌জিদ্-মক্তব-মাদ্রাসা-খান্‌কা-সমূহ, সুলতানেব প্রাসাদ, প্রধান বাজপথেব পাশে অভিজাতদেব বসতি, হামাম-সবাইখানা-বাজাব, নগব-দূর্গ এবং বাষ্ট্রীয মহাকবণ ইত্যাদি বিভিন্ন অংশে পুনর্বিন্যস্ত অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিশালী তৎকালীন বাংলাব বৃহত্তম নগবকেন্দ্র গৌড়নগব ছিল এক যথার্থই আন্তর্জাতিক শহব। তাব এই সমৃদ্ধি এসেছিল একদিকে কৃষি নির্ভব গ্রামগঞ্জেব উদ্বৃত্ত শোষণ এবং অন্যদিকে বাণিজ্য-প্রসূত অর্থাগম থেকে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়-সপ্তগ্রামেব পশ্চিমবঙ্গীয় পশ্চাৎভূমি দখলেব জন্য তুর্ক-আফগানদেব

সঙ্গে মোগলদেব প্রায সত্তব বৎসব ব্যাপী বক্তক্ষযী যুদ্ধেব পবিপ্রেক্ষিতে বাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসেব টানা-পোড়েনেব ফলেই ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়নগবেব পতন ঘটে, যদিও তাৎক্ষণিক কাবণ ছিল গঙ্গানদীব গতি পবিবর্তন এবং এক বিধ্বংসী মড়ক। এই বাজনৈতিক অস্থিবতা ও অনিশ্চযতা পর্তুগীজদেব উত্থানকে সাহায্য কবেছিল— সপ্তগ্রামেব পতনেব ফলে উদ্ভব ঘটেছিল পর্তুগীজ-নিযন্ত্রিত হুগলী বন্দবেব ; অনুকূল আর্থ-সামাজিক ও বাজনৈতিক শক্তিসমূহেব বিন্যাসেব ফলে হুগলীব পিছনে পিছনে উঠে আসাব প্রস্তুতি শুরু হযেছিল ইংবেজদেব কলকাতাব।[৪৭]

কিন্তু কলকাতাব উদ্ভবেব পূর্বেই, সম্ভবত ষোড়শ শতকেব শেষ দশকেই, জেলাঞ্চলে পত্তন হযেছিল পবস্পব সংলগ্ন মোগল শহব সৈদাবাদ-মকসুদাবাদ-কাশিমবাজাবেব ; পববর্তী একশো বছবেব মধ্যেই অতিদ্রুত সুবা বাংলাব বৃহত্তম শহব হিসাবে বিকশিত হযে উঠে, এই নগবই আখ্যাযিত হযেছিল মুর্শিদাবাদ নামে। বাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসেব যে-অস্থিবতা গৌড়নগবেব পতন ঘটিযেছিল এবং বাংলাব বাজধানী সবিযে নিযে যেতে বাধ্য কবেছিল সুদূব ঢাকায, সেই অস্থিবতা দূব হওযা মাত্রই অনুকূল অর্থনৈতিক পবিবেশে জেলাঞ্চল তাব দীর্ঘ দিনেব সমৃদ্ধ পশ্চাৎভূমিব সাহায্যেই পত্তন ঘটিযেছিল এই নতুন মহানগবেব। যে-সকল বৈশিষ্ট্য গৌড়-নগবকে সুলতানী আমলে বিশিষ্টতা দিযেছিল, আন্তর্জাতিকতা-সহ সেই সকল বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেল মোগল ও নবাবী আমলেব মুর্শিদাবাদ শহবেও। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হওযাব পূর্বেই, গৌড়েব মতই, মুর্শিদাবাদেব গৌবব ববিও অস্তমিত হল ইতিহাসেব কুটিল ঘটনা-প্রবাহে।[৪৮]

তুর্ক-আফগান-মোগল যুগে জেলাঞ্চলে যে সুবিপুল নগবাযণ সম্ভব হযেছিল জেলাঞ্চলেব সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনকে তা কতখানি গভীব ও ব্যাপকভাবে স্পর্শ কবতে পেবেছিল ? গ্রাম ও কৃষি-কেন্দ্রিক জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক জীবনকে এই নগবাযণ ব্যবহাব কবেছিল কৃষিজ উদ্বৃত্ত আহবণেব জন্য, কৃষিশস্যেব দ্বাবা নগবজীবনেব অধিকতব উন্নতি ও বিকাশ সুনিশ্চিত কবাব জন্য। বিনিমযে কৃষিজীবি গ্রামবাসীদেব সংখ্যাগবিষ্ঠ অংশ বঞ্চিতই শুধু হযনি, উৎপাদন ব্যবস্থাব প্রযোজনে বাষ্ট্রীয বলপ্রযোগ, দমন-পীড়ন ও ক্রীতদাসত্বেবও সুনিশ্চিত শিকাব হযেছিল।[৪৯]

তুর্ক-আফগান-মোগল যুগে তৃতীয যে ক্ষেত্রটিতে প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ প্রভাবেব ধাবা জেলাঞ্চলে এসে পৌঁছেছিল তা হল ধর্ম ও সমাজ-জীবন। জেলাঞ্চলেব পবম্পবাগত ধর্মীয ঐতিহ্য থেকে ভিন্নতব ও নতুনতব একটি ধর্ম— ইসলাম ধর্ম— বাষ্ট্রীয-ক্ষমতা-প্রাপ্ত অ-বাংলাভাষীদেব দ্বাবা ত্রযোদশ শতকেব শুরুতেই আনীত হল এবং জেলাঞ্চলেব বাংলাভাষী মানুষদেব মধ্যেও ধর্মটি ক্রমশ ছড়িযে পড়তে থাকল। উল্লেখযোগ্য ব্যাপাব হল এই যে উচ্চ-নীচ নানা জাতি-স্তবে বিন্যস্ত পূর্বতন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেব সকল স্তব থেকেই ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে লোকজন এই নতুন ধর্মেব অনুগামী হতে থাকল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নবধর্মেব দীক্ষিতদেব সংখ্যা জেলাঞ্চলে আলোচ্য যুগেব শেষে অষ্টাদশ শতকেব মধ্যাহ্নেও জনসংখ্যাব ত্রিশ শতাংশেব অতিবিক্ত হযে উঠতে পাবল না। সামাজিক স্তব-বিন্যাসেব সঙ্গে জড়িত থাকাব ফলে দেখা গেল যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীবাও লৌকিক ইসলাম ও শাস্ত্রীয ইসলাম এই দুই সমান্তবাল মতেব অনুগামী হল, যাব প্রথম ধাবাটি অবশ্যই জেলাঞ্চলেব প্রাক্-ইসলাম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন কবে চলল।[৫০] নতুন ধর্মেব প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও ছিল পূর্বতন ধর্মগুলিব উপবে

পবোক্ষ প্রভাবও। দ্বাদশ শতাব্দীব শেষদিকে জেলাঞ্চলে সামাজিক স্তব-ক্রমেব সঙ্গে মোটামুটি সম্পর্কযুক্ত তিন প্রকাব ধর্মমত প্রচলিত ছিল : লৌকিক ধর্ম, তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম এবং পৌবাণিক ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইসলাম-ধর্মেব পবোক্ষ প্রভাবে জেলাঞ্চলে পূর্বতন ধর্মগুলিব যে রূপান্তব শুরু হল পঞ্চদশ শতাব্দীব শুরুতেই তাব ফলে দেখা গেল যে লৌকিক ধর্ম ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেব অনুসবণকাবীবা অংশত ইসলামে এবং অংশত ব্রাহ্মণ্যধর্মে মিশে গেছে এবং লৌকিক ও শাস্ত্রীয এই দুই ধাবায় প্রবাহিত মূলত বৈষ্ণব শাক্ত শৈব তিন সম্প্রদাযে বিভক্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম হিন্দু ধর্ম আখ্যা লাভ কবেছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ পর্যন্ত জেলাঞ্চলেব ধর্মেব ইতিহাস হিন্দু ও ইসলাম ধর্মেব নানা শাখা প্রশাখাব পাবস্পবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিযাব ও উত্থান পতনেব ইতিহাস।[৫১]

ধর্মীয প্রভাবেব অচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসাবেই তুর্ক-আফগান-মোগল যুগে প্রভাবিত হযেছিল জেলাঞ্চলেব সামাজিক জীবনও। নবাগত ইসলাম ধর্ম হাজিব হযেছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতব এক সমাজ-সংস্থান নিযে। কিন্তু ইসলামী সমাজ-সংস্থানেব মধ্যেও শুরু থেকেই দুস্তব ব্যবধান-যুক্ত দুটি সমান্তবাল ধাবা লক্ষ্যণীয হযে উঠেছিল : গৌড় থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সর্বত্রই বাষ্ট্রীয ক্ষমতাব অধিকাবী অ-বাংলাভাষী মুসলিমবাই ছিল জেলাঞ্চলেব মুসলিম সমাজেব সর্বোচ্চ স্তবে ; অন্যদিকে অ-মুসলিম সমাজ থেকে আগত সংখ্যাগতভাবে ক্রমবর্ধমান বাঙালী মুসলমানদেব মধ্যেও জাত-কাঠমোব অনুরূপ সামাজিক স্তব-বিন্যাস লক্ষ্য কবা গিযেছিল।[৫২] দ্বাদশ শতকেব শেষ নাগাদ ব্রাহ্মণ প্রাধান্য-যুক্ত যে জাত-ব্যবস্থা জেলাঞ্চলে রূপ লাভ কবেছিল পববর্তী ছশো বছবে সমান্তবাল এক ভিন্ন ধর্ম তথা সমাজ-ব্যবস্থাব সঙ্গে ক্রিযা প্রতিক্রিয়াব ফলে তাবও রূপান্তব শুরু হযেছিল। একদিকে যখন কঠোবতব নিযমাবলীব সাহায্যে হিন্দু আখ্যাযিত পূর্বতন সমাজ-কাঠামোব ধাবাবাহিকতা বজায বাখাব এবং প্রতিবেশী মুসলিম-সমাজ থেকে তাকে সুচিহ্নিত কবাব ও স্বতন্ত্র বাখাব প্রচেষ্টা অব্যাহত থেকেছে, অন্যদিকে তখন পবিবর্তিত বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পবিস্থিতিব সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান কবতে গিযে হিন্দু সমাজেবও উপবেব স্তবগুলিতে লক্ষ্যণীয পবিবর্তন এসেছে। সুলতানী আমলেই উত্তম সংকব সৎ শূদ্র বৈদ্য ও কাযস্থবা উচ্চতব সামাজিক মর্যাদাব অধিকাবী হযে বাংলাব সমাজে উচ্চজাতিব অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হযেছে ; মোগল আমলেই একই প্রক্রিযায সদ্‌গোপ ও তিলিবা উচ্চতব সামাজিক মর্যাদাব অধিকাবী হযেছে, সুবর্ণ বণিকদেব সামাজিক মর্যাদাও উন্নততব হযেছে। এই উর্দ্ধমুখী সামাজিক সচলতাব প্রতিফলন ঘটেছে চৈতন্য বৈষ্ণবধর্মেব প্রসাবে এবং বহু সংখ্যক মন্দিব নির্মানেব প্রচেষ্টাব মধ্যে দিযে।[৫৩]

ধর্মীয ও সামাজিক ক্ষেত্রে তুর্ক-আফগান-মোগল যুগে জেলাঞ্চলে যে-সকল পবিবর্তন ঘটেছে সেগুলি এখানকাব মানুষেব শ্রেণী-বিন্যাসে কী ধবনেব পবিবর্তন এনেছিল তা-ও দেখা যেতে পাবে। বাষ্ট্রক্ষমতাব অধিকাবী অবাঙালী মুসলিমদেব ও তাদেব সহযোগী ও সাহায্যকাবী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কাযস্থ বৃহৎ সামন্ত ও ভূস্বামীদেব নিযে গঠিত ছিল উচ্চশ্রেণীটি ; মধ্য শ্রেণীটি রূপাযিত হযেছিল উচ্চ ও মধ্য মর্যাদাব জাতি-ভুক্ত ক্ষুদ্রতব সামন্ত ও ভূস্বামীদেব এবং বাঙালী মুসলমান সমাজেব উচ্চতব জাতি-সদৃশ গোষ্ঠীগুলিব সমন্বযে ; জেলাঞ্চলেব সমাজেব সংখ্যা গবিষ্ঠ নিম্নশ্রেণীতে স্থান পেযেছিল শ্রমজীবি ও দবিদ্র অজলচল ও অন্ত্যজ জাতি-ভুক্ত হিন্দু এবং বাঙালী মুসলমান সমাজেব নিম্ন-মর্যাদাব জাতি-সদৃশ গোষ্ঠী সমূহেব লোকেবা।[৫৪]

চতুর্থত তুর্ক-আফগান-মোগল যুগ জেলাঞ্চলেব সংখ্যাগবিষ্ঠ জনগণেব মধ্যে বিকশিত বিবর্তিত আধুনিক আর্যভাষা বাংলাব উপবে শুধুমাত্র কিছু আববি, ফার্সি ও তুর্কী শব্দেব প্রভাব এবং ইসলামী ঐতিহ্য বাহিত কথা ও কাহিনীব একটি ক্ষীণ ধাবা মাত্রই বেখে যেতে সক্ষম হযেছিল। যদিও এই যুগেব অনুকূল প্রভাবেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল।[৫৫]

সামগ্রিক বিচাবে দেখা যায যে আর্যীকবণেব মতই এই দ্বিতীয দফায আববি-ফার্সি-তুর্কি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীব প্রভাবও মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব জনজীবনেব মূল ধাবাটিকে, অর্থনৈতিক উৎপাদন, বিনিময ও বন্টন কর্মেব প্রবাহকে, তাব গ্রাম-মুখীনতা ও কৃষি-কেন্দ্রিকতাকে, প্রান্তিকভাবে স্পর্শ কবলেও আমূল রূপান্তবিত কবতে সক্ষম হযনি। এই দ্বিতীয দফাব বহিবাগতবা যে আর্যদেব তুলনায অনেক কম সংখ্যক ছিল এবং অনেক কম দিন ধবে প্রভাব ফেলেছিল শুধু তাই নয, আর্যদেব তুলনায এদেব প্রভাব-বলযও ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিতীয দফাব এই বহিবাগতদেব প্রভাবেব ফলে জেলাঞ্চলেব আর্থ-সামাজিক জীবনে আর্যপ্রভাবেব যুগে যে শ্রেণী তথা জাত ব্যবস্থা কাযেম হযেছিল তা হযে উঠল আবো সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল এবং কঠোব। ফলে আবো বেশী কবে উদ্বৃত্ত আহবণেব বোঝাব চাপ জেলাঞ্চলেব কৃষিশ্রমজীবি মানুষেব কাঁধে চাপল। অবশ্যই এই পর্বে জেলাঞ্চলে বস্ত্র-শিল্পেব অভূতপূর্ব উন্নতি, বাণিজ্য ও টাকাকডি-প্রচলনেব প্রসাব এবং যোগাযোগেব উন্নতি সমৃদ্ধি ডেকে এনেছিল। কিন্তু তাব ফলে শ্রমজীবি মানুষেব শোষণ যে প্রশমিত হযেছিল তা মনে কবাব কাবণ নেই। সুলতানী ও মোগল আমলে উত্তবভাবতেব বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহেব পবিচয আমবা পেযে থাকি। কিন্তু সমকালীন মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে তাব দেখাও মেলে না। আসলে আগেব পর্বেও আমবা যেমন দেখেছি যে জেলাঞ্চলে সমগ্র প্রদেশেব বাজনৈতিক-প্রশাসনিক কেন্দ্র থাকায বিপুল সেনা-সমাবেশ ঘটত এবং তাব ফলেই বঞ্চিত ও শোষিত কৃষকদেব বিক্ষোভ প্রকাশ্য রূপ গ্রহণ কবত না, সেইবকম এই পর্বেও বাজধানী গৌড থেকে বাজধানী মুর্শিদাবাদেব অবস্থিতি এবং অন্তর্বর্তীকালে এক গুরুত্বপূর্ণ বণাঙ্গণ হিসাবে এখানকাব ভূমিকা একই ধবনেব ফলশ্রুতিব জন্ম দিযেছিল। পলাশীব যুদ্ধেব পব থেকে, বিশেষত ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায বাজধানী স্থানান্তবেব পবেই— সামবিক বাহিনীব ভবকেন্দ্র অন্যত্র সবে গেলে তবেই,— জেলাঞ্চলেব কৃষকদেব অসন্তোষ-বিক্ষোভ প্রকাশ্য বিদ্রোহ-আন্দোলন-বিবাধিতাব রূপ গ্রহণ কবতে শুরু কবে। পাশাপাশি একথাও ভুললে চলবে না যে ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসন কৃষকদেব মধ্যে যে দুঃখ দুর্দশা ও বিপর্যযেব সৃষ্টি কবেছিল তা ছিল অতীতেব অনুরূপ সকল অত্যাচাবেব চাইতে অনেক বেশী দীর্ঘস্থাযী, ব্যাপক ও গভীব।[৫৬]

॥ ছয় ॥

জেলাঞ্চলে বহিবাগত প্রভাবেব তৃতীয তবঙ্গটিব অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কযেকটি ইউবোপীয জনগোষ্ঠীব মধ্যে থেকে মূলত ইংবেজী ভাষাভাষীদেব মাধ্যমে। সপ্তদশ শতকেব মাঝামাঝি থেকে একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে ইংবেজদেব প্রভাব জেলাঞ্চলে পড়তে শুরু কবেছিল। কিন্তু কেবল মাত্র অষ্টাদশ শতকেব দ্বিতীযার্ধ থেকেই বাষ্ট্র-যন্ত্রকে ব্যবহাব কবাব সাহায্যেই

তাবা এই অঞ্চলে পববর্তী দুশো বছবে বিংশ শতাব্দীব মাঝামাঝি পর্যন্তই বহুমুখী প্রভাব সঞ্চালনেব উৎস হিসাবে কাজ কবেছে। পূর্ববর্তী বহিবাগত আর্য এবং তুর্ক-আফগান-মোগলদেব মত ইংবেজবা জেলাঞ্চলেব জনজীবনেব অচ্ছেদ্য এবং স্থাযী অংশে পবিণত হযনি। ইংবেজবা পূববর্তীদেব মত এই জেলাঞ্চল ও এই দেশকে তাদেব স্বদেশে পবিণত কবেনি, এখানে তাবা বযে গেছে দীর্ঘদিনেব প্রবাসী হিসাবে এবং সুনিযমিত ও নিবন্তব যোগাযোগ বেখে চলেছে তাদেব ইউবোপীয স্বদেশেব সঙ্গে। একদল ইংবেজ এখানকাব কর্মজীবন সমাপ্ত কবে ফিবে গেছে তো পাশাপাশি আব এক দল নবীন ইংবেজ এখানে এসেছে কর্মজীবনেব সুযোগ নিযে। এই সকল ইংবেজদেব ভাগ্যেব ওঠা-নামা জেলাঞ্চল বা এদেশেব ঘটনা-প্রবাহেব উপব নয, নির্ভব কবত তাদেব শক্তিব মূলকেন্দ্র তাদেব স্বদেশেব অর্থনৈতিক, বাজনৈতিক ও সামবিক অবস্থাব উপবই। এইভাবে জেলাঞ্চলে থাকলেও কিন্তু জেলাঞ্চলেব জীবনেব সঙ্গে অঙ্গীভূত না হওযাব ফলে ইংবেজবা বণিক-ব্যবসাযী হিসাবে, মিশনাবী হিসাবে বা বাষ্ট্রীয কর্মচাবী হিসাবে জেলাঞ্চলেব জনজীবনেব উপব যে ধবনেব প্রভাব ফেলেছিল তা ছিল পূর্ববর্তী বহিবাগতদেব প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিব। ফলে আর্যদেব মত ভাষাগত ক্ষেত্রে কিংবা তুর্ক-আফগান-মোগলদেব মত ধর্মীয ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাবেব অধিকাবী ইংবেজবা হযে উঠতে পাবেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাবা খুব কম সমযেব মধ্যেই এ অঞ্চলেব জনজীবনকে গভীবভাবে সুদূবপ্রসাবী প্রভাবেব বৃত্তে টেনে এনেছিল। স্বদেশেব দেশপ্রেমিক ও অনুগত নাগবিক হিসাবে জেলাঞ্চলে বা এদেশেই ইংবেজবা যে ভূমিকা নিযেছিল তা যে ছিল তাদেব স্বদেশেব জাতীয স্বার্থেবই অনুকূল এ-বিষযে দ্বিমতেব কোনই অবকাশ নেই। ইংবেজদেব স্বদেশ ইংল্যান্ড যেহেতু ছিল সমকালীন বিশ্বেব অর্থনৈতিক, সামবিক ও বাজনৈতিক দিক দিযে সর্বাগ্রগণ্য বাষ্ট্র সেইজন্যই জেলাঞ্চলে ও এদেশেই ইংবেজদেব প্রভাবেব তাৎপর্য হযে উঠেছিল অসাধাবণ গুরুত্বপূর্ণ। আর্য বা তুর্ক-আফগান-মোগলদেব মত ইংবেজবা শুধুমাত্র এশিযাব দবজাই আমাদেব সামনে খুলে দেযনি, সমগ্র বিশ্বেব দববাবেই আমাদেব হাজিব কবেছে এবং সমগ্র বিশ্বকেই পৌঁছে দিযেছে আমাদেব আঙিনায। এক কথায, জেলাঞ্চলকে, সমগ্র বাংলাদেশকে, আমাদেব স্বদেশ ভাবতকে ইংবেজবা বহির্বিশ্বেব সুবিপুল গতিশীল মূল স্রোতোধাবাব সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত কবে দিযেছে, এই স্রোতোধাবাব সকল অর্থনৈতিক, বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তবেব স্পর্শে জেলাঞ্চলকে আলোড়নযোগ্য আন্দোলনযোগ্য কবে তুলেছে। এখানকাব দূবতম গ্রামটিব পক্ষেও আব তাব বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায বেখে নিস্তবঙ্গ নিরুত্তাপ অবস্থায থাকা সম্ভব নয, বিশ্বব্যাপী ঘটনাবর্তেব প্রবাহ পথে তাকেও আকর্ষিত হতে হযেছে। এইভাবে ইংবেজবা জেলাঞ্চলেব জনজীবনেব উপব বিশেষ ধবণেব যে-সকল প্রভাবসমূহ সঞ্চাবিত কবেছে সেগুলিব বাস্তব রূপবেখা ও গতিপ্রকৃতিব সঙ্গে পবিচিত হওযাব জন্য এই সকল পবিবর্তনকে আমবা তিন ভাগে ভাগ কবতে পাবি : (১) জেলাব প্রবহমান কৃষি উৎপাদন-সম্পর্কেব ক্ষেত্রে পবিবর্তন ; (২) শিল্পে প্রচলিত প্রযুক্তি ও সংগঠনেব ক্ষেত্রে পবিবর্তন এবং (৩) চিন্তা-ভাবনাব ক্ষেত্রে পবিবর্তন।[২৭]

আর্যীকবণেব যুগে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিব উদ্ভব ঐ সমযেব পূববর্তী সমাজেব আর্থ-সামাজিক বিবর্তনেবই ছিল স্পষ্টতব পবিণতি। কিন্তু ব্যক্তি-মালিকানাকে ভিত্তি কবে কিছুদিনেব মধ্যেই ভূস্বামী-ব্যবস্থা এবং সামন্ত ব্যবস্থাব উদ্ভব জেলাঞ্চলেব উৎপাদন সম্পর্ককে একটি দীর্ঘস্থাযী কাঠামো জুগিযেছিল, জেলাঞ্চলে উৎপাদন-সম্পর্কেব আমূল পবিবর্তন ঘটে

গিয়েছিল। তুর্ক-আফগান-মোগল যুগে পূর্ববর্তী সময় থেকে ধাবাবাহিত এই উৎপাদন-সম্পর্কেব কোনই মৌলিক পবিবর্তন ঘটেনি। ববং বিদ্যমান উৎপাদন-সম্পর্কই আইনগত সুস্পষ্টতা ও সুদৃঢতা লাভ কবেছিল। ইংবেজ আমলেব দুশো বছবেই আমবা দেখলাম যে দীর্ঘদিন ধবে বিদ্যমান এই উৎপাদন-সম্পর্কেব উপব জোবালো আঘাত পডছে এবং এই উৎপাদন-সম্পর্ক সুনিশ্চিতভাবে বদলে যেতে শুরু কবেছে। এই পবিস্থিতিতেই কৃষি-উৎপাদন সম্পর্কেব পবিবর্তন সমূহকে আলাদা কবে বোঝা দবকাব।

ইংবেজ আমলে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে কৃষি-উৎপাদন সম্পর্কেব ক্ষেত্রে পবিবর্তন নতুন প্রযুক্তি বা সাংগঠনিক বীতি-পদ্ধতিকে আশ্রয় কবে ততটা আসেনি, যতখানি এসেছিল প্রবহমান ভূমি-ব্যবস্থাব পবিবর্তনেব ফলে। ইংবেজ ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী ১৭৫৭ সালে পলাশীব যুদ্ধে বাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ১৭৬৫ সালে দেওযানী পাওযাব ফলে ভূমি সম্পর্কেব উপব নিযন্ত্রণেব অধিকাবী হলেও তাদেব কাজকর্মেব ফলে জেলাঞ্চলে ভূমি-সম্পর্কেব প্রকৃত রূপান্তব শুরু হযেছিল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। প্রাক্-সুলতানী যুগ থেকে শুরু কবে সুলতানী, মোগল ও নবাবী আমলেও সামন্তশ্রেণী বা জমিদাবদেব মাধ্যমেই বাজস্ব-সংগ্রহেব ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জমি জবিপ কবে বিভিন্ন স্তবেব ভূমি স্বত্ত্ব নির্ণয এবং উৎপাদনেব পবিমাণেব উপব নির্ভব কবে বাজস্ব নির্ধাবণেব বীতি গডে উঠেছিল। ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী এই বীতি উপেক্ষা কবে কৃষি-উৎপাদকদেব কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হযে সর্বোচ্চ নীলাম ডাকে বাজস্ব-সংগ্রহেব অধিকাব জমিদাব ও অন্যদেব বিক্রী কবতে শুরু কবল এবং এবা সমযমত বাজস্ব জোগাতে ব্যর্থ হলে জমিদাবী থেকে উৎখাৎ হতে থাকল। বাজস্ব-সংগ্রহেব এই নযা পদ্ধতি অনুসবণ কবেই ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত হল চিবস্থাযী বন্দোবস্ত যা বদলে দিতে শুরু কবল জেলাঞ্চলেব ভূমি-সম্পর্ককে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত ছিল প্রায বাবো তেবোশো বছব ধবে বিবর্তিত বিকশিত হতে থাকা জমিদাবতন্ত্রেব আইনগত ও বাস্তব-ক্ষমতাব চূডান্ত পবিণতিব শীর্ষবিন্দু, কেননা, এই বন্দোবস্তেব ফলেই জমিদাবী ক্রয-বিক্রয-হস্তান্তবযোগ্য এবং শর্তাধীনে বংশানুক্রমিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পবিণত হযেছিল, জমিব উপব বাযত-প্রজাব সম্পত্তিব অধিকাব প্রায অন্তর্হিত হযেছিল। কিন্তু এই বন্দোবস্তেব ফলে জমিদাবী নীলামে ক্রয-বিক্রযযোগ্য হযে ওঠায এবং এই বন্দোবস্তেব রূপাযন ও পববর্তী ইতিহাসেব বিচাবে অবশ্যই বলতে হয যে ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত এই চিবস্থাযী বন্দোবস্ত ছিল সাবা বাংলাদেশেব মতোই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও জমিদাবতন্ত্রেব পতনেব সূচনাবিন্দু। বাস্তবে এই বন্দোবস্তেব কযেক দশকেব মধ্যেই জমিদাবতন্ত্র নবাবী আমল থেকে লব্ধ তাব বাজনৈতিক, প্রশাসনিক, বিচাব-বিভাগীয সকল ক্ষমতা হাবিযে কেবলমাত্র খাজনা আদাযকাবী একটি শ্রেণীতেই শুধু পবিণত হযনি, ববং পববর্তী একশো বছবে ক্রমে ক্রমে খাজনা আদাযেব এই সামর্থ্যও জমিদাবতন্ত্র শোচনীযভাবে হাবিযে ফেলেছিল। এই বন্দোবস্তেব পব আইনগতভাবে ১৮১৯ সালেব পত্তনি আইন, ১৮৫৯ সালেব খাজনা আইন, ১৮৭১ সালেব বোড সেস্ আইন, ১৮৮৫ সালেব প্রজাস্বত্ব আইন এবং ১৯২৮ ও ১৯৩৮ সালেব প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন এবং ১৯৫০ সালেব বর্গাদাব আইন ধাপে ধাপে পথ প্রশস্ত কবে দিযেছিল স্বাধীনতা পববর্তী যুগে ১৯৫৩ সালেব জমিদাবী অধিগ্রহণ আইন বচনাব। পাশাপাশি এই সকল আইনেব মাধ্যমেই ক্রমে ক্রমে বায়ত-প্রজাব অধিকাব সমূহেবও স্বীকৃতি এসেছিল। বস্তুত চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব সাম্প্রতিক বিলুপ্তিব মধ্যে দিযেই জেলাঞ্চলে সুপ্রাচীন সামন্ত-ব্যবস্থা বা জমিদাবতন্ত্রেব বিলোপ ঘটেছে এবং ভূমি-বাজস্বেব ব্যাপাবে সবকাবেব সঙ্গে কৃষকদেব সবাসবি সম্পর্ক স্থাপিত হযেছে। যদিও, জমিদাবতন্ত্র

বিলোপের পরও, জেলাঞ্চলের ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামন্ত-ব্যবস্থা বা জমিদারতন্ত্রের চাইতেও প্রাচীনতর এবং একদা বিস্তৃততর অন্য সুচিহ্নিত পরগাছা গ্রামীণ শোষক শ্রেণীটি অর্থাৎ ভূস্বামী শ্রেণী বিদ্যমান থেকেই গেছে। কিন্তু শুধু ভূস্বামী শ্রেণীর অস্তিত্বই নয়, গ্রামীণ শোষণের ভিন্নতর শ্রেণী-ভিত্তিও ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে। অন্যভাবে বলা যায়, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তেরো চৌদ্দশো বছর ধরে প্রবাহিত ভূমি-সম্পর্কের বিশেষ রূপটি, যা জমিদারতন্ত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল, তা আসলে ছিল মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতির উপর নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় শোষণ কায়েম রাখার বিশেষ উপায় বা পদ্ধতিগত কৌশল মাত্র। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-সহ জমিদারতন্ত্রের ক্রমাবলুপ্তি এই কৌশলের পরিবর্তনই শুধু ঘটিয়েছে, গ্রামীণ শোষণের প্রতীক হিসাবে সুচিহ্নিত, সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী পরগাছা সামাজিক শ্রেণী-স্তরটির বিলোপ ঘটিয়েছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্থান ঘটিয়েছে অন্য একটি শোষক শ্রেণীর— জোতদার মহাজনদের। অন্যদিকে ভিন্ন পদ্ধতিতে অনেক বেশী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রাম ও কৃষি শোষণ, — গ্রাম ও শহরের মধ্যে বাণিজ্য শর্তের মাধ্যমে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে টাকা-পয়সার ব্যাপক প্রচলনের মাধ্যমে এবং গ্রামীণ মানুষকে রাজনৈতিক জীবনে অংশীদারত্ব দানের মাধ্যমে। অবশ্য আগের তুলনায় বর্তমানের শোষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেক বেশী দুর্নিরীক্ষ্য এবং নৈর্ব্যক্তিক। মোট কথা, ইংরেজ প্রভাবের কালে জেলাঞ্চলে গ্রামীণ ও কৃষি-নির্ভর মানুষের শোষণ ক্রমেই বেড়েছিল বই কমেনি এবং এর ফলেই গ্রামের শ্রমজীবি মানুষের একটি অংশ জীবিকার সন্ধানে নগর-মুখী হয়েছিল। শোষণের রীতি-পদ্ধতি বদলাতে থাকায় শোষক ভূস্বামী সামন্ত শ্রেণীর অনেক মানুষও শহরমুখী হয়েছিল শোষণের নতুন ব্যবস্থায় একটা জায়গা করে নেওয়ার জন্য। এইভাবেই প্রশস্ত হয়েছিল নগরায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনভিত্তি গড়ে ওঠার পথ।[৫৮]

ইংরেজ-প্রভাবে জেলাঞ্চলের শিল্প-প্রযুক্তি এবং সাংগঠনিক জীবনেও এসেছিল অভূতপূর্ব পরিবর্তন। ষোড়শ শতাব্দী থেকে মুর্শিদাবাদের যে রেশমী ও সুতী বস্ত্রশিল্প ইউরোপীয় বণিকদের আকৃষ্ট করতে শুরু করে সেই শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে থাকে সপ্তদশ শতক থেকেই। স্বদেশে বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের (mercantile capitalism) প্রভাবে গড়ে ওঠা হস্তশিল্প-কারখানাগুলির আদলে ডাচ ও ইংরেজ বণিকরা কুটির শিল্প হিসাবে সংগঠিত জেলাঞ্চলের বস্ত্রশিল্পকে তাদের বাণিজ্য কুঠিগুলির এলাকার মধ্যে কারখানা শিল্পে রূপান্তরিত করতে শুরু করল এবং মজুরী প্রথা ও দাদন-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই শিল্পের উৎপাদন-সম্পর্ককে পাল্টে দিতে থাকল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে সারা বাংলাদেশে ও জেলাঞ্চলের অর্থনীতিতেও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে শিল্প-উৎপাদন-সম্পর্কের এই সকল পরিবর্তনও ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্য-বিধাতা হয়ে উঠল এবং প্রায় সমকালেই ইংল্যান্ডে ঘটল শিল্প-বিপ্লব। ফলে কিছু কিছু নতুন প্রযুক্তির আগমন ঘটতে থাকল জেলাঞ্চলে এবং এর ফলে এখানকার শিল্প-উৎপাদন সম্পর্কের রূপান্তর হল ত্বরান্বিত। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেখা গেল ফিলেচার পদ্ধতিতে রেশম উৎপাদনে এবং নতুন ধরনের পূর্ত ও বাস্তুবিদ্যার প্রসারে। অস্ত্র-শস্ত্রের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির প্রভাবও নজরে আসতে থাকল। প্রায় এই ধারাই অব্যাহত থাকল উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত। ১৮৩২ সালের সংস্কার আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে বাণিজ্যিক পুঁজিপতিদের জায়গায় শিল্প-নির্ভর পুঁজিপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং ইংরেজদের

ভারত-শাসন-ব্যবস্থাতেও তার প্রভাব পড়ল। এই সময় ভারতেও আভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে উঠল। ফলে এদেশে শিল্প-নির্ভর পুঁজিপতিদের স্বার্থোপযোগী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আগমনেরও একটা নতুন পর্যায় শুরু হল। নীল ও রেশম শিল্পের ক্ষেত্রে, নদীপথে যোগাযোগ ব্যবস্থায়, ছাপাখানার প্রসারে, চালকল, তেলকলের প্রতিষ্ঠায় এবং সর্বোপরি রেলপথের প্রবেশের মধ্যে দিয়ে জেলাঞ্চলে নতুন প্রযুক্তি তার প্রভাব ফেলতে শুরু করল। কিন্তু এই সকল নতুন প্রযুক্তির আগমন কোনভাবেই জেলাঞ্চলের শিল্পায়নের সহায়ক হয়ে উঠল না— বরং এ-সবের ফলে ঘটতে থাকল জেলাঞ্চলের সামগ্রিক অব-শিল্পায়ন। পাশাপাশি উন্নততর সাংগঠনিক-ব্যবস্থার প্রভাব ও দৃষ্টিগোচর হতে থাকল— একদিকে সরকারী স্তরে ইংরেজরা এ-দেশীয়দের মধ্যে থেকে যোগ্যতাভিত্তিক এক যুক্তিনির্ভর-আইনগত প্রশাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে থাকল, অন্যদিকে বেসরকারী স্তরে নানাপ্রকার স্বেচ্ছা-সংগঠন গড়ে তুলতে এ-দেশীয়দের উদ্যোগী করে তুলল। কিন্তু এ-সবের প্রভাবেও গ্রাম-প্রধান কৃষি-প্রধান মুর্শিদাবাদের সামগ্রিক উন্নয়ন অপেক্ষা ঔপনিবেশিক নগরায়নের প্রবণতা জোরদার হয়ে উঠল। জেলাঞ্চলে আর্য যুগের অথবা তুর্ক-আফগান-মোগল আমলের নগরায়ন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল এই ঔপনিবেশিক নগরায়ন— জেলা-সদর বহরমপুর-সহ মহকুমা শহরগুলিরও গঠন-বিন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক প্রভূত্ব ও অধীনতার মূলনীতিটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকল এই পরিস্থিতি। তারপর থেকেই জেলাঞ্চলে ব্যাপকভাবে রেলপথের প্রসার ঘটার ফলে বহুতর নতুন প্রযুক্তি এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থাবলীর অনুপ্রবেশ চলতে থাকল। যাতায়াত, যোগাযোগ, শিল্প-উৎপাদন, এমনকি কৃষিতেও এই প্রযুক্তির প্রভাব লক্ষ্য করা গেল ; সাংগঠনিক ব্যবস্থাবলী নাগরিক জনসাধারণের ভূমিকাকেও যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ করে তুলল। এই সকল পরিবর্তনের সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রামের ভেতরের অর্থনৈতিক বিন্যাস, গ্রামের সঙ্গে গ্রামের এবং গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগের ছক একেবারে বদলে যেতে থাকল। গ্রামীণ মানুষ গ্রামের পরিস্থিতিতে যত ব্যাপকভাবে শহরমুখী হতে বাধ্য হল, শহরগুলি সেই পরিমাণে তাদের আকৃষ্ট করতে বা যথোপযুক্ত জায়গা করে দিতে পারল না। গ্রাম-সমাজের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন আর্য অথবা তুর্ক-আফগান-মোগল প্রভাবে ঘটতেই পারেনি— ঐ সময়ের নগর কেন্দ্রগুলি গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি-বব্যস্থায় কোনও প্রকার কাঠামোগত পরিবর্তনের উৎসমুখ হিসাবে কাজ করতে পারেনি। অন্যদিকে বলা যায় ইংরেজ আনীত বহুমুখী প্রভাব-সমূহই ঔপনিবেশিক নগরকেন্দ্রগুলি থেকে সঞ্চারিত হয়ে নব্য-প্রস্তর যুগ থেকে চলে আসা জেলাঞ্চলের গ্রাম সমাজের কাঠামোর উপর, তার অচল অনড় স্থবির চরিত্রের উপর, সবচেয়ে জোরালো আঘাত হানল, অথচ কোনও ভাবেই গ্রামগুলিকে নগরে রূপান্তরিত হয়ে ওঠার সুযোগ জোগালো না।[৫১]

ইংরেজ প্রভাবের আমলে তৃতীয় যে ক্ষেত্রটিতে জেলাঞ্চলে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে সেটি হল চিন্তা-ভাবনার জগৎ। এই আমলে সরকারী উদ্যোগে এদেশের পরম্পরাগত শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলকাঠামোটির সম্পূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমেই শুধু নয়, বে-সরকারী উদ্যোগ তথা সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে বহুপ্রকার ইংরেজের ও ইউরোপীয়দের জীবনাচরণের উদাহরণ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইংরেজ শাসনে সৃষ্ট বহুমুখী পরিবর্তনের ধারা এদেশের সকল প্রান্তের লোকের মতই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের মানুষের মনেও চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎকে উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল। ভূমি-সম্পর্কের রূপান্তর এবং প্রযুক্তি ও সংগঠনের এলাকায় আনীত পরিবর্তনের মতই এই পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রেও

যে ইংবেজদেব ঔপনিবেশিক স্বার্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিযেছিল সে-বিষযে যেমন সন্দেহেব অবকাশ নেই, সেইবকম এই সত্যও সন্দেহাতীত যে ইংবেজদেব ঘোব অনিচ্ছাকে অতিক্রম কবেই সাবা দেশেব মতই এই জেলাঞ্চলেও চিন্তা-ভাবনাব ক্ষেত্রে এক বিস্ফোবণ ঘটে গিযেছিল। বিজ্ঞান-চেতনা, ইতিহাস-চেতনা, যুক্তিবাদ, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ, সমাজেব সমান্তবালে ব্যক্তিব ভূমিকাব স্বীকৃতি, ঐহিকতাবাদী বস্তুনিষ্ঠ ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টি, আদর্শবাদ ও স্বাদেশিকতা, ন্যাযনিষ্ঠ সংগ্রামী চেতনা— কযেক হাজাব বছব ধবে প্রবহমান চিন্তা-ভাবনাব স্রোতকে এইবকম সম্পূর্ণ অনাখাতে প্রবাহিত কবে দেওযাব ফলেই ইংবেজ প্রভাবেব দুশো বছবেব যুগটি জেলাঞ্চলেব ইতিহাসে আগামী দিনেব পক্ষে হযে উঠেছে অসাধাবণ অর্থবহ। প্রদীপ থেকে যেমন প্রদীপ জ্বলে ওঠে সেইবকমই এইসকল চিন্তা-ভাবনা তাব নাগবিক শিক্ষিতজনেব সীমা থেকে বৃহত্তব জনসমাজে ছড়িযে পড়েছে— এমনকি শ্রমজীবি সাধাবণেব মধ্যেও সচেতনা, দ্রোহ ও সংগ্রামেব বীজ উপ্ত হযেছে, জাত ও ধর্মেব পার্থক্য ও বৈষম্যকে দূব কবে জীবন ও চিন্তাব সমভূমিতে একত্রিত হওযাব প্রচেষ্টা শুরু হযেছে, শুরু হযেছে সংগঠিত সংগ্রাম প্রতিবাদ আব প্রতিবোধেব মধ্যে দিযে শ্রমজীবি মানুষেব বিরুদ্ধে অত্যাচাব-বঞ্চনা-শোষণেব অবসান ঘটিযে এক নতুন সমাজ গড়ে তোলাব দীর্ঘস্থাযী প্রচেষ্টা।[১০]

উপবোক্ত আলোচনাব পবিপ্রেক্ষিতে জেলাঞ্চলেব উপব বহিবাগত তৃতীয দফাব ইংবেজ প্রভাবেব সামগ্রিক মূল্যাযন কবতে গিযে বলতেই হয যে এই অতি জোবালো প্রভাব তবঙ্গও নব্য-প্রস্তব যুগে উদ্ভূত জেলাঞ্চলেব গ্রাম-প্রধান কৃষি-প্রধান অর্থনৈতিক কাঠামোটিব আমূল পবিবর্তন ঘটাতে আর্য-প্রভাব এবং তুর্ক আফগান-মোগল প্রভাবেব মতই ব্যর্থ হযেছে। অবশ্য একথাও স্বীকাব কবতেই হবে যে এই তৃতীয দফাতেই জেলাঞ্চলেব জনজীবনে নব্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান-প্রযোগেব, নগবাযনেব এবং নব্য চিন্তা-ভাবনাব যে প্রবল স্রোতোধাবা সঞ্চাবিত হযেছে আগামী দিনে সেই ধাবাপথেই জেলাঞ্চলেব আমূল রূপান্তবেব দিগন্ত উন্মোচিত হতে পাববে।

চেনা মুর্শিদাবাদেব অচেনা ইতিবৃত্তেব দিকে তাকালে যা আমাদেব বাবে বাবে সচকিত কবে তোলে তা হচ্ছে এই জেলাঞ্চলে ঐশ্বর্য আব দাবিদ্র্যেব আশ্চর্য সহাবস্থান। এই অঞ্চলেব ঐশ্বর্যেব খ্যাতিই বাব বাব বাইবে থেকে আক্রমণকাবী আব লুঠেবাদেব প্রলুব্ধ কবে এনেছে— ভাস্কববর্মণ আব বাজেন্দ্র চোলেব কর্ণসুবর্ণ অভিযান, কনৌজবাজ যশোবর্মাব গৌড়াক্রমণ, বক্তিযাব খিলজি, গিযাসুদ্দিন বলবন, হুমাযুন শেবশাহ-আকববেব গৌড়-বিজয থেকে মাবাঠা বর্গীদেব আব ইংবেজ বণিকদেব মুর্শিদাবাদ আক্রমণ আব লুণ্ঠন— একই ইতিহাসেব পুনবাবৃত্তি ঘটে চলেছে। আব যে ঐশ্বর্যেব লোভে অতীতে বাব বাব এই ইতিহাস বচিত হযেছিল সেই ঐশ্বর্য গড়ে উঠেছিল জেলাঞ্চলেব গ্রামেগঞ্জে ছড়িযে থাকা অত্যাচাবিত আব বঞ্চিত প্রতিবাদ প্রতিবোধহীন নির্বাক কৃষক আব কাবিগবদেব দক্ষতা, শ্রম, ঘাম আব বক্তেব বিনিমযে সঞ্চিত নাগবিক উচ্চবর্গেব সুবক্ষিত সম্পদে। জেলাঞ্চলেব আগামী দিনেব ইতিহাস নিশ্চযই একই পথে অগ্রসব হবে না।

# মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক রূপান্তর (১৫৭৫-১৭৫৭) : একটি রেখাচিত্র

## ।। এক ।।

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক ইতিহাসের রূপরেখা রচনা করতে গিয়ে প্রাথমিক উৎস ব্যবহারে প্রবন্ধকারের অসুবিধা থাকায় মূলত মাধ্যমিক উৎস ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় মাধ্যমিক উৎসও যথেষ্ট নয়, কেননা, সংখ্যাতথ্যগত প্রমাণের অভাবে পরিস্থিতিগত যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়াও বর্তমান থেকে অতীতের দিকে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করেও কিছু কিছু শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য।[১] আর বর্তমান সময়ে তথ্যাবলীর বিন্যাস, সম্পর্ক-সন্ধান ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে হলেও আর্দশ বা মডেল-এর ব্যবহার বর্জন করাও সম্ভব নয়, বিশেষত সামন্ত সমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের মার্ক্সীয় মডেল এ-ক্ষেত্রে আমাদের সুনিশ্চিত অর্ন্তদৃষ্টি জোগাতে পারে।[২] ১৫৭৫ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কালকে আমরা জেলাঞ্চলে সামন্ত-অর্থনীতির অবক্ষয় ও বিদেশী বাণিজ্যিক পুঁজির অনুপ্রবেশ ও প্রসারের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের যুগ হিসাবে সাধারণভাবে চিহ্নিত করতে পারি, যদিও আলোচনার সুবিধার জন্য ক্ষুদ্রতর পর্ব-বিভাগও উপেক্ষা করা যায় না।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ইতিহাসে "যুগ" ও যুগের অর্ন্তগত "পর্ব" বিভাগ মূলত দুটি নীতিকে অনুসরণ করে করা যায়। প্রথমত রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র অর্থনৈতিক জীবনের প্রবাহকে নির্দিষ্ট খাতে চালিত করে বলেই অর্থনৈতিক ইতিহাসের যুগ বিভাগেও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনাকেই বিভাজিকা বলে ধরা যায় : বাংলায় মোগল আধিপত্য স্থাপন (১৫৭৫), পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) এবং স্বাধীনতা ও বঙ্গ বিভাগ (১৯৪৭) এই তিন ঘটনায় সীমায়িত মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সুতরাং দুটি যুগ, স্বাধীন অর্থনৈতিক রূপান্তরের যুগ (১৫৭৫-১৭৫৭) এবং বৈদেশিক প্রাধান্যের পটভূমিতে অর্থনৈতিক রূপান্তরের যুগ (১৭৫৭-১৯৪৭)। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ইতিহাসকে ১৫৭৫ খৃস্টাব্দেরও অতীতে প্রসারিত না করার যুক্তি এখানেই যে ঐ সময়ের পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে সাধারণভাবে ১৫৭৫-১৭৫৭ ও ১৭৫৭-১৯৪৭ এই দুই যুগের অর্থনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিকের সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, অথচ এই দুই যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস এক গভীর ধারাবাহিকতার সূত্রে এই অঞ্চলের স্বাধীনতা-উত্তর যুগের অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। স্বাধীনতা-উত্তর যুগ আমাদের জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত থাকায় এই সময়ের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির সঙ্গে আমরা পরিচিত। এই পরিচিতির ফলে যখন আমরা মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অতীতের দিকে তাকাই তখন সহজেই বোঝা যায় যে ১৫৭৫-এর পরে এ অঞ্চলের অর্থনীতিতে এমন কিছু কিছু নতুন শক্তির আর্বিভাব তথা সঞ্চার ঘটেছিল যেগুলি এ অঞ্চলের অর্থব্যবস্থায় সূচনা করেছিল কাঠামোগত কিছু পরিবর্তনের— পরিবর্তনের যে ধারাগুলি বিভিন্ন পর্ব অতিক্রম করে ক্রমশ পরিপুষ্ট ও বেগবতী হয়ে স্বাধীনতা-উত্তর

যুগে হযে উঠেছে দুর্বাব, বহুবিস্তৃত, গভীব এবং সুদূবপ্রসাবী। এই পবিবর্তনগুলিব সামগ্রিক প্রভাবে এ-অঞ্চলেব অর্থনৈতিক কাঠামোব কি কোনও মৌলিক ৰূপান্তব ঘটেছে, প্রাক-পবিবর্তন পর্য্যায থেকে এই কাঠামো কি আজকেব দিনে সম্পূর্ণ ভিন্ন হযে গেছে?[৩] ভবিষ্যাতেব পথনির্দেশী এই বিতর্কিত প্রশ্নটিব সঠিক উত্তব পাওযাব জন্যও মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ইতিহাসে ধাবাবাহিকতা ও পবিবর্তনেব পাবস্পবিক মেল-বন্ধনেব যথাযথ ৰূপটিকে ঐতিহাসিকভাবে বুঝে নেওযা দবকাব। দ্বিতীযত, অন্য নীতিটিব সাহায্যে উপবোক্ত দুটি যুগেব প্রত্যেকটিকে আবাব উল্লেখযোগ্য কযেকটি অর্থনৈতিক ঘটনাব নিবিখে তিনটি কবে পর্বে ভাগ কবা যায এবং ঐ ঘটনাগুলিব প্রত্যেকটিই অর্থনৈতিক ৰূপান্তবেব প্রক্রিযাকে প্রভাবিত কবেছিল গভীবভাবে। প্রথম যুগটিব অর্ন্তগত পর্ব তিনটি হল : জেলাঞ্চলেব অর্থনীতিব দেশজ ৰূপান্তবেব সূচনাপর্ব (১৫৭৫-১৬৩২), আঞ্চলিক আর্থিক গৌববেব প্রতিষ্ঠা পর্ব (১৬৩২-১৭০৪) এবং দেশী-বিদেশী অর্থনৈতিক শক্তিব দ্বৈবথ পর্ব (১৭০৪-১৭৫৭)। আব দ্বিতীয যুগেব পর্বগুলি হল: বিদেশী-নিযন্ত্রিত আঞ্চলিক অর্থনীতিব আদি পর্ব (১৭৫৭-১৮৩৬), ঔপনিবেশিক দমন-শোষণেব পর্ব (১৮৩৬-১৯০৫) এবং গতিশীল নযা অর্থনীতিব গোড়াপত্তন পর্ব (১৯০৫-১৯৪৭)।

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ৰূপান্তবেব দুটি যুগেব প্রথমটি অর্থাৎ স্বাধীন অর্থনৈতিক ৰূপান্তবেব যুগ (১৫৭৫-১৭৫৭) আপাতত আমাদেব আলোচনাব বিষযীভূত। বর্তমান প্রবন্ধেব সীমিত অবযবে প্রাপ্ত সকল তথ্যেব ব্যবহাব যেমন সম্ভব ছিল না, সেইবকম সম্ভব নয নতুন কোন তথ্যেব উপস্থাপনা। অর্থনৈতিক ৰূপান্তবেব গতিশীল উপাদানগুলিকে চিহ্নিত কবাব সামান্য চেষ্টামাত্র কবা হযেছে এখানে এবং এই চেষ্টাব প্রসঙ্গক্রমেই জেলাব জনসংখ্যা সম্পর্কিত অনুমান, উদীযমান নগব-কেন্দ্রেব গ্রামীণ পশ্চাৎভূমি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেব পাবস্পবিক গুরুত্ব বিষযক বিচাব বা জেলাব বিবর্তমান শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি কবা হযেছে। স্বভাবতই এই সকল বিতর্কিত বিষয অন্তর্ভুক্ত হওযায এবং একটি উপেক্ষিত পর্বেব প্রতি অতিবিক্ত মনোযোগ দেওযায প্রবন্ধটি সুসম ও সুবিন্যস্ত হযে উঠতে পাবেনি।

॥ দুই ॥

## জেলাঞ্চলের অর্থনীতির দেশজ রূপান্তরের সূচনাপর্ব (১৫৭৫-১৬৩২)

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দেব পূর্ববর্তী প্রায পঞ্চাশ বছব ধবে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক জীবনেব উপব যে তিনটি শক্তিব প্রভাব এসে পডছিল এবং এই জীবনেব ধীবগতি ৰূপান্তব আনতে শুরু কবেছিল ঐ সমযেব পব সেই শক্তিগুলি সুস্পষ্টতা ও সুস্থিতি অর্জন কবে। এই তিনটি শক্তিব মধ্যে প্রথমটি ছিল গঙ্গা নদীব গতিপথেব পবিবর্তন— গঙ্গা তাব প্রধান প্রবাহ-পথ ভাগীবথী খাত ছেড়ে পদ্মাখাতে প্রবাহিত হতে শুরু কবেছিল এবং গৌড়েব উত্তব-পূর্বেব কালিন্দী-মহানন্দা প্রবাহ পথ ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমেব বর্তমান প্রবাহপথে সবে এসেছিল। এই পবিবর্তনেব ফলে, প্রথমত, আংশিক ভাবে হলেও গৌড়-টন্ডা-বাজমহল থেকে সুদূব ঢাকায় বাংলাব বাজধানীব স্থানান্তব (১৬১২খৃঃ) অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত,

বাঢ়েব উত্তব-পূর্ব প্রান্তেব সমৃদ্ধ গ্রামীণ পশ্চাৎভূমিতে গৌড়-নগবেব যে নাগবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ভৌগোলিক বিপর্যয়েব ফলে তা মড়কেব ক্ষেত্র হয়ে ওঠায় এবং বাঢ়েব স্থলভূখন্ড থেকে নতুন গঙ্গা-প্রবাহেব দ্বাবা বিচ্ছিন্ন হয়ে পববর্তী মালদহ্ জেলাব অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়াব ফলে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল থেকে নাগবিক অর্থনীতি ও জীবন-ব্যবস্থাব প্রভাব অনেকখানিই মুছে গিয়েছিল। তৃতীয়ত, অন্যদিকে গঙ্গাব গতিপথেব পবিবর্তন মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব নদী-ব্যবস্থাব পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে বাগড়ি-মুর্শিদাবাদেব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিব পথ খুলে দিয়েছিল।[১]

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেব অর্থনীতিব উপব আবো ব্যাপক ও গভীব দ্বিতীয় যে প্রভাবটি এই কালপর্বে এসে পড়েছিল তা ছিল বাংলায মোগল প্রাধান্য বিস্তাব ও মোগল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনেব। গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীবথীব সংযোগস্থলে অবস্থিত বাংলাব পবাজিত পাঠান বাজন্য ও অমাত্যবর্গেব অন্যতম আশ্রয়-এলাকা মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল সামবিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানেব অধিকাবী ছিল। বাংলাব বাজধানী গৌড়-বাজমহল-টন্ডা থেকে মোগল প্রাধান্য দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে প্রসাবিত কবতে হলে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলকে সামবিক উদ্যোগেব ভিত্তিভূমি (Operational base) হিসাবে ব্যবহাব কবা ছিল অনিবার্য। ফলে ১৫৭৫ সাল থেকে ১৬১২ সালে ঢাকায বাংলাব বাজধানী স্থানান্তব পর্যন্ত পাঠান অভিজাতবর্গকে সম্পূর্ণভাবে দমন এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে শান্তি স্থাপনেব জন্য সামবিক কার্যকলাপেব প্রযোজনে বহুসংখ্যক বহিবাগত সৈন্যকে এই অঞ্চলে অবস্থান কবতে হওযায এখানে পত্তন ঘটেছিল ছোটখাট কযেকটি সামবিক ঘাঁটি বা ছাউনিব। আব সামবিক কাজকর্মেব জন্য স্থল ও নৌ-বাহিনীব বসদ ও অন্যান্য জিনিসপত্র জোগাং প্রযোজন অবশ্যম্ভাবী প্রভাব ফেলেছিল এই এলাকাব অর্থনীতিব উপব। কিন্তু এ-ধবনেব সামবিক প্রভাবেব ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ ও স্থাযী হয়ে উঠেছিল মোগল প্রাধান্য তাব সামবিক চবিত্র ত্যাগ কবে এক সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত বেসামবিক প্রশাসন গড়ে তুলতে থাকায। ১৫৮৬ সালে তোডবমলেব বাজস্ব-সংস্কাবেব মধ্যে দিয়ে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়ে ১৬১২ সালেব পব সুস্পষ্ট চেহাবা নিয়েছিল। মোগল প্রাধান্যেব এই রূপান্তবেব ফলে এই জেলাঞ্চলেব সামবিক ঘাঁটি বা ছাউনিগুলো ক্রমশ রূপ নিতে শুরু কবেছিল প্রশাসন-কেন্দ্রেব। ভাগীবথীব পূর্বদিকে এবং গোববানালাব পশ্চিমদিকেব যে এলাকাটিতে বাৎসবিক বন্যাব ফলে বালি ও পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিযায চাবপাশেব এলাকাব তুলনায এক নদী-বেষ্টিত উচ্চভূমিব সৃষ্টি হয়েছিল— যাকে আধুনিক ভূগোলবিদ্ বলেছেন Bhagirathi Levee— স্পষ্টতই তা ছিল সামবিক দিক থেকে গুরুত্বেব অধিকাবী। ফলে এই অঞ্চলেই সামবিক ছাউনি স্থাপন বা সেগুলিব প্রশাসনকেন্দ্রে রূপান্তবেব প্রক্রিযা দেখা যাবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। আকববেব সময়ে অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দেব পবেই মুর্শিদাবাদ শহবেব পত্তন হয়েছিল, টিফেনথ্যালাবেব এই বক্তব্যেব সমর্থক প্রমাণাদি না মিললেও শহবেব পূর্বদিকে আকববপুব গ্রামেব অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে আকববেব আমলেই ১৫৮৭ থেকে ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যেই বাংলাব সিপাহ-সালাব বা শাসক সৈয়দ খাঁ এবং তাঁব বণিক ভ্রাতা মখ্সুস্ খাঁ যে সৈদাবাদ ও মখ্সুদাবাদ এই দুই পবস্পব-সংলগ্ন শহবেব পত্তন কবেছিলেন এবং এদেব মধ্যে মখ্সুসাবাদেব বাণিজ্যিক গুরুত্ব যে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু কবেছিল এবকম সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। এইভাবেই ১৫৭৫ থেকে ১৬১২ সালেব মধ্যেই পবস্পব-সংলগ্ন সৈদাবাদ-মুখ্সুদাবাদ মাসুমাবাজাব অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এক নাগবিক বসতি এলাকা এবং বাংলাদেশে সমাগত মোগল-বাহিনী,

শাসকবৃন্দ ও তাদেব উপব নির্ভবশীল লোকজনেদেব এক প্রধান আবাসকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই এলাকাটি।[৫] এব ফলে গঙ্গানদীব গতিপথ পবিবর্তনেব জন্য যে নাগবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এ জেলাঞ্চলেব উত্তবাংশে বিপর্যস্ত হযে গিযেছিল মোগল প্রাধান্যেব বিস্তাব ও সুপ্রতিষ্ঠাব ফলে তাব জাযগায জেলাঞ্চলেব মধ্যাংশে ভিন্নতব নগববসতিব ভিত্তিপত্তন ঘটেছিল। নতুন নগববসতিব পত্তন ঘটাই শুধু নয সঙ্গে সঙ্গে মোগল সামবিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাব অবিচ্ছেদ্য ফলশ্রুতি হিসাবে এই নগবাঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও পবিপুষ্টিও শুরু হযেছিল। প্রযোজনীয সবববাহ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত বাখাব জন্য মোগল সৈন্যবাহিনী ও শাসকবৃন্দেব সঙ্গে সর্বদাই অনুগামী হত ব্যবসাযী-মহাজনবা। তাছাড়া বঙ্গবিজেতা মোগল শাসনকর্তা ও সেনাপতিবৃন্দ সে যুগে প্রায সকলেই লিপ্ত থাকতেন ব্যক্তিগত বাণিজ্যে। তাব ফলে তাঁদেব বসতিকেন্দ্রগুলি বাণিজ্যেব কেন্দ্রেও পবিণতি হত। এই কাবণেই সৈদাবাদ-মুখসুদাবাদ-মাসুমাবাজাব অঞ্চলও উদ্ভবেব প্রথম থেকেই ব্যবসাবাণিজ্যেব কেন্দ্র হিসাবে পবিচিতি পেযেছিল। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিব অন্য আব একটি দিকও ছিল। মোগল শাসক, সেনাপতি, অভিজাতবা যেখানেই বসতি কবতেন সেঁখানেই তাঁদেব চাহিদা পূবণেব জন্য এবং ব্যবসাযিক প্রযোজনে সমাবেশ ও বসতি কবানো হত নানা কাকশিল্পীদেব, গড়ে উঠত নানা কাকশিল্প। উত্তব ভাবতেব সঙ্গে নিযত যোগযুক্ত এবং বদলিযোগ্য মোগল কর্মচাবীদেব স্থানান্তবেব ফলে এই সকল শিল্পদ্রব্যেব চাহিদা অল্পদিনেই প্রস্তুতকেন্দ্রগুলিকে অতিক্রম কবে ছড়িযে পড়ত। একই ব্যাপাব ঘটেছিল সৈদাবাদ-মুখসুদাবাদ-মাসুমাবাজাব-এব ক্ষেত্রেও। মনে কবাব কাবণ আছে যে গৌড়নগব ও তাব সমৃদ্ধ পশ্চাৎভূমিতে তুঁতচাষ ও বেশমশিল্পকে আশ্রয কবে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব উত্তবাংশে হস্তশিল্পেব যে ধাবাটি কিছুদিন পূর্বেও বহমান ছিল মূলত সেই ধাবাটিই নতুন পত্তন হওযা শহবাঞ্চলকে কেন্দ্র কবে পুনর্বিন্যস্ত হযেছিল এবং খুব অল্প দিনেই এই অঞ্চলটিকে সমৃদ্ধ কবে তুলেছিল। ফলে ১৬১২ সালেব অল্প কযেক বছবেব মধ্যেই সৈদাবাদ-মুখসুদাবাদ শিল্প-বাণিজ্যে সর্ব-ভাবতীয খ্যাতি অর্জন কবে। এইজন্যই ১৬২০ খ্রীস্টাব্দেই দেখা যাচ্ছে যে পাটনায ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব কুঠিস্থাপনেব জন্য প্রেবিত ববার্ট হিউজেস এবং জন পার্কাব কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছেন যে মাকসৌদ ও সাযদীবান্দ-এ (অর্থাৎ মক্‌সুদাবাদে ও সৈদাবাদে) সবচাইতে ভাল 'সেববন্দী সিল্ক' পাওযা যায। তাঁবা আবো জানাচ্ছেন যে মক্‌সুদাবাদে ভাবতেব অন্য যে কোনও জাযগাব চাইতে ২০ শতাংশ কম দামে যে কোনও পবিমাণেব কাঁচা বেশম এবং সর্বোৎকৃষ্ট বেশম পছন্দমতো সূতো হিসাবে পাকানো অবস্থায পাওযা যায। কেননা, এখানে অসংখ্য বেশমেব সূতো কাটানি ও দক্ষ কাবিগব আছে এবং শ্রমিকদেব মজুবীও অন্যান্য জাযগাব চাইতে এক তৃতীযাংশ কম। হিউজেস ও পার্কাব ৫০০ টাকাব মক্‌সুদাবাদ বেশমেব নমুনা কিনেছিলেন এবং কর্তৃপক্ষকে মক্‌সুদাবাদে কুঠিযালদেব পাঠানোব পবামর্শ দিযেছিলেন।[৬]

গঙ্গাব গতিপথ পবিবর্তন এবং মোগল প্রাধান্যেব বিস্তাব ছাড়া তৃতীয এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল অথচ সুদূবপ্রসাবী তাৎপর্যযুক্ত যে শক্তিটি মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেব অর্থনৈতিক জীবনে পবিবর্তন আনতে সহাযক হয়েছিল সেটি ছিল বাংলায পর্তুগীজ অভিযান ও বাণিজ্যেব বিস্তাব। ১৫৩৫ খ্রীস্টাব্দেব পব থেকে বাংলাব নানাপ্রান্তেব নদীপথে বণিক দস্যু এবং ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে পর্তুগীজদেব পদসঞ্চাব ঘটতে থাকলেও বিশেষভাবে ১৫৭৫ সালেব পব হতেই বাংলাব অর্থনীতিতে পর্তুগীজ প্রভাব ভীষণভাবে পড়তে থাকে। ১৫৭৯ খ্রীস্টব্দেব শেষদিকে পর্তুগীজেবা

হুগলী ব্যান্ডেল বা বন্দবেব পত্তন কবে, অভাবনীয় দ্রুততাব সঙ্গে বন্দবটিব বিকাশ ঘটতে থাকে এবং ষোড়শ শতাব্দী শেষ হওযাব পূর্বেই হুগলী চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামেব জাযগায বাংলাব প্রধান বন্দব হযে ওঠে। এব ফলে চট্টগ্রাম থেকে পাটনা বা সপ্তগ্রাম-হুগলী থেকে পাটনা নৌবিশাবদ পর্তুগীজদেব যাতাযাত ও বাণিজ্যকর্মেব প্রভাবে যে সকল পবিবর্তনেব মুখ দেখতে শুরু কবে তা এই দুই পথেব সংযোগ-এলাকা মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলকে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবিত কবেছিল এবং এখানকাব উদীযমান নগবকেন্দ্রটিব দ্রুত উন্নতি ও সম্প্রসাবণ ত্ববান্বিত কবেছিল। ১৫৭৫ থেকে ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাব মোগল প্রাধান্যেব বিস্তাবেব সমযে সম্রাট আকবব ও জাহাঙ্গীব পর্তুগীজদেব সঙ্গে মিত্রতাব নীতি অনুসবণ কবেছিলেন। এব ফলে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল সহ সাবা বাংলাদেশেই পর্তুগীজ প্রভাব ও বাণিজ্য যথেষ্ট পবিমাণে বৃদ্ধি পেযেছিল। পর্তুগীজ বাণিজ্যই যে অনেকাংশে এ জেলাঞ্চলেব বেশমশিল্পেব খ্যাতি তাদেব বাণিজ্যেব মাধ্যমে ১৬১৫ সালেব মধ্যেই সর্বভাবতীয বাজাবে এবং ইউবোপীয বণিকদেব মধ্যে ছডিযে দিযেছিল এ-বিষযে সন্দেহেব অবকাশ কম। পর্তুগীজবা বাংলা থেকে যে-সব জিনিসপত্র ক্রয কবত সুনিশ্চিতভাবে তাব মধ্যে ছিল সৈদাবাদ-মুখসুদাবাদেব বেশমী কাপড ও কাঁচা বেশম। এই জন্য পর্তুগীজ বাণিজ্যেব প্রসাবেব ফলে এই জেলাঞ্চলেব কাঁচা বেশম ও বেশমী কাপড়েব উৎপাদন ও বিনিময যথেষ্ট বৃদ্ধি পেযেছিল। এ জেলাঞ্চলেব অর্থনীতিতে পর্তুগীজ বাণিজ্যেব দ্বিতীয প্রভাবটি ছিল তাদেব দ্বাবা আমদানী কবা বিপুল পবিমাণ সোনারূপাব সাহায্যে উল্লেখযোগ্যভাবে মুদ্রাব জোগান বৃদ্ধি এবং এব ফলে দ্রব্য-বিনিমযেব বদলে অর্থনির্ভব বিনিময বাণিজ্যেব প্রসাব। যদিও এই প্রভাব উদীযমান শহবাঞ্চলেব বাইবে বিশেষ প্রসাবিত হয়েছিল বলে মনে হয না তাহলেও পববর্তী পবিবর্তনেব একটি ধাবা যে শুরু হযেছিল এ-বিষযে সন্দেহ নেই। এ জেলাঞ্চলেব অর্থনীতিতে পর্তুগীজ প্রভাবেব তৃতীয দিকটি ছিল মধ্যস্থ হিসাবে জেলাব বাণিজ্যে গুজবাটি বণিকদেব একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান কবে দেওযা। এশীয বাণিজ্যে একদা গুজবাটি বণিকদেব একাধিপত্য থাকলেও বাংলাদেশে পর্তুগীজদেব আসাব পূর্বেই গুজবাটি বণিকেবা পর্তুগীজদেব সহযোগী ও অনুগামী মধ্যস্থে পবিণত হযেছিল। পর্তুগীজদেব ছত্রছাযায গুজবাটি বণিকেবা জেলাব অর্থনীতিতে যে স্থান ক'বে নিযেছিল পর্তুগীজ প্রভাব অবলুপ্তিব পবও বহুদিন তা স্থাযী হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মনে বাখা প্রযোজন যে ঐ সমযে বাংলাব বাজনৈতিক জীবন বহু ভাঙা গডাব মধ্যে দিযে যাচ্ছিল বলে পর্তুগীজ প্রভাবেব প্রসাব যতখানি ঘটাব সম্ভাবনা ছিল তা ঘটতে পাবেনি। অবশেষে সম্রাট সাজাহানেব বাজত্বকালে মোগল বাজশক্তিব সঙ্গে পর্তুগীজদেব বিবোধ দেখা দিল। এই বিবোধেব পবিণতিতেই 'মদক্সা' বা মুখসুদাবাদ ১৬২৮ থেকে ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যে কোনও সমযে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিব জন্যই মগ-পর্তুগীজ যৌথ আক্রমণ ডেকে এনেছিল। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে বাংলাব সুবাদাব কাশিম খাঁ পর্তুগীজদেব হুগলী থেকে বিতাড়িত কবে হুগলিকে বাদশাহী বন্দবে পবিণত কবেন; এব ফলে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল-সহ সাবা বাংলাদেশে পর্তুগীজ বাণিজ্যেব পতন ঘটে। কিন্তু অন্যদিকে ঐ সময থেকে সৈদাবাদ-সংলগ্ন মাসুমাবাজাব কাশিমবাজাব নাম নিযে বেসবকাবী নদী বন্দব হিসাবে আত্মপ্রকাশ কবায হুগলীব বাদশাহী বন্দবেব শুল্ক এড়ানোব জন্য দেশী-বিদেশী বণিকেবা সেখানে জড়ো হযে তাব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিব পথ খুলে দিল। আব পর্তুগীজদেব ছেড়ে যাওযা শূণ্যস্থান পূবণ কবতে অবিলম্বে এগিয়ে এল ডাচ ও ইংবেজ বণিকেবা।[৭]

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেব অর্থনৈতিক জীবনেব উপব ১৫৭৫-১৬৩২ কালপর্বে তিনটি শক্তিব প্রভাবেব যে-বিশ্লেষণ উপবে বাখা হযেছে তাতে এ জেলাঞ্চলে একটি শহব বা নগবকেন্দ্রেব উদ্ভব ও বিকাশ এবং এই নগবাযনকে আশ্রয কবে হস্তশিল্প ও বাণিজ্যেব প্রসাবেব সুনিশ্চিত প্রমাণ মেলে। এব থেকে জেলাঞ্চলেব সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে সঙ্গতভাবে কতকগুলি অনুমান কবা যায। প্রথমত, এ অঞ্চলেব জনবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন ঘটতে দেখা যায; পশ্চাৎভূমিসহ গৌড-নগবী এ-জেলাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন হযে যাওযাব পবে এ অঞ্চল সম্পূর্ণত একটি গ্রামীণ অর্থব্যবস্থায পবিবর্তিত হযেছিল; নতুন শহবাঞ্চলেব উদ্ভব ও বিকাশ গ্রামীণ অর্থব্যবস্থাব বৃহত্তব পটভূমিতে একটি নাগবিক অর্থব্যবস্থাব পত্তন ঘটিযে এ জেলাঞ্চলে অর্থনৈতিক ৰূপান্তবেব সূচনা কবেছিল। অর্থাৎ জনবিন্যাসেব পবিবর্তন এবং অর্থনৈতিক ৰূপান্তব ছিল পবস্পব সাপেক্ষ। এই যুগ্ম পবিবর্তন থেকে জেলাব জনসংখ্যাব পবিবর্তন সম্পর্কে কোন অনুমান যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও অন্যত্তব প্রমাণ থেকে এ বিষযে কিছু সিদ্ধান্ত কবা যায। মধ্যযুগে বাজনৈতিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলাব উপস্থিতিব সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং দুর্ভিক্ষ ও মডকেব সঙ্গে জনসংখ্যাহ্রাসেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য কবা যায। আলোচ্য পর্বে দুর্ভিক্ষ বা মড়কেব প্রমাণ মেলে না; অন্যদিকে প্রায ১৬১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল পাঠানেব যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা এ-জেলাঞ্চলেব শান্তি বিঘ্নিত কবেছিল। এই পবিস্থিতি থেকে অনুমান কবা যায ১৫৭৫-১৬১২ কালপর্বে এ অঞ্চলেব জনসংখ্যা বিশেষ বাডেনি; পবেব বিশ বছবে (১৬১২-১৬৩২) জনসংখ্যা বাডলেও সপ্তদশ শতকে সমগ্র দেশব্যাপী জনসংখ্যাবৃদ্ধিব ধীব গতিব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে সামান্যই বৃদ্ধি পেযেছিল। ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব লোকসংখ্যা প্রায ৮ লক্ষ ১৬ হাজাব অনুমিত হযেছে; ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ জেলাঞ্চলেব লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ ছিল এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না এবং তাব পূর্ববর্তী ২৫ বছবে বাজনৈতিক অস্থিবতাব জন্য জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পেযেছিল মনে হয না।[৮] দ্বিতীযত, যে নাগবিক অর্থব্যবস্থাব উদ্ভব ও বিকাশ জেলাঞ্চলে শুরু হযেছিল তা ছিল পব-নির্ভব ও পবজীবী, কেননা, এই অর্থব্যবস্থাব মূল কর্মধাবাই ছিল সেবাসৃজনমূলক, দ্রব্যউৎপাদনমূলক নয। শহবাঞ্চলটিব স্বল্পসংখ্যক লোক শিল্পউৎপাদনে নিযুক্ত থাকলেও বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠ অংশই নিযুক্ত ছিল সামবিক, প্রশাসনিক, ব্যবসাযিক এবং শ্রমিক ও গৃহভৃত্যেব কাজেকর্মে। মোবল্যাণ্ড মোগলযুগেব ভাবতে ভোক্তা এবং উৎপাদক যে-দুটি প্রধান অর্থনৈতিক গোষ্ঠীব কথা জানিযেছেন নাগবিক অথব্যবস্থায সুনিশ্চিতভাবে তাদেব মধ্যে সংখ্যাগবিষ্ঠতা ছিল ভোক্তা গোষ্ঠীব। ফলে শহবাঞ্চলেব বাইবে অবস্থিত উৎপাদকগোষ্ঠীব উপবই শহবাঞ্চল ছিল জীবনধাবণেব জন্য নির্ভবশীল। শহবাঞ্চলেব অর্থনৈতিক জীবন নির্বাহিত হত মূলত টাকাকডি-নির্ভব বিনিমযেব মাধ্যমে তিনটি সামাজিক শ্রেণী,— সামবিক, প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কর্মে নিযুক্ত উচ্চ বর্গ, হস্তশিল্প ও খুচবো ব্যবসাযে নিযুক্ত মধ্যবর্গ এবং বাণিজ্যিক শ্রমে নিযুক্ত স্বাধীন শ্রমিক ও ক্রীতদাস গৃহভৃত্যদেব নিম্নবর্গেব পাবস্পবিক লেনদেনেব মধ্যে দিযে। আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন লেনদেনের উপব এই নাগবিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল মনে হলেও নগবাঞ্চলেব অভ্যন্তবে তথা বৃহত্তব জেলাঞ্চলেব সঙ্গে নগবাঞ্চলেব সম্পর্কেব ক্ষেত্রে বলপ্রযোগেব সম্ভাবনাব ছিল নির্ধাবক ভূমিকা।[৯] তৃতীযত, মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব উদীযমান নগবকেন্দ্রটি অর্থনৈতিক দিক দিযে পবনির্ভব ছিল এই সত্যটি অনিবার্যভাবে এ-জেলাঞ্চলেব গ্রামগুলিব সঙ্গে এই নগবকেন্দ্রেব পবিবর্তমান সম্পর্ক এবং গ্রামগুলিব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব গতিপ্রকৃতি বিষযে আমাদেব দৃষ্টি ফেবাতে বাধ্য কবে। ১৫৭৫

খ্রীস্টাব্দেব বহু পূর্ব হতেই সাবা বাংলাদেশেব মতই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব গ্রামগুলিতেও প্রজাবর্গেব দ্বাবা বাজশক্তিকে দেয ফসলেব ছযভাগেব একভাগ বাজস্ব আদাযেব জন্য একটি খাজনা আদাযকাবী শ্রেণীব উদ্ভব ঘটেছিল এবং বাংলাব ইতিহাসেব সুলতানী আমলে ওই শ্রেণীটিই জমিদাবশ্রেণী নামে পবিচিত হযেছিল। এই জমিদাবশ্রেণী প্রজাবর্গেব কাছ থেকে বাজশক্তিব প্রাপ্য বাজস্বেব চাইতে অনেক বেশী পবিমাণ ফসলই প্রথাগতভাবে বল-প্রযোগেব সাহায্যে আদায কবত। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব গ্রামগুলি ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ছিল এইবকম বহুসংখ্যক ছোটখাট জমিদাবেব অধীন এবং এই জমিদাবেবা বাজস্ব আদাযেব নামে একদিকে যেমন প্রজাদেব উপব নানা জোবজুলুম চালাত সেইবকম নিজেদেব মধ্যেও নিযত বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থাকত। তাছাড়া ঐ সমযেব পূর্বেব পঞ্চাশ বছবে বাংলাব বাজশক্তি নড়বড়ে হযে পড়ায আদাযকৃত বাজস্বেব প্রায সবটাই এই জমিদাবেবা নিজেদেব প্রযোজনে ব্যয কবত। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে এইসব জমিদাবেবা ছিল পাঠান ও উচ্চবর্ণেব হিন্দু। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলায মোগল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে সঙ্গেই সামবিক শক্তিব জোবে এই জমিদাবর্গেব কাছ থেকে বাজশক্তিব প্রাপ্য বাজস্ব আদায যেমন শুরু হল সেইবকম এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাব এক দশকেব মধ্যেই তোডবমলেব বাজস্ব সংস্কাবেব সাহায্যে এই জমিদাবদেব খর্ব কবাব সুব্যবস্থিত প্রচেষ্টা শুরু হযে গেল। মূলত দুইভাবে চেষ্টা কবা হল জমিদাবদেব খর্ব কবতে: জেলাঞ্চলেব কিছু কিছু এলাকাকে সামবিক-প্রশাসনিক কর্মচাবীদেব জাযগীবে পবিণত কবে এবং কিছু এলাকাকে সবাসবি বাজশক্তি নিযন্ত্রিত 'খালসা' জমিতে রূপান্তবিত কবে। এই দুই এলাকায উৎপাদিত শস্যেব উল্লেখযোগ্য অংশ তথা জমিদাবদেব কাছ থেকে আদাযকৃত বাজস্বেব শস্যভাগেব উপব নির্ভব কবেই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব উদীযমান নগবকেন্দ্রটি তাব প্রযোজনীয বসদ ও কাঁচামাল সংগ্রহ কবে ভোক্তা-প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে সক্ষম হযেছিল। এখানেই ছিল নগব-কেন্দ্রটিব পব-নির্ভবতা ও পব-জীবীতা। প্রসঙ্গক্রমে অর্থমূল্যে বাজস্বদানেব বীতি সম্পর্কে মনে বাখা প্রযোজন যে পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বছবে ব্যবসা-বাণিজ্যেব প্রসাব ও মুদ্রাব প্রচলন বৃদ্ধি সত্ত্বেও আলোচ্য কালপর্বে বাজশক্তিকে প্রদত্ত বাজস্বেব প্রধান অংশটিই শস্য-মাধ্যমে প্রদান কবা হত, জমিদাববর্গ বাজস্বেব সামান্যমাত্র অংশই অর্থমূল্যে প্রদান কবতেন। অন্যদিকে প্রজাবর্গেব নিকট থেকে জমিদাববর্গ যা আদায কবতেন তা ছিল সম্পূর্ণতই শস্য-মাধ্যমে। এক কথায আলোচ্য কালপর্বে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব উদীযমান নগবকেন্দ্রটি ছাড়া তাব বাইবেব কিছু কিছু জমিদাবদেব মধ্যেই অথবা অত্যন্ত অল্পসংখ্যক হস্তশিল্পীদেব মধ্যেই মাত্র মুদ্রাব আংশিক প্রচলন ঘটেছিল।[১০]

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব গ্রামগুলিব সঙ্গে উদীযমান নগবকেন্দ্রটিব সম্পর্ক সঠিকভাবে বুঝতে হলে এই গ্রামগুলিব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব গতি-প্রকৃতি অবশ্যই আমাদেব জানতে হবে। এই গতিপ্রকৃতি অনেকখানিই নির্ধাবিত হযেছিল জেলাঞ্চলে গ্রামীণ উৎপাদন-সম্পর্ক এবং উৎপাদন শক্তি সমূহের পবিবর্তনেব ফলে। উপবেব অনুচ্ছেদে আলোচিত যে-ব্যবস্থাব মাধ্যমে উদীযমান নগবকেন্দ্রটি গ্রামীণ অর্থব্যবস্থাব উপব নির্ভবশীল হযে গড়ে উঠেছিল সেই ব্যবস্থাই গ্রামীণ উৎপাদন সম্পর্ককেও বদলাতে শুরু কবেছিল। তোডবমলেব বাজস্ব-সংস্কাবেব মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত মোগল প্রশাসনেব যে সুদীর্ঘ হস্ত মুর্শিদাবাদেব গ্রামাঞ্চলে প্রসাবিত হযেছিল তাব ফলেই এ অঞ্চলেব ভূমি-মালিকানাব্যবস্থায় ঘটতে শুরু কবেছিল উল্লেখযোগ্য রূপান্তব। অবশ্য এই রূপান্তবেব প্রক্রিয়া আলোচ্যপর্বেব অর্ধশতাধিক বছব পূর্বে শুরু হলেও তোডবমলেব

সংস্কাবেব পবেই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ৰূপ গ্রহণ কবতে শুরু কবেছিল। এই ৰূপান্তব প্রক্রিযা শুরু হওযাব অব্যবহিত পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক জীবনেব মূল স্রোতোধাবাটি বহুসংখ্যক গ্রামেব স্বনির্ভব অর্থ-ব্যবস্থাকে আশ্রয কবে প্রবাহিত হত। তীর্থযাত্রা, বৈবাহিক প্রযোজন, বা বাৎসবিক জেলাসমূহেব সীমিত বিনিময বাণিজ্য ছাড়া প্রতিটি গ্রামই ছিল বর্হিজগতেব সঙ্গে প্রায যোগাযোগশূণ্য। অন্যদিকে প্রতিটি গ্রামেব অভ্যন্তবে ভূমি-ব্যবহাব-নির্ভব কৃষি উৎপাদনেব মুখ্য এবং অকৃষি উৎপাদনেব গৌণ ধাবাদুটি যজমানী প্রথাব মাধ্যমে এক জটিল দ্রব্য-সেবা বিনিময়েব সুসমঞ্জস ব্যবস্থা বচনা কবে গ্রামেব মানুষদেব প্রযোজন পূবণেই প্রধানত নিযুক্ত ছিল। গ্রামীণ অর্থব্যবস্থাব এই বিন্যাসে বাজস্ব-আদাযকাবী শ্রেণীটি ছাড়াও সুস্পষ্টভাবে তিনটি উচ্চনীচ অর্থনৈতিক শ্রেণীব অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয ছিল : শ্রমবিমুখ ভূমি-মালিক শ্রেণী, শ্রম-নিষ্ঠ ভূমিমালিক শ্রেণী এবং শ্রমজীবী ভূমিহীন শ্রেণী। এই অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাসেব অন্যপিঠে ছিল হিন্দু ও মুসলিম জাতি-ব্যবস্থাব স্তববিন্যাস—উঁচু জাত, মাঝাবি জাত এবং ছোট জাত। শ্রেণী ও জাতিব্যবস্থাব এই দ্বৈত কাঠামোব দ্বাবা বচিত উৎপাদন-সম্পর্কেব মধ্যে দিযেই গ্রামীণ কৃষি উৎপাদন, হস্তশিল্প, গোপালন ও মৎস্যশিকাব এবং গ্রামীণ সেবা-সৃজন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ৰূপদান কবত। ষোড়শ শতকেব প্রথম দিক থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে, বিশেষভাবে ভাগীবথীব পূর্বে অবস্থিত বাগড়ি এলাকায, যাতাযাত যোগাযোগেব প্রসাবেব ফলে অর্থনৈতিক ৰূপান্তবেব যে প্রক্রিযা শুরু হয তা অত্যন্ত জোবালো হযে ওঠে গ্রামীণ শ্রেণী কাঠামোয সমাজেব উচ্চতব দুটি অর্থনৈতিক শ্রেণীব আযতন ও প্রভাববৃদ্ধিব ফলে। সুলতানী আমলেব শেষ বছবগুলিতে বাজস্ব আদাযকাবী শ্রেণীটি এই দুই দিক দিযেই যেমন পবিপুষ্ট হযে ওঠে অন্যদিকে উঁচুজাতিভুক্ত গ্রামেব শ্রমবিমুখ ভূমিমালিক শ্রেণীটিবও অনুৰূপ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বাঢ় ও বাবেন্দ্র থেকে উচ্চ ও মধ্যবর্ণেব হিন্দুবা এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন কবতে থাকে, শাসক মুসলিম সম্প্রদাযেব উচ্চস্তবেব লোকেবাও গ্রামাঞ্চলে ছড়িযে পড়তে থাকে। গ্রামাঞ্চলেব এই দুটি উচ্চশ্রেণীব এই প্রকাব গুরুত্ব বৃদ্ধি নিম্নতব উৎপাদক শ্রেণীদুটিব উপব সৃষ্টি কবে বিপুল চাপ। এই চাপেই পবিবর্তন ঘটতে থাকে গ্রামীণ অর্থনীতিব। আমাদেব আলোচ্য পর্বে এসে তোডবমলেব বাজস্ব সংস্কাবেব পবে গ্রামীণ অর্থনীতিব এই পবিবর্তন আবো ব্যাপক ও গভীব হযে ওঠে। তোডবমলেব এই সংস্কাবেব ফলেই মুর্শিদাবাদেব নানা এলাকায গ্রামাঞ্চলে জমিদাব জাযগীবদাব লাখেবাজদাব ইত্যাদি বাঙালী ও অবাঙালী হিন্দু ও মুসলিম বাজস্ব আদাযকাবী ও ভূমিসত্বভোগীশ্রেণীব বসতি স্থাপনেব ফলে জেলাব ভূমি মালিকানা ব্যবস্থাব উল্লেখযোগ্য ৰূপান্তব ঘটতে শুরু কবেছিল। জেলাঞ্চলেব ভূমি-ব্যবস্থায এইসব বহিবাগত ব্যক্তিদেব উচ্চতব গ্রামীণ শ্রেণীগুলিব মধ্যে সংস্থাপন না ঘটলে পববর্তীকালে এই অঞ্চলে ভূমি-ব্যবহাবেব পবিবর্তনেব মাধ্যমে অতিদ্রুত তুঁত চাষেব বিস্তাব এবং বেশম শিল্পেব বিকাশ সম্ভব হত না। শুধু তুঁত চাষই নয কৃষিব অন্যান্য ক্ষেত্রেও উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া উদীযমান নগবকেন্দ্রটিব পবিপোষণ সম্ভব হত না। অন্যদিকে গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পবিপোষক কৃষি (Subsistence agriculture) থেকে বেবিযে আসাব যেমন পথ কবে দিযেছিল সেইবকম গ্রামাঞ্চলে টাকাকড়িব প্রচলনকেও প্রশস্ততব কবে তুলেছিল।[১১]

উৎপাদন শক্তিসমূহেব যথোপযুক্ত বিন্যাস ছাড়া উৎপাদন-সম্পর্কগুলিব পবিবর্তন এককভাবে জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায ৰূপান্তবেব প্রক্রিয়া শুরু কবতে পাবত না। আলোচ্য কালপর্বে এ জেলাঞ্চলেব বাগড়ি এলাকায উৎপাদন শক্তিসমূহেব এমন এক নতুনতব বিন্যাস ঘটে

যাব ফলে উৎপাদন-সম্পর্ক জাত চাপসমূহ উৎপাদন ব্যবস্থায পবিবর্তন নিযে আসে। বাগড়ি এলাকাব গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিব পবিবর্তন শুরু হযেছিল পূর্বে উল্লেখিত গঙ্গানদীব দীর্ঘায়ত গতিপবিবর্তন প্রক্রিযাব ফলে। এই গতি পবিবর্তনেব ফলেই পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদেব বাগড়ি অঞ্চলে গোববানালা, ভৈবব, শিযালমাবা ও জলঙ্গী নদীসমূহ এবং জলনির্গমন ব্যবস্থা উদ্ভূত হযেছিল। এব ফলে একদিকে যেমন বাগডি অঞ্চলেব স্বল্পসংখ্যক পূর্ব-বসতিগুলি বিপর্যস্ত হয তেমনি আবাব নতুন পলিগঠিত নতুন গ্রামসকল গড়ে উঠতে থাকে। প্রাকৃতিক পবিবর্তনেব মোকাবেলা কবাব জন্য সুলতানী আমল থেকেই যে সকল বাঁধ গৌড়েব দক্ষিণে গঙ্গা-ভাগিবথী অঞ্চলে নির্মাণ কবা হযেছিল সেই সকল বাঁধও আলোচ্যপর্বে বাগডি মুর্শিদাবাদেব উত্তব ও মধ্যাঞ্চলে বসতি ও চাষেব বিস্তাব সম্ভব কবে তুলেছিল। বৎসবান্তে বন্যাপ্লাবিত জলাজঙ্গলপূর্ণ বাগডি অঞ্চলে পূর্ব থেকেই গোপালন, মৎস্যশিকাব ও আনাজ চাষেব মত প্রাক্-কৃষি উৎপাদন প্রচলিত ছিল ; নতুন চাষ ও বসতি বিন্যাসেব ফলে এই সকল উৎপাদনও বৃদ্ধি পেতে থাকল। অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রে আউস ধান চাষেব বিস্তাবেব পাশাপাশি ববিশস্য এবং তুঁত চাষেব বিপুল সম্প্রসাবণ জেলাব গ্রামীণ অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিব সূচনা কবে। বাগডি অঞ্চলেব গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই সকল পবিবর্তন সেখানে বাঢ় মুর্শিদাবাদেব আমন ধান ও আখ-চাষ নির্ভব সুপ্রাচীন এক-ফসলী কৃষি-ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র এক কৃষি-ব্যবস্থাব পত্তন কবল ; শুধু তাই নয বাঢ় মুর্শিদাবাদেব উত্তবাংশেব কৃষিতে আখেব পবিবর্তে তুঁত চাষেবও প্রচলন ঘটতে থাকল। উৎপাদন শক্তিসমূহেব, হস্তশিল্পেব, বিশেষত বস্ত্রশিল্পেব, প্রযুক্তিগত দিকটিব প্রতিও নজব দেওযা দবকাব। সুলতানী আমলেব শেষ দিক থেকে এ-জেলাব পূর্বাঞ্চলে মুসলিম শাসন বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রশিল্পেব প্রযুক্তিগত দিকে কী কোনও পবিবর্তন ঘটেছিল ? ইবফান হাবিব বলেছেন যে মুসলিমবাই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে উন্নত ধবনেব সুতোকাটা ও তাঁত প্রযুক্তি ভাবতে এনেছিলেন। অনুমান কবা যেতে পাবে, আলোচ্যপর্বেই উন্নত ধবনেব সুতোকাটা ও তাঁতপ্রযুক্তি মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে ছডিযে পড়েছিল এবং এইভাবে পববর্তীকালে বেশমশিল্পেব অভূতপূর্ব উন্নতিব বাস্তবভিত্তি বচনা কবেছিল।[১২]

॥ তিন ॥

## আঞ্চলিক আর্থিক গৌরবের প্রতিষ্ঠা-পর্ব (১৬৩২-১৭০৪)

মুর্শিদাবাদ জেলাব অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৬৩২-১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অথচ সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত পর্ব। এই পর্ব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই কাবণে যে বৈদেশিক কোনও প্রভাবেব নির্ধাবক ভূমিকা ছাডাই, দেশেব অভ্যন্তবেব বাজনৈতিক-সামাজিক-আর্থিক শক্তি সমূহেব ক্রিযা-প্রতিক্রিযাব ফলেই, এ-জেলাব অর্থনৈতিক জীবনে কৃষিব তুলনায শিল্প ও সেবাকর্মেব ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ হযে উঠে এখানে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিব সূচনা কবে। অবশ্য বৈদেশিক প্রভাবেব নির্ধাবক ভূমিকা যেমন ছিল না সেইবকম জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব আভ্যন্তবীণ চাপও এককভাবে এই পবিবর্তন আনেনি। ববং মোগল সাম্রাজ্যেব সুবা বাংলাব একটি অংশ হিসাবে এ-জেলাঞ্চলের অর্থনীতিতে প্রাদেশিক বা সর্বভাবতীয় ক্ষেত্রে উদ্ভূত অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক শক্তিগুলিব অনুপ্রবেশ

ও প্রতিষ্ঠাব ফলেই এখানে অর্থনৈতিক ৰূপান্তবেব প্রক্রিযাটি শুরু হযেছিল। আলোচ্যপর্বে এ অঞ্চলে বেশমশিল্পেব অভূতপূর্ব উন্নতি এবং জাতীয ও আন্তর্জাতিক বাজাবে এ-জেলাব কাঁচা বেশম ও বেশমী বস্ত্রেব চাহিদা অনিবার্যভাবেই এখানকাব কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে দীর্ঘকালীন ও গভীব এক পবিবর্তনেব সূচনা কবেছিল। সামগ্রিক বিচাবে এই জেলাঞ্চলে এই পর্বে অর্থনৈতিক পবিবতর্নেব যে-সকল ৰূপলক্ষণ ফুটে উঠেছিল সেগুলিকে এক কথায দেশজ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতিব কিছু কিছু উপাদানেব অত্যন্ত ক্ষীণ আবির্ভাব হিসাবে চিহ্নিত কবা যায। এ অঞ্চলেব অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই পর্বটি সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত এই কাবণেই যে আংশিকভাবে পববর্তী নবাবী পর্বেব বাজনৈতিক জাঁকজমক এই পর্বেব গৌববময স্বাধীন অর্থনৈতিক ভূমিকাকে আচ্ছন্ন কবে দিযেছে এবং আংশিকভাবে এই পর্বেব সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিবর্তনেব আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত তাৎপর্য ইতিহাসেব ছাত্রেবা এখনো পর্যন্ত উপলব্ধি কবতে পাবেননি।

এই পর্বে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক পবিবর্তন তিনটি পর্যাযেব মধ্যে দিযে ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততব হযে উঠেছিল। প্রথম পর্যাযেব ১৬৩২-১৬৫০ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যে তিনটি ঘটনাব ফলশ্রুতি উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে হুগলী থেকে পর্তুগীজদেব বিতাডনেব ফলে একদিকে বাংলাব বহির্বাণিজ্য থেকে তাদেব দ্রুত পশ্চাদপসবণ ঘটে এবং মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলসহ বাংলাব বাণিজ্যেব সুযোগ অন্য ইউবোপীয, প্রধানত, ডাচ ও ইংবেজ, বণিকদেব কাছে খুলে যায ; সঙ্গে সঙ্গে হুগলীকে বাদশাহী বন্দব ঘোষণা কবায শুল্ক এডানোব জন্য ব্যক্তিগত ব্যবসাযীবা সুবেদাব কাশিম খাঁ পৃষ্ঠপোষিত সৈদাবাদ-মুখসুদাবাদ সংলগ্ন মাসুমাবাজাব- কাশিমবাজাবে ভিড জমায। দ্বিতীযত, লন্ডনেব বাজাবে পাবস্যেব বেশমেব কদব থাকায ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী পাবস্যেব শাহেব অনুমিত নিযে সেখান থেকে বেশম কিন্তে আগ্রহী ছিল। কিন্তু এ-ব্যাপাবে শাহেব সঙ্গে সকল আলোচনা ব্যর্থ হওযাব পবই ইংবেজ কোম্পানী বাংলাব দিকে নজব দেয। তৃতীযত, ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে গুজবাটেব বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষেব ফলে সেখানকাব সুতী ও বেশমী বস্ত্রশিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওযায ডাচ এবং ইংবেজ ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী গুজবাটেব বদলে বাংলাকেই তাদেব প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয এবং ১৬৩৩-৩৬ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যেই উডিষ্যাব বালাসোবে তাদেব বাণিজ্যকুঠি গডে তোলে। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব সঙ্গে ডাচ ও ইংবেজদেব বাণিজ্য বালাসোব থেকে পাঠানো তাদেব প্রতিনিধি ও ভাবতীয বণিকদেব মাধ্যমে দ্রুত বিস্তাব লাভ কবতে থাকে। যদিও প্রায একই সমযে ডাচ ও ইংবেজবা এ অঞ্চলেব বহির্বাণিজ্যে অংশীদাব হযে উঠতে শুরু কবেছিল তাহলেও দেখা যাবে যে বাণিজ্যেব পবিমাণ ও বৈচিত্র্যেব দিক থেকে ডাচ বাণিজ্য ইংবেজ বাণিজ্যেব চাইতে অনেক ব্যাপক ছিল। অবশ্য এব একটি কাবণও ছিল : ডাচেবা যেখানে ১৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাজাহানেব কাছ থেকে বাংলায বাণিজ্য কবাব ফবমান পেযেছিল সেখানে ইংবেজবা স্বাধীনভাবে বাংলায বাণিজ্যেব সুযোগ পেযেছিল ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে শাহ সুজাব কাছ থেকে। কিছু পূর্বে বাণিজ্যেব সুযোগ পাওয়াব সুবাদে ডাচেবা ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে জাপানে ৩৩৮$^{1}/_{2}$ পাউন্ড কাশিমবাজাবেব কাঁচা বেশম বপ্তানীব মধ্যে দিযে এ অঞ্চলেব সঙ্গে জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিযাব বাণিজ্যেব পথ খুলে দেয। ঐ সমযে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল থেকে বপ্তানীব পবিমাণ সামান্য হলেও ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে ডাচ বণিকেবা বাংলা থেকে যে ৬০,০০০/৭০,০০০ পাউন্ড কাঁচা বেশম বপ্তানী

করত তার প্রধান অংশই যে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল থেকে আসত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই পর্যায় (১৬৩২-১৬৫০) মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে একদিকে ডাচ ও ইংরেজ বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকলেও অন্যদিকে পর্তুগীজ বাণিজ্য হঠাৎ ধ্বসে পড়ায় তার এক সুতীব্র অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। পর্তুগীজরা যে বিপুল পরিমাণ রূপো বাংলাদেশে আমদানি করত তা বন্ধ হয়ে গেল অথচ ডাচ ও ইংরেজ বণিকরা এ সময়ে রূপো অমাদানি করতে সমর্থ হল না; অন্যদিকে বছরে প্রায় কোটি টাকা মূল্যের রূপো উত্তর ভারতে চলে যেতে থাকল। ফলে টাকাকড়ির অভাবে বাংলার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় প্রকার বাণিজ্যই অতি ধীব গতিতে বিকশিত হতে থাকল। স্বাভাবিকভাবেই হুগলীর উত্তরে পর্তুগীজ বাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া অর্থনৈতিক বিকাশের গতিকে কিছু দিনের জন্য হলেও বেশ কমিয়ে দিয়েছিল। এই পর্যায়ে আবো লক্ষ্য করা যায় যে একদিকে পর্তুগীজ বণিকদের সবে যাওয়া এবং অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের ডাচ ও ইংরেজ বণিকদেব তখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে এসে না পৌঁছানোর ফলে এই জেলাঞ্চলের বাণিজ্যে গুজরাটি, ক্ষত্রি, বাঞ্জাবা ইত্যাদি ভাবতীয় বণিকেরা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন কবেছিল। পরবর্তীকালে জেলাঞ্চলে ডাচ ও ইংরেজ বাণিজ্যেব বিস্তারের ফলে যে বাঙালী ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব ও প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল তাবা যে এইসকল ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অনেকখানি সরিয়েই জাযগা করে নিয়েছিল তা মনে করার কারণ আছে। তবে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের বাণিজ্যে এই পর্যায় থেকে মোগল রাজকর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বা 'সওদা-ই-খাস'ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে। এই পর্যায়ে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ধীরগতি সত্ত্বেও উদীয়মান শহরাঞ্চলটি সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাব মধ্যেই জেলাঞ্চলের অর্থনীতির অর্থবহ ইংগিত থেকে গিয়েছে। এই সময়ের সৈদাবাদ-মুখসুদাবাদ-সংলগ্ন মাসুমাবাজার সম্পর্কে সেবাশিয়ান মানরিক (১৬২৯-১৬৪৩) যে বিববণ বেখে গেছেন, তাতে দেখা যায়: "মাসুমাবাজার শহরটি বেগবতী গঙ্গার তীরে অবস্থিত, যে গঙ্গা বালিঘাটা শহর থেকে মাসুমাবাজারকে তফাৎ করেছে। আমি নানাপ্রকার সুতী-দ্রব্যাদি, ওষুধ, তামাক, আফিং ইত্যাদি ছাড়াও এইসকল বাজারে সমস্ত কিছুরই প্রাচুর্য লক্ষ্য করেছিলাম, বিশেষত, খাদ্য দ্রব্যাদি এবং গৃহকর্মে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির।" মানরিক অন্যত্রও টাকায ৪ মণেব বেশী চাল এবং টাকায় ১৯ সের ঘি বিক্রী হওয়ার কথা বলেছেন।[১৩]

আলোচ্য পর্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬৫০ থেকে ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দেব এই ত্রিশ বছবের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব উদীয়মান শহরকেন্দ্রটির অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি যেমন দেখা যায় এর ফলে জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক বিকাশও সেইরকম ব্যাপক ও বহুমুখী হয়ে ওঠে। প্রথম পর্যায়ের ধীরগতি অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জায়গায় এই দ্বিতীয় পর্যায়ের অতি দ্রুতগতি পরিবর্তনের কারণ খুঁজতে গেলে কতকগুলি জিনিষ নজরে পড়ে। প্রথমত, পূর্বভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের সামগ্রিক সম্প্রসারণ ঘটায় উত্তরভারত ও উত্তরবঙ্গ থেকে গঙ্গা-ভাগীরথী নদীপথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ হয়ে ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্যে প্রসারিত বাণিজ্যপথের সংযোগ কেন্দ্রে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের এক মধ্যবর্তী বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে অভূতপূর্ব গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় বণিকেরা প্রত্যক্ষভাবে জেলাঞ্চলে এসে কুঠি স্থাপন করায় সুনিশ্চিতভাবে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যবৃদ্ধি এবং শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়। তৃতীয়ত, ডাচ ও ইংরেজ বণিকরা এই সময় থেকেই আমেরিকান খনি থেকে আহরিত বিপুল পরিমাণ রূপো এদেশে

আমদানী কবতে থাকায টাকাকড়িব ব্যবহাব অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে যায এবং এব ফলে দ্রুত বাণিজ্যেব প্রসাব ঘটতে থাকে।[১৪]

এই পর্যাযে (১৬৫০-১৬৮০) মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব সৈদাবাদ-মুখসুদাবাদ কাশিমবাজাব নগবকেন্দ্রটিতে যে অভূতপূর্ব বাণিজ্যবৃদ্ধি ঘটে তাব যে-বিববণ ইউবোপীয পর্যটকেবা বেখে গেছেন ঐতিহাসিকগণ তাকে মোগল যুগেব ভাবতেব কোনও একটি শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্রেব সর্বাপেক্ষা সংখ্যাতথ্যনিষ্ঠ বিববণ বলে গণ্য কবেছেন। আমবা এইসকল বিববণেব একটা সংক্ষিপ্তসাব দিতে পাবি। মূলত এই বিববণ ডাচ ও ইংবেজ বাণিজ্যেব পবিচয়ই আমাদেব দেয। আগেব পর্যাযেব মতই এই পর্যাযেও ডাচ বাণিজ্যেবই অসাধাবণ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য কবা যায। ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে ডাচ কোম্পানীব কোর্ট অব ডাইবেক্টব্স্ কাঁচা বেশমেব বাৎসবিক ববাৎ ৫০,০০০ পাউন্ড বেঁধে দেন। তবে ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজাব সংলগ্ন কালিকাপুবে কুঠি স্থাপনেব পব থেকে ডাচেবা কাঁচা বেশমেব বাণিজ্য-বিকাশে বিশেষভাবে উদ্যোগী হযে ওঠে। ফলে ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দেই ডাচেদেব কাঁচা বেশম বপ্তানী বেড়ে দাঁড়ায ২০০০ পাউন্ড; ট্যাভার্ণিযেবেব মতে এই পবিমাণ ছিল কাশিমবাজাবেব মোট উৎপাদনেব এক দশামাংশ। ডাচ বাণিজ্য এত দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে যে এক দশকেব মধ্যেই তা প্রায ২০ গুণ বেড়ে যায। এই সময়ে ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে ডাচেবা সম্রাট আওবঙ্গজেবেব কাছ থেকে বাণিজ্যেব ফার্মান লাভ কবায পববর্তী দুই দশকে বিপুল বাণিজ্যবৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হয। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে ট্যাভার্ণিযেব জানাচ্ছেন যে বাংলাব বেশমেব প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র ছিল কাশিমবাজাব এবং তাব পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তাঁব হিসেব অনুসাবে বছবে কাশিমবাজাব থেকে প্রতি গাঁট ১০০ পাউন্ড ওজনেব ২২০০০ গাঁট কাঁচা বেশম (বেশমেব কাটা সুতো) বপ্তানী হত; এব মধ্যে ছয থেকে সাত হাজাব গাঁট যেত জাপান ও হল্যান্ডে, প্রায সমপবিমাণ বপ্তানী হত তাতাবি ও মোগল সাম্রাজ্যেব নানা এলাকায এবং বাকী নয হাজাব গাঁট ডাচ ব্যবসাযীবা গুজবাটেব সুবাট এবং আহমেদাবাদে বিক্রী কবত। প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি থেকে জানা যায যে মোট উৎপাদনেব দুই-তৃতীযাংশ ইউবোপীয বণিকেবা বপ্তানী কবলেও এক তৃতীযাংশ কাঁচা বেশম থাকত লোকেদেব মধ্যেই যাব সাহায্যে তাবা স্থানীয চাহিদা পূবণেব জন্য বস্ত্রাদি বুনত। এব থেকে অনুমান কবা যায যে কাশিমবাজাব এলাকায মোট বেশম উৎপাদন হত আনুমানিক ৩.৩ মিলিয়ন পাউন্ড (২.২ মি. পা + ১.১ মি.পা)। বার্ণিযেব ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে লিখেছিলেন যে ডাচেবা তাদেব কাশিমবাজাব কুঠিতে ৭০০/৮০০ দেশী কাবিগবকে নিযুক্ত কবত এবং অন্যান্য ইউবোপীয বণিকবাও অনুরূপ সংখ্যক কাবিগব নিযুক্ত কবত। বার্ণিযেব না বললেও অনুমান কবা যায যে এইসব কাবিগব মূলত সুতা কাটাব কাজে নিযুক্ত থাকত। কেউ কেউ অনুমান কবেছেন যে ইউবোপীয ও দেশী উদ্যোগগুলিব মোট ২৫০০ জন বা তাবও বেশী বেশম কাবিগব সুতো কাটাব কাজে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এই অনুমান সঠিক নয বলে সিদ্ধান্ত কবাব পক্ষে প্রমাণ বযেছে। শুধুমাত্র ডাচ ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব কাশিমবাজাব কুঠি সম্পর্কেই যে তথ্যাদি পাওযা যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই কুঠিব বেশমী সুতো উৎপাদন কেন্দ্রটি যখন পূর্ণ সামর্থ্যে কাজ কবত তখন ৩০০০ জন বেশম কাবিগব নিযুক্ত কবা হত এবং পববর্তী সময়ে ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে এখানে যাতে ৪০০০ জন কাবিগব কাজ কবতে পাবে তাব জন্য প্রয়োজনীয় কাজেব জায়গা নিমার্ণ কবা হয়েছিল। সুতবাং আলোচ্য সময়ে কাশিমবাজাবে বেশম কাবিগবেব মোট সংখ্যা ৫০০০ জনেব কিছু বেশী হওয়াবই সম্ভাবনা। বেশমী কাপড়

বয়নে নিযুক্ত তাঁতীদের সংখ্যা জানা যায় না। ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে ষ্ট্রেনস্যাম মাস্টার লিখেছিলেন : "কাশিমবাজারের চারপাশের সমস্ত বা অধিকাংশ অঞ্চলেই তুঁতগাছের চাষ করা হয়। এই গাছগুলো প্রতি বছরই লাগাতে হয়, কেননা, রেশমকে সূক্ষ্ম করার জন্য পোকাদের এই গাছের পাতা খাওয়াতে হয়।" ডাচ বাণিজ্যের পর আমরা ইংরেজ বাণিজ্যের দিকে নজর দিতে পারি। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে ডাচ বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসারের সঙ্গে ইংরেজেরা পাল্লা দিতে না পারলেও ইংরেজরাও ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে কাশিমবাজারের রেশম বাণিজ্যে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠল। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ১০০ গাঁট কাঁচা রেশম, ১৪০০টি লম্বা টাফেটা এবং ৯০০ টি ছোট টাফেটা কেনার নির্দেশ পাঠান (কাশিমবাজার অঞ্চল বোনা রেশমী কাপড় পরিচিত ছিল টাফেটা নামে)। ঐ ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দেই প্রতিষ্ঠিত হল ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি এবং রেশম বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা হল ৫০,০০০ টাকা। ১৬৫৯ থেকে ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে মোগল উত্তরাধিকারের যুদ্ধ চলতে থাকায় এবং মোগল সেনাপতি ও শাসক মীরজুমলা ইংরেজদের প্রতি বিরূপ হওয়ায় ইংরেজদের যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে ব্যবসা চালাতে হলেও কাশিমবাজার কুঠির বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। ১৬৬০ থেকে ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে টাফেটার চাহিদা কোনওভাবে হ্রাস পায় না। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কাশিমবাজার কুঠিতে প্রতি বৎসরে ১২০০০ টাকা মূল্যে ১০০০ খানা সুপার-ফাইন টাফেটা, ৪৫০০০ টাকা মূল্যে ৫০০০ খানা ফাইন টাফেটা এবং ৬৭৫০০ টাকা মূল্যে ১৫০০০ খানা সাধারণ টাফেটা এবং ইচ্ছামত পরিমাণ এ প্রকারের কাঁচা রেশম কেনার জন্য বলা হচ্ছে। এই সময় জানা যাচ্ছে যে প্রতি বৎসরই আগাম অর্থবিনিয়োগ করতে হয় কোম্পানীকে এবং সারা বছর ধরে অল্প অল্প পরিমাণে মাল পাওয়া যায় এবং এই জন্য সারা বছরই দেখাশোনার লোকের দরকার হয়। গোটা ষাটও সত্তরের দশক ধরে ইউরোপীয় বাজারে বাংলার রেশমের চাহিদা-বৃদ্ধির ফলে এবং কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্যোগের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। জেলাঞ্চলের বাণিজ্যে ডাচ ও ইংরেজ বণিকদের মুখ্য ভূমিকা থাকলেও আরো দুটি ইউরোপীয় জাতিকেও এই পর্যায়ে বাণিজ্যকর্মে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। তাদের একটি ছিল ফরাসীরা, অন্যটি আর্মেনীয়রা। ১৬৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজারে সমাগত নিকোলো মানুচীর সাক্ষ্য অনুসারে সেখানে তখন ফরাসীদেরও কুঠি বিদ্যমান ছিল ; ফরাসীদের এই কুঠি বেশীদিন টিঁকে ছিল বলে মনে হয় না এবং এই পর্যায়ে জেলাঞ্চলের বাণিজ্যে ফরাসীরা কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। আর্মেনীয়রা ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দেই উদীয়মান নগরকেন্দ্রের সৈদাবাদ অঞ্চলে তাদের কুঠি ও বসতি গড়ে তোলে এবং ক্রমশ আন্তঃএশীয় বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে।"[৫]

এই পর্যায়ে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের যে অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে তা অন্যদুটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। প্রথমত, এই এলাকায় বিদেশী বণিকদের সমাগম, বিপুল পরিমাণ রূপোর আমদানি এবং বাণিজ্যের অভূতপূর্ব বৃদ্ধির ফলে মুখসুদাবাদে একটি টাঁকশাল স্থাপন অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অন্তত ১৬৭৯ সাল থেকে যে মুখসুদাবাদ টাঁকশাল-শহরে পরিণত হয় এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত, ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই মুখসুদাবাদ একটি ফৌজদারী শহরে পরিণত হয়েছিল ; কয়েকটি পরগণা নিয়ে গঠিত একটি "সরকার"-এর প্রধানকে বলা হত ফৌজদার ; সুতরাং ফৌজদারী শহর হিসাবে জেলাঞ্চলের

উদীযমান নগবকেন্দ্রটি তাব চাবপাশেব পশ্চাৎভূমিব উপবও বাজনৈতিক গুরুত্বেব অধিকাবী হযে উঠেছিল। শুধু তাই নয, মুখসুদাবাদেব ফৌজদাবেব অধীনে একজন উপ-ফৌজদাব নিযুক্ত হযেছিলেন কাশিমবাজাবেব ইউবোপীয বণিকদেব নিযন্ত্রণে বাখাব জন্য। অন্যভাবে বলা যায, মোগল বাজকর্মচাবী ও অভিজাতবৃন্দ বেশম শিল্পেব বিকাশে প্রযোজনীয সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণেব ফলেই বেশম শিল্পেব চবমোন্নতি ঘটতে শুরু হয।[১৬]

আলোচ্যপর্বেব তৃতীয পর্যাযে (১৬৮০-১৭০৪) একটি সুব্যবস্থিত কাঠামোব মধ্যে জেলাঞ্চলেব বাণিজ্য বৃদ্ধি পূর্ববর্তী দ্বিতীয পর্যাযেব ধাবা অনুসবণেই অগ্রসব হতে থাকে কিন্তু বাজনৈতিক কাবণে এই বাণিজ্যবৃদ্ধি বেশ কিছুটা বাধাগ্রস্ত হযে পড়ে। ডাচ বাণিজ্য পূববর্তী পর্যাযে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পেলেও আশিব দশকে ডাচ বপ্তানীব পবিমাণ কমে যেতে থাকে এবং শতাব্দীব প্রায শেষ দিক থেকে তা আবাব বাড়তে শুরু কবে; সেই সমযেই ডাচ বপ্তানীব পবিমাণ বৃটিশ বপ্তানীব প্রায দ্বিগুণ হযে ওঠে। ইংবেজ বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে দেখা যায যে ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব কর্তৃপক্ষ ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে বাংলায বৃটিশ বাণিজ্যকে উৎসাহ দানেব নীতি গ্রহণ কবায এই বাণিজ্যেব দ্রুত বিস্তাব ঘটতে থাকে। ঐ বৎসবই কাশিমবাজাবে বিনিমযোগেব জন্য ৮০,০০০ পাউন্ড ববাদ্দ হয। ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে বাংলায বাণিজ্যেব জন্য ববাদ্দ ২৫০,০০০ পাউন্ডেব মধ্যে শুধুমাত্র কাশিমবাজাবে বিনিযোগেব জন্যই ববাদ্দ কবা হযেছিল ১৪০,০০০ পাউন্ড; এ-ছাড়াও কাশিমবাজাবে স্থানীযভাবে ১০০,০০০ পাউন্ড ঋণ নিযে কাঁচা বেশম কেনায বিনিযোগেব জন্যও নির্দেশ দেওযা হযেছিল। ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাঁচা বেশমেব চাহিদা কম থাকলেও পববর্তী বছবগুলিতে এই চাহিদাব অভূতপূর্ব বৃদ্ধি লক্ষ্য কবা যায। কোম্পানী-কর্তৃপক্ষেব তবফে কাশিমবাজাবে ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে ৮৪,১০০ খানা বেশমী কাপড়, ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে ২২২,৬০০ খানা বেশমী কাপড় ও ২০ গাঁট কাঁচা বেশম এবং ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে ২০৮,০০০ খানা বেশমী কাপড় ও ২০ গাঁট কাঁচা বেশমেব অর্ডাব দেওযা হযেছিল। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলা থেকে যে ১৬৩০ গাঁট কাঁচা বেশম ও যত সংখ্যক সম্ভব টাফেটা ও বেশমী রুমাল পাঠানোব যে নির্দেশ দিযেছিলেন তাব প্রধান অংশই যে কাশিমবাজাব থেকে সংগৃহীত হতে বাধ্য ছিল এ-বিষযে সন্দেহ নেই। এইভাবে লাফ দিযে বেড়ে চলা বৃটিশ বাণিজ্য হঠাৎই বন্ধ হযে গেল বাজনৈতিক কাবণে। মোগল বাজশক্তিব সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব যে সশস্ত্র বিবোধ ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে শুরু হল তাব ফলে ১৬৮৬ থেকে ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চাব বছব ইংবেজবা মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলসহ বাংলাব বাণিজ্য থেকে মুছে গেল। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দেব শান্তি চুক্তিব পব তাবা পুনবায এই বাণিজ্যে ফিবে আসতে পাবল। আপাতদৃষ্টিতে পূর্বাবস্থা ফিবে এলেও এই বিবোধেব বাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল অপবিসীম। স্যাব যোশিযা চাইল্ডেব নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব কর্তৃপক্ষ ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ভাবতে দুর্গেব দ্বাবা সুবক্ষিত বৃটিশ-বসতি গড়ে তোলাব যে নীতি অনুসবণ কবতে শুরু কবে তাবই ফলশ্রুতিতে মোগল বাজশক্তিব সঙ্গে ইংবেজদেব সংঘর্ষ ঘটেছিল যদিও প্রকাশ্যে বলা হযেছিল যে মোগল বাজকর্মচাবীদেব অন্যায অত্যাচাবেব প্রতিবোধেব জন্যই এই সংঘর্ষ। সংঘর্ষেব কাবণ যাই হোক, এই সংঘর্ষেব পব থেকেই ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব ব্যবসাযিক চবিত্রেব পাশাপাশি সামবিক চবিত্রও আত্মপ্রকাশ কবতে থাকে এবং এই পবিপ্রেক্ষিতেই ভাগীবথী-হুগলী নদীতীবে কলকাতাব পত্তন, ফোর্ট উইলিযাম দুর্গ স্থাপন এবং ঢাকা থেকে বাংলাব বাজধানী ভাগীবথীব উত্তবাংশেব তীববর্তী মুখসুদাবাদে স্থানান্তবেব

মত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলী ঘটতে থাকবে এবং সারা বাংলার মত জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক ইতিহাসকেও একটি নতুন পর্বে পৌঁছে দেবে। তবে আপাতত ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের পর জেলাঞ্চলের বাণিজ্যে ইংরেজদের ভূমিকার দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। ইংরেজরা জেলাঞ্চলের রেশম বাণিজ্যে আবার ফিরে এলেও ইতিমধ্যে ডাচদের রেশম বাণিজ্য পুনরায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকায় ইংরেজদের পক্ষে তাদের পুনরায় জমি ফিরে পাওয়া শক্ত হয়ে উঠল। ফলে ইংরেজদের বাণিজ্য রেশম বস্ত্রের ক্ষেত্র ছাড়াও সুতিবস্ত্রের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হল এবং অল্পদিনেই কাশিমবাজার ইংরেজদের সুতি-বস্ত্র রপ্তানীরও এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল। কাশিমবাজার কুঠি থেকে ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে ২০,০০০ খানা, ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে ২৫,০০০ খানা এবং ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে ৩০,০০০ খানা সুতি কাপড় সরবরাহের অর্ডার থেকে দেখা যায় বাংলাদেশে কোম্পানীর অন্যান্য কুঠিগুলির তুলনায়, এমনকি সুতি বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র ঢাকার কুঠির তুলনাতেও, কাশিমবাজার কুঠি অনেক বেশী সুতি কাপড় সরবরাহ করেছিল। এইভাবেই ইংরেজদের বাণিজ্য মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জেলাঞ্চলের নগরকেন্দ্রটি সারা বাংলাদেশেরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। ফরাসীরা ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে আবার নতুনভাবে সৈদাবাদ-সংলগ্ন ফরাসডাঙ্গায় তাদের কুঠি পত্তন করেছিল; কিন্তু ঐ সময়ের পরই ডাচদের সঙ্গে ফরাসীদের বিবাদ শুরু হওয়ায় ফরাসী বাণিজ্য এ জেলাঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীতে আর উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। আর্মেনীয়দের বাণিজ্য জেলাঞ্চলে অবশ্য ধীরগতিতেই বেড়ে চলেছিল। উপরের আলোচনা থেকে আলোচ্য পর্বে (১৬৩২-১৭০৪) তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে জেলাঞ্চলের মূলত রেশম বাণিজ্যের অভূতপূর্ব বৃদ্ধির একটি রূপরেখা তুলে ধরা হলেও মনে রাখা প্রয়োজন যে যে-কোন একটি ক্ষেত্রেও বাণিজ্যবৃদ্ধি সম্পর্কিত কিছু কিছু ক্ষেত্রেও অনিবার্যভাবে বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। যেমন কাশিমবাজারের রেশম বাণিজ্যের ক্রমবৃদ্ধি এখানে রেশমের গাঁট বাঁধার দড়ির যোগান ও কেনাবেচা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এইরকম বহু উদাহরণ থেকে আলোচ্য সময়ে জেলাঞ্চলের সামগ্রিক বাণিজ্যবৃদ্ধিরই ইংগিত মেলে।[১৭]

কিন্তু কেবলমাত্র বাণিজ্যবৃদ্ধিই সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অথবা সামগ্রিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের পরিচায়ক নয়। ১৬৩২-১৭০৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের যে অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল এই জেলার অর্থনীতির মধ্যে তার পূর্বশর্তগুলি এবং এই বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াসমূহ বিশ্লেষণ করতে গেলে তিনটি দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে: জেলাঞ্চলে টাকাকড়ির ব্যাপক প্রচলন বৃদ্ধি, শিল্প উৎপাদনের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি এবং নগরায়নের উল্লেখযোগ্য প্রসার। কিন্তু জেলাঞ্চলের অর্থনীতির এই সকল মূলত নগরাশ্রয়ী পরিবর্তন সম্ভব করে তোলার ক্ষেত্রে জেলাঞ্চলের গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি পরোক্ষে কী ধরণের প্রভাব ফেলেছিল তা বিচার করে দেখাও একান্তভাবে প্রয়োজন।

আলোচ্যপর্বে এই জেলাঞ্চলের সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকদের যে বাণিজ্যবৃদ্ধি ঘটেছিল কীভাবে তারা এইসকল বাণিজ্যদ্রব্যের জন্য এ-দেশীয়দের মূল্য দিত ? আলোচ্য কালপর্বের পূর্ববর্তী পর্বেও এ অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ ভোগ মূলত ছিল দ্রব্য-বিনিময় প্রথার উপর নির্ভরশীল, অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যাদি কেনাবেচার ক্ষেত্র ছিল ভীষণভাবে সীমাবদ্ধ এবং উদীয়মান শহরকেন্দ্রটিতে সীমিত। ইউরোপীয় বণিকেরা, প্রথমত পর্তুগীজরা এবং পরে বিশেষভাবে ডাচ ও ইংরেজরা, তাদের বাৎসরিক বাণিজ্যের জন্য বিপুল পরিমাণ রূপো ও সোনা এদেশে এনে ঢাকা ও

বাজমহলেব মোগল টাঁকশালে মুদ্রা কবিযে নিযে তাব সাহায্যেই টাকাকড়ি-নির্ভব বিনিময বাণিজ্য প্রচলন কবতে থাকল। অবশেষে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেই টাকাকডিব চাহিদা ভীষণভাবে বেড়ে যাওযায ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে মুখসুদাবাদে টাঁকশাল স্থাপন কবতে হল। এইভাবে সম্রাট আকববেব আমল থেকে মুদ্র-ব্যবস্থা যে সুশৃঙ্খল ৰূপ ও মান অর্জন কবে, ইউবোপীয বণিকদেব সোনাৰূপো আমদানিব ফলে তা টাকাকডিব প্রচলন ক্রমশ সম্ভব কবে তোলে। ইউবোপীয বাণিজ্য বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে এদেশেব ব্যবসাযী, হস্তশিল্পী-শ্রমিক এবং জমিদাব-কৃষকদেব হাতে ধীবে ধীবে টাকাকডি পৌঁছানোব ফলে মোগল সম্রাটবাও নগদ মুদ্রায সুবাদাব-দেওযানেব মাধ্যমে বাজস্ব পেতে থাকবেন। বাংলাদেশে সম্রাট আকববেব সময থেকেই নগদ অর্থে বাজস্ব আদাযেব চেষ্টা শুরু হলেও বাস্তবে শস্য-মাধ্যমে বাজস্বদানেব বীতিব বিশেষ পবিবর্তন ঘটেছিল মনে হয না। কেননা, সম্রাট জাহাঙ্গীবেব বাজত্বেব শেষ বছব (১৬২৭) থেকেই মাঝেমধ্যে টাকাকডিব মাধ্যমে মোগল দববাবে বাংলাব বাজস্বদানেব প্রমাণ মিললেও কেবলমাত্র সতেবো শতকেব আশিব দশক থেকেই এটিকে বাৎসবিক বীতিতে পবিণত হতে দেখা যায। এই সমযে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এবং মুখসুদাবাদে টাঁকশাল স্থাপন এই নিযমিত বাজস্বদানকে কী সম্ভব কবেছিল ? বোঝা যায এই জেলাঞ্চলেব অর্থনীতিতে আলোচ্যপর্বেব শেষ দুটি পর্যাযে টাকা-কডিব মাধ্যমে বিনিময (monetization) ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেযেছিল। এব ফলে একদিকে অর্থেব বিনিমযে মজুবি-শ্রমেব বিকাশ ঘটে ও অন্যদিকে জেলাঞ্চলেব লোকেদেব অন্য বাজ্য বা অন্য দেশেব উৎপাদিত দ্রব্যাদি কেনাব সামর্থ্য বৃদ্ধি পায।[১৮]

ইউবোপীয বাণিজ্যেব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ ফল ছিল এই জেলাঞ্চলেব শিল্প উৎপাদনেব অভূতপূর্ব বৃদ্ধি। এই বাণিজ্যেব ফলে এই জেলাঞ্চলেব সুতিবস্ত্র, বেশমী বস্ত্র এবং বিশেষভাবে কাঁচা বেশম শিল্পেব সামনে খুলে গেল এক বিশাল বাজাব যেখানে ক্রেতাবা বিপুল অর্থেব বিনিমযে কৃষক ও হস্তশিল্পীদেব যোগান দেওযা যে-কোন পবিমাণ দ্রব্যাদি কিনতে তৈবী। জেলাঞ্চলেব গ্রামেগঞ্জে এইসব বিদেশী বণিকদেব প্রতিনিধিবা উপস্থিত থেকে এবং হস্তশিল্পীদেব আগাম দিযে সাবা বছব ধবে প্রযোজনীয উৎপাদন কবিযে নিতে থাকায উৎপাদনেব পবিমাণ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গিযেছিল। শুধু তাই নয, এই সব বণিকেবা ক্রমে ক্রমে তাদেব কুঠিতে কাবখানা কবে এদেশী কাবিগবদেব দিযে ইউবোপীয পর্যবেক্ষকদেব অধীনে উৎপাদনে সচেষ্ট হল এবং ইউবোপ থেকে কাপড বঙ কবাব ও সুতো পাকানোব উন্নততব পদ্ধতি চালু কবে এ অঞ্চলেব শিল্প উৎপাদনেব গুণগত মানকে যেমন উন্নত কবল উৎপাদনেব পবিমাণও সেইবকম ভীষণভাবে বাড়িযে দিল। এইসব বিদেশী বণিকেবা আমাদেব দেশেব শিল্পকে এমনভাবে সংগঠিত কবাব চেষ্টা কবল যাতে এই সকল শিল্পে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয হ্রাস পায। সতেবো শতকেব প্রথমদিকে ইউবোপীয কোম্পানীগুলো তাদেব মাল খবিদ কবত প্রযোজনীয জিনিষগুলি জেলাঞ্চলেব বড বাজাব ও গ্রাম এবং উদীযমান শহবকেন্দ্রটি থেকে ঘুবে ঘুবে। আডত বা শিল্পদ্রব্যেব উৎপাদনেব বিশেষ কেন্দ্র থেকে মাল কেনাব প্রচলন তখনও ব্যাপক হযে ওঠেনি। ক্রমশ বাণিজ্যবৃদ্ধিব ফলে সতেবো শতকেব মাঝামাঝি থেকে ইউবোপীয বণিকবা বহু হস্তশিল্পীকে নিযুক্ত কবে কাবখানা প্রথায কেন্দ্রীয নিযন্ত্রণে কাঁচা বেশম উৎপাদন চালু কবে। অবশ্য ইতিপূর্বে উদীয়মান শহবকেন্দ্রটিতে বাদশাহী বা মোগল রাজকর্মচারীদের ব্যক্তিগত "কাবখানা"য় এই ধবনেব দেশী সংগঠিত উৎপাদন

বিদ্যমান ছিল অনুমান কবলেও সে-উৎপাদন বাজাবেব জন্য ছিল না, ছিল অভিজাতবর্গেব ব্যক্তিগত ভোগেব জন্য। কিছু দেশী ব্যবসাযী বাজাবেব জন্য এই ধবনেব উৎপাদন শুরু কবেছিল অনুমান কবলেও ইউবোপীয বণিকেবাই এদেশে প্রথম বাজাবেব প্রযোজনে মজুবি-শ্রমিক নিযোগ কবে কেন্দ্রীভূত নিযন্ত্রণেব সাহায্যে বিপুল পবিমাণ কাঁচা বেশম উৎপাদনেব প্রচলন কবে। বেশম সেদ্ধ কবা, বঙ কবা, চিত্রিত কবা, ছাপা এবং জড়ানোব জন্য হস্তশিল্পীদেব নিযোগ এবং বিদেশী নির্দেশকদেব সাহায্যে তাদেব বিশেষ বিশেষ কৌশল শেখান তাবা চালু কবে। আলোচ্য সমযে মজুবী শ্রমেব প্রচলন থাকলেও বেশম শিল্পেব মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক হস্তশিল্পীকে নির্দিষ্ট সমযেব জন্য মজুবীব ভিত্তিতে নিযোগেব বেওযাজ মূলত ইউবোপীয কুঠিগুলিব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিল্প সংগঠনেব এই ব্যবস্থা হস্তশিল্পীদেব দাদন দানেব মাধ্যমে উৎপাদনেব ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণত মজুবী-নির্ভব কাবিগবদেব সাহায্যে চালিত হস্তশিল্প কাবখানাব মাঝামাঝি একটা পর্যায ছিল। শিল্প উৎপাদনেব এই অভূতপূর্ব বৃদ্ধি, শিল্পদ্রব্যেব অপেক্ষাকৃত উন্নতমান এবং শিল্প-সংগঠনেব ক্ষেত্রে মজুবী-শ্রম ভিত্তিক উৎপাদন কাঠামোব আবির্ভাব সত্ত্বেও কিন্তু প্রচলিত শিল্প-প্রযুক্তিই টিকে থাকে, বর্দ্ধিত চাহিদাব সঙ্গে পাল্লা দেওযাব জন্য প্রযুক্তিব যেটুকু সামান্য পবিবর্তন ঘটে তা অতীতেব সঙ্গে কোন বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয না। কিন্তু মনে বাখা প্রযোজন যে ইউবোপীয ও দেশী বাণিজ্যবৃদ্ধিব ফলে সামগ্রিকভাবে শিল্প উৎপাদনেব যে বৃদ্ধি ঘটেছিল তা ঘটেছিল প্রধানত দাদনী বা আগাম প্রথাকে আশ্রয কবে। হস্তশিল্পীদেব পুঁজিব পবিমাণ অত্যল্প হওযায বাজাবেব ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূবণেব জন্য দাদন ব্যবস্থা সবিশেষ প্রযোজনীয হযে উঠেছিল। বিশেষত ইউবোপীয কোম্পানীগুলি যাতে উৎপাদিত দ্রব্য বাতিল কবে দিতে না পাবে এবং অন্যদিকে হস্তশিল্পীবা যাতে প্রতিযোগিতাব মুখে নির্দিষ্ট সমযে ববাতমত কাপড়েব যোগান দিতে পাবে সেইজন্য দাদনী ব্যবস্থা উভযপক্ষেবই স্বার্থেব অনুকূল ছিল। এই দাদনী ব্যবস্থাব ফলে হস্তশিল্পীবা অনেকখানি স্বাধীনতা ভোগ কবত, কেননা, সুবিধামত সুতো যোগাড়েব সুযোগ তাদেব থাকত। এই জেলাঞ্চলেই কাঁচামাল সুলভ এবং স্বল্পমূল্য হওযায এখানকাব হস্তশিল্পীবা গুজবাট বা দক্ষিণেব হস্তশিল্পীদেব চাইতে ব্যবসাযী-ক্রেতাদেব উপব কম নির্ভবশীল ছিল। এইভাবে সতেবো শতকেব দ্বিতীযার্ধ থেকে প্রধানত দাদনী ব্যবস্থাকে আশ্রয কবে এবং অংশত ইউবোপীয কুঠিব কাবখানাব মাধ্যমে যে হস্তশিল্পীবা শিল্প-উৎপাদন-বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ কবেছিল তাবা ঐ সমযেও যথেষ্ট পবিমাণে 'যজমানী প্রথা'ব দ্রব্য-বিনিময ব্যবস্থাব সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই হস্তশিল্পীবা 'যজমানী প্রথা' থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হ'তে সক্ষম হযেছিল পববর্তী একশ বছবেব মধ্যে। প্রসঙ্গক্রমে জেলাঞ্চলেব এই পর্বেব শিল্পাযনেব একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দৃষ্টি আর্কষণ কবা প্রযোজন। এই সমযে বেশমশিল্পেব যে অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ্য কবা যায তা মূলত ছিল কাঁচা বেশম শিল্পেব অর্থাৎ বেশমী সুতো শিল্পেব, বেশমী বস্ত্র-শিল্পেব নয। মোট উৎপাদিত বেশমেব এক তৃতীযাংশ বস্ত্র-বযনেব জন্য জেলাঞ্চলে থাকলেও প্রধান অংশটিই বপ্তানী হযে যেত। এই পর্বেও মুর্শিদাবাদেব বেশমী বস্ত্র-শিল্পেব উন্নত শিল্পমানেব যে পবিচয পাওযা যায তাতে এই জেলাঞ্চলে উৎপাদিত কাঁচা বেশম এখানেই ব্যবহৃত হলে সুনিশ্চিতভাবে এখানকাব শিল্প-সমৃদ্ধি অভাবনীয উন্নতিব শীর্ষে উঠতে পাবত। কিন্তু এবকমটা না হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব কাঁচা বেশম প্রধানত গুজবাট এবং অংশত উত্তব ভাবতেব বেশমী বস্ত্রশিল্পেব উন্নতি ঘটিয়েছিল। ঐ দুই অঞ্চলেই পর্তুগীজ বণিকেবা মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল থেকে কাঁচা বেশম

রপ্তানীর যে ধারা সৃষ্টি করেছিল আলোচ্যপর্বে তাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল ডাচ বণিকেরা এবং এর ফলে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাটে রেশমের যোগানের ক্ষেত্রে চীনের জায়গায় বাংলা অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল স্থান করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে বৃটিশ বাণিজ্যের প্রসারের ফলেও এই পরিস্থিতির কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটে না, কেবলমাত্র ইংরেজরা এ জেলাঞ্চলের কাঁচা রেশম মূলত গুজরাটে রপ্তানী না করে ইংল্যান্ডে রপ্তানী করতে থাকে। কাঁচামালের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রেশমী বস্ত্র-শিল্পের ব্যাপকতম বিকাশ এই জেলাঞ্চলে না ঘটে কেন গুজরাটে ঘটল তা সন্ধান করা প্রয়োজন।[১১]

আলোচ্য পর্বে বাণিজ্য এবং শিল্পোৎপাদনের অভূতপূর্ব বৃদ্ধির ফলে মুখসুদাবাদ-সৈদাবাদ-কাশিমবাজার এলাকায় নগরায়ন (urbanization) অনেক ব্যাপকভাবে এবং দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। মানরিকের সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে এখানের বাজারে খাদ্য সামগ্রী এবং গৃহকর্মের দ্রব্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে লভ্য, চালের দাম টাকায় ৪ মণের বেশী, ঘি টাকায় ১৯ সের। এই তথ্যাবলী থেকে শহরে বিপুল সংখ্যক এবং অবস্থাপন্ন লোকেদের উপস্থিতির ইংগিত মেলে। এ ছাড়া পণ্যদ্রব্যের মধ্যে সুতি বস্ত্রাদি, ওষুধ, তামাক, আফিম ইত্যাদির তালিকা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এই উদীয়মান শহরাঞ্চল ইতিমধ্যেই পশ্চিম ভারত, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, কেননা, এইসকল দ্রব্যাদি প্রধানত উপরোক্ত এলাকাগুলিতেই উৎপন্ন হত।

এই অঞ্চলের নগরায়ন আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে ১৬৫০ থেকে ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ডাচ, ইংরেজ, ফরাসী ও আর্মেনীয়ানদের কুঠি এখানে গড়ে ওঠায়। এইসবের ফলে বাণিজ্য এবং শিল্পোৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি পায় এবং অনিবার্যভাবে এর ফলে শহরাঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটতে ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে বৈষ্ণব-সাহিত্যে উদীয়মান শহরাঞ্চলটির উত্তরে ভাগীরথীর সমান্তরালে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিন্যস্ত গাম্ভীলা, পঙ্কপল্লী, কুমারপাড়া ইত্যাদি সমৃদ্ধ যে সকল গ্রামের পরিচয় মেলে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে সেগুলি ক্রমশ শহরাঞ্চলটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়তে থাকে। বালুচর-গাম্ভীলা এলাকা পরবর্তীকালে রেশমী বস্ত্রশিল্পে যে খ্যাতি অর্জন করে এই সময়েই তারও শুরু হয়েছিল অনুমিত হয়। সমসাময়িক (১৬৫৮ খ্রীঃ) একটি ঘটনায় এই উদীয়মান শহরাঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়— মোগল উত্তরাধিকারের যুদ্ধে যুবরাজ সুজার বিরুদ্ধে আক্রমণের উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুম্লাকে ১৫,০০০ হাজারেরও বেশী সৈন্যসামন্ত নিয়ে বেশ কয়েকমাস অপেক্ষা করতে হয়েছিলো এই শহরাঞ্চলে এবং এই বিপুল সংখ্যক লোকের পর্য্যাপ্ত রসদাদির কোনই অসুবিধা হয়নি। এই ঘটনাটি থেকে অনুমান করা যায় যে এই শহরাঞ্চলটিতে সে সময়ে ৫০,০০০-৬০,০০০ হাজার লোকের বসতি ছিল। পরবর্তী কয়েক দশকে যে এই জনসংখ্যা বেড়েছিল সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ কম। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে মুখসুদাবাদ শহরাঞ্চলের রাজনৈতিক গুরুত্ব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সকল কুঠির মধ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কাশিমবাজার কুঠি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের পথ ছেড়ে প্রয়োজনে বাণিজ্যিক স্বার্থ-রক্ষায় অস্ত্র ধারণের নীতি গ্রহণ করা এবং ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের পত্তন করা কলকাতা শহরের অতিক্রান্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পেতে থাকা— এগুলিই ছিল শহরাঞ্চলটির রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ। মুর্শিদাবাদ

জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে মেদিনীপুরের চেতুয়া-বরদার বিদ্রোহী জমিদার শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর দ্বারা মুর্শিদাবাদ লুঠ এবং কাশিমবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় যে নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি করেছিল তার জন্য এই শহরাঞ্চলের প্রশাসনিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে মুখসুদাবাদ সুবা বাংলার রাজধানী শহব হয়ে ওঠার পূর্ব শর্তাবলী এ-ভাবেই রচিত হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় যে সুবা বাংলার রাজধানী হওয়াব পূর্বেও জেলাঞ্চলের শহবকেন্দ্রটি তাব উল্লেখযোগ্য নাগবিক বৈশিষ্টাবলী নিয়েই বিকশিত হচ্ছিল ; রাজধানী হওয়ার ফলে এই নগরায়ন প্রক্রিয়ার হার (rate) এবং মাত্রারই (dimension) কেবলমাত্র বৃদ্ধি ঘটেছিল। উদীয়মান শহরাঞ্চলটির শ্রেণী-বিন্যাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে আলোচ্যপর্বে উচ্চবর্গের মধ্যে ব্যবসায়িক কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা সামান্য কিছু বাড়লেও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছিল মধ্যবর্গের হস্তশিল্পীদের এবং নিম্নবর্গের স্বাধীন শ্রমিকদের সংখ্যা। শ্রেণীবিন্যাসের এই প্রকার সংখ্যাগত পরিবর্তন ছিল জেলাঞ্চলের অর্থব্যবস্থায় শহরাঞ্চলের বাইরেও সমাজের ব্যাপকতর স্তরে টাকাকড়ির প্রচলনের ইংগিত-বহ। শুধু তাই নয়, আগের পর্বে নাগরিক শ্রেণীবিন্যাসের যে বিশেষ চরিত্র ফুটে উঠেছিল বর্তমান পর্বে তাকেই আরো বিকশিত ও পরিণত হয়ে উঠতে দেখা যাবে। তবে শহরাঞ্চলের এই শ্রেণী-বিন্যাসের ভিন্নতর চরিত্রের উদ্ভবের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী পর্ব পর্যন্ত।[২০]

১৬৩২-১৭০৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের উদীয়মান শহরকেন্দ্রটিতে যে অতি দ্রুত নগরায়নের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায় এই নগরায়ন জেলাঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে কতখানি জৈ... সম্পর্কে যুক্ত ছিল আর কতখানিই বা বৃহত্তর প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিয়েছিল তা নির্ণয় করা দরকার। মোগল আমলের সকল নগরাঞ্চলের মতই এই নগরাঞ্চলটিও পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির সমৃদ্ধির উপর কেননা গ্রাম থেকে খাদ্যশস্য, কাঁচামাল এবং রাজস্ব সংগ্রহের উপরেই শহরের জীবনযাত্রা ও সমৃদ্ধি দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু এই শহরাঞ্চলের প্রাপ্ত ও রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যাদির তালিকা বিশ্লেষণ করলে সহজেই নজরে পরে যে এইসকল দ্রব্যের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ সুনিশ্চিতভাবেই এই জেলাঞ্চলের বাইরের নানা প্রান্তের গ্রামীণ এলাকা থেকে এখানে আসত। যেমন এখানে ভাল জাতের চাল আসত উত্তরবঙ্গ থেকে ; আফিং, তামাক, সোরা ইত্যাদি আসত পশ্চিমে বিহার থেকে এবং সুতি বস্ত্রাদি আসত পূর্ব ও মধ্যবঙ্গ থেকে। কিন্তু এই শহরাঞ্চলের বাজারে খাদ্যদ্রব্যাদির যে বিপুল সম্ভার মানরিক ১৬২৯-৪৩ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্য করেছিলেন তার প্রধান অংশই অথবা এখানকার যা ছিল প্রধান রপ্তানী পণ্য সেই কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্র যে প্রধানত এই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতিতেই উৎপাদিত হত সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার কী ধরণের কাঠামোয় এগুলি উৎপাদিত হত এবং সম্প্রসারণশীল শহরাঞ্চলের বর্তমান চাহিদা কীভাবে জেলাঞ্চলের গ্রামীণ উৎপাদনকে প্রভাবিত করেছিল তা দেখা দরকার।

এই পর্বে জেলাঞ্চলের নাগরিক সমৃদ্ধি এবং গ্রামীণ উৎপাদন-ব্যবস্থায় তার ভিত্তির মূল আমরা খুঁজে পাব এ-অঞ্চলে উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তনের মধ্যে। আলোচ্য পর্বে বাংলার সুবাদার যুবরাজ সুজার রাজস্বসংস্কারের (১৬৫৮) মধ্যে দিয়ে উৎপাদন-সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে তোডরমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের তুলনায়

সুবা বাংলায় ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে সুজার বন্দোবস্তে ১৫১/৩শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা ছিল কিন্তু যে-পরিমাণে শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার ঘটছিল সেদিক দিয়ে এই বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। অবশ্য এই রাজস্বসংস্কারের গুরুত্ব ছিল অন্যত্র। তোডরমলের নির্ধারিত রাজস্ব প্রজাবর্গের নিকট থেকে আদায় করা সম্ভব হত না বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেছেন। আলোচ্যপর্বে সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালেই তোডরমল নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের জোরদার প্রচেষ্টা শুরু হয়— যুবরাজ সুজার রাজস্ব-সংস্কার এই প্রচেস্টারই ইংগিতবহ। সুবাদার হিসাবে সুজা বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থায় যে— পরিবর্তনের সূচনা কবেছিলেন পরবর্তীকালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে তা শুধু বর্তমানই ছিল না, আরো সুকঠোব ভাবেই কার্যকারী হযেছিল এবং এর ফলেই ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দের পরে বাংলা থেকে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ নিয়মিত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং আলোচ্যপর্বে রাজস্ব-সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সুদূরপ্রসারী প্রভাব যে জেলাঞ্চলের অর্থব্যবস্থায় পড়েছিল এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। কার্যকারীভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করা ছাড়াও সুজার রাজস্ব-সংস্কারের আর একদিক দিয়ে অপরিসীম গুরুত্ব ছিল। এই সংস্কার সারা বাংলার মত জেলাঞ্চলেরও সম্পত্তি-ব্যবস্থা তথা শ্রেণীবিন্যাসকে আইনগত সুনির্দিষ্টতা ও সুস্পষ্টতা দান করে ভূমিব্যবস্থার পরবর্তী বিকাশের গতিপথকে বেঁধে দিয়েছিল। প্রথমত, রাজস্বসংগ্রহের ব্যবস্থাকে জোরদাব ও পাকাপোক্ত করার জন্য ছোট বড় জমিদারী ও তালুকদারী জোতের সৃষ্টি ও আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, 'আয়মা', 'মদদ্-ই-মাস্', 'চাকরান' ইত্যাদি লাখেরাজ নিষ্কর জমির পরিমান রাষ্ট্রীয় বদান্যতার জন্য বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষভাবে রাঢ় মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের গ্রামসমাজে শ্রম-বিমুখ সেবাসৃজন-কারী শ্রেণীটি বিপুল শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়। তৃতীয়ত, সরাসরি রাষ্ট্রাধীন 'খালসা' জমির পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্ব কর্মচারী এবং রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত গ্রামপ্রধানদের সংখ্যা এবং গুরুত্ব বাড়ে ; চতুর্থত, জায়গীরদারদের অধীন এলাকা বেড়ে যাওয়ায় তাদেরও সংখ্যা ও সামর্থ্যের বৃদ্ধি ঘটে। মনে করার কারণ আছে যে পলি-সমৃদ্ধ উর্বর তুঁত-চাষ প্রধান বাগড়ি অঞ্চলেই এই শেষ দুই প্রকার পরিবর্তন বেশী পরিমাণে ঘটে। মোটকথা, বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গ্রাম-সমাজে কৃষি-শিল্প উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের উপর নির্ভরশীল, উদ্বৃত্ত ভোগী, অংশত সেবাকার্যে নিযুক্ত, অংশত রাজশক্তি ও রাজকার্যের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত যে দুটি শ্রেণী মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল আলোচ্য পর্বে তারাই সংখ্যাগতভাবে এবং আর্থিক সমৃদ্ধির দিক দিয়ে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। এই দুই শ্রেণীর উচ্চতর শ্রেণীটিকে 'জমিদার' আখ্যা দেওয়ার ব্যাপারে ইতিহাসের ছাত্রদের বিশেষ মতপার্থক্য না থাকলেও নিম্নতর শ্রেণীটিকে 'জোতদার' আখ্যা দান বিতর্কিত। গ্রাম সমাজে কৃষি-শিল্পে নিযুক্ত যে-দুটি শ্রেণীর পরিচয় পূর্ববর্তী পর্বে আমরা পেয়েছিলাম আলোচ্য পর্বে তাদের মধ্যে বড় ও মাঝারি কৃষক এবং হস্তশিল্পীদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তুঁতচাষ ও রেশমশিল্পের প্রসারের জন্য এবং উদীয়মান শহরাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তাগিদে বেশ কিছুটা ঘটেছিল। স্বাভাবতই এইসবের ফলে গ্রাম সমাজের নিম্নতম শ্রেণীটির উপর শোষণ এবং দারিদ্র্যের বোঝা আরো বেশী করে চেপেছিল।[২১]

জেলাঞ্চলের গ্রামীণ উৎপাদন-সম্পর্কের পাশাপাশি উৎপাদন শক্তিসমূহ এবং উৎপাদন পদ্ধতির পরিচয় নেওয়া দরকার। মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে যে আলোচ্য পর্বেও ধান-চাষই প্রধান কৃষি পেশা হিসাবে বিদ্যমান ছিল একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যদিও রাঢ় অঞ্চলে

আমন ধানেব চাষই যে আজকেব মতই কৃষিকাজেব মুখ্য ধাবা ছিল এ-বিষযেও সন্দেহ নেই। তবে বাগডি মুর্শিদাবাদেব অর্থনীতিতে আউস ধান ও ববিশস্য চাষেব যে গুরুত্ব আমবা বর্তমানে লক্ষ্য কবি আলোচ্য পর্বে তাব গুরুত্ব ততখানি ছিল না বলেই অনুমান কবা যায। আখেব চাষ মুর্শিদাবাদেব উত্তবাঞ্চলে একটি প্রধান ফসল হিসাবে বহুদিন ধবে চালু থাকলেও আলোচ্য পর্বে আখ চাষেব বদলে তুঁত চাষ এ-অঞ্চলে সম্প্রসাবিত হযেছিল অনুমান কবা অসঙ্গত হবে না। বাগডি অঞ্চলেও উঁচু ভাল জমিতে তুঁত চাষেব ব্যাপক প্রচলন এই পর্বেই ঘটেছিল। ক্রমবর্ধমান কাঁচা বেশমেব চাহিদা পূবণেব জন্য তুঁত চাষেব সম্প্রসাবণ ঘটানো দু' ভাবেই সম্ভব ছিল : অন্য চাষ থেকে জমি সবিযে এনে তুঁত চাষে ব্যবহাব কবে এবং চাষেব সম্প্রসাবণ ঘটিযে। জেলাঞ্চলেব উত্তবাংশে তুঁত চাষ বেডেছিল প্রথম পদ্ধতিতে আব বাগডি অঞ্চলে দ্বিতীয পদ্ধতিতে। উদীযমান শহবাঞ্চলেব প্রযোজনে তবী-তবকাবীব চাষ যেমন বৃদ্ধি পেযেছিল, সেইবকম অভিজাত-বর্গেব চাহিদা মেটাতে মুর্শিদাবাদেব আম কাঁঠালেব বাগানেব পত্তনও এই পর্বে শুরু হযেছিল : গ্রামীণ উৎপাদনে দুধ ও মাছেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাব খববও বিদেশীদেব বিববণ এবং সমসামযিক বৈষ্ণব সাহিত্যেব সাক্ষ্যে অনুমিত হয ; তবে এই সবকটি ক্ষেত্রেব উৎপাদন বৃদ্ধিতেই বাগডি অঞ্চলেব এবং জেলাব উত্তবাংশেব ভূমিকাই ছিল মুখ্য এ-বিষযে সন্দেহ নেই। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব গ্রামীণ কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিব মাত্রাব সঙ্গে অনিবার্যভাবে যুক্ত ছিল মৃৎশিল্প, কাষ্ঠ এবং লৌহ শিল্প। এখনও পর্যন্ত জেলাব গ্রামীণ পাবিবাবিক জীবনে মাটিব তৈবী তৈজস দ্রব্যাদিব যে ভূমিকা এই কালপর্বে তা যে আবো বেশী গুরুত্বপূর্ণ আকাবে ছিল সে-বিষযে সন্দেহ নেই। মাঠ থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে অন্যগ্রাম ও শহবে যোগাযোগেব ক্ষেত্রে গরুব গাডিব একা, লাঙলেব প্রযোজন, দূবযাত্রাব প্রধান যানবাহন হিসাবে নৌকাব ব্যাপক ব্যবহাব এবং বাগড়ি মুর্শিদাবাদে জলজীবী কৈবর্ত জাতিব বসবাস ইত্যাদিব ফলে এ জেলাঞ্চলেব অর্থনীতিতে কাষ্ঠ শিল্পকে যথেষ্ট অর্থনৈতিক গুরুত্ব দান কবেছিল। আলোচ্য পর্বে মীব জুমলাব সৈনাপত্যেব সময থেকে সামবিক প্রযোজনে জেলাঞ্চলেব কাষ্ঠশিল্পেব এবং লৌহশিল্পেব গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ-জেলাব উত্তবাঞ্চলে পাগলা নদীব দক্ষিণ-প্রান্তে লৌহশিল্পেব একটি সুপ্রাচীন ধাবা বহমান থাকলেও আলোচ্য কালপর্বেব নাগবিক প্রযোজনে যে এই শিল্পেব গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু কবেছিল এ-বিষযেও সন্দেহ নেই। ফলত এই পর্বেই এ-অঞ্চলেব কাষ্ঠ ও লৌহশিল্পকে গ্রামীণ উৎপাদনেব সুনির্দিষ্ট কাঠামো থেকে বেবিযে এসে এক ব্যাপকতব ভূমিকা গ্রহণ কবতে দেখা যায। তবে এই সকল শিল্পেব চাইতে জেলাঞ্চলেব গ্রামীণ মানুষেব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সুতি বস্ত্রশিল্পেব ; গ্রামীণ মানুষেব বস্ত্রেব প্রয়োজনীযতা যে এই জেলাঞ্চলেব গ্রামে গ্রামে উৎপাদিত তুলো থেকে প্রস্তুত সুতি বস্ত্রেব সাহায্যেই পূবণ হত এবং কৃষি কাজেব পাশাপাশি এটি যে বহু ক্ষেত্রে জেলাব কৃষিজীবিদেব প্রধান আনুসঙ্গিক পেশা ছিল এ-বিষযে সন্দেহেব অবকাশ কম ; অবশ্য উদীযমান শহবাঞ্চলেব বাণিজ্যে এই পর্বে যে সুতি বস্ত্রেব দেখা মেলে তা প্রধানত মধ্য ও পূর্ববঙ্গ থেকে আসত এমন অনুমানই সঙ্গত। এই সকল গ্রামীণ হস্তশিল্পেব ভূমিকা মুর্শিদাবাদেব অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকলেও যে-গ্রামীণ হস্তশিল্পটি এ-জেলাঞ্চলেব সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনে এবং বিশেষভাবে কৃষি অর্থনীতিব ক্ষেত্রে অতি দ্রুত সুদূবপ্রসাবী এবং ব্যাপক পবিবর্তনেব সূচনা আলোচ্য পর্বে কবেছিল সেটি হচ্ছে কাঁচা বেশম ও বেশমী বস্ত্র-শিল্প। সাধাবণভাবে বলা যায় যে এই পর্বেই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব গ্রামীণ অর্থনীতি কয়েকশতক ধবে এক একটি

বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত প্রতিটি গ্রামের স্বাধীন ও স্বনির্ভর পরিপোষক কৃষিকে আশ্রয় করে যজমানী-প্রথা-নির্ভর দ্রব্য সেবা বিনিময় ব্যবস্থায় যে-ভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছিল এই পর্বে এসেই রেশম শিল্পের মধ্যে দিয়ে তাতে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগল। এই পরিবর্তনের যথাযথ স্বরূপকে বোঝার জন্যই জেলাঞ্চলের শিল্প-উৎপাদনের প্রবহমান রূপটির আরেকটু ঘনিষ্টতর পরিচয় লাভ করা দরকার। এই জেলাঞ্চলে আলোচ্য পর্বে এবং তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্বেরও গ্রামীণ শিল্প-উৎপাদনের প্রধান অংশই বংশানুক্রমিক হস্তশিল্পী জাতিগুলির দ্বারা উৎপাদিত হত এবং এই জাতিগুলি মুখ্য কৃষিজীবী জাতিগুলির সঙ্গে মক্কেল-পৃষ্ঠপোষক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল এবং যৌথভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করত। প্রধানত উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা কয়েক শতাব্দী ধরে ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হত। বংশানুক্রমে নির্ধারিত গ্রামীণ উৎপাদনের অংশ এবং নিষ্কর ভূমি-জাত ফসলাদি বা সীমিত ক্ষেত্রে নগদ অর্থ ছিল এইসকল হস্তশিল্পীর আয়ের প্রধান উৎস। বর্হিজগতের প্রভাবমুক্ত একটি বা অল্প কয়েকটি গ্রামের অভ্যন্তরে দ্রব্য উৎপাদন ও বিনিময়ের এই পারস্পরিক ব্যবস্থাকেই আধুনিক নৃতত্ত্বে বলা হয়েছে 'যজমানী প্রথা'। এই ব্যবস্থা মুখ্যত সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা গ্রামগুলির নিজেদের ভরণপোষণের জন্য উৎপাদন এবং প্রথানুগ বন্টনের প্রয়োজনেই কাজ করত, নগদ অর্থের ভিত্তিতে বাজারে বিনিময়ের জন্য নয়। গ্রামীণ শিল্প উৎপাদনের এই প্রবহমান ও মুখ্য ধারার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য পর্বের শিল্প-উৎপাদনের ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলিকে বুঝতে হবে।[২২]

১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় মোগল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কয়েক দশক পূর্ব থেকেই শেরশাহের মুদ্রা সংস্কার, পর্তুগীজ বণিকদের যাতায়াত ইত্যাদির ফলে জেলাঞ্চলের কিছু কিছু নদীতীরবর্তী গ্রামে পরিপোষক হস্তশিল্প-উৎপাদনের যৌথ ব্যবস্থায় অল্প অল্প টাকাকড়ির অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। অবশ্য এই টাকাকড়ির পরিমাণ এবং বর্হিগামী শিল্পদ্রব্যের পরিমাণ এতই নগণ্য ছিল যে গ্রামীণ শিল্প-উৎপাদনের উপর তার প্রভাব পড়তে পারেনি যদিও এর ফলে অর্থ ব্যবস্থায় একটি নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল। ১৫৭৫ থেকে ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে এবং উপরোক্ত নতুন ধারাটি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী জোরালো হয়ে ওঠে। এই কালপর্বে গ্রামীণ হস্তশিল্প উৎপাদনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে, কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্রশিল্পে, এই জেলাঞ্চলে দুই দিক দিয়ে পরিবর্তন শুরু হয়। প্রথমত, পর্তুগীজ বণিকদের দ্বারা এবং মোগল রাজকর্মচারী ও তাদের অনুগামী ব্যবসায়ীদের দ্বারা কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে যজমানী প্রথা বহির্ভূত-ভাবে এই বিশেষ শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে গ্রামাঞ্চলে টাকাকড়ির অনুপ্রবেশও বাড়তে থাকে। তাছাড়া, মোগল রাজস্ব-সংস্কারও গ্রামাঞ্চলে টাকাকড়ির সঞ্চারণ বৃদ্ধি করে। গ্রামীণ হস্তশিল্পীদের দ্বারা উৎপাদিত অন্যান্য শিল্পদ্রব্যও যে টাকাকড়ির বিনিময় ব্যবস্থার প্রভাবাধীন হতে শুরু করেছে তা জেলাঞ্চলের সমকালীন বাংলাসাহিত্যে হাটে বিক্রয়যোগ্য জিনিষপত্রের তালিকা থেকেও বোঝা যায়। পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক গ্রামে যজমানী-প্রথা-বহির্ভূত কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি, অন্যান্য হস্তশিল্পাদির উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং পণ্যশস্যাদির উৎপাদের সূচনা প্রতিফলিত হয়েছে এই পর্বে জেলাঞ্চলে দুটি 'কসবা'র উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে। 'তবকাৎ-ই-আকবরী'র সাক্ষ্যে দেখা যায় সম্রাট আকবরের শাসনকালে তাঁর সাম্রাজ্যে ৩২০০টি, 'কসবা' অর্থাৎ বড়গ্রাম বা ছোট

শহব ছিল ; মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে এ-সময়ে অন্তত দুটি 'কসবা' যে ছিল এবকম অনুমানেব পক্ষে জোবালো যুক্তি বিদ্যমান। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলাব ভগবানগোলা থানাব অন্তর্গত 'কসবা বাহাদুবপুব' মৌজা এবং বাণীনগব থানাব অন্তর্গত 'কসবা গোযাস' মৌজাব অতীত ইতিহাস যদি সবেজমিনে ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং বর্তমান থেকে অতীতেব দিকে ফিবে যাওযাব ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসবণ কবে পুনর্গঠিত কবা যায তাহলে এধবণেব অনুমান অযৌক্তিক বিবেচিত না হওযাবই কথা। বিশেষত সমসামযিক বৈষ্ণব সাহিত্যে যখন বাহাদুবপুব ও গোযাসেব সমৃদ্ধিব অবিসম্বাদী প্রমাণ থেকে গেছে। শুধু তাই নয, বাহাদুবপুবে এই শতাব্দীব প্রথম পর্যন্ত এবং গোযাস-অঞ্চলে বর্তমান সময পর্যন্ত কাঁচা বেশম ও বেশমশিল্পেব যে-ধাবা আমবা লক্ষ্য কবছি ঐ দুটি জাযগাব অতীত সমৃদ্ধিব সঙ্গে যে তাব সুনিশ্চিত যোগ ছিল তা অনুমান কবা যায। অর্থাৎ বলা যেতে পাবে যে মোগল যুগেব পূর্ব থেকেই বাহাদুবপুব ও গোযাস দুটি জাযগাতেই গ্রামীণ বেশমশিল্পেব কেন্দ্রীভবনেব ফলে দুটি গন্ডগ্রামেব উদ্ভব ঘটেছিল এবং মোগল শাসনেব প্রথম পর্বেই (১৫৭৫ ১৬৩২) কসবা বাহাদুবপুব এবং কসবা গোযাস 'কসবা'ব মর্যাদা লাভ কবেছিল। 'কসবা'গুলি বড এবং সমৃদ্ধ গ্রাম হলেও শহবেব কিছু কিছু সুবিধাও সেখানে লভ্য ছিল ; চাবপাশেব ১০০ থেকে ১০০০ গ্রামেব উপব থাকত কসবাব প্রভাব ; অনেক সময মহাল বা পবগণাব প্রধান কেন্দ্র ছিল কসবা। ফলে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব কসবা দুটিও হয়ে উঠেছিল গ্রামাঞ্চলেব বিনিময় কেন্দ্র এবং গ্রামাঞ্চলেব উৎপাদিত দ্রব্যাদিব গ্রামীণ তথা গ্রাম-বহির্ভূত চাহিদা পূবণেব জাযগা। গ্রামীণ শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনেব ক্ষেত্রেও যে যজমানী প্রথা থেকে বিযুক্ত উৎপাদনেব ধাবাটি জোবালো হযে উঠেছিল কসবাব উদ্ভব ও ভূমিকা থেকে তা বোঝা যায়।[২৩] জেলাঞ্চলেব গ্রামীণ শিল্প-উৎপাদনেব ক্ষেত্রে ১৫৭৫-১৬৩২ কালপর্বে দ্বিতীয যে পদ্ধতিতে পবিবর্তন শুরু হযেছিল তা হচ্ছে উদীযমান শহব কেন্দ্রটিতে বাজকর্মচাবীদেব পৃষ্ঠপোষকতায 'কাবখানা' মাধ্যমে কাঁচা বেশম ও বেশমী বস্ত্রেব উৎপাদন। বাষ্ট্রশক্তিব মাধ্যেমে গ্রামীণ হস্তশিল্পীদেব নগবকেন্দ্রে সমবেত কবে এই কাবখানা উৎপাদন গড়ে তোলা সম্ভব হলেও এই সকল হস্তশিল্পীদেব যে তাদেব গ্রামীণ বসতিচ্যুত কবে পাবিবাবিক হস্তশিল্পেব ধাবা থেকে এবং যজমানী প্রথাব প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন কবা সম্ভব হযেছিল তা মনে হয় না। সুতবাং সাধাবণ ভাবে সিদ্ধান্ত কবতেই হয যে ১৫৭৫-১৬৩২ কালপর্বে জেলাঞ্চলেব অর্থ ব্যবস্থায় যজমানী-প্রথা বহির্ভূত টাকাকড়ি-নির্ভব বিনিময-ব্যবস্থাব প্রসাব ঘটলেও, বাজাবেব জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও তাব ফলে পবিপোষক কৃষি ও শিল্প-উৎপাদনেব মূল ধাবাটির কিছু প্রান্তিক পবিবর্তনমাত্রই ঘটেছিল, তাব বেশি কিছু নয। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব গ্রামীণ শিল্প-উৎপাদনেব ক্ষেত্রে বাজাবেব মুখাপেক্ষী নতুন ধাবাটি আবো শক্তিশালী এবং ব্যাপক হয়ে ওঠে ১৬৩২-১৭০৪ কালপর্বে। একদিকে উদীয়মান শহবাঞ্চলটিতে অভূতপূর্ব বাণিজ্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকায় এবং ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দেব পব থেকে এখানে ইউবোপীয় বণিকদেব কুঠিগুলি গড়ে ওঠায় শহবাঞ্চলে কাবখানা প্রথায় কাঁচা বেশম ও বেশমী বস্ত্র উৎপাদন বিপুল পবিমাণে বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী কালপর্বে শহবাঞ্চলে কাবখানা প্রথায় উৎপাদন শুরু হয়ে থাকলেও ইউবোপীয় কুঠিগুলিব মাধ্যমেই তা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। শহবাঞ্চলটিতে কাঁচা বেশম ও বেশমী বস্ত্রশিল্পেব উৎপাদন যথেষ্ট পবিমাণে বৃদ্ধি পেলেও এবং বহুসংখ্যক হস্তশিল্পী এইসকল কুঠিব কাবখানাব উৎপাদন কার্যেব সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এই হস্তশিল্পীদেব উপব জাতিভেদ প্রথাব গভীব প্রভাবেব জন্যই তাবা শহবেব চাবপাশেব গ্রামাঞ্চল থেকেই কুঠিতে

কাজ কবতে আসত অনুমিত হয; শুধু তাই নয, এই জাতিভেদপ্রথাব প্রভাবেব জন্যই এই হস্তশিল্পীবা সুযোগ পেযেও জেলাঞ্চলেব বাইবে নিজেদেব এলাকা ছেড়ে যেতে সম্মত হযনি তাও দেখা যায। অবশ্য গ্রামীণ হস্তশিল্পীবা এইভাবে শহবে এসে কাজ কবায টাকাকড়িব প্রচলন যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল এ-বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ নেই। অন্যদিকে উদীয়মান শহবাঞ্চলেব অভূতপূর্ব বাণিজ্যবৃদ্ধিব সমৃদ্ধ গ্রামীণ পশ্চাৎভূমি হিসাবে বাহাদুবপুব-গোযাস অঞ্চলেব অধিকতব বিকাশ ঘটে। আলোচ্যপর্বে ভাগীবথীব পূর্বতীবে উত্তব থেকে দক্ষিণে প্রসাবিত গাম্ভীলা-পঞ্চপল্লী-কুমাবপাড়া-মুখসুদাবাদ-কাশিমবাজাব-সৈদাবাদ অঞ্চলে নগবাযন, বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং শিল্প-প্রসাবেব যে ইতিহাস মেলে তাব সঙ্গে এই শহবাঞ্চলটিব উত্তব-পূর্বে প্রায় সামান্তবাল বেখায অবস্থিত ভগবানগোলা-বুধুবি বাহাদুবপুব থেকে বোবাকুলি-গোযাস-ইসলামপুব পর্যন্ত উত্তবে দক্ষিণে প্রসাবিত ভৈবব ও শিযালমাবা নদীব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলটিতে উল্লেখযোগ্য জনবসতি, যোগাযোগ-ব্যবস্থা, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক গুৰুত্বেব যে পবিচয পাওযা যায তাব গভীব যোগসূত্র যে এই গোটা এলাকাটিতে তুঁত চাষ, কাঁচা বেশম ও বেশমী বস্ত্রশিল্পেব অভূতপূর্ব উন্নতি ও প্রসাবেব সঙ্গে যুক্ত এ-বিষযে সন্দেহ নেই। এই পর্বে ইউবোপীয বণিকদেব কুঠিগুলি দালাল ও ব্যবসাযীদেব মাধ্যমে যে-সকল কাঁচা বেশম ও বেশমী বস্ত্রাদিব সবববাহ জেলাঞ্চলেব গ্রামীণ এলাকাগুলি থেকে পেতে থাকে তাব বেশ কিছু অংশই যে কসবা বাহাদুবপুব ও কসবা গোযাস কেন্দ্রিক অঞ্চলটি থেকে আসত তা সঙ্গত ভাবেই অনুমান কবা যায। বাজাবেব ক্রমবর্ধমান চাহিদাব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে জেলাঞ্চলেব শহবকেন্দ্র ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে যজমানী প্রথা-বহির্ভূত যে-ধাবাটি বেশম শিল্পকে আশ্রয কবে অত্যন্ত জোবদাব হয়ে উঠেছিল এই পর্বে শিল্প-উৎপাদনেব অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাব প্রকাশ লক্ষ্য কবা যায— লৌহশিল্প এবং কাষ্ঠ শিল্প এই পর্বেই অস্ত্র ও নৌকা নির্মাণেব তাগিদে যজমানী প্রথাব নিষেধাত্মক প্রভাব থেকে আংশিকভাবে বেবিয়ে আসাব চেষ্টা কবে। কিন্তু যজমানী-প্রথা-বহির্ভূত এই সকল অর্থনৈতিক শক্তিগুলি যতই জোবদাব হয়ে উঠুক না কেন এবং এব ফলে শিল্প-উৎপাদন ও বাণিজ্যেব বৃদ্ধি যে পবিমাণেই ঘটুক না কেন যৌথ পবিবাব ও জাতিপ্রথাব কাঠামো ভেঙে ফেলে সে শক্তিগুলি যজমানী প্রথাব মূল ধাবাটিকে পাল্টে দিতে অথবা উৎপাদনেব প্রযুক্তিতে কোন গুৰুত্বপূর্ণ পবিবর্তন আনতে সমর্থ হয়নি। পূর্ণাঙ্গৰূপে বেশমেব উৎপাদন নানাস্তবে অত্যন্ত বিশেষীকৃত কাজ হলেও আলোচ্যপর্বে দেখা যায় যে তুঁত চাষ, পলু সংগ্রহ, সুতোকাটা, কাপড়বোনা সবকটি পর্যায়ই একই জাতিব লোকেদেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সকল প্রতিটি প্রক্রিয়াব ভিত্তিতে এক একটি পৃথক পেশাব উদ্ভবেব সূচনা পববর্তী পর্বেই (১৭০৪-১৭৫৭) দৃষ্টিগোচব হতে থাকবে। আব এই পববর্ত্তী পর্বেই জেলাঞ্চলেব গ্রামীণ ও নাগবিক অর্থনীতি যেমন তাব উন্নতি ও সমৃদ্ধিব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে সেইবকম এক দীর্ঘায়ত অবনতি ও স্রোতোহীন বদ্ধতাব দিকে অগ্রসব হবে।[২৪]

আলোচ্য পর্বে কাশিমবাজাবে ডাচ, ইংবেজ ও আর্মেনিযান বণিকেবা যে-সকল কুঠি নির্মান কবে কাঁচা বেশম ও বেশমী কাপড় উৎপাদনে উদ্যোগী হযেছিল তাব ফলে মোগল বাংলায় সবপ্রথম ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিব আবির্ভাব হয়েছিল বলে অনেকে সিদ্ধান্ত কবেছেন। এ-বিষয়ে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীব কুঠি সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওমপ্রকাশেব দীর্ঘ মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে: "কাশিমবাজার কেন্দ্রটিব প্রতিষ্ঠাকে মোগল বাংলায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির আবির্ভাবের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যায়। কেবলমাত্র কেন্দ্রটিব

আযতনেব জন্যই একথা বলা হচ্ছে না, যদিও নিশ্চিতভাবেই এটিও ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মোগল ভাবতে একই ছাদেব নীচে নিযমিত মজুবী-ভিত্তিক নিযোগেব মাধ্যমে এই আযতনেব শিল্পোৎপাদন ছিল বিবল ঘটনা। দুটি কাবণে ডাচ কেন্দ্রটিব সঙ্গে বাদশাহী ও অন্যান্য কাবখানাগুলি পুবোপুবি তুলনীয ছিল না। প্রথমত ঐ সকল কাবখানায উৎপাদিত দ্রব্যগুলি কেবলমাত্র বাজপবিবাব, অভিজাতবর্গ, ধনী ব্যবসাযী ও অন্যান্যদেব এবং সৈন্যবাহিনীব দ্বাবা ব্যবহৃত হত, বাজাবে বিক্রীব জন্য উৎপাদিত হত না। দ্বিতীযত, অন্তত বেশ কিছু বড কাবখানা যে স্বাধীন চুক্তিবদ্ধ শ্রমেব বদলে স্বল্প-পাবিশ্রমিকেব বাধ্যতামূলক শ্রমেব ভিত্তিতেই চালিত হত এবকম মনে হয। মোগল বাংলায ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতিব বিকাশেব ক্ষেত্রে ডাচ বেশম-উৎপাদন কেন্দ্রটিকে এই দুটি উপাদানই কাবখানাগুলি থেকে ভিন্নতা দিযেছিল।” ইংবেজ ও আর্মেনিযান কুঠিগুলিব ভূমিকাকেও এইভাবে উপস্থাপন কবা যায। কিন্তু আসল প্রশ্ন হল : এই ধবনেব উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সংগঠন কতখানি স্থাযিত্ব অর্জন কবেছিল অথবা জেলাঞ্চলেব সামগ্রিক অর্থনীতিব উপব কতখানি ব্যাপক ও গভীব প্রভাব ফেলতে পেবেছিল ? এই প্রশ্নটিব উত্তব খুঁজতে গিযে একবাব পিছন ফিবে আলোচ্য পর্বটিব সামগ্রিক চেহাবাব দিকে তাকিযে বলা যায যে শিল্প-উৎপাদন ও বাণিজ্যেব অভূতপূর্ব বৃদ্ধি এবং নগবাযনেব উল্লেখযোগ্য প্রসাব এই সমযে ঘটলেও সমস্তটাই ঘটেছিল প্রচলিত প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতিব কাঠামোব মধ্যেই, জেলাঞ্চলেব যজমানী-প্রথা-নির্ভব জাতিভেদ-ভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থাব মূল ধাবাটি বজায বেখেই। আব কেন্দ্রীভূত মোগল প্রশাসনেব ক্রমবর্ধমান বাজস্বেব চাহিদা জেলাঞ্চলেব শ্রেণী-সম্পর্ককে যে-ভাবে প্রভাবিত কবেছিল, কৃষি ও শিল্প-উৎপাদক শ্রেণীগুলিব নিকট থেকে উদ্বৃত্তেব আহবণ যেমন ভাবে বৃদ্ধি পেযে পবজীবী শ্রেণীগুলি বিলাসবহুল জীবনমানেব উন্নযনে নিযুক্ত হযেছিল তাতে পুঁজি সঞ্চয ও বিনিযোগেব মাধ্যামে কোনও ভিন্নতব অর্থনৈতিক কাঠামোব আবির্ভাব সূচিত হওযাব সম্ভবনা অল্পই ছিল। সুতবাং এইপর্বে দৃশ্যমান পবিবর্তন-সমূহেব পবিপ্রেক্ষিতে জেলাঞ্চলেব সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থাকে অগ্রসব সামন্ত ব্যবস্থা হিসাবেই চিহ্নিত কবতে হয। অবশ্য এই অর্থ-ব্যবস্থা প্রকৃতিতে অগ্রসব সামন্ত ব্যবস্থা হলেও পবিবর্তনহীন কোন অচলাযতন ছিল না— সামন্ত ব্যক্তি সম্পত্তিব প্রসাব, ভূমিব উপব বাষ্ট্রীয মালিকানাব হ্রাস, অধিকাংশ কৃষকেব জমিব উপব দখলি সত্ত্বেব অবক্ষয, গ্রামীণ স্বনির্ভবতাব আংশিক অবলুপ্তি, টাকাকড়িব ক্রমবর্ধমান প্রচলন, পণ্য উৎপাদনেব বৃদ্ধি ইত্যাদি আর্থিক-সামাজিক কাঠামোব গুরুত্বপূর্ণ পবিবর্তন অগ্রসব সামন্ত-ব্যবস্থাব চৌহদ্দিব মধ্যেই ঘটতে দেখা গিযেছিল।[২৫]

॥ চার ॥

## দেশী ও বিদেশী অর্থনৈতিক শক্তির দ্বৈরথ পর্ব (১৭০৪-১৭৫৭)

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৭০৪-১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ এই পর্বটিব অসাধাবণ গুরুত্ব এইখানে যে এইপর্বেব অর্থনৈতিক ঘটনাবলী এ অঞ্চলেব অর্থনৈতিক জীবনেব পববর্তী প্রায় আড়াইশো বছবেব গতিপথ নির্ধাবণ কবে দিয়েছিল। অবশ্যই এই পর্বেব অর্থনৈতিক ঘটনাবলীকে তাদেব বাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং জেলাঞ্চলেব বাইবে সাবা বাংলাদেশেব সামগ্রিক

পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী দুটি পর্বে (১৫৭৫-১৬৩২ এবং ১৬৩২-১৭০৪) কেন্দ্রীভূত মোগল প্রশাসনের অধীন সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত একটি এলাকা হিসাবে জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনে শিল্প, বাণিজ্য ও নাগরিক সমৃদ্ধির যে-ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় আলোচ্য পর্বে সেই বিকাশ আরো ব্যাপক ও ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে, যদিও সুবা বাংলা এই পর্বে আইনত দিল্লীর মোগল সম্রাটের অধীন থাকলেও কার্যত হয়ে পড়ে স্বাধীন। মোগল সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে সুবা বাংলার শাসক ও অভিজাতবর্গ কার্যত স্বাধীন হওয়ার ও স্বাধীন থাকার চেষ্টা করলেও প্রথম থেকেই তাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এক প্রবল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের: পূর্ববর্তী দুটি পর্বেই জেলাঞ্চল-সহ সারা বাংলাদেশেই ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে ইউরোপীয় বণিকদের অর্থনৈতিক প্রভাব সারা বাংলার অর্থব্যবস্থায় যে-ভাবে বাড়ছিল ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ইংরেজ বণিকরা অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় অস্ত্রধারণের নীতি গ্রহণ করায় সেই প্রভাব সামরিক ও রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করতে শুরু করেছিল এবং কলকাতা শহর ও ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ পত্তনের মধ্যে দিয়ে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই তা সুবা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরোধী একটি জোরালো রাজনৈতিক-সামরিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এইভাবেই ১৭০৪-১৭৫৭ কালপর্বে জেলাঞ্চল-সহ সারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লাভজনক বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তারের অভূতপূর্ব তাগিদ এবং সাফল্য কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত পরিবর্তন তথা সামাজিক শ্রেণী-ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ঘটাতে শুরু করেছিল এবং এর ফলে ইংরেজ বণিকদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিও ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। অন্যদিকে, রাজশক্তির অধিকারী সুবা বাংলার প্রায় স্বাধীন শাসক ও অভিজাতবর্গ উদীয়মান ইংরেজশক্তিকে ঠেকানোর জন্য এবং নিজেদের কার্যত স্বাধীন অবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। আলোচ্য পর্বে জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনের রূপরেখা এই দুই প্রবল শক্তির পরস্পর বিরোধী কার্যকলাপের ফলশ্রুতি হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু যেহেতু এই পর্বেও রাজশক্তির অধিকারী দেশী শাসক ও অভিজাতবর্গ আর্থিক-সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ও পরিপুষ্ট করার অধিকতর ক্ষমতা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল, সেইজন্য, তাদের সিদ্ধান্তগুলিই জেলাঞ্চল-সহ বাংলার অর্থনীতিকে এই পর্বে এবং এর পরবর্তী পর্বেও আপাতদৃষ্টিতে অনেক বেশী পরিমাণে প্রভাবিত করেছিল, যদিও এর ফলে সাময়িকভাবে স্থিতাবস্থা-বিরোধী উদীয়মান ইংরেজ বণিক-শক্তির রাজনৈতিক প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠাকে আটকানো যায়নি।[২৬]

অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সারা বাংলাদেশের পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে জেলাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি ফেরালে রাজশক্তির অধিকারী শাসক ও অভিজাতবর্গের দুটি কাজকে জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনের দিক থেকে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যযুক্ত বলা যায়: মুখসুদাবাদে সুবা বাংলার রাজধানী স্থানান্তর (১৭০৪-১৭১৬) এবং রাজস্ব ও ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন (১৭২২)। বাংলার মোগল দেওয়ান এবং মুখসুদাবাদের ফৌজদার করতলব খান ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা থেকে কর্মচারিবৃন্দ এবং জমিদারদের প্রতিনিধিবর্গ-সহ দেওয়ানী-দপ্তর মুখসুদাবাদে স্থানান্তর করেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট থেকে মুর্শিদকুলি খান উপাধি ও মুখসুদাবাদকে মুর্শিদাবাদ আখ্যাদানের অনুমতি লাভ করেন; মুর্শিদকুলি ১৭১৬

খ্রীস্টাব্দে বাংলাব সুবাদাব হওয়ায় মুর্শিদাবাদ হয় সুবা বাংলাব বাজধানী। দেওয়ানী এবং পবে সুবাদাবীব কেন্দ্র হয়ে ওঠায় মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব উদীয়মান শহব কেন্দ্রটিব নাগবিক রূপান্তব অতিদ্রুত ও ব্যাপক হয়ে উঠল। পূর্ববর্তী দুটি পর্বে শহবকেন্দ্রটিব যে ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছিল তাব পবিণতি ঘটেছিল মুর্শিদাবাদ বাজধানী শহব হয়ে ওঠায়। এব ফলে আগেব পর্বে কাশিমবাজাবকে কেন্দ্র কবে শিল্প-বাণিজ্য ও তাব উপব নির্ভবশীল লোকেবা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এইপর্বে তাব চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল মুখসুদাবাদ অঞ্চলে নবাগত সামবিক ও বেসামবিক বাজকর্মচাবিবৃন্দ ও অভিজাতবর্গ।

এই অভিজাতবর্গেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত জৈন মহাজন ও ব্যবসাযীদেব বসতিব ফলে শহবাঞ্চল ভাগীবথীব পূর্ব পাড়ে উত্তবে দেবীপুব পর্যন্ত প্রসাবিত হয়ে আগেব পর্বেব কুমাবপাড়া-পঙ্কপল্লী- গাম্ভীলা ইত্যাদি গণ্ডগ্রামকে নসীপুব-মহিমাপুব-জিযাগঞ্জ ইত্যাদি নতুন নামে অন্তর্ভূক্ত কবে নিল। অল্পদিনেই ভাগীবথীব পশ্চিমপাড়েও ঘটল শহবাঞ্চলেব প্রসাব। বস্তুত দেওয়ানীব সদব শহব হয়ে ওঠাব পঁচিশ বছবেব মধ্যেই জেলাঞ্চলেব শহবকেন্দ্রটি হয়ে উঠল এক বিশাল নগবকেন্দ্র। নগবাযনেব প্রকৃতি বিচাবে দেখা যায যে এই নগবাযন ছিল মূলত প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক ; এব ফলে গ্রামীণ ও নাগবিক শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কোনভাবেই নগবাযণ মূল চবিত্রে শিল্প-ভিত্তিক হয়ে ওঠেনি। অবশ্য নগবকেন্দ্রটি বাজধানী শহবে পবিণত হওযায তাব পূর্বেব শিল্পধাবা ব্যাপকতা লাভ কবেছিল— মোগল বাজধানী-শহবেব শিল্পাযন-প্রবণতাব ফলে, শহব বেড়ে ওঠাব অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যেব প্রযোজনে। বাজধানী শহব হওযায অস্ত্র-শস্ত্র, নৌকা-যানবাহন, সাজসবঞ্জাম এবং অভিজাতদেব বিলাস-দ্রব্যাদিব প্রযোজনেও শিল্পাযনেব প্রসাব ঘটেছিল। এ-ছাড়া নগবেব বিপুল জনসংখ্যা বাণিজ্যিকবণেব প্রসাব ঘটিযেছিল। এই সবেব ফলে জেলাঞ্চলেব সামগ্রিক অর্থনীতিতে কৃষিব তুলনায শিল্প ও সেবাকর্মেব আপেক্ষিক গুরুত্ব এই পর্বে যথেষ্ট পবিমাণে বৃদ্ধি পেযেছিল এবং জেলাঞ্চলেব অর্থনীতিতে পববর্তী পর্বেও এই গুরুত্ব প্রসাবিত হযেছিল। এই শিল্পাযন ও বাণিজ্যিকবণ মুর্শিদাবাদেব কৃষি অর্থনীতিতে কী ধবনেব প্রভাব ফেলেছিল ? অবশ্যই বেশমী বস্ত্রশিল্পেব কাঁচামাল ও বিপুল লোকেব খাদ্যশস্যেব প্রযোজন এই পর্বে বাণিজ্যিক কৃষিবও পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী প্রসাব ঘটিযেছিল। নগবাঞ্চলেব শ্রেণী-বিন্যাসে এই পর্বে উল্লেখযোগ্য যে-দুটি পবিবর্তন ঘটে তাতে একদিকে দেখা যায ত্রি-স্তব-বিন্যস্ত নাগবিক সমাজেব উচ্চতম শ্রেণীটিব মধ্যে পূর্বাপেক্ষা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী মুসলিম ও হিন্দু অভিজাতদেব সংখ্যাগত ও ক্ষমতাগত প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা এবং অন্যদিকে মধ্যস্তবে ইংবেজ বণিকদেব উপব সম্পূর্ণত নির্ভবশীল এক নতুন ব্যবসাযীশ্রেণীব সম্প্রসাবণ। এইভাবে আলোচ্যপর্বে বাংলাব প্রায-স্বাধীন শাসক ও অভিজাতবর্গ মুর্শিদাবাদকে বাজধানী শহবে রূপান্তবিত কবে পূর্ববর্তী শতাধিক বৎসবে ইউবোপীয বণিকদেব ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যেব ফলে অর্থনৈতিক-বাজনৈতিক গুরুত্বেব অধিকাবী ভাগীবথী তীববর্তী বাংলাব পশ্চিমাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিজেদেব সংস্থাপন কবে অর্থনৈতিক পবিবর্তনেব প্রবাহেব উপব নিজেদেব নিযন্ত্রণ বজায় বাখতে চেষ্টা কবেছিল। মুর্শিদাবাদ শহব সাবা বাংলাদেশেব বাজস্ব-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকাকড়ি-ঋণব্যবস্থাব কেন্দ্র হয়ে ওঠায় এ-জেলাঞ্চলে অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদেব অভূতপূর্ব কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল এবং শাসক ও অভিজাতবর্গেব জীবনযাত্রাব মধ্যে ঘটেছিল তাব প্রতিফলন। নাগবিক উচ্চবর্গেব এই সামাজিক অবস্থান ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রাকে আবো সুনিশ্চিত

ও সুদৃঢ় কবাব তাগিদেই প্রযোজন দেখা দিযেছিল বাজস্ব ও ভূমি-ব্যবস্থাব সংস্কাবেব।[২৭]

সুবা বাংলাব দেওযান হিসাবে এবং পববর্তীকালে সুবাদাব হিসাবে মুর্শিদকুলি খান বাংলাব অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যে গভীব অন্তর্দৃষ্টি লাভ কবেছিলেন তাবই প্রতিফলন ঘটেছিল ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে তাঁব সম্পাদিত বাজস্ব ও ভূমি-সংস্কাবেব মধ্যে। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে শাহ সুজাব বাজস্ব সংস্কাবেব পব সুবা বাংলায মোগল শাসনেব সম্প্রসাবণ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি কাবণেব জন্য বাজস্ব বৃদ্ধি কবা অস্বাভাবিক ছিল না ; ফলে মুর্শিদকুলিব বাজস্ব-সংস্কাবে বাজস্ব-বৃদ্ধি একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলেও এই সংস্কাবেব গুরুত্ব ছিল অন্যত্র। মোগল আমলে বাংলাব ভূমি-ব্যবস্থা তোডবমল ও শাহ সুজাব সংস্কাবেব মধ্যে দিযে যে-ভাবে বিকশিত হযেছিল মুর্শিদকুলি মূলত সেই ধাবা অনুসবণ কবেও ভূমি-ব্যবস্থাব বিভিন্ন উপাদানগুলিব এমন এক নতুনতব পুনর্বিন্যাস ঘটান যাব ফলে ভূমি-ব্যবস্থাব অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক তাৎপর্য অন্যবকম হযে ওঠে। মুর্শিদকুলি সুবা বাংলা থেকে প্রায সমস্ত জাযগীব উড়িষ্যায স্থানান্তব কবেন এবং বাংলাব অধিকাংশ জাযগীব জমিকে অংশত খালসা এবং অংশত জমিদাবীতে পবিণত কবে বাজস্ব বৃদ্ধিব ব্যবস্থা কবেন ; এই ব্যবস্থাব ফলে উত্তব ভাবত থেকে মুসলিম অভিজাতদেব নিবন্তব বাংলায আসাব প্রবণতা রুদ্ধ হযে যায এবং বাংলাব শাসক-অভিজাতবর্গেব আস্থাভাজন এক স্থানীয অভিজাতগোষ্ঠীব উত্থান শুরু হয। মুর্শিদকুলিব প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায বাজধানী মুর্শিদাবাদেব চাবপাশে ছোট ছোট জমিদাবীকে গ্রাস কবে কতকগুলি বিশাল জমিদাবীব পত্তন হয যাদেব সঙ্গে বাজনৈতিক বোঝাপডাব মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলেব শান্তি-শৃঙ্খলা নিযন্ত্রণ এবং বাজস্ব-সংগ্রহেব নিশ্চয়তাবিধান সম্ভব হয। এইভাবে মুর্শিদকুলি বাংলাব জমিদাবী-ব্যবস্থাব বিন্যাসে যে পবিবর্তন নিযে আসেন তা অব্যাহত থাকে পববর্তী পঞ্চাশ বছব ধবে। মুর্শিদকুলিব এই ভূমি-সংস্কাবেব ফলে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও নানা অংশে এইসব বিশাল জমিদাবীব অনেকগুলিবই অন্তর্ভুক্ত হযে পডে। বাজশাহী, লস্কবপুব, ককুনপুব, ফতেসিংহ, চুনাখালি, বাঙামাটি, নদীযা ইত্যাদি বিশাল জমিদাবীব নিযন্ত্রণে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অধিকাংশ এলাকা চলে গেলেও কিছু কিছু ছোটখাট জমিদাবী, জাযগীবদাবী ও হুজুবী তালুকদাবী তাদেব অস্তিত্ব টিকিযে বাখতে সমর্থ হয। সামগ্রিক বিচাবে এই পর্বেই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব গ্রামেগঞ্জে জমিদাবতন্ত্রেব নিবঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয। এব তাৎপর্য ছিল এইখানে যে মুর্শিদকুলি কঠোবভাবে নিযমিত বাজস্ব আদাযেব যে-ব্যবস্থা চালু কবেছিলেন বলপ্রযোগেব ক্ষমতাযুক্ত শক্তিশালী জমিদাব-বৃন্দও অনুরূপ কঠোবতাব সঙ্গেই বাযত-কৃষিজীবী ও হস্তশিল্পীদেব উপব তা প্রযোগ কবতে শুরু কবেছিলেন। এব ফলে ব্যাপক জনগণ যে মেষপালেব মত ঘাসপাতা খেযে দলে দলে মৃত্যুব সম্মুখীন হত একথা বলতে আচার্য যদুনাথ বাধ্য হযেছেন। এ-বিষযে সন্দেহেব কোনই অবকাশ নেই যে প্রদীপেব নীচেব অন্ধকাবেব মতই জেলাঞ্চলেব এই পর্বেব ইতিহাস নবাবী আমলেব জৌলুষ ও জাঁকজমকেব আড়ালে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলিব প্রতিবাদভীত দাসত্ব ও লাঞ্ছনাব ইতিহাস।[২৮]

আলোচ্যপর্বে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ইতিহাসে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে সুবা বাংলাব বাজধানী স্থানান্তব এবং বাজস্ব ও ভূমিব্যবস্থাব সংস্কাব অর্থনৈতিক জীবনেব চলে আসা ধাবাটিকে পবিপুষ্ট কবে তুলেছিল এবং এই ধাবাটিকে পববর্তী পর্ব পর্যন্ত এগিযে যাওযাব সামর্থ্য জুগিযেছিল। অর্থনৈতিক জীবনেব আবো গভীব এবং সুদূবপ্রসাবী কপান্তবেব অনুকূল যে-শক্তিটি আলোচ্যপর্বে ক্রিযাশীল ছিল এবং ক্রমশ জোবদাব হয়ে উঠেছিল তা হল বৃটিশ

বাণিজ্যের অপ্রতিরোধ্য প্রসার। বৃটেন ও ইউরোপের বাজারে বাংলার পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এই বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ হলেও দুই প্রকারের বাধাকে অতিক্রম করেই এই বাণিজ্যবৃদ্ধি ঘটতে পেরেছিল : বাংলার নবাবী রাজশক্তি বৃটিশের বাণিজ্যবিস্তারে বারে বারে বাধা দানের চেষ্টা করেছিল এবং ডাচ, বেলজিয়ান ও ফরাসী বণিকদের সুতীব্র বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার মুখে ইংরেজদের বাণিজ্যকে দাঁড়াতে হয়েছিল। সুবা বাংলার রাজশক্তির সঙ্গে বৃটিশ বণিকদের সম্পর্ক পূর্ববর্তী পর্ব থেকেই বিশেষ ভাল ছিল না। আলোচ্য পর্বে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের ভরকেন্দ্র হয়ে উঠলেও প্রশাসনিক রাজধানী না হয়ে ওঠায় জেলাঞ্চলে ইংরেজ বাণিজ্যের প্রসার সত্ত্বে এই রাজশক্তির সঙ্গে তাদের বিরোধ যথেষ্ট তীব্র হয়ে উঠতে পারেনি। তা ছাড়াও, এই সময়ে জেলাঞ্চলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইংরেজদের চাইতে ডাচ বণিকদের ভূমিকা ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে বাংলাদেশে স্থলপথে ও জলপথে বিনাশুল্কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদানকারী এক বিশেষ 'ফার্মান' লাভ করে। সঠিকভাবেই এই ফার্মানকে ইংরেজদের বাণিজ্যিক মহাসনদ (Magna Carta) আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেননা, এই সনদের বলেই ইংরেজরা তাদের ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের সরিয়ে দিয়ে জেলাঞ্চল সহ রাজ্যের বাণিজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দিল্লীর নামে মাত্র সম্রাটের প্রদত্ত এই 'ফার্মান' কার্যকরী করতে গিয়েই ১৭১৭ থেকে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজদের সম্মুখীন হতে হয় বাংলার প্রায় স্বাধীন নবাবী রাজশক্তির তীব্রতম বিরোধিতার। ফারুক শিয়ারের এই ফার্মানের পরবর্তী অর্ধশতাব্দী বস্তুত ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবদের ধারাবাহিক পাঞ্জা কষার ইতিহাস— একদিকে ইংরেজরা এই ফার্মানের সাহায্যে বাংলার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামোর গভীরে ঢুকতে চেষ্টা করছিল এবং অন্যদিকে বাংলার নবাবী রাজশক্তি অসাফল্যের সঙ্গে চেষ্টা করেছিল এটি ঠেকাতে। ইংরেজরা তাদের বাণিজ্য বিস্তারে প্রথম মোকাবিলা করতে অগ্রসর হয় ডাচ বণিকদের এবং ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে তারা সুনিশ্চিতভাবে ডাচেদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়। বাণিজ্যে বহুদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ডাচেদের পর্যুদস্ত করতে সক্ষম হলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দের আগের এবং পরের দশকে যথাক্রমে বেলজিয়ানদের অস্টেণ্ড কোম্পানী এবং ফরাসীদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রবল বাণিজ্য প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হয়েছিল। ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের পর্যুদস্ত করার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে একচ্ছত্র হয়ে উঠতে থাকে ঠিক সেই সময়েই মারাঠা আক্রমণে নবাবী রাজশক্তির দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে; এর ফলে ১৭৪০ থেকে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যে সুবিধাজনক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানে উন্নীত হয় তা ক্রমশ সামাজিক শ্রেণী-সমর্থনকে নবাবী পক্ষ থেকে ইংরেজ পক্ষে টেনে আনে, ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধে নবাবপক্ষ ক্রমশ সামাজিকভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তে থাকে। নবাবী রাজশক্তির পিছনের অর্থনৈতিক আশ্রয়ভূমি স্বরূপ মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী মহাজনদের নেতৃস্থানীয় জগৎশেঠ পরিবার তাঁদের শক্তি সামর্থ্য নিয়ে ধীরে ধীরে নবাবী অভিজাতবর্গকে ছেড়ে ইংরেজপক্ষে চলে আসতে থাকেন। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে দেশীয় ব্যবসায়ী-মহজনদের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা অন্যান্য বিদেশী বণিকদের যে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক ছিল এই সময়ের পরে তা রূপান্তরিত হতে থাকে একধরণের সহযোগিতা বা 'আঁতাত'-এ, ভারতীয়

ব্যবসায়ীদের এশীয় বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এবং নাদির শাহের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব-ভারতে নিরাপত্তার সংকট দেখা দেওয়ার জন্য। এইভাবেই রচিত হয় ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের সামাজিক পটভূমি।[২১]

মুর্শিদাবাদের কাঁচা রেশম ও রেশমী কাপড়ের বাণিজ্যকে আশ্রয় করেই যেহেতু জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনের সর্বাপেক্ষা গতিশীল উপাদানটি বিকশিত হচ্ছিল সেইজন্য আলোচ্য পর্বে এই রেশম বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতির খবর নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। রেশম বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি আলোচনার পূর্বে আলোচ্যপর্বে রেশমশিল্পের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে যে-সকল পরিবর্তন এসেছিল সেগুলির দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে চীন থেকে আমদানি করা 'বড় পলু' নামের পলুপোকা এখানে চালু করা হয়; সম্ভবত মুর্শিদাবাদ জেলায় বিদেশ থেকে আমদানী করা 'রেশম' পোকার প্রবর্তন এই প্রথম। দ্বিতীয়ত সুতো কাটা ও সুতো জড়ানোর প্রযুক্তিতে এই সময়ে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। হাত দিয়ে সুতো জড়ানোর পুরোনো পদ্ধতির জায়গায় একটি দেশজ যন্ত্রের প্রবর্তন ঘটে যার নাম ছিল 'ঘাই' বা 'বাঙ্ক' যা চালানোর জন্য দু'জন কারিগর 'কাটানি' ও 'পাকদার', দরকার হত এবং যন্ত্রের মধ্যে এমন একটি কৌশল ছিল যার সাহায্যে একই রকম রেশমের আঁশ দিয়ে একটি সুতো পাকানো যেত। কাঁচা রেশম উৎপাদনের ইতালীয় কৌশল বা ফিলেচার পদ্ধতি ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে জেলাঞ্চলে চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই কৌশলেই প্রভূত পরিমাণ কাঁচা রেশম উৎপাদিত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ইউরোপীয় বাজারে কাঁচা রেশমের চাহিদার তীব্র ওঠা নামা লক্ষ্য করা যায় এবং তার প্রভাব অনিবার্যভাবে বাংলার রেশম বাণিজ্যে পড়ে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭০৬-১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে গড়ে বছরে ৪৩,৬৫৯ পাউন্ড, ১৭১৫-১৭২০ খ্রীস্টাব্দে বছরে গড়ে ১২৭,০৪৫ পাউন্ড এবং ১৭১৭-১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে সর্বোচ্চ ১৮১,৯৪৯ পাউন্ড এবং ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭০৫-১৭১১ খ্রীস্টাব্দে বছরে গড়ে ১২১,৫২২ পাউন্ড, ১৭১১-১৭১৬ খ্রীস্টাব্দে বছরে গড়ে ১৬৫,৫৭৪ পাউন্ড এবং ১৭১৬-১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে বছরে গড়ে ১৭৮,৮২৫ পাউন্ড কাঁচা রেশম বাংলা থেকে রপ্তানী করে এবং এই রেশমের প্রধান অংশটিই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে উৎপাদিত হত। অর্থাৎ আলোচ্য দুই দশকের শেষের দিকে ইংরেজ ও ডাচ কোম্পানী দুটি ১৬৮০-১৭০০ খ্রীস্টাব্দের চাইতেই কাঁচা রেশমের রপ্তানী বাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। লক্ষ্যণীয় যে ডাচেরা এই সময় পর্যন্তও ইংরেজদের চাইতে বেশী কাঁচা রেশম রপ্তানী করত। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ইউরোপীয় বাজারে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের রেশমী কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রপ্তানী ভীষণভাবে বেড়ে যায় এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম দুই দশকে ১৭১৬-১৭১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছরে ২৫০,০০০-৩০০,০০০ খানা কাপড়ের রপ্তানী অব্যাহত থাকে এবং ১৭১৭-১৭১৮ ও ১৭১৯-১৭২০ খ্রীস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪১৫০০০ খানা ও ৪৮০০০০ খানা কাপড়ে। ডাচ বণিকেরাও এই সময়ে বছরে ২৫০,০০০ খানা থেকে ৩০০,০০০ খানা রেশমী কাপড় রপ্তানী করত। এই সকল রেশমী কাপড়েরও অধিকাংশই কাশিমবাজার ও তার পশ্চাৎভূমিতেই উৎপাদিত হত। এই সময়ে ইংরেজ বণিকেরা কাশিমবাজারে খরিদ করা সুতী কাপড়ের রপ্তানীও ক্রমশ বাড়িয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এই কাপড় রপ্তানী ছিল ইউরোপীয় বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য, কেননা, ১৭০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বৃটিশ বাজারে এই কাপড়ের আমদানি নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল উদীয়মান

বৃটিশ রেশমী ও সুতী বস্ত্র-শিল্পের স্বার্থে। ১৭২০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ইংরেজ কোম্পানী তার বাণিজ্যের পরিমাণে ডাচ কোম্পানীকে শুধু ছাড়িয়েই যেতে শুরু করেনি, রেশমী কাপড়ের জায়গায় তার বাণিজ্যে প্রধান হয়ে উঠতে থাকে কাঁচা রেশম ও সুতী কাপড়ের ভূমিকা। দেখা যায় ইংরেজ কোম্পানী ১৭২৭-১৭২৯ খ্রীস্টাব্দে ৪০১,৭৩৭ পাউন্ড, ১৭৩০-১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে ৩১৪,৮৮৬ পাউন্ড, ১৭৩৩-১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দে ৫১৯,৪০২ পাউন্ড, ১৭৩৬-১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দে ৪০০,৮৭২ পাউন্ড এবং ১৭৩৯-১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে ২৮৭,৩৫৪ পাউন্ড কাঁচা রেশম প্রধানত কাশিমবাজার এলাকা থেকে রপ্তানী করেছিল। আরো দেখা যায় ১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দে কাশিমবাজার থেকে তারা ২২,৭০০ খানা রেশমী কাপড় এবং ১৯৫,৯৫০ খানা সুতী কাপড় কেনার নির্দেশ পেয়েছিল। কিছুদিন বাদে পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মেজর রেনেল জানাচ্ছেন যে কাশিমবাজার থেকে ইউরোপীয় কারখানাগুলির জন্য বছরে ৩০০,০০০ থেকে ৪০০,০০০ পাউন্ড কাঁচা রেশম রপ্তানী হত আর এখানকার রেশমী কাপড়ের চাহিদা ছিল সারা এশিয়ার বিভিন্ন বাজারে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এই অভূতপূর্ব বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জেলাঞ্চলের সামাজিক জীবনের উপরও তার প্রভাব পড়তে শুরু করে।[৩০]

সতেরো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বৃটিশ বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জেলাঞ্চলে একটি নতুন বাঙালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উদ্ভব শুরু হয় এবং ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দের পরে এই গোষ্ঠীটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাতিপ্রথা নির্ধারিত বাংলার সমাজ কাঠামোর বংশানুক্রমে হস্তশিল্পে নিযুক্ত, ব্যবসায়ে নিযুক্ত নয়, এমন একটি জাতি তাঁতী-হস্তশিল্পীদের মধ্যে থেকেই এই নতুন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীটির উদ্ভব শুরু হয়। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে ঐ সময়ে তাঁতী-হস্তশিল্পীদের হাতে টাকাকড়ি আসতে শুরু করেছিল; ফলে, তাদের মধ্যে থেকে যে একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটবে তা ছিল খুবই স্বাভাবিক। ফলে আলোচ্য পর্বের (১৭০৪-১৭৫৭) প্রথম থেকেই জেলাঞ্চলের 'কাঠমা' তাঁতী-ব্যবসায়ীদের দেখা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্কে যুক্ত থাকতে। ১৭০১-১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 'দাদনী প্রথা' (Contract system) -য় পণ্যদ্রব্যাদি খরিদ করতে শুরু করায় কাঠমা ব্যবসায়ীরা অল্পদিনেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। তা ছাড়াও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের 'ব্যক্তিগত বাণিজ্য'-ও কাঠমা-ব্যবসায়ীদের সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। জেলাঞ্চলের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এই পর্বে অন্যান্য জাতির লোকেদেরও তাদের জাতিগত পেশা থেকে ব্যবসায়ের দিকে টেনে আনতে শুরু করে; কাঠমা-ব্যবসায়ী ছাড়া এই ধরণের অন্য বাঙালী ব্যবসায়ীরা 'শর্মা' নামে পরিচিত হলেও ব্রাহ্মণ ছাড়াও তিলি ইত্যাদি জাতির ব্যবসায়ীরাও এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল মনে করার কারণ আছে। বিশেষত কাঠমা-ব্যবসায়ীদের জাতিগত এবং হস্তশিল্পের পেশাগত পটভূমির জন্য তাদের মধ্যে অন্য-গোষ্ঠীটির তুলনায় ঐক্য-সংহতি অনেক বেশী লক্ষ্য করা যায়। জেলাঞ্চলের অর্থনীতিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এই অগ্রগতির পর্বে এই দুই বাঙালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি এবং কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বিরোধ বৃদ্ধির ফলে কোম্পানীর পক্ষেও ব্যবসায়িক সুবিধালাভ সহজ হয়। এই বাঙালী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই কোম্পানীর পক্ষে জেলাঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির অভ্যন্তরে প্রবেশ সহজসাধ্য হয়। ফলে একদিকে জেলাঞ্চলের অর্থনীতি থেকে পুরানো গুজরাটি ব্যবসায়ীরা যেমন সরে যেতে বাধ্য হয় অন্যদিকে নবাগত নবাবী প্রশাসন ও অভিজাতবর্গের অনুগামী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের পক্ষেও জেলাঞ্চলের অর্থনীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে বিলম্ব ঘটে।

জেলাঞ্চলেব পববর্তী পর্বেব (১৭৫৭-১৮৩৬) ইতিহাসে এই নতুন বাঙালী ব্যবসাযীবা জমিদাবী কেনাব দিকে নজব দেওযাব পবেই এ-অঞ্চলেব অর্থনীতিতে মাডোযাবী ব্যবসাযীদেব প্রতিষ্ঠাব পথ প্রশস্ত হয।[৩১]

নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদে বাংলাব বাজধানী স্থানান্তবিত হওযায এবং বৃটিশ বাণিজ্যেব ক্রমবিস্তাব ঘটতে থাকায জেলাঞ্চলেব সাধাবণ অর্থনৈতিক জীবনেও নানা দিকে উন্নতিব লক্ষণ দেখা যেতে থাকে। বাজপুরুষ, অভিজাতবর্গ এবং সৈন্যবাহিনীব চলাচলে যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত হযে ওঠে; অস্ত্রশস্ত্র, নৌকানির্মাণ, হস্তীদন্ত, কাঁসাপিতল, সোনারূপো, বিদ্‌বি ইত্যাদি শিল্প-উৎপাদনেব প্রচলন ও বৃদ্ধি এই পর্বে ঘটে; কৃষিজপণ্যাদিব বাণিজ্যবৃদ্ধিও এই পর্বেব উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কৃষি ও শিল্প উৎপাদনেব বৃদ্ধি এবং লোক ও পণ্য চলাচলেব প্রসাব সামাজিক কাঠামোব উপবও সুদূবপ্রসাবী প্রভাব ফেলতে শুরু কবে। একদিকে বিকাশমান নগবকেন্দ্র ছাডাও সুতী, জঙ্গীপুব, কান্দি, ভগবানগোলা ইত্যাদি জাযগায নতুন শহবেব উদ্ভব ঘটতে শুরু কবে। অন্যদিকে, বংশানুক্রমিক পেশা ছেড়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক পেশাব দিকে লোকে ঝুঁকতে থাকে; এই পর্বেই বেশম শিল্পেব বিভিন্ন পর্যাযেব কাজকর্ম একই জাতিব নিযন্ত্রণেব বাইবে গিযে শ্রমবিভাজনেব ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হতে শুরু কবে। যোগাযোগ, উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং তাব ফলে অর্থনীতিব সামাজিক-সংগঠনেব পবিবর্তন থেকে মনে হতে পাবে যে এই পর্বে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব গ্রামীণ অর্থনীতি তাব বিচ্ছিন্নতা ও স্বনির্ভবতাব প্রবহমান ধাবা ছেড়ে বেবিযে আসতে শুরু কবেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যাবলী থেকে দেখা যায যে সেবকমটা ঘটেনি। অর্থনৈতিক বিকাশেব দিক থেকে গ্রামীণ বিচ্ছিন্নতা ও স্বনির্ভবতা ভেঙে বেবিযে আসাব সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও অস্থিব এবং নিবাপত্তাহীন বাজনৈতিক পবিস্থিতিব জন্য প্রচলিত অবস্থাব পবিবর্তন ঘটেনি। নবাবদেব দুর্বল শাসন ব্যবস্থা, জমিদাবী বাধা-নিষেধেব প্রতাপ, দস্যু-তস্কবেব ভয, বিপুল কবভাব এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেব দুর্নীতি ও জোবজববদস্তি ইত্যাদিব ফলেই গ্রামগুলি নিজেদেব মধ্যেই গুটিযে ছিল এবং আভ্যন্তবীণ ঐক্য ও সংহতি-বৃদ্ধিতে মনোযোগী হযেছিল, বর্হির্জগতেব প্রভাব-প্রতিক্রিযায যথোপযুক্তভাবে সাড়া দিযে বদলাতে শুরু কবেনি। জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ইতিহাসেব পববর্তী পর্বেবও (১৭৫৭-১৮৩৬) প্রায শেষ পর্যন্ত গ্রামীণ স্বনির্ভবতা ও বিচ্ছিন্নতাব এই ধাবাটিকে বহমান থাকতে দেখা যাবে।[৩২]

আলোচ্য পর্বে একদিকে নবাবী বাজধানী শহবেব জাঁকজমক এবং অন্যদিকে ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যেব ফলে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন-বৃদ্ধি জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক উন্নতি ও বিকাশ ঘটিযেছিল বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও জেলাঞ্চলেব অর্থব্যবস্থাব ভবিষ্যৎ অবনতিব বীজও সুনিশ্চিতভাবে এই পর্বেই বোনা হযেছিল। বৃটিশ বাণিজ্যবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে এই বাণিজ্যেব চবিত্র-পবিবর্তন সূচনা কবেছিল এই অবনতিব: ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে এবং পুনবায ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডেব বাজাবে বাংলাব বেশমী ও সুতী বস্ত্র আমদানি নিষিদ্ধ হওযায জেলাঞ্চলেব বেশমী বস্ত্র-শিল্পেব পতন শুরু হয; অবশ্য আলোচ্য পর্বে ইউবোপীয বাজাবেব জন্য ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী এই বস্ত্র বপ্তানী কবতে থাকায কিছু দিনেব জন্য এই পতন ঠেকানো গেলেও ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দেব পব তা ত্ববান্বিত হযে ওঠে। মজাব কথা, জেলাঞ্চলেব বেশমী বস্ত্র শিল্পেব পতন শুরু হলেও কাঁচা বেশম শিল্পেব কিন্তু দ্রুত প্রসাব ঘটতে থাকে—ইংল্যান্ডেব বেশমী বস্ত্রশিল্পেব কাঁচামালেব চাহিদা পূবণেব জন্য। তাঁতী-হস্তশিল্পীদেব মধ্যে থেকে উদ্ভূত কাঠমা-ব্যবসাযীবা তাদেব অর্থনৈতিক সাফল্যকে নিজেদেব অভিজ্ঞতাপুষ্ট

জেলাঞ্চলের রেশমী বস্ত্র-শিল্পকে অধিকতর উন্নত ও সুবিস্তৃত করার কাজে নিয়োজিত করার বদলে এই শিল্পকে বিনষ্ট করায় বিদেশী বণিকদের প্রচেষ্টার সহযোগী যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে থাকল ; বাঙালী ব্যবসায়ীদের অন্য গোষ্ঠীটির ভূমিকাও ভিন্নতর কিছু হল না। বস্তুত এইভাবেই আলোচ্য পর্ব থেকেই জেলাঞ্চলের অর্থনীতি তার আধা-ঔপনিবেশিক চরিত্র অর্জন করতে শুরু করেছিল। অবশ্য জেলাঞ্চলের অর্থনীতির আপাত উন্নতির উপর চরম আঘাত আসে ১৭৪০-এর দশকে পশ্চিমবাংলায় উপর্য্যুপরি 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে পরিচিত মারাঠা আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে। এই বিপর্যয় জেলাঞ্চলের রাঢ় এলাকার কৃষি ও শিল্পের উপর যে আঘাত নামিয়ে আনে তার ফলে এই অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক লোকজন বাগড়ি এলাকায় চলে আসতে বাধ্য হয়। এইভাবে মারাঠা আক্রমণ জেলাঞ্চলের অর্থনীতিতে, বিশেষত রেশমী বস্ত্র-শিল্পের উপর, যে আঘাত হানে তা কাটিয়ে ওঠা এই অর্থনীতির পক্ষে পরে আর কখনও সম্ভব হয়নি।[৩৩]

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পটভূমি হিসাবে আলোচ্য পর্বে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক ইতিহাসের বস্তুভিত্তি রচনা করতে হলে জেলাঞ্চল এবং মুর্শিদাবাদ শহরাঞ্চলের জনসংখ্যার বিবর্তন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গড়ে তোলা দরকার। এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য সংখ্যাতথ্যের একান্ত অভাবের জন্য নানা পরোক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে একপ্রকার ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা যেতে পারে। পূর্বের আলোচনায় ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ জেলাঞ্চলের লোকসংখ্যা ৮ লক্ষ ১৬ হাজার এবং শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা ৫০ হাজার মত অনুমিত হয়েছে। পরবর্তী কালের তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে জেলাঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল ১০,২০,৫৭২ জন এবং ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ। পূর্ব ও পরবর্তীকালের এই তথ্যাবলী এবং মধ্যবর্তী কালের প্রাসঙ্গিক নানা তথ্যাদি থেকে অনুমান করা যায় যে ১৭০০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ জেলাঞ্চলের লোকসংখ্যা ৯ লক্ষ এবং শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ হাজারের উপরে ছিল ; ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তীকালে জেলাঞ্চলের শহরকেন্দ্রের দ্রুত উন্নতি এবং গ্রামীণ এলাকায় সুশৃঙ্খল মোগল শাসনের প্রবর্তন থেকে জনসংখ্যার এই পরিমাণ বৃদ্ধি অযৌক্তিক মনে হয় না। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপিত হওয়ার বছর বিশেক বাদে সেখানকার লোকসংখ্যা ২০০,০০০ হতে দেখা যায় ; দেওয়ানী কেন্দ্র হয়ে ওঠার পূর্বেই মুর্শিদাবাদে জনসংখ্যা ৮০ হাজারের উপরে থাকায় সহজেই অনুমান করা যায় যে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুকালে (১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে) এই শহরাঞ্চলে প্রায় ৩ লক্ষ লোকের বাস ছিল ; ঐ সময়ে জেলাঞ্চলের লোকসংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ অনুমিত হতে পারে। পরবর্তীকালে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভ লিখেছিলেন যে মুর্শিদাবাদ শহর লন্ডন শহরের মতই সুবিস্তৃত, জনবহুল এবং সম্পদশালী ছিল ; ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ লন্ডন শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৭৫০,০০০ ; ক্লাইভ বহুদিন পূর্বে ভাবতে এসেছিলেন ; সুতরাং মুর্শিদাবাদ শহরের লোকসংখ্যা ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ৭৫০,০০০-এর কম থাকারই কথা। আবার অন্যদিকে মেজর রেনেল জানাচ্ছেন যে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা নগরের লোকসংখ্যা ছিল ৪৫০,০০০ এবং মুর্শিদাবাদ ছিল ঢাকার চাইতেও অনেক বড় শহর ; সুতরাং মুর্শিদাবাদ শহরের জনসংখ্যা ঐ সময়ে নিশ্চিতভাবেই ৪৫০,০০০-এর বেশী ছিল। অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের সমকালে মুর্শিদাবাদ শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ মত ; ঐ সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের লোকসংখ্যা সহজেই ১৪/১৫ লক্ষ অনুমিত হতে পারে। গৌরবের চরম সীমায় মুর্শিদাবাদ শহরাঞ্চলের লোকসংখ্যা

১৫ লক্ষ ছিল এই জনশ্রুতি যথেষ্ট তথ্যসহ নয় বলেই মনে হয়।[৩৪]

।। পাঁচ ।।

## নতুন অর্থনৈতিক যুগের সূচনায়

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক জীবনে ১৭৫৭-১৮৩৬ কালপর্বে যে-সকল পবিবর্তনেব বূপবেখা ফুটে উঠেছিল সে-গুলিব ফলে একটি বৈদেশিক জনগোষ্ঠীব অর্থনৈতিক স্বার্থ-সাধনেব তাগিদে জেলাঞ্চলেব অর্থ-ব্যবস্থাব সচেতন পুনর্বিন্যাস ঘটেছিল। বৈদেশিক স্বার্থেব প্রযোজনে এটি ঘটেছিল বলেই পূর্ববর্তী ১৭০৪-১৭৫৭ কালপর্বে গডে ওঠা জেলাঞ্চলেব পুবোনো অর্থব্যবস্থাব ভাঙনেব মধ্যে দিযেই এই পুনর্বিন্যাস ঘটানো হযেছিল। দ্রুত নগবাযন, বাণিজ্যিকবণ, শিল্প-সমৃদ্ধি, টাকাকডিব প্রচলন, নতুনতব শ্রেণী-বিন্যাস ইত্যাদি উন্নত সম্প্রসূতন্ত্র থেকে সবে আসাব অনুকূল যে-সকল শক্তি জেলাঞ্চলেব প্রাক্-পলাশী যুগেব পুবোনো অর্থব্যবস্থাব মধ্যেই আত্মপ্রকাশ কবেছিল সেগুলিব সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যেব একটি গভীব সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী এইভাবে ক্রমশ একটি নির্ধাবক ভূমিকায চলে যেতে থাকাব জন্যই বলা যায যে এ-জেলাঞ্চলেব অর্থব্যবস্থায় ঐ সমযে আধা-ঔপনিবেশিক একটি উপাদানেব সঞ্চাব ঘটেছিল। পলাশীব যুদ্ধে বৃটিশ বিজযেব ফলে অর্থব্যবস্থাব এই জায়মান আধা-ঔপনিবেশিক চবিত্রেব পবিপূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক হয়ে ওঠাব সম্ভবনা সুনিশ্চিত হযে গেল। পলাশীব যুদ্ধে বাজনৈতিক ভাবসাম্যেব যে-পবিবর্তনেব ফলে বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী হযে উঠল একটি সামবিক ও বাজনৈতিক শক্তি, সেই পবিবর্তনেব অর্থনৈতিক প্রতিফলন ঘটতে থাকল ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে। এই জন্যই জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দেব চাইতেও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ। বস্তুত জেলাঞ্চলেব পুবোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবই অনুবর্তন চলেছিল ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দেব পবে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু কাঠামো বা বিন্যাসগত কোনও পবিবর্তন না হলেও পলাশী-উত্তব যুগেব তিনটি ঘটনা জেলাঞ্চলেব পুবোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মাবাত্মক আঘাতে বিপর্যস্ত কবে দিযেছিল। প্রথমত পলাশীব যুদ্ধে বিজযেব ফলে ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব কর্মচাবিবৃন্দ যে দাযিত্ববর্জিত ক্ষমতাব অধিকাবী হযে প… তাব ফলে শুরু হয 'পলাশীব লুঠ' (Plassey Plunder); ১৭৫৭-১৭৬৫ এই আট বছবে ৫,৯৪০,৪৯৮ পাউন্ড সম্পদ কার্যত এ-দেশ থেকে লুঠ কবে ইংল্যান্ডে চালান কবা হয আব এই সম্পদেব প্রধান অংশই নিষ্কাশিত হয বাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল থেকে। দ্বিতীযত, ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সুবা বাংলাব দেওযানী লাভ কবাব বছব থেকেই বাংলাব বাজস্বেব এক বিবাট অংশ ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিতে শুরু কবল; ১৭৬৫-১৭৭১ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যে ৪,০৩৭,১৫২ পাউন্ড অর্থাৎ সুবা বাংলাব বাজস্বেব এক তৃতীযাংশ বিদেশে চলে গেল; প্রাক্-পলাশী যুগে বাজস্বেব উদ্বৃত্ত বাজধানী মুর্শিদাবাদেব কোষাগাবে সঞ্চিত হয়ে জেলাঞ্চলেব যে সম্পদ-বৃদ্ধি ঘটাত তা বন্ধ হয়ে গেল। তৃতীয়ত, বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তবেব মন্বন্তব' (১৭৭০-১৭৭১ খ্রীস্টাব্দ) মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব এক তৃতীয়াংশ এবং মুর্শিদাবাদ শহবাঞ্চলেব প্রায় অর্ধেক লোকেব জীবনহানি ঘটানোয় জেলাঞ্চলেব কৃষি ও শিল্প ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হযে গেল। এইভাবে

জেলাঞ্চলেব পুবনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব উপব ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে মাবাঠা আক্রমণেব মধ্যে দিযে যে আঘাত শুরু হযেছিল তা পূর্ণ পবিণতি পেল ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যে। এই সমযেব পব থেকেই জেলাঞ্চলেব পুবনো দেশজ অর্থনৈতিক কাঠামো ধাপে ধাপে ভেঙে পড়তে থাকল এবং বৃটিশ প্রভাবিত, প্রবর্তিত ও নিযন্ত্রিত এক নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোব আত্মপ্রকাশ শুরু হল।[৩৫]

# মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ

॥ এক ॥

নীলচাষেব উত্থান পতন, নীলকবদেব অত্যাচাব এবং নীল বিদ্রোহেব কাহিনী আধুনিক বাংলাব অর্থনৈতিক, বাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসেব এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায জুড়ে ছড়িযে বযেছে। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসনেব ফলে সৃষ্ট কুৎসিত শোষণ ও অত্যাচাব এবং অন্যদিকে জনগণেব ব্যাপক প্রতিবোধ— এই দুই দিকেবই ছবি নীল কাহিনীতে ধবা আছে। কিন্তু বাংলাব ইতিহাসে নীল কাহিনীব সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি কবতে হলে আমাদেব মনোযোগ শুধুমাত্র সে আমলেব বাংলা প্রদেশেব স্তবেই সীমাবদ্ধ বাখলে চলবে না। বাংলাব বিভিন্ন জেলায নীল সমস্যা যে স্থানীয চেহাবা এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যেব অধিকাবী হযে উঠেছিল তাব দিকেও নজব দেওযা প্রযোজন। এই প্রযোজনেব তাগিদেই মুর্শিদাবাদ জেলায নীল চাষ ও নীল বিক্ষোভেব বেখাচিত্র বচনাব এই প্রচেষ্টা। কিন্তু শুকতেই বাংলাব ইতিহাসেব নীল পর্ব সম্পর্কে আমবা কিছুটা ধাবণা গড়ে না নিলে মুর্শিদাবাদেব নীল কাহিনীব অনেকটা আমাদেব বোধগম্য হবে না।

নীল গাছেব চাষ, তাব থেকে দেশী পদ্ধতিতে নীল বং তৈবী এবং এই বঙেব ব্যবহাব প্রাচীনকাল থেকেই ভাবতে চালু ছিল। পনেবো শতকে ইউবোপীয বণিকবা ভাবতে আসাব পব থেকে অন্যতম পণ্য হিসাবে ইউবোপেব বাজাবে নীলেব বপ্তানীও শুরু হযেছিল। আঠাবো শতকেব দ্বিতীযার্ধ থেকেই সমসামযিক ইতিহাসেব কিছু অপবিসীম গুকত্ব সম্পন্ন ঘটনাব ফলে ভাবতেব পূর্বপ্রান্তে বাংলাদেশে নীল চাষ ও নীল তৈবী সুদূব প্রসাবী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে শুক কবে।

১৭৫৭ সালে পলাশীব যুদ্ধে বিজযেব মধ্যে দিযে বৃটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী ভাবতেব বাংলা প্রদেশে তাব সামবিক ও বাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কবল ; ১৭৬৫ সালে ভাবতেব মোগল সম্রাটেব কাছ থেকে বাংলা প্রদেশেব দেওযানি লাভেব মধ্যে দিযে এই প্রাধান্য আইনগতভাবে প্রশাসনেব ক্ষেত্রে প্রস বিত হল ; ১৭৭২ সাল থেকে বাংলাব বাজস্বকে ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব পক্ষে লাভজনক কবে তোলাব প্রচেষ্টা শুক হল। এই প্রচেষ্টাব ফলেই ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী বাংলা দেশে গড়ে তুলতে আবম্ভ কবল এক নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা। কিন্তু সামবিক বাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই সকল সাফল্য সত্ত্বেও ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী তাব মূল বাণিজ্যিক চবিত্রটি অক্ষুণ্ণ বাখল।

ভাবতেব ইতিহাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীব এই ক্রমবর্ধমান ভূমিকাব সমান্তবালে ইংল্যান্ডেব ইতিহাসে ঘটে চলেছিল আবো বেশী গুকত্বপূর্ণ, আবো বেশী সুদূব প্রসাবী এক ঘটনা। প্রায় ১৭৬০ সাল থেকে ইংল্যাণ্ডে শুক হযেছিল শিল্পবিপ্লব। শিল্প-বিপ্লবেব ফলে উৎপাদনেব নানা ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পবিবর্তন ঘটতে শুক কবল— এইবকম পবিবর্তন লক্ষণীয়ভাবে দেখা গেল বস্ত্রশিল্পেব ক্ষেত্রে। আধুনিক ধবনেব বস্ত্রশিল্পেব দ্রুত সম্প্রসাবণেব সঙ্গে সঙ্গে কাপড় বং কবাব জন্য নীলেব চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকল। কিন্তু অন্যদিকে আবাব এই সময়েই

ইংল্যাণ্ডের বাজারে নীলের যোগান কমে গেল দুটি কারণে : আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে সেখান থেকে নীল আমদানি বন্ধ হয়ে গেল ; অন্যদিকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃটিশ উপনিবেশিকরা অধিকতর লাভজনক কফি ও চিনি উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় সেখান থেকেও বন্ধ হল নীলের আমদানি। এই পরিস্থিতিতেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দেখল যে প্রয়োজনীয় মান ও পরিমানের নীলের জন্য ইংরেজদের নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হচ্ছে কিছু ফরাসী ও স্পেনীয় উপনিবেশের উপর তখনই তারা ভাবতে তাদের সদ্যলব্ধ উপনিবেশ বাংলাদেশে নীল উৎপাদনের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু করল।[১]

কিন্তু ইউরোপের বাজারে নীলের চাহিদা থাকায় ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে দেশী পদ্ধতিতে নীল তৈরীর বদলে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনুসৃত পদ্ধতিতে নীল তৈরী শুরু হয়ে গিয়েছিল কিছু কিছু ইউরোপীয় ব্যবসায়ীর উদ্যোগে। ১৭৭২ থেকে ১৭৮০ সালের মধ্যে চন্দননগর, হাওড়া, হুগলি ও চুঁচুড়ার আশে পাশে ল্যুই বোনাদ্, কারেল ব্লুম ও কয়েকজন ফরাসী চিকিৎসক বেশ কয়েকটি নীলকুঠি গড়ে তুলেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৭৯ সালে সকল ইউরোপীয়কেই বাংলা ও বিহারে নীলচাষের সুযোগ ও অধিকার দিলেও প্রতিষ্ঠান হিসাবে নীল উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হল না, ১৭৭৯ থেকে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত নির্দ্ধারিত মূল্যে নীল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নীলে সরবরাহের চুক্তিতে আবদ্ধ থাকল। এই সময়ে প্রিন্সেস, ডগলাস, ফার্গুসন, ব্যারেটো, জে.পি. স্কট ও হেনরী স্কট কোম্পানীকে নীল সরবরাহ করত। কোম্পানী নীল ক্রয় করতে থাকার ফলে কিছু কিছু দুঃসাহসী ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও কিছু কিছু কোম্পানী কর্মচারী নীল চাষে বিনিয়োগ করতে থাকল এবং বাংলা দেশে নীল কুঠির সংখ্যাও বাড়তে থাকল।[২]

কিন্তু এইভাবে ব্যবসায়ীদের যোগান দেওয়া নীল উন্নত মানের না হওয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৮৮ সাল থেকে নীল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চুক্তি করা বন্ধ করল এবং যে আট দশ জন ইউরোপীয় নীলকর উন্নত নীল উৎপাদনে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করছিল তাদের উৎসাহ ও সাহায্য দিতে এগিয়ে এল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার এই সকল নীলকরকে আগাম অর্থ দাদন দিয়ে, উৎপাদিত নীল কিনে নিয়ে, অন্যপ্রদেশের নীলের উপর শুল্ক বসিয়ে নীল চাষ ও নীল উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে দিল। কিন্তু আবার অন্যদিকে গ্রাম বাংলায় নীলকরদের অনুপ্রবেশের ফলে কোম্পানীর ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে এই আশংকায় কোম্পানী সরকার নীলকরদের এদেশে থাকার লাইসেন্স দেওয়া, নীলকুঠি তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণকে ৫০ বিঘার মধ্যে সীমিত রাখা, কুঠি তৈরীর জন্য বাধ্যতামূলক অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা করা, অন্যকুঠি থেকে নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে কুঠি তৈরীতে বাধ্য করা ইত্যাদি বিধি-নিষেধের সাহায্যে নীল শিল্পের বিকাশকে একরকম নিয়ম-নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেছিল। ইংল্যাণ্ডের বাজারে এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় নীলের বিপুল চাহিদা থাকায়, নীল ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক হওয়ায় এবং কোম্পানীও বৃটিশ বণিকদের কাছে বিনিময় মাধ্যম হিসাবে (convenient means of remittance) নীলের ভীষণ গুরুত্ব থাকায় কোম্পানী সরকার গৃহীত এই সকল ব্যবস্থার ফলে অচিরেই বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলাতেই বহুসংখ্যক নীলকুঠি গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতক শুরু হতে না হতেই লক্ষ্য করা গেল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশে এক প্রধান বাগিচা শিল্পের পত্তন

ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। নীল শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠায় ১৮০২ সাল থেকে নীলকবদেব আগাম দাদন দেওয়াব ব্যবস্থাও তুলে দিল কোম্পানী। ১৭৮৩-৮৪ সালে ১২০০/১৩০০ মণ, ১৭৯৫-৯৬ সালে ২৪০০০ মণ এবং ১৮০৪-৫ সালে ৬২০০০ মণ নীল বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়েছিল এবং এই সংখ্যাতথ্য থেকে বোঝা যায় নীল চাষ ও নীল শিল্পেব বিকাশ বাংলাদেশে কত দ্রুত ঘটেছিল।[৩]

কোম্পানী আগাম দাদনেব মাধ্যমে নীল কেনা বন্ধ কবাব পব খোলা বাজাব থেকেই নীল কিনতে শুরু কবল। এব ফলে ১৮০২ সালেব পব থেকে নীল ব্যবসাবও ক্রমশ প্রসাব ঘটতে থাকল। অন্যদিকে নীলকবদেব কাছে কোম্পানীব আগাম বাবদ পুঁজিব আমদানি বন্ধ হওয়ায় তাবা বাধ্য হযে কলকাতাব এজেন্সী হাউসগুলোব উপব পুঁজিব জন্য নির্ভবশীল হযে উঠল। এই এজেন্সী হাউসগুলো গড়ে তুলেছিল কলকাতাব সবকাবী ও বেসবকাবী ইউবোপীয়বা এবং তাদেব কিছু এদেশী সহযোগীবা এদেশে ব্যবসাযেব মাধ্যমে সঞ্চিত বিপুল অর্থলগ্নী কবে। উনিশ শতকেব প্রথম তিন দশকে বাংলাব নীলেব কাববাবে লগ্নী কবা প্রায দু'কোটি টাকাব মধ্যে এক কোটি ষাট লক্ষ টাকাই সবববাহ কবেছিল এধবনেব ছটি ইউবোপীয এজেন্সী হাউস। নীলকবদেব পুঁজিব সমস্যা এজেন্সী হাউসগুলো মেটাতে পাবায় এবং বিকাশেব অনুকূল অন্যান্য শর্তাদি উপস্থিত থাকায দ্রুত নীলকুঠিব সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বাংলাদেশেব প্রতিটি জেলাতে নীল চাষ ও নীল উৎপাদন বেড়ে চলতে থাকে। বলা যায ১৮০২ সাল থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত নীলেব এই দ্রুত অগ্রগতি ঘটতে পেবেছিল : প্রথমত এই সমযে নীলেব চাহিদা শুধু গ্রেট বৃটেনেই নয, শিল্প-বিপ্লব প্রসাব এবং রুচিব পবিবর্তনেব ফলে সমগ্র ইউবোপেই বেড়ে যেতে থাকে এবং বাংলাব নীল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানেব হওযায স্বাভাবিক ভাবেই এব চাহিদা বেশী হয; অন্যদিকে বাংলা দেশে নীল উৎপাদনেব খবচ অত্যন্ত কম হওযায় এবং নীলেব দব যথেষ্ট বেশী থাকায নীল ব্যবসাযীদেব কাছে অত্যন্ত লাভজনক হয়ে ওঠে। দ্বিতীযত, ১৮১৩ সালেব চার্টাব আইনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীব একচেটিয়া বাণিজ্যেব অধিকাব অধিকাংশ পণ্যেব ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হওযায বহু নতুন ব্যবসাযী নীল ব্যবসাযেব দিকে ঝুঁকতে থাকে। এ ছাড়াও এ সমযে আইনগত কিছু সুযোগ সুবিধাব বৃদ্ধিও নীলকবদেব বিশেষভাবে সাহায্য কবে; ১৮২৩ সালে ষষ্ঠ আইনে নীলকবেবা টাকা বা নীল বীজ দাদন গ্রহণকাবী চাষীব জমিতে বিশেষ স্বত্ব ও অধিকাব পায; ১৮৩০ সালেব পঞ্চম আইনে দাদন গ্রহণ কবে নীল চাষ না কবা চাষীদেব পক্ষে ফৌজদাবী অপবাধ বলে গণ্য হল; অন্যদিকে ইউবোপীয নীলকবেদেব উপবে মফঃস্বলেব দেওযানী বা ফৌজদাবী আদালতেব কোন এক্তিয়াবই নীল চাষ ও নীল উৎপাদনেব প্রথম থেকেই প্রযুক্ত হল না। কিন্তু এই সকল অনুকূল পবিস্থিতিব জন্য নীলেব যে অপ্রতিহত অগ্রগতি বাংলাব অর্থব্যবস্থায় শুরু হযেছিল তা ১৮৩০-১৮৩৩ সালে হঠাৎই কিছুটা থমকে দাঁড়াল। ১৮২৯-৩০ সাল থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 'হাইপথিকেশন' ব্যবস্থাব মাধ্যমে নীলকবদেব কাছ থেকে নীল নিতে শুরু কবায নীল ব্যবসাযেব উন্নতিব সম্ভাবনা আবো বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও এই সময়েই কলকাতাব এজেন্সী হাউসগুলোব পব পব পতন ঘটায় নীল ব্যবসায় নিদারুণ পুঁজিব সংকট সৃষ্টি হয়, এই ব্যবস্থা ভীষণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, বহু নীলকুঠি বন্ধ হয়ে যায়, অনেক নীল ব্যবসায়ীব নীল ব্যবসা উঠে যায়। অবশ্য অচিবেই নীল শিল্প তাব এই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সক্ষমও হয।[৪]

বাংলা দেশে নীলচাষেব ইতিহাসে এক নতুন যুগেব সূচনা হয়েছিল ১৮৩০ সাল নাগাদ।

এজেন্সি হাউসগুলোব পতনেব ফলে নীল ব্যবস্থা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলেও ১৮২৯ সালে প্রবর্তিত "হাইপোথিকেশন" ব্যবস্থা এবং ঐ সালেই গঠিত "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" নীল ব্যবসায়েব সংকটমোচনে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নতুন পর্বেব সূচনায় যে ব্যাপাবটি আবো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল তা হচ্ছে ১৮৩৩ সালেব চার্টাব আইন প্রবর্তন। এই আইনেব ফলেই ইউবোপীয় বৃটিশ প্রজাদেব ভাবতে বসবাস কবা, জমি কেনা ও অবাধ বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে সকল বাধা দূব হয়ে গেল। বহু ইউবোপীয় নীল উৎপাদানেব জন্য বাংলা দেশে আসতে শুরু কবল। এজেন্সি হাউসগুলোব জায়গায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এগিয়ে এল নীলেব ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ কবতে, কোনও কোনও দেশী জমিদাব এবং নবাগত বিদেশী বণিকেবাও কিছু কিছু পুঁজিব যোগান দিতে থাকল। হাইপোথিকেশেন ব্যবস্থা বৃটেনে নীল বাজাবজাত কবা ও বৃটেনে অর্থ স্থানান্তবেব ব্যাপাবটিকে সহজ কবে তুলল। নীলকবেবা জমিদাবী, পত্তনি বা বায়তী জোত কিনে কুঠি এলাকাব বাইবে নীলেব চাষ ছড়িয়ে দিতে লাগল। বিশেষত নিজ আবাদে নীল চাষেব প্রসাব ঘটায় এই চাষ যে বেশ লাভজনক হতে পাবে তা এই পর্বে কিছুটা প্রমানিত হল। ১৮৩৪ থেকে ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ও আমেবিকায় নীলেব চাহিদা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় এবং নবার্জিত জমিব মালিকানাব মাধ্যমে নীলকবদেব পক্ষে বলপ্রয়োগেব সাহায্যে কমখবচে নীল তৈবীব সামর্থ্য আগেব তুলনায় অনেক বেড়ে যাওয়ায় নীল ব্যবসা পূর্বাপেক্ষা লাভজনক হয়ে উঠল। ফলে নীলকবদেব সংখ্যা এবং কাজকর্মও বৃদ্ধি পেতে থাকল। আবো কিছু কাবণে এই পর্বে নীলকবদেব দাপট ভীষণভাবে বেড়ে যেতে পেবেছিল। ১৮৪১ ও ১৮৪৫ সালে বচিত নতুন বিক্রয় আইন দুটিতে (Sale Laws) নীলকবদেব স্বার্থ সংবক্ষণেব জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ১৮৩৩ সালেব পূর্বে ইউবোপীয় নীলকবদেব সঙ্গে ইউবোপীয় সবকাবী কর্মচাবীদেব অলিখিত বিবোধ ছিল মূলত এদেশে প্রবেশ ও বসবাসেব নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র কবে; এছাড়া নীলকবদেব নিজেদেব মধ্যেও বিবাদ বিসম্বাদ লেগেই থাকত একই অঞ্চলে নীলকুঠি তৈবী কবাব নানা সমস্যা নিয়ে। ১৮৩৩ সালেব পব থেকে এই সমস্যাদুটি না থাকায় একদিকে যেমন নীলকবদেব নিজেদেব মধ্যেব সংহতি বৃদ্ধি পেল, অন্যদিকে ইউবোপীয় সবকাবী কর্মচাবীদেব সঙ্গে তাদেব সম্পর্কও অনেক ঘনিষ্ঠতব হয়ে উঠল। এই দুইয়েব ফলেই মফঃস্বল বাংলায় নীলকবদেব দোর্দন্ডপ্রতাপেব বাজত্ব শুরু হল। কলকাতায় ১৮৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্স" নীল ব্যবসায়ীদেব স্বার্থবক্ষায় সচেষ্ট হল, নীলকবদেব স্বার্থবক্ষাব জন্য ১৮৪১ সালে গঠিত হল "ইন্ডিগো প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন" এবং ১৮৪২ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু কবল "দি প্ল্যান্টার্স জানার্ল"। এইভাবে সুসংগঠিত হওয়াব ফলে নীলকবদেব মধ্যে এবং সাধাবণভাবে বাংলায় বসবাসকাবী ইউবোপীয়দেব মধ্যে যে শক্তি, আত্মবিশ্বাস ও জাতিদম্ভ সৃষ্টি হল তা প্রকাশ পেল দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র কবে। ১৮৩৩ সালেব চার্টাব আইনেব শর্তানুসাবে ১৮৩৭ সালে দেওয়ানী বিচাবেব ক্ষেত্রে এবং ১৭৪৯ সালে ফৌজদাবী বিচাবেব ক্ষেত্রে ইউবোপীয়দেব মফঃস্বল আদালতেই, কলকাতাব সুপ্রীম কোর্টে নয়, বিচাবযোগ্য কবে তোলাব প্রচেষ্টা হল। এই প্রচেষ্টাব বিরুদ্ধে ইউবোপীয়বা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি কবে ১৮৩৭ সালেব আইন বচনা ঠেকাতে না পাবলেও ১৮৪৯ সালেব ফৌজদাবী বিচাব সম্পর্কিত আইনটিকে পাশ কবতে দিল না। ফলে গ্রামাঞ্চলে নীলকবেবা ফৌজদাবী অপবাধেব ক্ষেত্রে পূর্বেব মতই কার্যত আদালতেব এক্তিয়াবেব বাইবেই থেকে গেল এবং তাদেব অত্যাচাব ও শোষণেব ব্যবস্থাকে আবো জোবদাব কবে তোলাব

মনোবল পেল। উপরের আইন দুটি উপলক্ষে ইউরোপীয়রা যে প্রবল জাতিদম্ভী আন্দোলন শুরু করেছিল তার প্রতিক্রিয়াতেই যে সকল ভারতীয় জমিদারী, ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং ইত্যাদিতে ইউরোপীয়দের সহযোগী ছিলেন তাঁরাও তাদের কাছ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যেই দূরে সরে এলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য পর্বে নীল হয়ে উঠল বাংলার প্রধান রপ্তানী পণ্য এবং প্রধান বাণিজ্যিক ফসল (Cash crop) । এক কথায় ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ সাল ছিল বাংলায় নীলকর প্রাধান্যের, নীলকর শোষণ আর শাসনের, নীল চাষ আর নীল শিল্পের সুবর্ণযুগ।[৫]

বাংলার নীল ব্যবস্থায় সংকটের শুরু হয় ১৮৫০ সাল থেকে এবং এই সংকট চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ১৮৬০ সালের নীল বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে। এই সংকটের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৮৪৭ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর থেকে নীলকররা পুঁজির অভাবের মধ্যে পড়েছিল এবং বৃটিশ পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে নীলকরেরা পুঁজির ব্যবহারে মিতব্যয়ী হয়ে উঠতে থাকল, চাষীদের কম দাদন দিয়ে পুরানো পাওনা আদায়ে তৎপর হল। নিজ আবাদে ব্যয় সাপেক্ষ নীল চাষ বাদ দিয়ে কম ব্যয়সাধ্য রায়তী আবাদে তারা আরো বেশী করে' ঝুঁকে পড়তে থাকল। অন্যদিকে আবার এই সময়েই নীলের রপ্তানী ক্রমশ কমে যেতে থাকায় লাভের হার কমে যাওয়ারও সম্ভাবনা দেখা দিল ; নীলকরেরা এই অবস্থায় ক্রমশ আরো বেশী জোর জবরদস্তির সাহায্যে নীল তৈরী করার চেষ্টা করতে থাকল। মোটকথা নীলকরেরা কৃষকদের জমি ও শ্রমের জন্য যত কম সম্ভব মূল্য দিয়ে নীলচাষের চেষ্টাকে জোরদার করে তুলল। পাশাপাশি নীল চাষীদের দিক থেকেও নীল চাষে অনিচ্ছা ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকল মূলত অর্থনৈতিক কারণে।[৬] পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকেই দ্রব্যমূল্য দু' আড়াই গুণ বেড়ে যাওয়ায় কৃষি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং চাষীদের কাছে যথেষ্ট লাভজনক অন্য ফসল চাষের আগ্রহ হয়ে উঠে দুর্নিবার। কিন্তু কোনই পরিবর্তন হয় না নীলচাষের এক টাকা/দু'টাকা হারে। "এবং চাষীরা একেবারে খোলাখুলি বিদ্রোহ না করা পর্যন্ত নীলকরেরা নীলগাছের দাম বাড়াবার কথা একদিনের জন্যও চিন্তা করেনি।" চাষীদের অসন্তোষের পুষ্টিতে কাজ করেছিল আরো কতক গুলি প্রভাবও : নীল ছাড়া অন্য অর্থকারী ফসলের চাষ ও মহাজনিকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের সঙ্গে নীলকরদের ক্রমবর্ধমান বিরোধ এবং চাষীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান এই বিশ্বাস যে নীলকরদের কাজকর্মের প্রতি সরকারের সমর্থন নেই। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের ওহাবি ও ফারাজি আন্দোলন, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সম্মিলিত প্রভাবের ফলে নীলচাষীদের চেতনা বৃদ্ধি ঘটেছিল এবং তার ফলেই ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহ ঘট্তে পেরেছিল।[৭]

১৮৩০-৩৩ সালে এজেন্সী হাউসগুলোর এবং ১৮৪৭ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের ফলে নীলকুঠিগুলোর পুঁজির উৎস সাময়িকভাবে শুকিয়ে গেলেও এবং কুঠিগুলোর সাময়িক বিপর্যয় ঘট্লেও বাংলাদেশে নীল চাষ নীল বিদ্রোহের বছর ১৮৬০ সাল পর্যন্ত বেড়েই চলেছিল। নীল বিদ্রোহ সুনিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্পের এক প্রধান ধারা হিসাবে নীলচাষের দ্রুত পতন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। নীলবিদ্রোহের ফলে নীলচাষ বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে উঠে গেল না, তবে বলপ্রয়োগের সাহায্যে নীলচাষ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, নীলচাষ রায়তদের স্বেচ্ছাধীন হয়ে উঠল। কৃত্রিম নীল বাজারে আসতে থাকায় ১৮৯০ সালের পরে বাংলাদেশ

থেকে ধীরে ধীরে নীল চাষ উঠে গেল। অন্যদিকে বাংলাদেশের নীলকুঠিগুলোতে যে বৃটিশ পুঁজি খাটছিল ১৮৪৭ সালের পর থেকে সে পুঁজি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিহারে নীলচাষের ক্রমপ্রসারের পথ প্রশস্ত করা হল। অবশ্য ১৮৯০ সালের পর থেকে কৃত্রিম নীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিহারেও নীল চাষ ও নীল শিল্পের ক্রমাবণতি ঘটতে থাকে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বিহারের নীলকরেরা পুনরায় নীলচাষকে জোরদার করার ও নীলের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিলে গান্ধীজির নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের চম্পারণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে বিহার থেকেও নীল ব্যবস্থাব বিলুপ্তি ঘটে। একই সময়ে বাংলাদেশেও নীল চাষ পুনঃ প্রবর্তনের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। বাংলা দেশে নীল কাহিনীর এই প্রেক্ষাপটটি মনে রেখে মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।[৮]

॥ দুই ॥

বাংলাদেশে নীলকাহিনীর রূপরেখা জানার পব আমরা মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল চাষ ও নীল বিক্ষোভ সম্পর্কে মনোযোগ দিতে পাবি। কিন্তু বিশেষভাবে মুর্শিদাবাদ জেলাকে এই জন্য কেন আমরা বেছে নেব? মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল চাষ ও নীল বিক্ষোভ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ পৃথকভাবে যথেষ্ট মনোযোগ দেননি। কিন্তু অন্তত পাঁচটি কারণে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিৎ।

প্রথমত নীল চাষকে কেন্দ্র কবে উনিশ শতকের সুবিখ্যাত গণ-অসন্তোষ ও বিদ্রোহে মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে নীল বিক্ষোভ যশোর ও নদীয়া জেলার পর মুর্শিদাবাদ জেলাতেই সবচাইতে ব্যাপক ও জঙ্গী রূপ নিয়েছিল, অথচ ব্যাপারটি অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে। তা ছাড়া মুর্শিদাবাদের নীল-বিক্ষোভ শুধু মাত্র এই জেলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এর ঢেউ গঙ্গা পেরিয়ে মালদহ জেলাতেও গিয়ে পৌঁচেছিল। দ্বিতীয়ত মুর্শিদাবাদের নীল-বিক্ষোভের উপর একাদিক্রমে ওহাবি-ফারাজি আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ভারতীয় মহাবিদ্রোহের তিনটি ধারার গণ-বিক্ষোভের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়েছিল। এইসব ঐতিহাসিক প্রভাবের ফলে মুর্শিদাবাদের নীল-বিক্ষোভের সহিংস হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অন্যান্য জেলার তুলনায় ছিল অনেক বেশী, অথচ এই বিক্ষোভ সহিংস হয়ে ওঠেনি। উল্লেখযোগ্য নীল জেলাগুলির মধ্যেও মুর্শিদাবাদের নীল-বিক্ষোভের এই অনন্যতা বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। তৃতীয়ত পূর্বে থেকেই 'রেশম জেলা' হিসাবে দেশে বিদেশে সুখ্যাত মুর্শিদাবাদ জেলায় অর্থকবী তুঁত চাষের পাশাপাশি অর্থকরী নীলচাষের প্রবর্তন ও প্রসার কি ধরণের অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা দেখা দরকার। কারণ, কৃষির বাণিজ্যিকরণের এই সমস্যা মুর্শিদাবাদের মত এত তীব্রভাবে অন্য কোনও জেলায় দেখা যায়নি। চতুর্থত, মুর্শিদাবাদে নীল চাষের সঙ্গে এর কিছু স্থানীয় ভৌগোলিক ও প্রকৃতি-সৃষ্ট সমস্যার যে ধরণের সম্পর্ক ঘটেছিল তার ফলে মুর্শিদাবাদের পরবর্তীকালের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের উপর এক সুদূরপ্রসারী, গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়েছিল ; আর এ-প্রভাব এ-জেলার মানুষের দুঃখকষ্টকে বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণে। এ-দিকটির প্রতিও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। পঞ্চমত ইতিহাসখ্যাত নীলবিদ্রোহের পরবর্তীকালেও—এই বিংশ শতাব্দীতেও— এ-জেলায় নীলচাষ পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টাকে কেন্দ্র

করে গণ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল এবং তা ভিন্নতর রাজনৈতিক তাৎপর্য অর্জন করেছিল।

বর্তমান প্রবন্ধে মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল চাষ ও নীল বিক্ষোভ সম্পর্কে প্রধানত পরোক্ষ উৎস থেকে পাওয়া তথ্যাবলীকে একত্রে ধরে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কালানুক্রমিক উপস্থাপনা এবং কিছু কিছু কার্যকরণ বিশ্লেষণের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন তথ্যাবলীর মধ্যে কিছুটা যোগসূত্র রচনার চেষ্টা করা হলেও প্রবন্ধকারের অক্ষমতার জন্যই রচনাটি তথ্য সংগ্রহেব অতিরিক্ত কিছু হতে পারেনি।

## ।। তিন

অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে বাংলাদেশে হুগলী-হাওড়া অঞ্চলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পদ্ধতিতে নীল উৎপাদন শুরু হলেও এই পদ্ধতিতে নীল উৎপাদনেব অবস্থা মুর্শিদাবাদ জেলায় ঠিক ঐ সময়ে ছিল না।১৭৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে বিধ্বংসী "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ এবং মুর্শিদাবাদ শহরাঞ্চলের প্রায় অর্ধেক লোকের জীবনহানি ঘটানোয় জেলাঞ্চলের কৃষি ও শিল্প ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার উপরে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরের ফলে জেলাঞ্চলে একধবণের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে এখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নীল চাষ ও শিল্পে অর্থ-বিনিয়োগের সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না।[৯] অথচ পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব থেকেই এই জেলায় বিখ্যাত নদী-বন্দর ভগবানগোলা উত্তব ভারতীয় দেশী নীলের এক বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এমনকি জানা যাচ্ছে আলোচ্য সময়েও ১৭৭৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে উত্তর ভারতীয় নীল সরবরাহ করেছেন কাশিমবাজারের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী কৃষ্ণকান্ত নন্দী।[১০] ১৭৭৯ থেকে ১৭৮৭ সালের মধ্যে কোম্পানী যখন ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নীল সরবরাহের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল তখনও এই জেলায় নীল চাষ ও নীল শিল্পের প্রসারের কোনও প্রমাণ মিলছে না।[১১] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার নীল চাষ ও নীল শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য ১৭৮৮ সাল থেকে যে নতুন নীতি অনুসরণ করতে শুরু করে তার ফলেই জেলাঞ্চলের অর্থনীতিতে নীলের অনুপ্রবেশ ঘটে। অবশ্য এই অনুপ্রবেশ সম্ভব হয় এখানকার অর্থনীতিতে দীর্ঘ দিন ধরে গুরুত্বের জায়গায় থাকা তুঁত চাষ ও রেশম শিল্পের তৎকালীন অবস্থার ফলেই।

পলাশী যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ক্ষমতার সুবাদে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মুর্শিদাবাদ জেলায় সচেতনভাবে রেশমী বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস সাধন করে কাঁচা রেশমের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির নীতি অনুসরণ করতে থাকে। ১৭৭২ সাল থেকে ইতালিয়ান "ফিলেচার" পদ্ধতিতে কাঁচা রেশমের মান উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা চললেও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলাফল এ-ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। আশীর দশক থেকে মুর্শিদাবাদের অর্থনীতি দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি অতিক্রমের চেষ্টা শুরু করলেও সমকালে কাঁচা বেশমের আন্তর্জাতিক চাহিদা-বৃদ্ধি বেশ কিছু দিনের জন্য থমকে থেমে গেল আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের যুদ্ধের ফলে। এ-সবের জন্য এ-জেলায় তুঁত চাষের পরিমাণও বৃদ্ধি পেল না। সর্বোপরি রেশম ব্যবসায়ে দেখা দিল মন্দা। মোটামুটিভাব ১৭৮৫ থেকে ১৮১৫ সাল পর্যন্ত রেশম ব্যবসা ও শিল্পে এই অবস্থা বিদ্যমান থাকায় ব্যক্তিগত উদ্যোগীরা অনেকে তুঁত চাষ ও রেশম

শিল্প থেকে নীল চাষ ও নীল শিল্পের দিকে ঝুঁকলেন, নতুন উদ্যোগীরাও কোম্পানী-সরকার প্রদত্ত সুবিধাদির সুযোগে নীলের দিকে ঝুঁকতে থাকলেন।[১২]

প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যাচ্ছে যে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে (১৭৮৬-১৭৯৩) গভর্ণর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের অনুমতিক্রমে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম নীলকুঠিটি গড়ে উঠেছিল।[১৩] ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী উইলিয়াম পোপ মেসার্স ল্যামবার্ট অ্যান্ড রসের কাছ থেকে মুর্শিদাবাদ শহরের নিকটেই রাজসাহী জমিদারীর মধ্যে মহম্মদপুর গ্রামে একখন্ড জমি ও রেশমকুঠি কেনেন এবং এইখানেই নীলকুঠি নির্ম্মান করেন। সে সময়ে মুর্শিদাবাদ শহর দক্ষিণে ভাগিরথীর পূর্বপাড়ে বহরমপুর এবং পশ্চিমপাড়ে বারাবঘাট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মহম্মদপুর গ্রামটি কাশিমবাজার ও বহরমপুর দুই জায়গা থেকেই প্রায় তিন মাইল এবং কালিকাপুর ডাচ কুটি থেকে আরো কিছুটা বেশী দূরে অবস্থিত ছিল। তাঁর কুঠির মজুরেরা যাতে খুব সকালে কাজে আসতে পারে এবং এর ফলে কোন অসুবিধায় না পড়ে সে জন্য পোপ বোর্ড-অফ-রেভেনিউ-এর কাছে আবেদন করেছিলেন নিজের জায়গায় একটি বাজার স্থাপনের অনুমতি চেয়ে এবং এই অনুমতি মিলেওছিল। মহম্মদপুর ছাড়াও পোপ ১৭৮৯ সালেই জেম্‌স্ ইংলিশ কেইলীর কাছ থেকে কাশিমবাজারের দু' মাইল দূরে রাজসাহী জমিদারীর মধ্যে তারোপুর বা তারাকপুরে আরো একটি রেশম কুঠি কেনেন যেখানে পরে একটি নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল।[১৪] এই তারাকপুর নীলকুঠিই পরবর্তী সময়ে বাবুলবোনা কুঠি নামে পরিচিত হয়েছিল (বর্তমানে এখানেই বোর্স্টাল জেল)। পোপের নীলকুঠি তৈরীর অল্পদিন পরেই ১৭৯৩ সালের ১২ই মে কাশিমবাজারে কোম্পানীর কুঠির সমাধিস্থলে ইন্‌সপেক্টর অফ্ ইন্ডিগো মি. লায়ন প্রেজার সমাধিস্থ হয়েছিলেন। অনুমান করা যায় যে ১৭৮৮ সালের নতুন নীতি অনুসারে আগাম মাধ্যমে এ-জেলাতেও কোম্পানী নীল উৎপাদনে উৎসাহ যোগাতে শুরু করেছিল।[১৫] মুর্শিদাবাদ জেলায় পরবর্তী নীলকুঠির খবর পাওয়া যায় ১৭৯৫ সালে। ঐ বৎসর বোর্ড-অফ-রেভেনিউ কাশিমবাজারের মিঃ জে. ব্রাউনকে নীলকুঠি তৈরীর জন্য পাটকাবাড়িতে ৫০ বিঘা এবং নারায়ণপুরে ২০ বিঘা জমি কেনা বা বন্দোবস্ত নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার তৃতীয় নীলকুঠিটির খবর পাওয়া যায় দৌল্‌তেবাজার ও ছয়ঘড়ির কাছে হাজিডাঙ্গা গ্রামে।[১৬] স্যামুয়েল ব্ল্যাকবার্ণ সম্ভবত ১৭৯৭-৯৮ সালে এই কুঠি নির্ম্মান করেন। ঐ সময়েই গঙ্গার ধারে ডঃ বার্ণেট নির্ম্মিত একটি নীলকুঠিরও খবর পাওয়া যায়। ১৮০১ সালে আরো দুটি নীলকুঠি সম্পর্কে জানা যাচ্ছে— একটির মালিক চাস হ্যাম্পটন এবং অন্যটির মালিক জি. বিট্‌সো।[১৭] হ্যাম্পটনের কুঠি এলাকা দাদপুর থেকে দক্ষিণে পলাশীর দিকে প্রসারিত ছিল ; আর হ্যাম্পটনের কুঠির উত্তরে সুজাপুরে ছিল বিট্‌সোর কুঠি। প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য থেকে মনে করার কারণ আছে যে বিট্‌সো ১৭৯০ সাল নাগাদই তাঁর কুঠি তৈরী করেছিলেন। উপরে আলোচিত কুঠিগুলি কাশিমবাজার-বহরমপুরের পূর্বে বা দক্ষিণে এ-জেলার বাগড়ি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। প্রসঙ্গত বাগড়ি অঞ্চলের আর একটি নীলকুঠির কথাও বলা দরকার। দাবী করা হয়েছে যে মুর্শিদাবাদ জেলায় "১৭৭৫ হতে ১৭৮০ সালের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ডোমকলে প্রথম নীলচাষ শুরু হয়।" এই দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব ; তাছাড়া নীল চাষ সম্পর্কে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় না এই তথ্য সঠিক। তবে আঠারো শতকের শেষ দশকে ডোমকল কুঠির প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা মেনে নেওয়া যায়।[১৮] প্রায় একই সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরপশ্চিমে নীল চাষ

ও নীল শিল্পেব প্রবতর্ন কবেন মি. হেনবী মাসেইক।[১৯] সম্ভবত ডাচ বংশোদ্ভূত এই ব্যক্তি ১৭৯০ সাল নাগাদ কোনও সময়ে এ জেলাব জঙ্গীপুবে এসে একটি ছোট নীলকুঠি তৈবী কবেছিলেন এবং কযেক বছবেব মধ্যেই তাঁব কুঠিব সংখ্যা দাঁড়িযেছিল ২৫টি। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দেব কিছু পবে মি. মাসেইক বংশধবদেব দাযিত্ব দিয়ে ২৫ লাখ টাকাব সঞ্চয নিযে অবসব গ্রহণ কবেন। মুর্শিদাবাদ জেলাব নীল চাষ ও নীল বিক্ষোভেব ইতিহাসে মি. মাসেইক বংশধবদেব কুঠিগুলিব দেখা পবে বাববাব মিল্‌বে। মুর্শিদাবাদেব বাঢ় অঞ্চলে পববর্তীকালেব বিখ্যাত বামনগব কুঠিও আঠাবো শতকেব শেষ বছবগুলিব কোনও সময়ে প্রতিষ্ঠিত হযেছিল ১৪০০০ বিঘা নিজ আবাদেব জমি নিযে পলাশীব উল্টোদিকে গঙ্গাব পশ্চিমপাড়ে ; পবে ১৮২৮ সাল নাগাদ ডব্লিই জি. বোজ এখানকাব কুঠিযাল হন।[২০]

মুর্শিদাবাদ জেলাব নানা প্রান্তে প্রধানত গ্রামাঞ্চলে ইউবোপীয নীল কুঠিযালবা এইভাবে নীল তৈবীব জন্য ছড়িযে পডাবও প্রায এক দশক পূর্বে থেকেই জেলাব নীল-ব্যবসাও ইউবোপীযদেব হাতে চলে গিযেছিল, কোম্পানী ইউবোপীয ব্যবসাযীদেব সঙ্গে নীল সবববাহেব চুক্তি কবাব সময থেকেই। জেলায নীল উৎপাদন শুরু হওযাব পবও দেখা যাচ্ছে ইউবোপীয নীল-ব্যবসাযীবা পূর্বেব মতই সক্রিয। পিযেক ও গুইনান্দ এবং পিযেক ও পলিং যে নীল-ব্যবসাযেব সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন তাই নয, সম্ভবত উত্তব-পশ্চিম মুর্শিদাবাদেব নীল-কুঠিযাল মাসেইক পবিবাবেব সঙ্গেও তাঁদেব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলাব নীল-ব্যবসাযেব উপব এই ইউবোপীয নিযন্ত্রণ বাংলাদেশ থেকে নীল-শিল্প বিহাবে স্থানান্তবেব পবও উনিশ শতকেব শেষ দশকগুলিতেও অব্যাহত ছিল, ভগবানগোলা তখনও পর্যন্ত বিহাবী নীলেব এক প্রধান বাজাব ছিল[২১]।

মুর্শিদাবাদ জেলায নীলেব প্রসাবেব এই প্রথম পর্বে যে-সব তথ্য পাওযা যাচ্ছে তাতে নীলকুঠিব সংখ্যা, নীল আবাদেব অধীন জমিব পবিমাণ, নীল চাষেব পদ্ধতি, নীল থেকে লাভেব পবিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তাবিত তথ্য পাওযা যায না। কোন নীলকবেব পক্ষে সে সময়ে ৫০ বিঘাব বেশী জমি বন্দোবস্ত নেওযা সম্ভব ছিল না ; ফলে অনেক সময নীলকবেবা কুঠিব কর্মচাবীদেব বেনামীতে জমি কিনত বা বন্দোবস্ত নিত। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে ব্ল্যাকবার্ণ সাহেব বলেছেন তাঁব ৩৫০০ বিঘাব চাষ ছিল, অথবা বিট্‌সো সাহেব জানাচ্ছেন তাঁব কযেক হাজাব টাকাব নীলেব গাছ বন্যায নষ্ট হয়েছে, তখন সহজেই অনুমান কবা যায এই প্রথম পর্য্যায থেকেই মুর্শিদাবাদে নীল চাষ নিজ আবাদ পদ্ধতিব চাইতে শোষণমূলক বাযতী আবাদ পদ্ধতিব উপবই প্রধানত নির্ভবশীল হযে উঠেছিল। মি. মাসেইক অল্প কযেক বছবেব মধ্যেই নীল উৎপাদন থেকে ২৫ লাখ টাকা লাভ কবায সহজেই বোঝা যায যে এই প্রথম পর্বেও নীল তৈবী কী বকম লাভজনক ছিল।

মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল প্রসাবেব এই প্রাথমিক পর্বে এ-জেলাব বাগড়ি অঞ্চলেব একটি প্রকৃতি-সৃষ্ট বাৎসবিক সমস্যাব ক্ষেত্রে নীলকুঠিগুলি যে ভূমিকা গ্রহণ কবেছিল মুর্শিদাবাদেব পববর্তীকালেব ইতিহাসে তাব সুদূবপ্রসাবী প্রভাব পড়েছিল। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে বহবমপুবকে সৈনাবাস শহব হিসাবে গড়ে তোলাব চেষ্টা শুরু হওযাব পব থেকেই মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজাব বহবমপুব অঞ্চলে সবকাবী ইন্‌জিনীয়াববা ভাগিবথীব গতিপথ এবং বন্যা প্রতিবোধ নিয়ে নানা বকম পবীক্ষা-নিবীক্ষা শুরু কবেন।[২২] মুর্শিদাবাদ এবং পার্শ্ববর্তী নদীয়া ও যশোব জেলায আঠেবো শতকেব শেষ দুই দশকে নীলচাষ ও নীলকুঠিব প্রসাব ঘটায় বন্যা প্রতিবোধেব

ব্যবস্থাবলীকে আবো বিস্তৃত ও জোবদাব কবাব দাবী নীলকবদেব দিক থেকে উঠতে থাকে। খাল বিল নদী নালায ছেযে থাকা মুর্শিদাবাদেব বাগড়ি অঞ্চলে প্রতি বছব বর্ষাব সমযে যে বন্যা আসত এবং যাব জলস্রোত অনেক সময মুর্শিদাবাদ ছাড়িযে নদীযা ও যশোব জেলাতে গিযেও পৌঁছাত তাব ফলে এ অঞ্চলেব নীলকুঠিগুলিকে প্রতি বছবই প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত। এই এলাকায বন্যা প্রতিবোধেব জন্য যে অসংখ্য ছোট বড বাঁধ বা পুল ছিল সেগুলিব বক্ষণাবেক্ষণেব দাযিত্ব নবাবী আমল থেকেই ন্যস্ত ছিল জমিদাবদেব উপব। কিন্তু জমিদাবেবা কখনই ঠিকমত বাঁধ মেবামতি কবতেন না। ফলে এই সব জমিদাবী বাঁধ ভেঙে নানা অঞ্চলে প্লাবন দেখা দিত। কোম্পানীব কাছ থেকে অগ্রিম পাওযা যে বিপুল অর্থ নীলকবেবা স্থাযি পুঁজি হিসাবে বিনিযোগ কবতে বাধ্য হতেন তাতে বন্যায ক্ষতিগ্রস্ত হযে তাঁদেব নীল ফসল নষ্ট হযে গেলে নীল ব্যবসা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওযাব সম্ভাবনা ছিল। ফলে নীলকবদেব বোর্ড-অফ-বেভেনিউ-এব কাছে আবেদন বাখতে হত যাতে সবকাব এইসব বাঁধ বা পুল যথোপযুক্তভাবে মেবামত কবে বা এগুলি উঁচু কবা বা বড কবাব দাযিত্ব জমিদাবদেব হাত থেকে নিজ হাতে তুলে নেয।[২৩] এই সব আবেদনেব ফলে বোর্ড-অফ-বেভেনিউ-এব নির্দেশে মুর্শিদাবাদেব জেলাশাসকেবা বাঁধ ও পুল মেবামতিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ কবতে শুরু কবেন। বিশেষভাবে নদীযা ও যশোব জেলাতেও বন্যা প্রতিবোধেব জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায বাঁধ-নির্মাণ অবশ্য প্রযোজনীয বলে বিবেচিত হওযায এক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদেব জেলাশাসক ও নীলকবদেব ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ হযে ওঠে। ১৭৮৬ সালে বোর্ড-অফ-বেভেনিউ গঠিত হওযাব পব থেকেই মুর্শিদাবাদেব জেলা শাসক বা সমাহর্তা থেকে স্বাধীন এবং বোর্ড-অফ-বেভেনিউ-এব নিকট সবাসবিভাবে দাযিত্বশীল যে সুপাবিনটেনডেন্ট-অফ-এমব্যাঙ্কমেন্টস মুর্শিদাবাদে বাঁধ গুলিব দেখাশোনা কবতেন ১৮০০ সালে বোর্ড-অফ-বেভেনিউ জেলা-শাসক ও সমার্হতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে বাঁধ মেবামতেব জন্য তাঁকে টাকা মঞ্জুব কবা হয এবং জমিদাবদেব জমি বিক্রী কবে আগেব বছবেব বাঁধ মেবামতিব খবচ উশুল কবা হয।[২৪] মূলত নীলকবদেব চাপে এবং তাদেব স্বার্থবক্ষাব তাগিদেই এবং পবোক্ষভাবে নিজেদেব লগ্নী অর্থ বক্ষাব জন্যই যে কোম্পানী সবকাব আঠেবো শতকেব শেষ দশক থেকে উনিশ শতকেব প্রথম দুই দশক এ-জেলাব বাগডি অঞ্চলে ব্যাপক বাঁধ নির্মান কাজ চালায এ-বিষযে সন্দেহেব অবকাশ কম। শুধু মুর্শিদাবাদ জেলাতেই নয, পাশ্ববর্তী বীবভূম জেলাতেও ঐ সমযে দেখা যায যে যেখানেই ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব পুঁজি বিনিযোগ কবা হযেছে সেখানেই সবকাব বাঁধ তৈবী ও মেবামতিতে অংশ নিযেছে এবং এ-ব্যাপাবে নীলকবদেবও উৎসাহিত কবেছে; জমিদাব এবং বাযত উভয পক্ষই অভিযোগ কবেছে যে কেবলমাত্র যেখানে নীল চাষ হযেছে সেখানেই সবকাব বাঁধেব বক্ষণাবেক্ষণে আগ্রহী হযেছে।[২৫] জঙ্গিপুবেব নিকটে কুলগাছি থেকে ভাগীবথীব পূর্ব তীবে দক্ষিণে পলাশী পর্যন্ত এবং দক্ষিণ-পূর্বে ভগবানগোলা-দাদামাটি পর্যন্ত বাঁধপুল ব্যবস্থা সুদৃঢ় কবাব মধ্যেই মুর্শিদাবাদ, নদীযা ও যশোব এই তিন নীল জেলাব বন্যাব হাত থেকে নিবাপত্তা সুনিশ্চিত কবা সম্ভব ছিল[২৬] কিন্তু এব ফলে এ অঞ্চলেব স্বাভাবিক নদী-ব্যবস্থা তথা বহির্গমন ব্যবস্থা (river system and natural system of drainage) বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এব ভযাবহ ফলাফল মুর্শিদাবাদেব সমগ্র বাগড়ী অঞ্চলকে গোটা উনিশ শতক এবং বিশ শতকেবও প্রায় তিন দশক ধবে ভুগতে হয়েছিল। নদীয়া এবং যশোব জেলাকেও এই দুর্ভোগেব মধ্যে দিয়ে যেতে হযেছিল। এ অঞ্চলে *"The deterioration in the river system is a primary cause of unhealthiness and of economic poverty"*।[২৭] এই সিদ্ধান্তকেই

অধ্যাপক বাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁব Changing Face of Bengal বইতে প্রচুব তথ্য ও যুক্তি দিযে প্রতিষ্ঠা কবে দেখিযেছেন যে এ জেলাব বাগড়ী অঞ্চলে জমিব উর্ববতা হ্রাস, কৃষিব অবনতি, জঙ্গলেব বিস্তাব, এঁদো পচা জলাশযগুলোব উদ্ভব, বর্দ্ধমান জ্বব ও ম্যালেবিযাব প্রসাব এবং লোকসংখ্যা হ্রাস প্রাকৃতিক নদী-ব্যবস্থাব মনুষ্যকৃত বিনষ্টীব ফল।[২৮] ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব সমর্থন ও সাহায্যপুষ্ট নীলকবদেব স্বার্থবক্ষাব জন্য গৃহীত দূবদৃষ্টিহীন সবকাবী পদক্ষেপ যে পববর্তীকালে মুর্শিদাবাদেব তথা মধ্যবঙ্গেব অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদতাব অন্যতম প্রধান কাবণ তা মনে বাখা দবকাব। মুর্শিদাবাদে নীলপ্রসাবেব প্রথম পর্ব থেকেই মুর্শিদাবাদেব এই গভীবতব সর্বনাশেব শুরু হযেছিল।

শুধু সর্বনাশই নয, মুর্শিদাবাদ জেলায নীল চাষ ও নীলশিল্পেব প্রসাব গ্রামাঞ্চলেব জীবন-প্রবাহে যে-সকল দৃশ্যমান পবিবর্তন ঘটিযেছিল সেগুলিব ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয। প্রথমত ছিযাত্তবে মন্বন্তবে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মুর্শিদাবাদ জেলাব বিস্তীর্ণ অঞ্চল লোকসংখ্যা হ্রাস ও চাষবাস উঠে যাওযাব ফলে জঙ্গলে ছেযে গেছিল। নীলকবেবাই জেলাব বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গল হাসিল কবে তাদেব কুঠি স্থাপন কবে এবং অনেক নতুন বসতি গড়ে তোলে। জেলাব অর্থনৈতিক পুনরুত্থানে নীলকবেবা অবশ্যই কিছু পবোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ কবে। দ্বিতীযত, প্রাযশই সপবিবাবে নীলকুঠিতে বসবাসেব প্রযোজনে নীলকবেবা এ-জেলাব গ্রামীণ গৃহ-স্থাপত্যে উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন নিযে আসতে থাকে। এদেশে সমাগত ইউবোপীয গৃহ-স্থাপত্যেব নানা ধাবা এইভাবেই গ্রামাঞ্চলে গিযে পৌঁছায এবং পববর্তীকালে গ্রামেব জমিদাব-জোতদাববে প্রভাবিত কবে। তৃতীযত, পশ্চিম ভাবতীয দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসাবে নীল উৎপাদন কবতে গিযে নীলকবেবা নানা ধবণেব নতুন প্রযুক্তি জেলাব গ্রামাঞ্চলে আমদানি কবে। ইতিপূর্বে 'ফিলেচাব' পদ্ধতিতে কাঁচা বেশম উৎপাদনেব জন্য নতুন প্রযুক্তিব কিছু কিছু চল হলেও নীলকুঠিগুলিতে নীলেব 'ভ্যাট', নীলগাছ মাড়াই, নীলকুঠিব চুল্লি, চীনা পাম্প ইত্যাদিব মধ্যে দিযে অনেক ব্যাপকতব ক্ষেত্রে গ্রামেব প্রথাগত প্রযুক্তি থেকে ভিন্ন ধবণেব প্রযুক্তিব আমদানি ঘটেছিল। দুর্ভাগ্যেব বিষয এইসকল সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন প্রযুক্তি দীর্ঘদিন ধবে চালু থাকলেও জেলাব গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোনই স্থাযী প্রভাব বেখে যেতে পাবেনি। চতুর্থত, নীলকুঠিগুলি উৎপাদন সংগঠনেব ক্ষেত্রেও গ্রামাঞ্চলে এক নতুন model বা আর্দশ নিযে এসেছিল। নিজ আবাদে বা বাযতী আবাদে বিবাট এলাকায নীল চাষ কবা বা কবানো, কুঠিতে নীলগাছ এনে পেটাই ও মাড়াই, নীল উৎপাদনেব বিভিন্ন ধাপগুলিকে কার্যকবী কবা— ইত্যাদি প্রতিটি স্তবেই প্রচুব লোকজনকে সুশৃঙ্খলভাবে খাটিযে নীল উৎপাদন সুনিশ্চিত কবাব মত বৃহদাযতন কর্মকান্ড গ্রামীণ জীবনে ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধবনেব ব্যাপাব। গ্রামীণ মানসে ভযমিশ্রিত সমীহেব উদ্রেক কবলেও এই উৎপাদন সংগঠনও গ্রামেব অর্থনৈতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বেখে যেতে পাবেনি। পববর্তীকালে জেলাব জমিদাব ও বায়তেবা কিছু কিছু নীলকুঠি স্থাপন কবলেও সেগুলি কখনই ইউবোপীয নীলকুঠিগুলোব মত বৃহদাযতন হতে পাবেনি। পঞ্চমত, নীলকুঠিগুলি অনেক সমযই নদীব ধাবে বা নিকটে অবস্থিত থাকায জলপথে যোগাযোগেব উপব গুরুত্ব দিলেও জেলাব বিভিন্ন অঞ্চলে ভাল বাস্তা বা সড়কও তৈবী কবেছিল, বিশেষত জেলা সদবেব সঙ্গে গ্রামাঞ্চলেব যোগাযোগকে ঘনিষ্ঠতব কবে তুলেছিল। জেলাব ডাক-ব্যবস্থা প্রসাবেব ইতিহাসেও দেখা যায় যে বহু অঞ্চলে নীলকুঠিতেই প্রথম ডাকঘব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মোটকথা জেলাব যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থাব আধুনিকীকবণে নীলকুঠিগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। জেলাব গ্রামাঞ্চলে নীলকুঠিগুলি ছড়িয়ে পড়াব

ফলে জন সাধারণের জীবনযাত্রার সঠিক উন্নতি হয়নি ঠিকই, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের চেহারা ও চালচিত্রের অবশ্যই রূপান্তর ঘটেছিল।[২৯]

নীল চাষ ও নীলকুঠির প্রবর্তন জেলার গ্রামাঞ্চলের চালচিত্রেরই শুধু পরিবর্তন ঘটায়নি, গ্রাম-সমাজের আভ্যন্তরীণ বিন্যাসেও এনেছিল উল্লেখযোগ্য অবস্থান্তর। কর্ণওয়ালিসের আমলে জেলার চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-সৃষ্ট নব্য জমিদারতন্ত্রের উদ্ভব ও জেলার গ্রামাঞ্চলে নীলকুঠিয়ালদের পদসঞ্চার সমসাময়িক ও সমান্তরাল ঘটনা। নীল প্রবর্তনের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে নীলকরেরা আইনগতভাবে জমিদারদের অধীন হলেও কার্যত এবং বাস্তবে গ্রামজীবনে তাদের সুনিশ্চিত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। নব্য জমিদারেরা যে-সময়ে জেলার উদীয়মান শহরগুলিতে বসবাস করতে ও বাড়িঘর তৈরী করতে শুরু করেছে এবং নিজেদের জমিদারীতে ক্রমশ "অনুপস্থিত জমিদার"-এর (absentee landlords) ভূমিকা নিচ্ছে ঠিক সেই সময়েই নীলকরেরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নীলকুঠি বানিয়ে সপরিবারে সেখানে বসবাসই শুধু করছে না, গ্রামীণ উৎপাদন-ব্যবস্থায় দাপটের সঙ্গে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাও করছে। ব্যাপক সরকারী সমর্থন এবং শাসকদের স্ব-জাতি-ভুক্ত হওয়ার ফলে গ্রাম-জীবনে নীলকরদের প্রাধান্য আরো জোরদার হতে পারছে। মোটকথা নীলপর্বের শুরু থেকেই নীলকরেরা গ্রামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের শীর্ষে নিজেদের স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রামীণ জীবনে নীলকরদের এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দুই ধরনের সামাজিক ফলাফল লক্ষ্য করা গিয়েছিল : প্রথমত, মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ি এলাকার প্রধান কৃষিজীবি জাত কৈবর্তদের মধ্যে অনেকেরই নীলকুঠির কাজকর্মের সুবাদে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। তার ফলে কৈবর্ত সমাজে সচলতার সৃষ্টি হয় এবং বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে স্বতন্ত্র "মাহিষ্য" জাতিত্বের দাবী নিয়ে এই সচল অংশটি জেলার নতুন পেশাজীবি মধ্যবিত্ত সমাজে তার জায়গা করে নিতে থাকে।[৩০] দ্বিতীয়ত নীলকুঠিগুলি জেলার গ্রাম-সমাজে একটি বহিরাগত উপাদানও যোগ করে : নিজ আবাদে নীলকুঠি সংলগ্ন জমিতে নীলচাষের জন্য দরকার হত মজুর এবং 'রেশম জেলা' মুর্শিদাবাদে স্থানীয় মজুরের মজুরির হার বেশী হওয়ায় ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, মুসাহার, বহেলিয়া ইত্যাদি আদিবাসী ও অন্ত্যজ লোকেদের এনে কুঠির আশে পাশে বসতি করানো হতো। এই রকমের বসতি বা "বুনা পাড়া" মুর্শিদাবাদে অনেক নীলকুঠির কাছেই দেখা যায়।[৩১]

নীলকাহিনীর প্রথম পর্বে জমিদার ও রায়তদের সঙ্গে নীলকরদের সম্পর্ক বিষয়েও প্রাপ্ত তথ্য থেকে কিছু আলোকপাত হয়। জমিদার ও তাদের গোমস্তাদের সঙ্গে নীলকরদের সম্পর্ক এই সময়ে ছিল সুনিশ্চিতভাবেই বিরোধমূলক। মূলত জমিদারী বাঁধগুলির মেরামতিকে কেন্দ্র করেই এই বিরোধ দেখা দিত। সকল জমিদারের গোমস্তাই জমিদারেরা যথেষ্ট অর্থ না দেওয়ায় বাঁধ মেরামত করা সম্ভব হয় না এই অভিযোগ করত। কিন্তু নীলকর ও রায়তরা বাঁধগুলি মেরামত করতে গেলে তারাই আবার জমিদারের অধিকারের দোহাই দিয়ে বাধা দিত। বহু ক্ষেত্রেই এই বাধাদান সহিংস হয়ে উঠত।[৩২] কোন জমিদারের গোমস্তা আবার বাঁধ মেরামতির নামে চাপ দিয়ে নীলকরদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা করত। দেখা যায় এই সময়ে বহরমপুরের পূর্বে বা দক্ষিণে অধিকাংশ নীলকরের সঙ্গেই কাশিমবাজারের জমিদার কান্তবাবুর ছেলে রাজা লোকনাথের গোমস্তা, দারোগা ও অন্যান্য লোকজনের জমি-জায়গা বা বাঁধ মেরামতিকে কেন্দ্র করে প্রায়ই বিরোধ বাধত। অন্যদিকে আবার এ-কথা মনে করার কারণ

আছে যে মুর্শিদাবাদে নীলচাষেব এই প্রাথমিক পর্যাযে বন্যা-প্রতিবোধকে কেন্দ্র কবেই নীলকবদেব সঙ্গে বাযতদেব এক ধবনেব সু-সম্পর্ক গড়ে উঠত। যেখানে স্যামুযেল ব্ল্যাকবার্ণেব মত নীলকবেবা নিজখবচে বাঁধ মেবামত কবে ৫৬টি গ্রামেব ১০০,০০০ বিঘা জমিব ফসল বক্ষায এগিযে আসেন অথচ জমিদাবেব লোকেবা এ-ব্যাপাবে বাধাদানেব চেষ্টা কবে সেখানে বাযতদেব সঙ্গে নীলকবদেব সুসম্পর্ক গড়ে ওঠাব ভিত্তি থাকে। তাই ব্ল্যাকবার্ণ বলতে পাবেন, " I have been applied to repeatedly to carry forward petitions from very large Bodies of Ryots praying for Redress".[৩৩] কিন্তু মনে হয নীলকব ও বাযতদেব এই সুসম্পর্ক ছিল সামযিক এবং নীলকব-বিশেষেব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কেননা যেহেতু এই পর্বেও মুর্শিদাবাদে প্রধানত বাযতী পদ্ধতিতেই নীল চাষ হতে শুরু হযেছিল সেইজন্য নীলকবদেব সঙ্গে বাযতদেব বিবোধ কোন না কোনভাবে বর্তমান ছিলই। বিশেষত দুটি নীলকুঠি খুবই নিকটে থাকলে নীলকব ও তাদেব কর্মচাবীদেব সঙ্গে বাযতদেব সম্পর্ক খুবই খাবাপ হওযাব সম্ভাবনা ছিল। এ ছাড়া জঙ্গীপুবেব নীলকব মি. মাসেইকেব মত মাত্র অল্প কযেক বছবেই সেই যুগে ২৫ লাখ টাকা লাভ কবা যে বাযতদেব উপব অমানুষিক অত্যাচাব ছাড়া সম্ভব হযেছিল তা ভাবাই যায না। বিশেষত এই মাসেইক পবিবাবকেই যখন পববর্তী কালেও নীলকব হিসাবে ব্যাপক অত্যাচাবেব পবিচয বাখতে দেখা যায।

॥ চার ॥

মুর্শিদাবাদ জেলায নীল চাষ ও নীল উৎপাদনেব অগ্রগতিতে ১৮২০ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয পর্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাবা বাংলাদেশেব মতই মুর্শিদাবাদেও অনুকূল পবিস্থিতিব জন্য এই সমযে অতি দ্রুত নীল চাষ এবং নীল শিল্পেব বিস্তাব ঘটে। এই সমযে ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব আগাম দাদনেব মাধ্যমে নীল কেনা বন্ধ হলেও কলকাতাব এজেন্সি হাউসগুলোব পব পব পতন ঘটায সামযিকভাবে সাবা বাংলাব মত মুর্শিদাবাদেও নীল শিল্প সংকটেব আবর্তে পডে যায। এই পর্বেই এ জেলাব ভাগিবথীব পূর্ববর্তী বাগডী অঞ্চল ব্যাপকভাবে নীলকুঠিতে ছেযে যায। গঙ্গাব তীববর্তী উর্বব নীচু জমি ও তাব গতিপথেব চবগুলি এবং ঝিল, খাল, বিল, দাঁড়া ইত্যাদিব তীববর্তী নীচু জমি, যে-সকল জাযগায বন্যাব ফলে পলি পড়ে সে-সকল জাযগাতেই নীলকবদেব সবচাইতে উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল।[৩৪] আব এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোব জন্যই নীলকবেবা জেলাব নানাপ্রান্তে কুঠি গডে তুলল। অধিকাংশ নীলকবেবই একটি বা দুটি কুঠি ছিল; অল্পসংখ্যক নীলকবেবই কুঠিব সংখ্যা ছিল বেশী। এ ছাড়া নীলকবেবা যৌথ কোম্পানী গডে ও জেলায প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা শুরু কবেছিল। বেশম ব্যবসাযী ববার্ট ওযাটসন এন্ড কোম্পানী মুর্শিদাবাদ জেলাব দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে অনেক বড বড় নীলকুঠি তৈবী কবে জমজমাট ব্যবসা চালু কবেছিল এবং মুর্শিদাবাদ, নদীযা ও বাজসাহী জেলায় তাদেব একাধিপত্য স্থাপন কবেছিল।[৩৫] ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাব সবচাইতে বড় নীল কোম্পানী বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীব অনেকগুলি কুঠিও নদীযা ও বাবাসতেব মতই মুর্শিদাবাদ জেলাতেও ছিল। মুর্শিদাবাদেব পুবনো নীলকুঠিগুলোব ক্ষেত্রেও এই সময পবিবর্তন লক্ষ্য কবা যায। মি. মাসেইক-এব ২৫টি কুঠি-যুক্ত প্রতিষ্ঠানটি উনিশ শতকেব তৃতীয় দশকেব মধ্যেই "বড় জঙ্গীপুব" ও "ছোট জঙ্গীপুব" এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায।

কিন্তু এই ভাগ হওয়ার পরও এই দুই প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদিত নীলের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০০০/৫০০০ মণ। অবশ্য এই দুই ভাগকেই এর পরে ক্রমশ তাদের কুঠিগুলি দুটি একটি করে বন্ধ করতে হয়েছিল।[৩৬] তৃতীয় দশকের শেষ দিকে "বাংলার রেনেশাঁ"-এর অন্যতম পথিকৃৎ দ্বারকানাথ ঠাকুর যে সাতটি নীল প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন তার মধ্যে দুটি ছিল এই "মুর্শিদাবাদের বড় জঙ্গীপুর ও ছোট জঙ্গীপুরে একটি করে।"[৩৭] অর্থাৎ নীলের এই লাভজনক ব্যবসার দ্রুত প্রসার দেশীয় জমিদারদেরও এদিকে টেনে আনতে শুরু করেছিল এবং মুর্শিদাবাদও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এই পর্বে ১৮২৮ সাল নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার পরবর্তীকালের এক বিশিষ্ট নীলকর ডব্লিউ. জি. রোজ রামনগর কুঠির মালিকানা পান এবং কুঠিটিকে সারা বাংলাদেশেই এক আর্দশ নীলকুঠি হিসাবে গড়ে তুলতে শুরু করেন।[৩৮] এই পর্বেই রাজারামপুর, ভগবানগোলা, খড়িবোনা, আখেরীগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলেও নীলকুঠি গড়ে ওঠে।[৩৯] তবে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর পশ্চিমে অওরঙ্গাবাদ (জঙ্গীপুর) মহকুমায় এবং বাগড়ি অঞ্চলে বহুসংখ্যক নীলকুঠির খবর পাওয়া গেলেও রাঢ় অঞ্চলে এক রামনগর ছাড়া অন্য কোনও উল্লেখযোগ্য নীলকুঠির খবর এই সময়ে মিলছে না। এইভাবে মুর্শিদাবাদে দ্রুত নীলকুঠির সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে মুর্শিদাবাদ যে বাংলাদেশে নীলচাষ বিস্তারের দিক থেকে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য জেলাগুলির একটি হয়ে উঠেছে তা বোঝা যায় ১৮৩০ সালে সংগৃহীত নীচের সংখ্যাতথ্য থেকে।[৪০]

| জেলা | নীলকুঠি | নীলকর | সহকারী | নীলচাষ (বিঘা) |
|---|---|---|---|---|
| মুর্শিদাবাদ | ৪০ | — | ১৬ | ১৫৯,৪৬৬ |
| নদীয়া | ৫৬ | ১৯ | ১৮ | ১৫৯,৫১৭ |
| যশোর | ৬৩ | ২ | ৩০ | ১২০,৬৩৩ |
| ঢাকা জালালপুর | ৭৪ | — | ৩৮ | ১২২,১৫১ |
| পাবনা | ১৯ | ৯৯ | ৩৮ | ১৬৯,৩৪৭ |

শুধুমাত্র পরিমাণগত দিক দিয়েই নয়, গুণগত মানের দিক থেকেও মুর্শিদাবাদের নীল বিপুল খ্যাতির অধিকারী হয়েছিল। 'মাসেইক-এর নীল' (Maseyk's indigo) নামে এক বিশেষ জাতের উন্নতমানের নীল যথেষ্ট পরিমাণেই কিনত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং অনুমিত হয় যে এই নীল উৎপাদিত হত মুর্শিদাবাদের উত্তরাঞ্চলের মাসেইক পরিবারের কুঠিগুলিতেই। কোম্পানীকে এই নীল সরবরাহ করত 'ইন্ডিগো কিং অব্ বেঙ্গল' নামে খ্যাত 'মেসার্স পামার অ্যান্ড কোম্পানী' নামের এজেন্সি হাউসটি।[৪১]

মুর্শিদাবাদ জেলায় নীলচাষের এই দ্বিতীয় পর্বেই নীলের শোষণমূলক চরিত্র সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম পর্বে বন্যা প্রতিরোধ নিয়ে নীলকর ও রায়তদের মধ্যে যে সাময়িক সুসম্পর্কের উদ্ভব ঘটত সরকার থেকে বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে থাকায় তার আর প্রয়োজন থাকল না। অন্যদিকে নীলের ব্যবসা সবচেয়ে লাভজনক প্রমাণিত হওয়ায় নীলকরদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হল এবং রায়তী আবাদের অধীন জমির পরিমাণ বাড়তে থাকল। ফলে রায়তদের শোষণ করার এলাকা ভীষণভাবে সম্প্রসারিত হয়ে গেল। আর একটি কারণেও নীলকরদের অত্যাচারও শোষণ জোরদার হয়ে উঠতে থাকল ; প্রথম পর্বে অন্তত এ জেলাতে নীলকরদের সঙ্গে জমিদারদের যে বিরোধ লক্ষ্য করা যায় এই পর্বে তা যে শুধু কমেই গেল তাই নয়, এ দেশের প্রভাবশালী জমিদারেরাও কেউ কেউ নীলকর হয়ে উঠতে থাকলেন। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। উত্তর মুর্শিদাবাদের অত্যাচারী মাসেইক

পবিবাবেব নীলকুঠি কিনে সেখানকাব অত্যাচাব ভিত্তিক নীল ব্যবস্থাকে বদলানো যে দ্বাবকানাথ ঠাকুবেব পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তা মনে কবাব সঙ্গত কাবণ নেই। কিন্তু নীল ব্যবস্থাব সঙ্গে দ্বাবকানাথেব মত প্রভাবশালী ও অর্থবান ব্যক্তিবা যুক্ত হওযায তা পবোক্ষ এব অত্যাচাব ও শোষণকেই পবিপুষ্ট কবেছিল।[৭২]

এ প্রসঙ্গে নিজ আবাদ ও বাযতী প্রথায নীল চাষেব তুলনাব মধ্যে দিযেই ক্রমবর্ধমান বাযতী প্রথায প্রথম থেকেই কেন অত্যাচাবমূলক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণমূলক হতে বাধ্য ছিল তা বোঝানো যাবে। নিজ আবাদ প্রচলিত ইঁউবোপীয বাগিচা-প্রথায় একটি ধনতান্ত্রিক খামাবেব ধবনে পবিচালিত হত ; নিজ আবাদ ১৮৩৩ সালেব পূর্বে সাধাবণত নীলকুঠি সংলগ্ন জমিতেই হত ; কুঠিব নীল বীজ এবং লাঙল বলদ দিযেই এই চাষ চলতো এবং এব জন্য দবকাব হত প্রচুব মজুব। নিজ আবাদেব সকল খবচই নীলকবদেব বহন কবতে হত। কিন্তু এইভাবে নীল উৎপাদন কবলে নীলেব উৎপাদন ব্যয হযে পডতো অস্বাভাবিক বেশী ; ১৮৬০ সালে নীল কমিশনেব হিসাব মত নিজ আবাদে ১০,০০০ বিঘা নীল চাষে খবচ পডত ২,৫০,০০০ টাকা ; অন্যদিকে সমপবিমাণ জমিতে বাযতী আবাদেব খবচ পডত কমবেশী ২০,০০০ টাকা।[৭৩] সুতবাং কম খবচ ও কম ঝুঁকিতে বেশী লাভেব আশায অধিকাংশ নীলকবই নিজ আবাদেব চাইতে বাযতী আবাদেব মাধ্যমেই কযেকগুণ বেশী পবিমাণ নীল উৎপাদনেব চেষ্টা কবত। মুর্শিদাবাদ জেলায এই সাধাবণ নিযমেব একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ডব্লিউ. জি. বোজ-এব বামনগব নীলকুঠি যেখানে কেবলমাত্র নিজ আবাদেই নীল চাষ হত। প্রধানত বায়তী পদ্ধতিতে লাঠিযাল-বাহিনী এবং চাষেব দেখাশোনাব জন্য বাখতে হত বেশ কিছু ভালজাতেব ঘোডা। বাযতী পদ্ধতিব চাষে এই জেলায নীলকবেবা বাযতদেব নিজ জমিতে কুঠিব দেওযা বীজে নীল বুনত। জমি নিডানি থেকে অন্য সব বকমেব কাজই বাযতদেব কবতে হত। কোম্পানীব কর্মচাবীদেব আদেশ নির্দেশ মত। জমি থেকে কুঠিতে নীল তুলে নিয়ে যাওযাব দাযিত্ব ছিল কুঠিবই। বাযতেবা দশ বান্ডিল নীলেব জন্য পেত এক টাকা কবে।[৭৪]

মুর্শিদাবাদ জেলায ছোট বাযতেবা সংখ্যাগবিষ্ঠ হওযায এবং সাবা বছবেব প্রযোজনীয খাদ্য উৎপাদনই তাদেব কৃষিব মূল লক্ষ্য হওযায নীল চাষ তাদেব পক্ষে লাভজনক হলে তবেই তাদেব স্বেচ্ছায় নীল চাষেব দিকে ঝোঁকাব সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বেশম শিল্পেব জন্য বহুদিন ধবে বিখ্যাত জেলায় পলু পোকাব জন্য তুঁতগাছেব চাষ অধিকতব লাভজনক হওযায বাযতচাষেব স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল খাদ্যশস্যেব বাইবে তুঁতচাষেব দিকে ঝোঁকাব। এই পবিস্থিতিতে তাদেব দিয়ে ১/২ টাকা বিঘা দাদনে ও টাকায দশ বান্ডিল হিসাবে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিকব নীল চাষ কবাতে হলে লাঠিযালদেব জোবে বলপ্রয়োগেব মাধ্যমে তা কবানো ছাড়া উপায় ছিল না। জোব কবে দাদন নেওয়ানো, ভাল জমিতে নীল বুনতে বাধ্য কবা, ফসল নষ্ট কবে দিয়ে নীল বোনানো, জমি ও নীলেব মাপ কমানো নীলকব ও তাদেব এ-দেশীয় অনুচবেবা অনুসবণ কবায় বায়ত চাষীবা নীলকবদেব কাছে বংশানুক্রমে ঋনগ্রস্ত ও দায়বদ্ধ হযে পড়ত। আব যদি তাবা এইসব অত্যাচাবেব বিন্দুমাত্র প্রতিবাদেব চেষ্টা কবত তাদেব ভাগ্যে জুটত বা জোটাব সম্ভাবনা ছিল কুঠিতে গরুবাছুব আটক বাখা, তাদেব ধবে নিয়ে গিয়ে প্রহাব, আটক বাখা, ঘব জ্বালিয়ে দেওয়া, বাড়ি লুঠ কবা, মেযেদেব উপব অত্যাচাব কবা এবং মৃত্যু। বোঝা যায় বায়তী পদ্ধতিতে নীলচাষকে নীলকবদেব লোভ কেন শোষণ ও অত্যাচাব ভিত্তিক কবে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে অন্য জেলা থেকে মুর্শিদাবাদেব বিশেষ পবিস্থিতিব

পার্থক্যেব কথাটি মনে বাখা দবকাব।[৫৫] মুর্শিদাবাদ জেলায কাঁচা বেশমেব উৎপাদন ১৭৫৭ সালে পলাশীব যুদ্ধেব পব থেকে বাডতে থাকলেও আঠাবো শতকেব সাতেব দশক থেকে আমেবিকাব স্বাধীনতাযুদ্ধ, ফবাসী বিপ্লব এবং নেপোলিযনেব যুদ্ধেব ফলে ১৮১৫ সাল পর্যন্তই কাঁচা বেশমেব চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছিল খুবই কম পবিমাণে। কিন্তু ১৮১৫ সাল থেকে প্রায ১৮৬০ সাল পর্যন্ত কাঁচা বেশমেব বপ্তানী লক্ষ্যনীযভাবে বৃদ্ধিপায এবং তাব ফলে মুর্শিদাবাদ জেলায তুঁতচাষেবও প্রসাব ঘটতে থাকে এবং কাঁচা বেশম উৎপাদন এ-জেলাব প্রধান শিল্পেব স্থান নেয। সুতবাং দেখা যাচ্ছে যে ১৭৮৯ সালেব পব থেকে এই জেলায নীলেব চাষ প্রবর্তন ও প্রসাব মূলত ঘটতে থাকে বেশম শিল্পেব সঙ্গে প্রতিযোগিতাব মধ্যে দিযে এবং এই প্রতিযোগিতা তীব্রতম হযে ওঠে ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৬০ সালেব মধ্যে। দুটি চাষই চাষীদেব দাদনেব মাধ্যমে কবানো হতে থাকে। কিন্তু তুঁত চাষ নীলচাষেব তুলনায অধিকতব লাভজনক হওযায চাষীবা স্বাভাবিকভাবেই তুঁতচাষেব দিকে ঝুঁকত, নীলচাষ কবাতে হত বলপ্রযোগেব সাহায্যে। তাছাড়াও, স্থানীয চাহিদা থাকাব জন্যই তুঁত চাষ ও বেশম শিল্পেব বেশ কিছুটা অংশ দাদন-বহির্ভূত ছিল বলে বেশম কুঠিযালদেব পক্ষে কোনদিনই তুঁত চাষ ও বেশম শিল্পেব উপব পবিপূর্ণ নিযন্ত্রণ স্থাপন কবা সম্ভব হযনি। অন্যদিকে এ-ব্যাপাবে নীলেব অবস্থা ছিল অনেকখানি পৃথক। নীল চাষ, নীল শিল্পেব উপব ইউবোপীযদেব মোটামুটি পবিপূর্ণ নিযন্ত্রণ ছিল, চাষীদেব ও ব্যবসাব পক্ষে তা ছিল ক্ষতিকব এবং অত্যাচাব মূলক। ফলে তুঁত চাষ ও বেশম শিল্পেব চাইতে নীল চাষ ও নীল শিল্প জেলাব চাষীদেব কাছে অনেক বেশী শোষণমূলক বলে গণ্য হত। "যা না কবে পুতে, তা কবে তুঁতে" এবং "ধর্মেব শত্রু হিল, চাষীব শত্রু [illegible]।' এই দুটি জনপ্রবাদেব মধ্যে দিয়ে তুঁত ও নীলেব প্রতি এ-জেলাব চাষীদেব বিপবীত মনোভাবেব সুন্দব প্রকাশ ঘটেছে।[৫৬] আব এই মনোভাবেব জন্যই মুর্শিদাবাদ জেলায নীল-ব্যবস্থা অন্য অনেক জেলাব তুলনায ছিল অধিকতব অত্যাচাবমূলক এবং তাব ফলেই অধিকতব প্রতিবোধ সৃষ্টিকাবী।

বাযতদেব উপব নীলকবদেব অত্যাচাব ও তাকে কেন্দ্র কবে কোন বিক্ষোভেব ঘটনা এই কালপর্বে জানা না গেলেও অনুমান কবতে অসুবিধা হয না যে এ-বকম অসংখ্য ঘটনা তখন প্রতি নীলকুঠি এলাকাতেই ঘটে চলত, কিন্তু এইসকল প্রতিবাদেব ফলাফল হত ভযাবহ। এই সমযেব একটি ঘটনা উল্লেখেব দাবী বাখে। এ-জেলাব ডোমকল থানাব কাটাকোপবা গ্রামে ববার্ট ওয়াটসন কোম্পানী নীলকুঠি স্থাপন কবেছিল। গ্রামবাসীব উপব নীলকুঠিব অত্যাচাবেব ফলে গ্রামেব প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ পবিবাবেব ব্রহ্মলাল ব্রহ্মচাবীব সঙ্গে কোম্পানীব সংঘর্ষ হয় এবং ব্রহ্মচাবী পক্ষ সামযিকভাবে জযী হন। পবে নীল কুঠিযালদেব কুটকৌশলে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মচাবী বংশ সর্বস্বান্ত হযে যায। কিন্তু লোক-স্মৃতিতে ব্রজলাল ব্রহ্মচাবী নীলকব-বিবোধিতাব জন্য আজও বেঁচে আছেন। এমনিভাবে বহু নীলকুঠি এলাকাতেই জেলাব নানা প্রান্তে এবকম অসংখ্য লোক-নাযক (Popular hero)-এব সন্ধান মেলে।[৫৭]

## ॥ পাঁচ ॥

১৮৩০ সাল থেকে ১৮৫০ সালেব মধ্যে মুর্শিদাবাদেব নীলচাষ সম্পর্কে বিস্তাবিত তথ্য পাওয়া যায় না। আচার্য যদুনাথ সবকাব বলেছেন যে ১৮৪০ সাল নাগাদ মুর্শিদাবাদে অনেকগুলি

নীলকুঠি ছিল যাব মধ্যে সবচেযে বড় কুঠি দুটি ছিল জঙ্গীপুব ও নিকটবর্তী কালীগঞ্জে।[৪৮] এই দুটি কুঠিতেই বছবে দেড় হাজাব থেকে দু'হাজাব মণ নীল উৎপাদিত হত। মনে হয যদুনাথ কথিত এই দুটি নীল কুঠিই ছিল দ্বাবকানাথ ঠাকুব ও তাঁব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান "কাব, ঠাকুব এন্ড কোং"-এব মালিকানাধীন, কেননা,১৮৩৫ সালে জঙ্গীপুবেব বেশম ফিলেচাব কেনাব সমকালেই বা অব্যবহিত পবেই "বড জঙ্গীপুব" ও "ছোট জঙ্গীপুব" প্রতিষ্ঠান দুটি দ্বাবকানাথেব নিযন্ত্রণে এসেছিল। প্রতিটি নীল প্রতিষ্ঠান (Indigo Concern) কতকগুলি নীলকুঠি নিযে গঠিত ছিল এবং সম্ভবত উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটিতে ছিল গোটা সাতেক কুঠি।[৪৯] ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে জঙ্গীপুবেব অন্য একটি নীল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে-সংবাদ পাওযা যায তাতে মনে হয সেটি দ্বাবকানাথেব প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা: "জিলা মুবশীদাবাস্তঃ পাতি জঙ্গীপুব কানসাবণেব পশ্চিমভাগ যাহা অবঙ্গাবাদ নামে বিখ্যাত নিজ অবঙ্গাবাদ ও তৎসংসৃষ্ট মনোহবপুব, লক্ষ্মীপুব, ভগবানপুব, দুবড়িবোনা, আইড়মাবী, চৌকা, গোলাবগঞ্জ, কালাপানী, বেনিযাগ্রাম ইত্যাদি ত্রযোদশ কুঠিতে নীলকার্য চলিতেছে এ পর্যন্ত ষোলশত মোন নীলোৎপন্ন হইযাছে ন্যূনাধিক ২৪০০ শত মোন নীল জন্মিবাব সম্ভাবনা অত্র জেলাব ঈদৃশ নীলেব কৃষি অন্য কুঠীতে ফলবতী হয নাই উক্ত কান সাবণেব অধিকর্ত্তা শ্রীযুক্ত আলেকজন্ডব ইমলাক্ল্যাম সাহেব।"[৫০] জঙ্গীপুব অঞ্চলেই আব একটি নীলকুঠি ছিল বিখ্যাত বেশম কুঠিযাল ল্যাকলেটা সাহেবেব কাশিযাডাঙ্গা নীলকুঠি। পববর্তীকালে নীল কমিশনেব বিপোর্টে এই সমযেব আবো তিনটি নীলকুঠি সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওযা যায।[৫১] একটি হচ্ছে হেনবি ডেভেবিলেব আখবাগঞ্জ কুটি— ভগবানগোলা থানাব আখেবিগঞ্জে অবস্থিত। এই কুঠি পত্তনি, ইজাবা এবং বাযতী জোতেব মালিক ছিল এবং কুঠিব অধীনে প্রায সমপবিমাণ জমিতে নিজ আবাদ ও বাযতী পদ্ধতিতে নীল চাষ হত। কুঠিব লাঙল ছিল ১৫০টি; আনুমানিক ৩,০০০ বিঘা ছিল নিজ আবাদে; সুতবাং বাযতী আবাদও ছিল প্রায ৩,০০০ বিঘাব। দ্বিতীয কুঠিটি হচ্ছে হবিহবপাড়া থানায জে. এফ্. হেজাবেব তবতিপুব কুঠি। এই কুঠি পত্তনি জোতেব মালিক ছিল এবং এই কুঠিব অধীনে নিজ আবাদে ৮০০ বিঘা এবং বাযতী আবাদে ১৭,২০০ বিঘা জমি ছিল। তৃতীয কুঠিটি হল ইতিপূর্বে উল্লিখিত বামনগব কুঠি। এই কুঠিব জমিদাবী, পত্তনি ও মৌবসী পাট্টা জোত ছিল এবং ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে এই কুঠিব ৭,০০০ বিঘা কেবলমাত্র নিজ আবাদেব নীল চাষ কবত; দবকাব পড়লে লাঙল ও মজুব ভাড়া কবত।

১৮৩০ সালেব পূর্বে দেশী উদ্যোগে নীলকুঠি স্থাপনেব বণতা লক্ষ্য কবা যাযনি, কেননা, সে-সমযে নীলকবেবা বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ছিল ভীষণ শক্তিশালী। কিন্তু ১৮৩০ থেকে ১৮৫০ এই কালপর্বে মুর্শিদাবাদে নদীযা ও যশোবেব মতই প্রচুব দেশী মালিকানাব ছোটখাট নীলকুঠিবও দেখা মিলতে থাকে।[৫২] চল্লিশেব দশকেব শেষদিকে দ্বাবকানাথ ঠাকুবেব মৃত্যুব পব জেলায তাঁব নীল প্রতিষ্ঠান দুটি বিক্রী হযে যায। চল্লিশেব দশকে "বেণেশাঁ" আমলেব আব এক প্রখ্যাত বাঙালী বাজা দিগম্বব মিত্র-ও জেলাব দৌলতাবাদ বা দোলতেবাজাবে একটি বেশম ও নীলকুঠিব মালিক হয়ে নিজভাগ্য ফিবিযেছিলেন। অবশ্য তাঁব কুঠিও দ্বাবকানাথেব কুঠিব মতই ১৮৫০ সালেব মধ্যেই বিক্রী হযে গিযেছিল। দ্বাবকানাথ ঠাকুব ও দিগম্বব মিত্রেব মত বহিবাগত জমিদাব ও ব্যবসাযী ছাড়াও স্থানীয জমিদাবদেব মালিকানাতেও এ-ধবনেব নীলকুঠি এ-জেলায ছিল। এঁদেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাঞ্চনতলা জমিদাববংশেব আদিপুরুষ জগবন্ধু বায়। "জগবন্ধুবাবু একাধাবে জমিদাব ও নীলকব ছিলেন এবং তাঁহাব

বিস্তব নীলেব চাষ ও নীলকুঠি ছিল।" ১৮৬০ সাল নাগাদ এই পবিবাবেব নীলেব কাজ উঠে যায়।[৫৩]

১৮৩০ থেকে ১৮৫০ সময়কাল ছিল জেলায নীলশিল্পেব স্বর্ণযুগ। এই পর্বে ইউবোপ ও আমেবিকায নীলেব চাহিদা দ্বিগুণ হওযায নীল চাষ ও নীল শিল্প বিকাশেব হিড়িক পড়ে যায়। দ্বাবকানাথ ঠাকুবেব নেতৃত্বে ইউনিযন ব্যাঙ্ক নীলেব কাববাবে বিপুল পবিমাণ মূলধন সববৰাহ্ কবে। "নীলকবেবা মূলধন নিযে গ্রামেগঞ্জে খামাবেব সাহায্যে এই বাণিজ্যিক পণ্য লাভজনকভাব চাষ কবে জমিদাব ও ধনী চাষীদেব দেখিযে দেয যে খাজনাব চাইতে অর্থকাবী শস্যচাষ অনেক লাভজনক"।[৫৪] দেশী মালিকানায নীলচাষ ও নীল শিল্পেব প্রসাব এব প্রতিক্রিয়াতেই ঘটতে থাকে।

চল্লিশেব দশক থেকেই পবিস্থিতিব পবিবর্তন ঘটতে শুরু কবে। নীলকবেবা জমি ও জমিদাবী কেনাব অধিকাবী হয়ে ওঠায জমিদাবদেব সঙ্গে তাদেব কর্তৃত্ব নিযে বিবোধ তীব্রতব হযে ওঠে। "কালো আইন" বা ব্ল্যাক স্যাক্টেব ফলে শ্বেতাঙ্গ নীলকবেবা ঐক্যবদ্ধ হযে ওঠে, "ইন্ডিগো প্ল্যান্টার্স এসোসিযেশন" ও "দি প্ল্যান্টার্স জার্নাল" তাদেব এই সংহতিকে দৃঢতব কবে। এবং মুর্শিদাবাদেব মত উল্লেখযোগ্য নীল জেলায এব সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য কবা যায়। "জিলা বাজসাহী, যশোহব এবং মুবশিদাবাদেব অনেক প্রজাবা নীলকবেব নির্দ্দয ব্যবহাবে অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে, দাবোগা প্রত্যক্ষে সেইসকল ঘটনা দৃষ্টি কবিয়া বিপোর্ট কবিতে সাহসী হয় না, কাবণ সাক্ষীব জোগাড় হইযা উঠে না, এবং তাহা হইলেও শেষ বক্ষা হয না, বিচাবপতিব কোপদৃষ্টে পড়িয়া পবিশেষে তাহাব কর্ম থাকা ভাব হয।" প্রথম বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কানাথ ঠাকুবেব ভাগিনেয চন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায ১৮৪৩-৪৪ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় নিযুক্ত হওযাব ফলে এই জেলায নীলকবদেব অত্যাচাব প্রশমিত হযেছিল।[৫৫] ১৮৫০ সালেব পব থেকে নীল পবিস্থিতি এক নতুন পর্যাযে প্রবেশ কবে।

॥ ছয় ॥

১৮৫০ সাল থেকে ১৮৬০ সালেব মধ্যে সাবা বাংলা দেশেব মত জেলাব নীল শিল্পও যে সংকটেব মধ্যে দিযে চলছিল কিছু তথ্য থেকে তা জানা যায। ১৮৪৭ সনেব ডিসেম্বব মাসে ইউনিযন ব্যাঙ্কেব পতন হলে নীলেব কাববাবে মূলধন সববৰাহেব সমস্যা দেখা দিতে থাকে এবং নীলেব উৎপাদন ব্যাহত হতে থাকে। সাধাবণ মূল্যবৃদ্ধি এবং বেল-স্থাপন ইত্যাদি কাজে মজুবেব চাহিদাবৃদ্ধিব ফলে মজুবীব হাব বেড়ে যায়। নীল ছাড়া অন্যবিধ অর্থকবী ফসলেব দিকে জেলাব বায়ত চাষী ও জমিদাবেবা ক্রমশ ঝুঁকে পড়ে। ফলে এই গোটা দশকে নীলেব উৎপাদন খুব একটা আশাপ্রদ অবস্থায় ছিল না। নীলকুঠিগুলোবও যে সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছিল এ-কথা বলা যায় না। এই পবিস্থিতিতে মুনাফা বজায় বাখতে গিযে নীলচাষ ও নীল শিল্প আবো বেশী কবে অত্যাচাবমূলক হয়ে উঠেছিল।

১৮৫২ থেকে ১৮৫৪ সালেব মধ্যে নীচেব নীলকুঠিগুলো মুর্শিদাবাদ জেলায চালু ছিল বলে জানা যাচ্ছে।[৫৬]

দোগাছি কদমসাব দাদপুব চৌখ আবমাবি ডোবাপুব, বালিয়াঘাটা (?) দুববিবুনে নুবপুব নোন্‌চা কালীগঞ্জ খান্দুব পাইকুবা সাহেববামপুব বালাগাছি চাঁদপুব শাবদলপুব গায়সাবাদ

কাৎলামাবি মঙ্গাবপুব বামপুবা বাজাপুব আখবীগঞ্জ কিষাণপুব ভুবনপুব, খড়বুনা ফবিদপুব হাজীডাঙ্গা সাদিপুব শংকবপুব হোসেনপুব বামপাড়া ঠাকুবদাস ডোমকল চোয়া কাটাকোপবা হুকাবহুড়া চিকটী গোববহাটি বামনগব মবীচা জাঙ্গীবপাড়া তাবাপুব বাহাদুবপুব মহিষাতলী সাহাপুব বগদামাবী আসাবীযাদাহ্ কালমেঘা বাধাকৃষ্ণপুব বসুমতী চিল্লা গাদী বামপাড়া সুজাপুব বাবুলবোনা বাঙেটিযা প্রসাদপুব (ববফখানাব পূর্বে) শবদবনগব গোবিন্দপুব মিঠিপুব। এক একটি নীল প্রতিষ্ঠানেব অধীনে অনেকগুলো নীলকুঠি থাকত বলে মনে কবাব কাবণ আছে যে এ তালিকা অসম্পূর্ণ। ১৮৬০ সালেব নীল কমিশনেব বিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ জেলায ইউবোপীযদেব ২৩টি জমিদাবী, ২০ টি পত্তনি জোত এবং এ গুলি ছাড়া সবকাবও জমিদাবদেব কাছ থেকে বন্দোবস্ত কবা আলাদা ১৮টি জোত ছিল।[৫৭] অর্থাৎ এই ৬১টি মহালে বা জোতেব অধিকাংশেই নীলকুঠি ছিল। এ-ছাড়াও বাযতী পদ্ধতিতে প্রধানত নীলচাষ হত বলে নীলকুঠিব সংখ্যা আবো কিছু বেশী থাকাব সম্ভাবনা।

এই দশকে মুর্শিদাবাদে নীল উৎপাদনেব অবস্থা কেমন ছিল তাব পবিচয নীচেব সাবণি থেকে কিছুটা মেলে :[৫৮]

| বৎসব | মণ |
|---|---|
| ১৮৪৯-৫০ | ৬০৬১ |
| ১৮৫০-৫১ | ৪৪৯৯ |
| ১৮৫১-৫২ | ৪২০১ |
| ১৮৫২-৫৩ | ২৫৫১ |
| ১৮৫৩-৫৪ | ৩০৫৪ |
| ১৮৫৪-৫৫ | ৬৫১৬ |
| ১৮৫৫-৫৬ | ৪০৩৭ |
| ১৮৫৬-৫৭ | ৭০৬১ |
| ১৮৫৭-৫৮ | ৫২২২ |
| ১৮৫৮-৫৯ | ৪৯১২ |

এই কালপর্বে (১৮৫০-১৮৬০) মুর্শিদাবাদ জেলায নিজ আবাদ ও বায়তী আবাদেব তুলনামূলক গুরুত্ব সম্পর্কেও অতিবিক্ত কিছু খবব পাওয়া যায়।[৫৯] মুর্শিদাবাদ জেলায নীল চাষেব প্রসাবেব পব থেকে বাযতী আবাদেব পাশাপাশি নিজ আবাদেব চাষ থাকলেও তাব গুরুত্ব খুব একটা ছিল না, কিন্তু ১৮৩০ সালেব পবে নীলকবেবা জমিব মালিকানাব অধিকাব পাওয়াব ফলে নিজ আবাদেব উল্লেখযোগ্য প্রসাব ঘটে। অবশ্য তাব ফলে বায়তী আবাদেব অবিসম্বাদী প্রাধান্যেব বিশেষ কোনই পবিবর্তন ঘটে না। মুর্শিদাবাদ জেলাব বামনগব কুঠিতে ১৮৬০ সালেব পূর্বে প্রায় ৩২ বছব ধবে নিজ আবাদে নীল চাষ চালু ছিল। এতদিন টিঁকে থাকলেও কুঠিয়াল ডব্লিউ. জি. বোজেব বক্তব্য থেকে জানা যায় যে নিজ আবাদে নীলকবদেব নানাবকম সমস্যাব সম্মুখীন হতে হত। "নীলকবদেব থেকে বাযতদেব অবস্থান পৃথক। বায়ত নিজেই সব কিছু কবে; চাষ কবে ও নিড়ানি দেয় এবং বাড়তি লোকেবা তাদেব সাহায্য কবে। কিন্তু নীলকবেবা তাদেব কাজে লাগালে তাবা অত্যন্ত বেশী মজুবী দাবী কবে এবং এব ফলে চাষেব দেখাশোনাব ব্যাপাবটা আবো ব্যয়সাধ্য হযে পড়ে।" মিঃ বোজ আবো মন্তব্য কবেছিলেন যে "নীল চাষের সময়ে বায়তদেব অন্য চাষ পড়ে গেলে তাদেব কাজে

পাওয়া অসম্ভব হযে ওঠে।" "নিজ চাষ কেবলমাত্র চড়েব জমিতে অথবা সহজে চাষযোগ্য জমিতে সুবিধাজনক হতে পাবে ; অবশ্য খাজনাব হাব এবং মজুবী কম হলে তবেই।" এই সকল কাবণেই ১৮৫০ সালেব পব থেকে নিজ চাষে নীল আবাদ কমে যেতে বা একেবাবেই উঠে যেতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-সব নীল কুঠিতে নিজ আবাদ ১৮৬০ পর্যন্তও চালু ছিল সেখানেও তাযে জেলায প্রচলিত ধনী বাযত চাষীদেবও নিজেব জমিতে আবাদেব চাইতেও মাত্রাগতভাবে বিপুল আযতনেব ছিল তা উপবে প্রদত্ত তথ্যেব ১৫০/২৫০টি লাঙল, ৭০০ বলদ বা ৭০০০/৮০০০ বিঘা জমিতে চাষেব হিসাব থেকে বোঝা যায, নীলকুঠিব এই নিজ আবাদ লাভেব উদ্দেশ্যে ধনতান্ত্রিক খামাবেব ধবণে চালিত হওযায গুণগতভাবে বাযতদেব মূলত পবিপোষক নিজ আবাদ থেকে তা ছিল পৃথক। কিন্তু নিজ আবাদে নীল চাষ যে জেলাব ধনী বাযত চাষীদেবও ধনতান্ত্রিক খামাবেব অনুসবণে তাদেব নিজ চাষেব পুনর্গঠনে অনুপ্রাণিত কবেছিল তা মনে কবাব কোনও কাবণ নেই।

১৮৫০ সালেব পব থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায নীলচাষ আবো বেশী অত্যাচাবমূলক হযে ওঠাব অর্থনৈতিক বিভিন্ন কাবণ ছাড়াও দুটি সুনির্দিষ্ট কাবণেব পবিচয মেলে। ও'ম্যালি তাঁব মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিযাবে একটি কাবণেব কথা বলেছেন :[৬০] নীল প্রতিষ্ঠানগুলি আযতনে ক্রমশ বিবাট হযে ওঠায ইউবোপীয ম্যানেজাব ও তাঁব সহকর্মীদেব পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে পবিচালনাব দিকে নজব দেওযা শক্ত হযে উঠেছিল এবং তাব ফলে কুঠিগুলিব নীচেব দিকেব দেশী কর্মচাবীবা অপেক্ষাকৃত বেশী পবিমাণে স্বাধীন হযে ওঠায চাষীদেব কাছ থেকে জোব কবে অর্থ আদায কবতে ও তাদেব ঠকাতে শুরু কবেছিল। ও'ম্যালিব এই বক্তব্যে কিছুটা সত্য থাকলেও পবোক্ষে নীলকবদেব আড়াল কবাব প্রচেষ্টা লক্ষ্য কবা যায। মুর্শিদাবাদ জেলায দ্বিতীয যে কাবণটিব জন্য নীলচাষ বিশেষভাবে অত্যাচাবমূলক হযে উঠেছিল তা হচ্ছে জমিদাব হিসাবে নীলকবদেব অধিকাব যে কোনও ভাবে প্রতিষ্ঠিত কবাব চেষ্টা।[৬১] মুর্শিদাবাদেব দক্ষিণপূর্বে অনেকগুলো কুঠিব মালিক মের্সাস ববার্ট ওযাটসন এন্ড কোম্পানী জমিদাব হিসাবে তাদেব অধিকাবকে আইনেব শেষ সীমা পর্যন্ত ব্যবহাব কবতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল এবং এব জন্য চড়েব জমিব বাযতদেব 'উঠবন্দী' বা 'জববদখলকাবী' এই অজুহাতে উচ্ছেদ কবতে পিছুপা ছিল না। এ-প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ককবার্ণেব সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য : "যে-সব নীলকব জমিদাব হযেছে তাবা প্রজা-বক্ষাব আইনেব কথা শুনলে হাসে। কোন আইনই তাদেব বিরুদ্ধে প্রয়োগ কবা যায না এই কাবণে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রজাদেব সব কিছু নীলকবদেব মুঠোব মধ্যে বযেছে ততক্ষণ পর্যন্ত আইনেব সাহায্য নিতে সাহসই কববে না।"[৬২]

মুর্শিদাবাদ জেলায নীলকবেবা ১৮৫০-১৮৬০ সালেব মধ্যে যে অত্যাচাব চালাত সে-সম্পর্কে অ্যাসলী ইডেন ৫টি ঘটনা ও গুরুত্বপূর্ণ অপবাধমূলক মামলাব বিববণ দিযেছিলেন নীল কমিশনেব কাছে।[৬৩] সেগুলি হল এই বকম : (১) ১৮৫১ সালে মেসার্স লাযন্স্ এন্ড হোযাইট কোম্পানীব বেনিযাগ্রাম কুঠিব কর্মচাবীদেব উপব নিমতলা কুঠিব মিঃ মাসেইক-এব কর্মচাবীবা আক্রমণ চালায চড়েব জমি নিযে বিবোধকে কেন্দ্র কবে ; মাবামাবিব ফলে দু'জন লোক নিখোঁজ এই অভিযোগ বিচাবে টেঁকেনি। (২) ১৮৫৩ সালে মিঃ ল্যাকলেটাব কাশিয়াডাঙ্গা কুঠিব একজন কর্মচাবী কুঠিব অন্য কর্মচাবীদেব দ্বাবা নিহত হয় ; নিহত ব্যক্তি বাস্তব বা কল্পিত গরুছাগল ঢোকাব অভিযোগে গ্রামবাসীব কাছ থেকে জবিমানা আদায় কবে আত্মসাৎ কবত, কুঠিতে জমা দিত না। এই মামলায কয়েকজন দেশীয় কর্মচাবীব দশ বছব জেল হলেও মিঃ ল্যাকলেটাব কোন বিচাবই হয়নি। (৩) ১৮৫৩ সালে নুবপুবের জমিদাবেব লোকেবা

যখন জমিদারের জমি চাষ করছিল, তখন গঙ্গার অপর পাড়ের মের্সাস টেইলর এন্ড মর্টন কোম্পানীর নুরপুর নীলকুঠির কর্মচারীরা তাদের বলদগুলো জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ বলদগুলো উদ্ধার করতে গিয়ে কাযেম খান নামে জমিদারের একজন লোক বর্শার আঘাতে নিহত হয় এবং গরুগুলি নীলকুঠিতেই পাওয়া যায়। মামলায় একজন কর্মচারীর ১৪ বছর জেল হলেও মিঃ টেইলর-এর বিচারই হয় না। (৪) মিঃ অ্যাসলী ইডেন ১৮৫৪ সাল নাগাদ অওরঙ্গাবাদ (জঙ্গীপুর) মহকুমার অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তখন মের্সাস লায়ন্স্ এন্ড হোয়াইট কোম্পানীর এবং মিঃ ডেভিড অ্যানড্রুর দুই নীলকুঠি নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল করত এবং চাষীদের উপর ভীষণ অত্যাচার চালাত। ইডেনের কথায়, "আমি সেখানে দেখলাম যে-সব চাষীরা নীল বুনতে রাজী হয় না নীলকররা তাদের গোরুবাছুর নিয়মিতভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক রেখে দেয়। এর ফলে রায়তদের খুবই ক্ষতি হচ্ছিল। আমি তদন্ত করে একটা স্থানের কথা জানতে পারলাম। একদল পুলিশ পাঠিয়ে সেখান থেকে ৩০০ গোরু বাছুর উদ্ধার করলাম ও আমার নিজের বাড়িতে নিয়ে এলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও নীলকরের ভয়ে কয়েকদিন পর্যন্ত চাষীরা গোরুগুলি দাবী করতে ও নিয়ে যেতে সাহস করেনি।" (৫) ১৮৫৭ সালে চড়ের জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে কাশিযাডাঙ্গা কুঠির ল্যাকলেটা এবং রাজারামপুর কুঠির হারক্লুট্স্ এই দুই নীলকরের সশস্ত্র লাঠিয়ালবাহিনী দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে থাকলে অওরঙ্গাবাদের অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হার্শেল তাদের ধরতে গেলে মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এই মামলাগুলোর নমুনা থেকেই বোঝা যায় যে নীলকরেরা শুধু অওরঙ্গাবাদ বা জঙ্গীপুর মহকুমাতেই নয়, সারা জেলাতেই, নিজেদের মধ্যে মারামারি, জমিদারদের সঙ্গে গন্ডগোল, প্রশাসনের সঙ্গে বিবাদ এবং জনসাধারণের উপর নানা ধরনের অত্যাচারে ব্যাপকভাবে লিপ্ত ছিল এবং সাধারণভাবে আইনের হাত তাদের কাছে পৌঁছানোর মত দীর্ঘ ছিল না।

১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় নীলচাষকে কেন্দ্র করে জন সাধারণের মধ্যে নীলকরদের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল তার প্রকৃতি এবং সম্ভাব্য পরিণতির ইঙ্গিত এক্ষেত্রে জেলার জমিদারদের দ্বি-মুখী ভূমিকার মধ্যে ধরা পড়ে। একদিকে জমিদারেরা যে ক্রমশ বিরোধী হয়ে উঠছেন তার যেমন প্রমাণ মিলতে থাকে, অন্যদিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে নীলকরদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতাও যে বিদ্যমান তা-ও দেখতে পাওয়া যায়। জমিদারদের এই দ্বিমুখী ভূমিকার নমুনা হিসাবে কান্দী রাজ পরিবারের রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের কথা উল্লেখ করা যায়।[১১] ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলে উত্তর মুর্শিদাবাদের বহু নীল কুঠিই আক্রান্ত হয়েছিল, আক্রান্ত হয়েছিল কান্দী জমিদারীর অধীন বেলে ও মৃত্যুঞ্জয়পুর এবং আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ঐ জমিদারীর লাটঝুরি তালুকে। স্বভাবতই একই আক্রান্ত পক্ষভুক্ত হওয়ার দরুণ কান্দী জমিদারেরা সাঁওতাল বিদ্রোহের বিরোধিতা করলেও নীলকরদের ভূমিকা সম্পর্কে নীরব ছিলেন। কিন্তু নীল ব্যবস্থায় জমিদারেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন এবং নীলকরদের দ্বারা নানাভাবে অসম্মানিত ও অপদস্থ হচ্ছিলেন বলেই বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন সম্পাদক রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৫৬ সালে নীলকরদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজনে একটি নীল কমিশন গঠন করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ শুরু হলে বৃটিশ সরকার ইংরেজ নীলকরদের অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় এ-রকম

অনরারি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন ডেভারেল, জ্যাকসন এবং ওয়াটসন। ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রজার উপর জমিদার না নীলকর কাদের প্রাধান্য থাকবে সে প্রশ্ন ওঠে। বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৫৭ সালের ২০ শে আগস্ট জ্যাকসন ইত্যাদি নীলকরদের নামোল্লেখপূর্বক ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বাংলা সরকারের তৎকালীন সেক্রেটারীকে জানান— "It is not fair to the people to place them under the magisterial authority of persons who have more than ordinary temptions to abuse that authority"।[৬৫] উক্ত প্রতিষ্ঠানও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে ১৮৫৮ সালের ২৫শে জুন উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। ১৮৬০ সালের মার্চ মাসে নীল বিদ্রোহের কালেও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 'নীল কমিশন' গঠনের দাবী জানান। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও নীলকরদের সম্পর্কে জমিদারদের মনোভাব দ্রুত কি-ভাবে পাল্টে যাচ্ছিল এর থেকে তা বোঝা যায়। কিন্তু পাশাপাশি নীলকরদের সঙ্গে জমিদারদের সহযোগিতার কিছু ক্ষেত্রও অব্যাহত ছিল। গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের সঙ্গে যে-টুকু সুসম্পর্ক জমিদারদের ১৮৫০ সালের পূর্বে ছিল প্রজাদের উপর আধিপত্যের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ঐ সময়ের পর তার আর বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল না। কিন্তু মুর্শিদাবাদের শহরগুলোতে বৃটিশ শাসনের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা জমিদারদের নেতৃত্বাধীন নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে নীলকরদের সামাজিক সু-সম্পর্কে এই সময়ের পরও কোনও ছেদ পড়েনি।[৬৬] ১৮৫৩ সালে জেলাসদর বহরমপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে এবং চাঁদা-দাতা হিসাবে জেলার রাজা, মহারাজা, জমিদার, উকিল, মোক্তারদের সঙ্গে নীলকরদেরও দেখা মেলে— সেখানে কান্দীর রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ যেমন আছেন, সেইরকমই আছেন ওয়াটসন এবং জ্যাকসনও। শুধু ১৮৫৩ সালেই নয় নীল বিদ্রোহের পরে ১৮৬৩ সালেও দেখা যাচ্ছে রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ও রবার্ট ওয়াটসনের সহাবস্থান। একইভাবে মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল অত্যাচারের প্রধান কেন্দ্র অওরঙ্গাবাদ (জঙ্গীপুর) মহকুমাতেও দেখা যাচ্ছে ১৮৫৮ সালে জঙ্গীপুর অ্যাঙ্গলো ভার্ণাক্যুলার স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগেও অন্য অনেকের সঙ্গে জমিদার বিজয় গোবিন্দ বড়াল ও রামলাল সিং-এর সঙ্গে নীলকর জে. ল্যারুলেটার সহাবস্থান।[৬৭] বিদেশী শাসকদের ছত্রছায়ায় গ্রামীণ কৃষকদের শোষণের উপর জমিদার ও নীলকর এই উভয়শ্রেণীই দাঁড়িয়েছিল বলেই সম্ভবত এই সহাবস্থান! বহরমপুর কলেজ স্থাপনের উদ্যোগে রুকুনপুর জমিদারীর ৮৪ জন সাধারণ রায়তের 'অপ্রার্থিত ও স্বেচ্ছাদত্ত' চাঁদা সত্ত্বেও এই সিদ্ধান্ত করতে হয়, কেননা, ঐ রুকুনপুর জমিদারী ছিল জেলার অন্যতম প্রধান কৃষক-শোষক রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানীরই। জেলার জমিদারদের এই দ্বিমুখী ভূমিকা সুনিশ্চিতভাবে নীল বিদ্রোহকে সশস্ত্র বিদ্রোহে রূপান্তরের পথে অন্যান্য কিছু কারণের মতই বাধা দিয়েছিল।

## ।। সাত ।।

নীলকরের অত্যাচারে বাংলার কৃষকেরা যখন জর্জরিত বিক্ষুব্ধ এবং বিদ্রোহে ফেটে পরার জন্য তৈরী— যখন তারা 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধের' মোকাবেলায় কৃতসংকল্প হয়ে উঠছে— ঠিক তখনই বারাসাতের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসলী ইডেন একটি সরকারী রোবকারী বা ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ১৮৫৯ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী জানালেন যে নীল চাষ করা

না-কবা চাষীব সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এই ঘোষণাপত্রেব বক্তব্য অচিবেই নীল জেলাব বায়তদেব মধ্যে ছড়িযে পড়ে এবং বাযতেবা উৎসাহিত হযে নীল চাষ বন্ধ কবে দিতে শুরু কবে ১৮৫৯ সালেব শবৎকালে— শুরু হযে যায নীল বিদ্রোহ।[৬৮] বাবাসাত-কৃষ্ণনগব অঞ্চলেব নীলেব গন্ডগোলেব প্রভাব মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছাতে দেবী হয না। মুর্শিদাবাদে দুটি ঘটনাব মধ্যে দিযে এই বিক্ষোভ আন্দোলনেব শুরু হযেছিল। প্রথম ঘটনায মুর্শিদাবাদ শহবেব আট মাইল পূর্বে কালিনগব গ্রামেব কৃষকেবা ববার্ট ওযাটসন এন্ড কোম্পানীব দাদন নিতে এবং নীল বুনতে অস্বীকাব কবেছিল।[৬৯] নীলকুঠিব লাঠিয়ালবা গ্রাম আক্রমণ কবলে গ্রামাবাসীবা তাদেব মেবে তাড়িযে দেয। এই গ্রামবাসীবাই ১৮৬০ সালেব জানুযাবী মাসে লেফটেনান্ট গভর্নবেব কাছে এক আবেদন কবে। এই আবেদন এক হিন্দু বিধবা শিবসুন্দবী দাসীকে ন্যাযত প্রাপ্য সবকাবী জমিব (চড বামনগব) ইজাবা থেকে বঞ্চিত কবে ওযাটসন কোম্পানীকে এ জমি এক বছবেব জন্য বন্দোবস্ত কবায জেলা সমাহর্তাব বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয; ঐ নীল কুঠিব দ্বাবা অনুষ্ঠিত অনেকগুলি অন্যাযেবও প্রতিবাদ জানানো হয এবং এই সকল অন্যাযেব মধ্যে নীলচুক্তি জাল কবা এবং গ্রাম লুঠ কবাবও উল্লেখ থাকে। মুর্শিদাবাদেব অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. কীন এ-ব্যাপাবে তদন্ত কবে গ্রামবাসীদেব অভিযোগ উড়িযে দেন। মুর্শিদাবাদেব জেলাশাসক বিউফোর্ট এবং বহবমপুবস্থ বাজসাহী বিভাগেব কমিশনাব এফ. গোল্ড্‌স্‌বেবী উপবোক্ত হিন্দু বিধবাব বদলে ওযাটসনেব কোম্পানীকেই জমিটি ইজাবা দেওযা সমর্থন কবেন। কিন্তু লেফটেনান্ট গভর্নব জে.পি. গ্রান্ট সবকাবী কর্মচাবীদেব বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বেব অভিযোগ এনে হিন্দু বিধবাকেই জমিটি পুনবায ইজাবা দেওযাব প্রস্তাব কবেন বোর্ড-অফ-বেভিনিউ-এব কাছে— বাযতদেব আইনসম্মত অধিকাবকে বক্ষা কবাব প্রযোজনীযতাব কথা বলেন তিনি। মুর্শিদাবাদ জেলায দ্বিতীয ঘটনাটি ঘটেছিল জেলাব উত্তব-পশ্চিমে জঙ্গীপুব মহকুমায।[৭০] কদমসাব কুঠিব চার্লস বি. মাসেইক একটি মহালেব মালিক জগবন্ধু দত্তেব বাড়ি আক্রমণ কবেছিল, আগেব বছবে মাসেইককে বন্দোবস্ত কবা মহালটি পবেব বছবেব জন্য বেশী টাকায অন্য একজনকে বন্দোবস্ত কবাব জন্য। মাসেইক চাবশো জন সশস্ত্র লোক নিযে জগবন্ধু দত্তব বাড়ি আক্রমণ কবেছিল, হাতি দিযে একটি দেওযাল ভেঙে দিযেছিল, স্ত্রীলোক ও শিশুদেব টেনে বেব কবেছিল, এক লক্ষ টাকা নিয়ে গিযেছিল এবং জগবন্ধু ও অন্য একজনকে ধবে নিয়ে গিযে দশদিন আটকে বেখেছিল। জগবন্ধুব ভাই অওবঙ্গাবাদেব অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট জে. ডব্লিউ. ফাবেলকে আবেদন কবায মাসেইকেব বিরুদ্ধে সমন জাবি হয। কিন্তু মাসেইক কোর্টে হাজিব না হযে জগবন্ধুব টাকা ফেবৎ দিয়ে অভিযোগ প্রত্যাহাব কবিয়ে নেয়; কিন্তু পবেই আবাব জগবন্ধুকে ধবে নিযে যায— দাবোগা গিয়ে জগবন্ধুকে মুক্ত কবে। জগবন্ধু লেফ্‌টেনান্ট গর্ভনব গ্রান্টেব কাছে আবেদন কবলে বাজসাহী বিভাগেব কমিশনাবেব কাছে কৈফিযৎ চাওয়া হয়। অবশেষে মাসেইকেব বিরুদ্ধে তদন্তে অপবাধ প্রমাণিত হযে তাব একবছব কাবাদন্ড ও একহাজাব টাকা জবিমানা হয়। সবকাব ফাবেলেব শিথিলতাব জন্যও কৈফিয়েৎ দাবী কবে। এইভাবে মুর্শিদাবাদ জেলায নীলকবদেব বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ এবং ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছিল এবং যাব বহিঃপ্রকাশও লক্ষ্য কবা যাচ্ছিল, বাংলা সবকাবেব সর্বোচ্চ স্তব থেকে ব্যবস্থা গ্রহণেব মাধ্যমে তাকে চাপা দেওয়াব এবং বিক্ষোভ প্রশমিত কবাব চেষ্টা হযেছিল ১৮৫৯-৬০ সালে। কিন্তু এত কবেও শেষ বক্ষা হয়নি। এবং তা হযনি মুর্শিদাবাদ জেলাতেই। এ-জেলাতেই ঘটে গিয়েছিল নীল আন্দোলনেব সবচাইতে বড়, ব্যাপক ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান।[৭১]

মুর্শিদাবাদ জেলার অওরঙ্গবাদ কনসার্নের নীলকুঠির অধীন রায়তরা বহুদিন ধরে নানাভাবে অত্যাচারিত হলেও এতদিন মুখ বুজে এই অত্যাচার সহ্য করে আসছিল। এই কনসার্ণের মালিক ডেভিড এনড্রুজ কলকাতাবাসী হওয়ায় কুঠির কাজকর্ম পরিচালিত হত ম্যানেজার ম্যাকলিওড, তার সহকারী রাইস এবং গোমস্তা তুফাজ্জিল হোসেনের দ্বারা। ম্যানেজার ম্যাকলিওড ও তার সহকারী পুরোপুরি ছিল তুফাজ্জিলের হাতের মুঠোয়। এমতাবস্থায় মালিক কলকাতা থেকে নীলের চাষ কয়েকশো বিঘে বাড়ানোর নির্দেশ পাঠালে গোমস্তা লোভী, অত্যাচারী ও নির্দয় মীর তুফাজ্জিল হোসেন এই নির্দেশের সুবাদে নিজের পকেট ভর্তি করতে সচেষ্ট হল। তুফাজ্জিল রায়তদের জানাল যে তাকে ঘুষ না দিলে রায়তদের জমি থেকে ধান উপড়ে ফেলে নীল চাষ করা হবে। ক্রমশ যাতায়াতের রাস্তায় নীল বুনতে থাকায় এবং নদীতে বা স্নানের ঘাটে যাওয়ার জন্যও মাশুল দাবী করতে থাকায় রায়তেরা উত্তেজিত হতে থাকল। অবশেষে তুফাজ্জিল আশি টাকা ঘুষ না দিলে গ্রামের মেয়েদের নীল কাটতে বাধ্য করবে এই হুমকি দিলে ক্ষেপে গেল একটি মুসলিম গ্রাম। গ্রামের লোকেরা ৪০ টাকা দিতে চাওয়ায় তুফাজ্জিল লোক পাঠিয়ে গ্রামের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল। বন্দী গ্রামবাসীদের উদ্ধার করার চেষ্টার মধ্যে দিয়েই রায়তদের সঞ্চিত ক্রোধ ফেটে পড়ল। রায়তদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত তিন ছোট জোতদার মোরাদ বিশ্বাস, সৌহাস বিশ্বাস ও লালচাঁদ সাহা রায়তদের সংগঠিত ও উত্তেজিত করায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল, পিছনে ছিল প্রতিবেশী জমিদার যাদবন্ধু ঘোষের পরামর্শ। ১৮৬০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তুফাজ্জিল গ্রামে জমি মাপতে গিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়ে বুঝল যে অবস্থা বেগতিক। অতঃপর ঘোড়া ছুটিয়ে নীল কুঠিতে গিয়ে লুকানোর চেষ্টা করলেও তার পিছু পিছু তাড়া করে গেল তিন হাজার কৃষকের এক জনতা মোরাদ, সৌহাস ও লালচাঁদের নেতৃত্বে। তারা কুঠি আক্রমণ করল এবং তুফাজ্জিলকে টেনে বের করে বেদম প্রহার দিল। আটক রাখা কৃষকদের তারা ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। অসহায় ও ভীত কুঠির কর্মচারী ও পুলিশদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হল। এই ঘটনাটি সম্পর্কেই বাকল্যান্ড সাহেব বলেছিলেন যে অওরঙ্গাবাদ মহকুমার এনড্রুজ কোম্পানীর আনকুরা (আগুকারা) নীলকুঠির উপরেই নীলবিদ্রোহীরা সর্বপ্রথম আক্রমণ পরিচালনা করে।[৭২] উত্তেজিত কৃষকেরা আনকুরা কুঠি আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হতে চাইল না। তারা তাদের তিন নেতার নেতৃত্বে পরদিন সকালেই এনড্রুজ্ কোম্পানীর আর একটি নীলকুঠি কালাপানি কুঠি আক্রমণ করতে গেল ম্যানেজার ম্যাকলিওড সাহেবের সহকারী রাইস সাহেবের স্ত্রী ও মেয়েদের দিয়ে নীলগাছ কাটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু রাইস পরিবার আগের রাত্রেই পালিয়ে গিয়েছিল। নেতারা রায়তদের নিয়ে রীতিমত লাঠি খেলে কুঠি আক্রমণের মহড়া দিতে থাকল এবং অবেশেষে নেতাদের দ্বারা নিরস্ত হয়ে ফিরে গেল। কৃষকদের এই সঙ্ঘবদ্ধ ও জাগ্রত রূপ দেখে অওরঙ্গাবাদ কনসার্নের মালিক তুফাজ্জিলকে বরখাস্ত করে এবং জমিদার যাদবন্ধুর ভাই দ্বারকানাথকে কুঠির গোমস্তা নিযুক্ত করে বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। তিন নেতা এবং জমিদার এই ফয়সালায় সন্তুষ্ট হল এবং রায়তদের শান্ত রাখার চেষ্টা করতে থাকল।

কিন্তু রায়তদের কাছে আগের জমিতেও নীল চাষের বোঝা ভীষণ ভারী বোধ হতে থাকল এবং তারা একদিকে নীলকরদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখতে এবং একেবারেই নীল চাষ বন্ধ করে দিতে মনস্থ করল। ফলে নেতারা বন্যার যে স্রোতকে পথ করে দিয়েছিল তারই তোড়ে তারা নিজেরাই ভেসে গেল, যে আন্দোলনকে তারা চালনা করছিল তারা

তারই বন্দী হয়ে পড়ল। অন্যদিকে এনড্রুজ কোম্পানীর অন্য কর্মচারীরাও চাইছিল যাতে কৃষকদের আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং অত্যাচারী ম্যানেজার ম্যাকলিওড পদত্যাগে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতেই কয়েকশো লোক মোরাদ বিশ্বাস, সৈহাস বিশ্বাস ও লালচাঁদ সাহার নেতৃত্বে গঙ্গা পার হয়ে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের ২০ শে মার্চ মালদহ জেলার কালিয়াচক থানায় অবস্থিত এনড্রুজ কোম্পানীরই মালিকানাধীন বকবাবাদ নীলকুঠি আক্রমণ করল। এই আক্রমণে তারা কুঠির অফিস ও জিনিষপত্র তছনছ করল, হিসাবের খাতা নষ্ট করে দিল, ম্যানেজারের বাড়ি আক্রমণ করল এবং সেখান থেকে কিছু জিনিষপত্রের সঙ্গে লুঠ হল কয়েকটি বন্দুক ও একটি তলোয়ার। পরিস্থিতি যে চেহারা নিয়েছিল সরকারী প্রতিবেদনেই তা প্রকাশ পেয়েছিল : "নীল চাষের বিরুদ্ধে রায়তেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠল, হিন্দু-মুসলমান সকল রায়ত মিলে প্রতিজ্ঞা করল, একগ্রামে রায়তদের ঢাক বাজিয়ে অন্য গ্রামের রায়তদের সাহায্যে ডাকা হতে থাকল, কুঠিয়ালদের লোকেরা আক্রমণ করলে অথবা জমিতে জোর করে নীল বুনতে চেষ্টা করলে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠতে থাকল ; ঢাকের বাজনার সংকেতে অল্প সময়েই গন্ডগোলের জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রায়তেরা বিপুল সংখ্যায় হাজির হতে থাকল, পুলিশ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রায়তদের দিকে চলে এল ; গোটা পরিস্থিতিই রায়তদের নিয়ন্ত্রণে এসে গেল।"[৭৩]

বকবাবাদ কুঠি আক্রমণ করার পর উত্তেজিত কৃষকদের নেতারা গঙ্গার অপর পাড় থেকে সরিয়ে এনে পার্শ্ববর্তী মিঃ লায়ন্সের বেনিয়াগ্রাম কুঠি আক্রমণের পরিকল্পনা করল। লায়ন্সের কুঠির কিছু কর্মচারী রায়তদের উপর অত্যাচার করলেও লায়ন্সের বিরুদ্ধে কোন বড় রকমের অভিযোগ রায়তেরা কখনো আনেনি। কিন্তু মোরাদ বিশ্বাস কিছুদিন ধরেই চাষীদের উত্তেজিত করে আসছিল লায়ন্সের কুঠি আক্রমণের জন্য। মোরাদ এই কুঠিতে এক সময় খাজনা আদায় করত এবং মোরাদের মুসলিম প্রজারা অনেকেই ছিল লায়ন্সের নীল চাষী। লায়ন্সকে ভয় দেখিয়ে মোরাদ প্রায় তাকে বাধ্য করে এনেছিল কুঠির গোমস্তা পদে মোরাদকে নিযুক্ত করতে, ঠিক যেভাবে ডেভিড এনড্রুজ বাধ্য হয়েছিল দ্বারকানাথকে নিযুক্ত করতে। ফলে মোরাদ নীল কুঠিয়াল লায়ন্সের সঙ্গে বোঝাপড়া করে লড়াই থেকে রায়তদের সরিয়ে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু রায়তেরা এককাট্টা হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে লায়ন্সের কুঠি আক্রমণের সিদ্ধান্ত থেকে সরল না এবং মোরাদ বাধ্য হল তার ছেলে কুতুব বিশ্বাসকে বিদ্রোহীদের দলভুক্ত করার প্রস্তাব দিতে। পরদিন ২১শে মার্চ, ১৮৬০ সাল, সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে এনড্রুজের কুঠির অধীন রায়তেরা সহ অসংখ্য রায়ত তরোয়াল বর্শা ইত্যাদিতে সশস্ত্র হয়ে লায়ন্সের বেনিয়াগ্রাম কুঠি আক্রমণ করল। অল্প কয়েকজন মাত্র রক্ষী থাকায় কুঠিয়াল লায়ন্স ভীত হয়ে আক্রমণকারী রায়তদের উপর গুলি চালান। ফলে মারা গেল ২ জন, এবং আহত হল পাঁচ জন। উত্তাল প্রতি আক্রমণে লায়ন্সের কুঠির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া অবধারিত হয়ে উঠল। কিন্তু ঘটনাক্রমে একটি সরকারী স্টীমার এইচ. এম. এস. পাইওনীয়ার কুঠির উল্টোদিকের ঘাটে এসে ভিড়ল এবং স্টীমার থেকে এসে সরকারী লোকেরাই— সুনিশ্চিতভাবে সশস্ত্র লোকেরা— লায়ন্সকে উদ্ধার করল। ঐ স্টীমারেই মোরাদ বিশ্বাসকে ধরে বিচারের জন্য বহরমপুর নিয়ে যাওয়া হল। লালচাঁদ সাহা এবং অপর এক নেতা রতন মন্ডলকেও বহরমপুরে গ্রেপ্তার করা হল ; সর্বসাকুল্যে গ্রেপ্তার হল ২৪ জন প্রধান আক্রমণকারী। মার্চ মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই এলাকা শান্ত হয়ে গেল।[৭৪] কিন্তু বেনিয়াগ্রামের ঘটনার পর নীল আন্দোলন আর ঐ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকল না। শামসেরগঞ্জ থানার কাশিমনগর, মীরতোলা, পাঁচগাছা ও আরো ১০/১৫

টি গ্রামেব কৃষকবা নীল না বোনাব সংকল্প কবল। ধুববিবোনা কুঠিব গোমস্তাকে প্রচন্ডভাবে পিটিযে বাস্তায ফেলে বাখা হল। নিকটবর্তী বাধাকৃষ্ণপুব কুঠিতে কে বা কাবা আগুন লাগিযে দিল। মুর্শিদাবাদ থেকে গঙ্গা পাব হযে বিদ্রোহীবা উত্তববঙ্গেব জেলাগুলোতেও বিদ্রোহেব আগুন ছড়িযে দিল। অন্যান্য কুঠিও লুঠ হবে এমন কথা শোনা যেতে থাকল।[৭৫] নীল বিদ্রোহেব এইবকম চবম অবস্থায ১৮৬০ সালেব ৩১শে মার্চ বাংলাদেশে নীল চাষেব অবস্থা এবং কৃষকদেব অভিযোগ তদন্ত কবাব জন্য পাঁচজন সদস্য নিযে নীল কমিশন গঠিত হল। সন্দেহেব কোনই অবকাশ নেই যে উত্তব মুর্শিদাবাদেব ক্রমশ হিংসাত্মক হযে উঠ্তে থাকা নীল আন্দোলনই সবকাবকে বাধ্য কবল নীল কমিশন গঠন কবতে।[৭৬]

অওবঙ্গাবাদ মহকুমাব কৃষক অভ্যুত্থান এই সত্যকে তুলে ধবেছিল যে কৃষক আন্দোলন একবাব গতিবেগ অর্জন কবলে সাধাবণ কৃষকদেব মধ্যে থেকেই নতুন নতুন নেতাদেব আবির্ভাব ঘটে, ক্রমশ নীচেব স্তবেব কৃষকদেব হাতে উদ্যোগ চলে যেতে থাকে এবং কৃষকদেব মধ্যে যাবা পিছিযে পড়তে থাকে তাদেব হয ফেলে দিযে নয ভাসিযে নিযে আন্দোলন এগিযে যায অপ্রতিবোধ্য গতিতে। অওবঙ্গাবাদে এই আন্দোলন শুরু হযেছিল জমিদাবেব উস্কানিতে "অত্যাচাবী নীলকবেব ততোধিক অত্যাচাবী গোমস্তাকে সবাবাব জন্য। জমিদাবেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবাব পব তিনি আন্দোলন বন্ধ কবে দিতে চেযেছিলেন, কিন্তু সংগ্রামেব মধ্য দিযে তখন কৃষকদেব মধ্যে আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছে তাবা জমিদাবকে উপেক্ষা কবে নীলচাষ বন্ধ কবাব আন্দোলনেব দিকে নিজেদেব নেতৃত্বে অগ্রসব হযে গেল।"[৭৭] কিন্তু আবাব এই অগ্রগতিব পথে যখন নেতাদেব মধ্যেই কেউ বাধা সৃষ্টি কবতে চেষ্টা কবেছে তখন জাগ্রত কৃষক জনতা সেই নেতাকেই বাধ্য কবেছে আন্দোলনেব সঙ্গে সামিল থাকতে। এবং অনিবার্যভাবেই কৃষক আন্দোলনকে মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হযেছে বাষ্ট্রযন্ত্রেব।

॥ আট ॥

মুর্শিদাবাদ জেলায নীল চাষ ও নীল উৎপাদনকে কেন্দ্র কবে উনিশ শতকে যে অসন্তোষ দেখা দিযেছিল তাব সঠিক প্রকৃতি নির্ধাবণ না কবলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। প্রথমত দেখা প্রযোজন মুর্শিদাবাদ জেলাব ভূমি সম্পর্কেব পবিবর্তনশীল পবিপ্রেক্ষিতে নীলকব ও নীলচাষেব ভূমিকা কী বকম ছিল। দ্বিতীয়ত নির্ণয কবা আবশ্যক মুর্শিদাবাদ জেলায নীল-অসন্তোষেব ও তাব বহিঃপ্রকাশেব বিশেষ প্রকৃতি এবং এই বিশেষত্বেব কাবণগুলি।

আলোচ্য সমযে মুর্শিদাবাদেব ভূমি-ব্যবস্থায স্তব-বিন্যাসেব রূপান্তবে ১৭৯৩ সালেব চিবস্থাযী বন্দোবস্ত, ১৮১৯ সালেব পত্তনি আইন, ১৮৫৯ সালেবা বাজস্ব আইন এবং ১৮৮৫ সালেব প্রজাসত্ব আইন উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন।[৭৮] প্রথম আইনটি সৃষ্টি কবেছিল ইংবেজ ব্যবসাযী ও সবকাব-নির্ভব মুর্শিদাবাদ জেলাব নতুন জমিদাবশ্রেণীকে; দ্বিতীয় আইনেব ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদে গড়ে উঠেছিল বিবাট মধ্যসত্ত্বভোগী পত্তনিদাব-ইজাবাদাব ইত্যাদিকে নিযে জমিদাবদেব অধস্তন এক পবজীবি গোষ্ঠী। তৃতীয ও চতুর্থ আইনটিতে প্রথম ও দ্বিতীয আইনেব বিরূপ ফলাফলকে অতিক্রম কবে মুর্শিদাবাদেব বায়ত প্রজাদেব কিছু কিছু সুযোগসুবিধা দেওযাব চেষ্টা হযেছিল। মুর্শিদাবাদেব কৃষি অর্থনীতি মূলত এই বড়-মাঝাবি-ছোট বাযত চাষীদেব প্রধানত খাদ্য উৎপাদক পবিপোষক কৃষিকে আশ্রয় কবেই আবর্তিত হত— কৃষি-ব্যবস্থায় বায়ত-চাষীদেব

শ্রেণী-প্রতিপক্ষ ছিল জমিদাব-মধ্যসত্বভোগীবা। নীলকবেবা মুর্শিদাবাদেব কৃষি অর্থনীতিব এই কাঠামোব মধ্যেই তাদেব নীলচাষ ও নীল উৎপাদনে এগিযে এসেছিল।[৭৯] ১৮৩৩ সালেব পূর্বে নীলকবেবা নিজ আবাদে যে নীল চাষ শুরু কবেছিল তা মূলত ছিল বাযতচাষী হিসাবেই স্বনামে বা বেনামে; কিন্তু নীল চাষ ও উৎপাদনেব আযতন প্রচলিত নানা মাপেব বাযতী কৃষিব আযতন থেকে এতই বড ছিল এবং এত বেশী মজুবেব প্রযোজন ছিল এতে, কৃষি ও শিল্পেব যে সংমিশ্রণ ঘটেছিল এখানে তাব ফলে নীলকবেবা প্রথম থেকেই বাযতদেব থেকে পৃথক একটি বাস্তব অর্থনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে দেখা দিযেছিল, যদিও আইনেব চোখে মোটামুটিভাবে তাবা বাযতদেব সগোত্রীয ছিল। আব বাযতচাষীদেব সঙ্গে নীলকবদেব এই বাস্তব পার্থক্য ক্রমশ সুস্পষ্ট হযে উঠতে থাকে নীলকবেবা লাভজনক নয বলে নিজ আবাদ ছেড়ে প্রথম থেকেই ক্রমশ বাযতী আবাদেব দিকে ঝুঁকতে থাকায। এভাবেই নীলকবেবা বাযত-চাষীদেব শ্রেণী-প্রতিপক্ষেব রূপ গ্রহণ কবতে থাকে। বাযতী চাষেব মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিযুক্ত পবিপোষক কৃষি থেকে অর্থকবী নীলচাষেব দিকে বাযতদেব টানতে চেষ্টা কবেছিল নীলকবেবা। নীলচাষ তুলনামূলকভাবে লাভজনক হলে বাযতবা স্বেচ্ছায নীলচাষ কবতে থাকত; কিন্তু বাযতদেব পক্ষে নীলচাষ লাভজনক না হওযায নীলকবেবা বলপ্রযোগেব সাহায্যেই বাযতদেব দিযে নীলচাষেব চেষ্টা কবতে থাকল। আব এই প্রচেষ্টায নীলকবেবা প্রাথমিক কিছু বাধাব পব সাহায্য ও সমর্থন পেযেছিল দেশী জমিদাব ও মধ্যস্বত্বভোগীদেব কাছ থেকে। ১৮৩৩ সালেব পব অবস্থাব উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন ঘটে গেল। নীলকবেবা জমিদাবী ও পত্তনী ইত্যাদি নানা প্রকাবেব মধ্যস্বত্ব কিনে মুর্শিদাবাদেব কৃষি-ব্যবস্থায বাযত-চাষীদেব শ্রেণী-প্রতিপক্ষ জমিদাব-মধ্যস্বত্বভোগীদেব মধ্যে নিজেদেব জাযগা কবে নিল এবং তাদেব শোষণকে আবো পাকাপোক্ত কবে তুলতে সক্ষম হল।[৮০] এইভাবে তাবা বিদ্যমান শ্রেণী-সম্পর্ককে নিজেদেব উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহাব কবল। কিন্তু মুর্শিদাবাদেব গ্রামাঞ্চলে তাদেব নতুন আইনগত ভূমিকাকে নীলকবেবা যেভাবে ব্যবহাব কবতে থাকল ত'তে দেশী জমিদাব মধ্যস্বত্বভোগীদেব থেকে তাদেব পার্থক্য শুধু যে স্পষ্টই হযে উঠল তাই নয, এব ফলে দেশী বাযতদেব মতই দেশী জমিদাব ও মধ্যসত্বভোগীবাও ক্রমশ চলে গেল নীলকবদেব বিরুদ্ধে। ১৮৫০-৬০ সালেব মধ্যে এইবকম পবিস্থিতিবই মুখোমুখি হল নীলকবেবা। নীল অসন্তোষেব সামাজিক ভিত্তি ছিল এইবকমই। ১৮৬০ সালেব পবে যে-সব নীলকব নীলশিল্পে যুক্ত থাকল তাবা হয নিজ আবাদে নয বাযতদেব স্বেচ্ছা-উৎপাদনেব উপব নির্ভবশীল হযে থাকল; তবে এই সমযেব পব থেকে নীল উৎপাদনে লাভেব চাইতে জমিদাবী ও মধ্যস্বত্বেব খাজনা ও উপসত্ব বাড়ানোব দিকে নীলকবেবা সচেষ্ট হযে উঠল।

এবাবে মুর্শিদাবাদেব নীল আন্দোলনেব বিশেষত্ব। সাবা বাংলাদেশেব মত মুর্শিদাবাদেও নীলচাষেব শুরু থেকেই প্রায সত্তব বছব ধবে নীলচাষীবা নীলকবদেব সীমাহীন অত্যাচাবেব শিকাব হযেছিল এবং জেলাব নানা প্রান্তেই নানা সমযে বিক্ষোভ ও প্রতিবোধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এই সকলই ছিল মূলত বিচ্ছিন্ন ও সংকীর্ণভাবে আঞ্চলিক। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেব দিক থেকে অদৃষ্টবাদী, স্বভাবত মন্থব ও গতিহীন কৃষি-নির্ভব জীবনযাত্রা যে নিবাপদ ও সংকীর্ণ স্বার্থকেন্দ্রিকতাব সৃষ্টি কবেছিল তাব ফলে নীলচাষীবা শ্রেণীগতভাবে সুসংগঠিত হযে প্রতিবাদমুখব হয়ে উঠতে পাবেনি। কিন্তু উনিশ শতকেব পঞ্চাশেব দশকে দেশীয় জমিদাব, মধ্যসত্বভোগী, জোতদাব-মহাজন শ্রেণীব একাংশ ও মধ্যবিত্ত পেশাজীবিবা অত্যাচাবিত বিক্ষুব্ধ নীলেব

রায়তচাষীদের সাহায্য ও সমর্থনে এগিয়ে আসার ফলেই খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আঞ্চলিক অসন্তোষ সঙ্ঘবদ্ধ ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করল।[৮১] নীল বিক্ষোভ বাংলার যে-সকল জেলায় অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছিল নদীয়া ও যশোর ছাড়া মুর্শিদাবাদই ছিল তাদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। সৈন্যাবাসযুক্ত মুর্শিদাবাদেও অতিরিক্ত সৈন্য আনতে হয়েছিল নদীয়া ও যশোরের মতই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে, যদিও লক্ষ্যণীয়ভাবে তাদের ব্যবহার করতে হয়নি।[৮২] শুধু তাই নয়, ১৮৫৯-৬০ সালের নীল আন্দোলনে একমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই রায়তদের দ্বারা নীলকুঠি আক্রমণের সময়ে দুটি জীবনহানির মত অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল।[৮৩] নীল চাষ-বিরোধী শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলন অন্যান্য জেলার তুলনায় এ জেলায় এতখানি জঙ্গী এবং তীব্র কেন হয়ে উঠেছিল তার কারণ হিসাবে সুনিশ্চিতভাবেই এই জেলার নীল চাষীদের উপর ওহাবি-ফারাজি আন্দোলন, সাঁওতাল-বিদ্রোহ এবং ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রভাবকে চিহ্নিত করতেই হয়; অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল বিদ্রোহ অধিকতর জঙ্গী হয়ে উঠল না কেন তারও অনেকখানি ব্যাখ্যা মিলবে এ-জেলায় এবং আশেপাশে সাঁওতাল-বিদ্রোহ দমনের বিভৎসতার মধ্যে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নদীয়া ও যশোরের নীল-বিদ্রোহকে সমর্থন করতে যত ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছিল, কলকাতা থেকে দূরবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলায় তারা সেই পরিমাণে এই বিদ্রোহের পিছনে এসে দাঁড়ায়নি। ফলে মুর্শিদাবাদ জেলার নীল-বিদ্রোহ যতখানি সংগঠিত ছিল তার চাইতে অনেক বেশী ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সুতরাং অন্য নীল-জেলাগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে এ-ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার অনন্যতা সহজেই চোখে পড়ে।

পাটনার ওহাবি কেন্দ্রের সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার মধ্যে দিয়ে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের ওহাবিকেন্দ্রগুলির যোগসূত্ররচনার ক্ষেত্রে ১৮৪০ সালের পরে জঙ্গীপুর মহকুমার মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গড়ে ওঠে; এ-ছাড়াও মালদহের গুরুত্বপূর্ণ ওহাবি কেন্দ্রগুলির প্রভাবও এসে পড়েছিল এ অঞ্চলে। জঙ্গীপুর মহকুমায় চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে নীলকর-বিরোধী আন্দোলন দেখা যায় তার উপর এই ওহাবি বা তরীকা-ই মহম্মদীয়া আন্দোলনের প্রভাব ওহাবি বিচারের সময়ে প্রমাণিত হয়েছিল। মালদহের ওহাবি প্রচারক রফিক মণ্ডল ও তাঁর পুত্র আমিরুদ্দিন ১৮৫৭ সালের আগে ও পরে মালদহ ও রাজসাহী জেলার মত মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু কিছু অংশেও নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৮৪] ফারাজী আন্দোলন দুধু মিঞার নেতৃত্বে যে ব্যাপক [illegible] সংগঠন লাভ করেছিল তা ১৮৫০-এর দশকে প্রতিবেশী রাজসাহী, যশোর ও নদীয়া জেলা থেকে এসে মুর্শিদাবাদের পূর্বাঞ্চলে বা বাগড়ি এলাকায় এবং জঙ্গীপুর মহকুমায় বৃত্তিচ্যুত জোলা মুসলিমদের মধ্যে [illegible] নীলকর শোষণের বিরোধিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।[৮৫] মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলের উত্তরাংশে ও সারা বাগড়ি অঞ্চলে নীলকুঠিগুলো ছড়িয়ে থাকায় এবং এই অঞ্চলের রায়তচাষীরা প্রধানত মুসলিম হওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদের নীলকর-বিরোধী আন্দোলনে মুসলিমদের বিশেষভাবে মুসলিম ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের, ভূমিকা ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য; স্বাভাবিকভাবেই ওহাবি-ফারাজি আন্দোলনের জঙ্গী প্রভাব এসে নীলকর-বিরোধী আন্দোলনের উপর পড়েছিল। কিন্তু এই ওহাবি-ফারাজী আন্দোলনের প্রভাব অন্য নীল জেলাগুলোতেও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল বলে এ-ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়; কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রভাব নীল জেলাগুলোর

মধ্যে একমাত্র মুর্শিদাবাদকেই ভালভাবে স্পর্শ করে গিয়েছিল এবং পরবর্তী নীল বিদ্রোহে সুনিশ্চিত ছায়াপাত ঘটিয়েছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) মুর্শিদাবাদের অওরঙ্গাবাদ (বর্তমান জঙ্গীপুর) মহকুমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। "সেদিন সাঁওতালদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল কুমোর, তেলী, কর্মকার, চামার, ডোম, মোমিন সম্প্রদায়ের গরীব মুসলমান ও গবীব হিন্দু জনসাধারণ।"[৮৬] আর এই সাঁওতাল বিদ্রোহ যে সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ী আর ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের ইউরোপীয় নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হয়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্য। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও সাঁওতাল বিদ্রোহের এই নীলকর-বিরোধী চেহারা প্রকাশ পেয়েছিল। রাজমহালের পাশাপাশি অওরঙ্গাবাদের নীলকুঠিগুলিও আক্রান্ত হয়। অওরঙ্গাবাদের অনেকগুলি নীলকুঠি বন্ধও হয়ে যায়। হেনশ নামে এক নীলকর ও তার দুই পুত্রকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। ১৮৫৫ সালের ১৪ই জুলাই ৫০০০ সাঁওতাল পাকুড় শহরের কয়েকমাইল দক্ষিণ-পূর্বে কদমসায়ের গ্রামে অম্বরের রাজার বাড়ি ও ঐ "গ্রামের কুখ্যাত নীলকর মাসেইক সাহেবের কুঠি আক্রমণ" করে। মাসেইক সাহেবের ভাই ধুলিয়ান থেকে বহু লাঠিয়াল ও ১৬০ জন পুলিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করলে সাঁওতালরা পাকুড়ের দিকে সরে যায়। ফলে অম্বব রাজবাড়ি ও কদমসাযের কুঠি রক্ষা পায়।[৮৭] মুর্শিদাবাদ জেলায় অল্পদিন পরেই নীল অসন্তোষের সময়ে এই চার্লস বি. মাসেইক সাহেবই তার অত্যাচরের জন্য আবার অশান্তির কেন্দ্রবিন্দু হযে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সরকারের কাছে শাস্তিলাভ করেছিল। যে বীভৎসতা ও অমানুষিকতার সঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং বিদ্রোহীদেব বিচারের জন্য জঙ্গীপুরে আনা হয় তার ফলে মুর্শিদাবাদের ঐ অঞ্চলের জন সাধারণের মধ্যে চাপা সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং তা যে-ভাবে দমিত হয় তা মুর্শিদাবাদের নীলকব-বিরোধী আন্দোলনের উপর সুনিশ্চিতভাবে প্রভাব ফেলেছিল এই আন্দোলনকে অধিকতর জঙ্গী হয়ে উঠতে দেয়নি। অন্যকোনও নীল জেলায় এরকমটা ঘটতে দেখা যায়নি।

১৮৫৭ সালেব ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ এখানেই ১৮৫৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী শুরু হয়েছিল। বহরমপুর ব্যারাকের সিপাহীদের বিদ্রোহের খবর মুর্শিদাবাদ শহবে পৌঁছে যাওয়া মাত্র "মুর্শিদাবাদের সহস্র সহস্র লোক বিদ্রোহের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল" এবং একটি বে-সামরিক বিদ্রোহের সম্ভাব্য আশঙ্কায় জেলার ইংরেজরা বিচলিত হযে উঠেছিল।[৮৮] ও'ম্যালী লিখেছেন যে বহরমপুরের বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়া কৃষ্ণনগব, যশোহর ও সমগ্র ডিভিসনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইংবেজদের ভয় দেখা দিয়েছিল যে হৃতরাজ্য বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব বংশের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের জনসাধাবণ বিদ্রোহী সিপাহীদের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে এবং তার ফলে "all Bengal would soon be in blaze"। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের পক্ষে দাঁড়ানোয় ইংরেজরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। তাদের মনে হয়েছিল, মুর্শিদাবাদের মুসলিমদের মনে যে উত্তেজনাই সৃষ্টি হয়ে থাকুক তাদের নেতার কাছ থেকে কোন সংকেত না পাওয়ায় তারা বাহ্যত শান্ত হয়ে গেছিল। কিন্তু বাইরে শান্ত থাকলেও মুর্শিদাবাদের মুসলিমরা অন্তরে যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল পরিস্থিতিগত প্রমাণে তা অনুমান

কবাব সঙ্গত কাবণ আছে। ১৮৫৭ সালেব ফেব্রুযাবী মাস থেকে ডিসেম্বব মাস পর্যন্ত ভাবতেব নানা প্রান্তে যখন মহাবিদ্রোহ ছড়িযে পড়েছে তখন বহবমপুবে বাববাবই বিদ্রোহেব আশঙ্কা দেখা দিযেছে এবং এখানকাব মানুষেব মানসিক ভাবসাম্য অস্থিব বযে গেছে।[৮৯] জনসাধাবণেব এই মানসিক অস্থিবতাব পিছনে সুনিশ্চিতভাবে দুটি কাবণ কাজ কবছিল : একটি ওহাবি-ফাবাজি আন্দোলনেব অন্তঃসলিলা প্রবাহ এবং অন্যটি নীলকব-বিবোধী অসন্তোষ। মুর্শিদাবাদে ফাবাজী আন্দোলনেব ক্ষীণ প্রভাব এই সমযেব পূর্বেই এসে পৌঁছেছিল ; ফাবাজীবা এই মহাবিদ্রোহেব কালে যে-বকম ইংবেজ-বিবোধী ভূমিকা ঢাকা ও ফবিদপুব জেলায নিযেছিল এ-জেলায ঠিক সেইবকম ভূমিকা না নিলেও উত্তেজনা যে প্রভূত পবিমাণে সঞ্চাবিত হযেছিল তা অনুমেয আব পববর্তীকালেব ওহাবী বিচাবেব সময়ে তো একথা প্রমাণই হযে গিযেছিল যে মুর্শিদাবাদেব অভিজাত সুন্নী মুসলিমদেব মধ্যে তবীকা-ই-মহম্মদীযাব জেহাদ আন্দোলন ১৮২০ সালেব পব থেকেই প্রভাব বিস্তাব কবেছিল ; শুধু তাই নয বহবমপুব সৈনাবাসে জেহাদ প্রচাবেব সময মৌলভী আবদুল্লা নামে একজন প্রচাবক ধবাও পড়ে।[৯০] এ-ছাড়াও মুর্শিদাবাদ ও বহবমপুব শহবেব পূর্ব দিকেব নিকটবর্তী গ্রামগুলোতেও একাধিক নীলকুঠি ও তাদেব জোবজুলুমে সৃষ্ট অসন্তোষেব একটি স্রোত বিদ্যমান ছিলই এবং এই অসন্তোষ সমগ্র বাগড়ি অঞ্চলেই পবিব্যাপ্ত ছিল। এই পবিপ্রেক্ষিতেই বহবমপুব ব্যাবাকেব ঘটনাব কযেকমাসেব মধ্যেই আগস্ট মাসে জেলাব বাগড়ি অঞ্চল থেকেই তিনজন প্রতিপত্তিশালী নীলকবকে অনবাবি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত কবাব ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মহাবিদ্রোহেব ফলে ইংবেজ ও ভাবতবাসীব মধ্যে যে তীব্র জাতিগত বিদ্বেষ অতিদ্রুত দানা বাঁধছিল এই ঘটনাব মধ্যে দিযেই তাবই প্রতিফলন লক্ষ্য কবা যায়, ইংবেজবা গ্রামাঞ্চলকে নিযন্ত্রণে বাখাব ব্যাপাবে তাদেব অনুগত দেশীয় জমিদাবদেব উপব আব আস্থা বাখতে সমর্থ হচ্ছিল না। আমবা আগেই দেখেছি নীলকবদেব এইভাবে অনবাবি ম্যাজিস্ট্রেট কবাব ফলে অসন্তুষ্ট জমিদাবেবা কীভাবে নীল-বিদ্রোহকে পবিপুষ্ট কবেছিল। মহাবিদ্রোহেব অব্যবহিত পবেই, শুধু মুর্শিদাবাদেই নয, সাবা বাংলাদেশেই নীলচাষ-বিবোধী অসন্তোষ যে-বকম বিস্ফোবক চেহাবা নিযেছিল তাতে গভর্নব জেনাবেল লর্ড ক্যানিং মন্তব্য কবতে বাধ্য হয়েছিলেন,— "I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in lower Bengal in flames"[৯১] ভীত এবং নির্বোধ এক নীলকবেব বন্দুক গর্জে উঠেছিল এবং তা উঠেছিল এই মুর্শিদাবাদেব মাটিতেই বায়তচাষীব অমূল্য প্রাণেব বিনিময়ে। কিন্তু আশ্চর্যেব ব্যাপাব, সাবা বাংলাদেশ তো দূবেব কথা এই মুর্শিদাবাদেও এব ফলে নীলকুঠিগুলোয় আগুন জ্বলে ওঠেনি। ওহাবি ফাবাজী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ভাবতীয় মহাবিদ্রোহ এই ত্রিমুখী গণজাগবণেব যে স্রোত মুর্শিদাবাদে এসে পড়েছিল নীল অসন্তোষেব মধ্যে দিয়ে তাব যে-বকম বহিঃপ্রকাশেব সম্ভাবনা ছিল বাস্তবে সেবকম কিছুই ঘটল না। সাঁওতাল-বিদ্রোহ-মহাবিদ্রোহ দমনেব নির্মমতা, নীল অসন্তোষ দূবীকবণে সবকাবী প্রচেষ্টাব শুরু, না, নীল আন্দোলনেব প্রতি ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত সমর্থন— এইসকল কাবণেব ঠিক কোন্ ধবনেব বিন্যাসেব ফলে 'নীল বিদ্রোহ' আসলে নীল-বিক্ষোভই থেকে গেছিল, বিদ্রোহ হয়ে ওঠেনি, তা ইতিহাসেব ছাত্রদেব বিচাব কবে দেখা উচিৎ।

**নয় ॥**

১৮৩০-৩৩ সালে এজেন্সী হাউসগুলোব এবং ১৮৪৭ সালে ইউনিযন ব্যাঙ্কেব পতনেব ফলে নীলকুঠিগুলোব পুঁজিব উৎস সামযিকভাবে শুকিযে গেলেও এবং কুঠিগুলোব সামযিক বিপর্যয ঘটলেও বাংলাদেশে নীলচাষ নীল বিদ্রোহেব বছব ১৮৬০ সাল পর্যন্ত বেড়েই চলেছিল। নীল বিদ্রোহ সুনিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশেব কৃষি ও শিল্পেব এক প্রধান ধাবা হিসাবে নীলচাষেব দ্রুত পতন ঘটাতে সমর্থ হযেছিল। নীল বিদ্রোহেব ফলে নীলচাষ বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে উঠে গেল না, তবে বলপ্রযোগেব সাহায্যে নীলচাষ একেবাবে বন্ধ হযে গেল, নীলচাষ বাযতদেব স্বেচ্ছাধীন হযে উঠল। ১৮৪৭ সালেব পব থেকে বাংলাদেশেব নীলকুঠিগুলোতে যে বৃটিশ পুঁজি খাটছিল সেই পুঁজি সবিযে নিযে গিযে বিহাবে নীলচাষেব ক্রম-প্রসাবেব পথ প্রশস্ত কবা হল।

মুর্শিদাবাদ জেলাতেও নীলচাষ ও উৎপাদনেব উপব নীল বিদ্রোহেব সুদূব প্রসাবী প্রভাব পড়েছিল। ১৮৭৬ সালে হান্টাব লিখেছেন, "জেলাব নানা প্রান্তে এখন অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত নীলকুঠি দেখা যাবে এবং যে-সকল প্রতিষ্ঠান এখনও কাজ কবছে সেগুলিও নানাভাবে অসুবিধাগ্রস্ত।"[১২] হান্টাব প্রদত্ত হিসাব অনুযাযী ঐ সমযে কুঠিব বাৎসবিক উৎপাদন ছিল ৩০০ মন যাব তৎকালীন বাজাব দব প্রায ৭ লক্ষ টাকা। আব একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে নীল বিদ্রোহেব ফলে অন্যান্য জেলাতে নীলউদ্যোগগুলি দেশীয লোকেদেব হাতে চলে গেলেও বাজসাহি এবং মুর্শিদাবাদ জেলায তা ইউবোপীযদেব হাতেই থেকে গিযেছিল। যে-দুটি প্রতিষ্ঠান তখন মুর্শিদাবাদে উল্লেখযোগ্য ছিল সে-দুটি হল মেসার্স জোহন এ্যান্ড ববার্ট ওযাটসন এ্যান্ড কোম্পানী এবং জার্ডিন, স্কীনাব এ্যান্ড কোম্পানী।[১৩] ববার্ট ওযাটসন কোম্পানী ১৯০০ সালে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীব কাছে তাদেব বেশমেব কাববাব বিক্রী কবে দেয এবং ১৯০০ থেকে ১৯০২ সালেব ভেতবেই মিঃ সি. বি. ক্রিগসন এবং স্যাব ডেভিড ইয়্যুল এই কোম্পানীব সমস্ত নীলেব কাববাব ক্রয কবে নেন এবং সেন্ট্রাল বেঙ্গল জমিদাবী কোম্পানী ও মেদিনীপুব জমিদাবী কোম্পানী নামে দুটি জমিদাবীব পত্তন কবেন। ১৯০৬ সালেব ডিসেম্বব মাসে এই দুটি জমিদাবী একত্রিত হযে "মেদিনীপুব জমিদাবী কোম্পানী" নাম ধাবণ কবে। কোম্পানীব নীলেব কাববাব ১৯০০ সাল থেকেই উঠে যায এবং কোম্পানীব প্রধান কাজ হযে ওঠে জমিদাবী, পত্তনি, দবপত্তনি, বাযতী ইত্যাদি জোত পবিচালনাব মাধ্যমে লাভ কবা।[১৪] বিশেষভাবে মুর্শিদাবাদ জেলাব দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কোম্পানী পত্তনি সহ বহুবকম মধ্যস্বত্ব জোতেব মালিক ছিল। প্রধানত বেশমেব কাববাবে যুক্ত অন্য একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান লুই পাযেন এ্যান্ড কোম্পানীও উনিশ শতকেব শেষ পর্যন্ত নীল উৎপাদনে নিযুক্ত ছিল। অন্য কতকগুলি নীল প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উনিশ শতকেব শেষ দশকেও কিছু খবব পাওযা যাচ্ছে। এই সমযে "বড় জঙ্গীপুব" (লুর্তিপুব কনসার্ন) ও "ছোট জঙ্গীপুব" এই দুটি প্রতিষ্ঠানেব অধীনে পাঁচটি কবে দশটি নীলকুঠি ছিল এবং দুটি প্রতিষ্ঠানেব মোট উৎপাদিত নীলেব পবিমাণ ভাল বছবেও ১২০০ মণ পৌঁছাত না। "ছোট জঙ্গীপুব" প্রতিষ্ঠান মাসেইক পবিবাবেব মালিকানা থেকে বাবু ভগবতী চবণ বাযেব মালিকানায় গিযেছিল। এই প্রতিষ্ঠানেব আঁকুবা (নীল বিদ্রোহ-খ্যাত আক্কুবা) কুঠিতে ১৮৮৯-৯০ সালে ২৫০০ বিঘা, ১৮৯৩-৯৪ সালে ১৮৩৫ বিঘা এবং ১৮৯৮-৯৯ সালে

৩২৫২ বিঘা নীল লাগানো হয়েছিল ; আঁকুরা কুঠিতে ১৮৯০-৯১ সালে ৫০ মণ থেকে ১৮৯৪-৯৫ সালে ১৪০ মণ নীল উৎপন্ন হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানেরই বেনিয়াগ্রাম কুঠিতে এই একই সময়ে গড়ে ১২০০ বিঘা জমিতে নীল চাষ হয়েছিল কিন্তু উৎপাদন ১৮৯৫-৯৬ সালে ২০ মণ থেকে ১৮৯৭-৯৮ সালে ৯২ মণের মধ্যে ওঠা নামা করেছিল। এ-জেলার পূর্বাঞ্চলের বাগানগর-জলঙ্গী থানা এলাকার বারমাসিয়া প্রতিষ্ঠানটির কয়েকটি কুঠি সম্পর্কেও কিছু খবর পাওয়া যায় : ১৮৯৭-৯৮ সালে বারামাসিয়া কুঠিতে নীলচাষ ছিল ৩২১৪ বিঘার এবং উৎপাদন হয় প্রায় ৮০ মণ, জাগীরপাড়া কুঠিতে চাষ ছিল ২৩০৩ বিঘার এবং উৎপাদন হয় প্রায় ৬১ মণ, খামারপাড়া কুঠিতে চাষ ছিল ২৪২৬ বিঘার এবং উৎপাদন হয় ৫০ মণ এবং কাৎলামারী কুঠিতে চাষ ৫৫০৩ বিঘা এবং উৎপাদন হয় প্রায় ১২৫ মণ নীল। কিন্তু শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই ১৮৯৮-৯৯ সালে বারমাসিয়া প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণ-পূর্ব মুর্শিদাবাদের চাঁদপুর কোম্পানী প্রতিষ্ঠানটির অধীনে নীলকুঠি ছিল চারটি— পাটকেবারি, বালী, মধুপুর ও সোনাটিকরী। পাটকোবারি কুঠিতে ১৮৮৯-৯০ থেকে ১৮৯৮-৯৯ সালের মধ্যে ৩৫৯৮ বিঘা থেকে ৮৪৩৩ বিঘার মধ্যে নীল চাষ হয়েছিল এবং নীল উৎপাদিত হয়েছিল ৪৭ মণ থেকে ৩৫৪ মণের মধ্যে ; বাকী তিনটি কুঠির প্রতিটির উৎপাদন গড়ে পাটকেবারি কুঠির চাইতে কম হয়েছিল ; এর মধ্যে মধুপুর কুঠিটি বন্ধ হয়ে যায় ১৮৯৮ সালে। আখেরীগঞ্জ কুঠিটি পদ্মার ভাঙনে বন্ধ হয়ে যায় ১৮৯৮-৯৯ সালে। ১৯০২ নাগাদও জেলায় ছোট জঙ্গীপুর প্রতিষ্ঠান, নুরপুর, সুজাপুর এবং চাঁদপুর প্রতিষ্ঠানটির পাটকেবারি, সোনাটিকরী এবং বালী এই কটি কুঠি চালু ছিল এবং ২২,২০০ একর জমিতে নীল চাষ করা হয়ে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ঐ সময়ে জেলায় তুঁত চাষ হয়েছিল ৭৫,০০০ একর জমিতে।[১৫] ১৮৮০ সালের পর জার্মান সিন্থেটিক নীলের তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নীলচাষের পক্ষে কোনক্রমেই আর লাভজনক থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে ১৯০৫ সালের পর জেলায় রেলপথ স্থাপনের ফলে প্রধানত নদীর ধারে গড়ে ওঠা নীলকুঠিগুলো অর্থনৈতিকভাবে একেবারে অচল হয়ে পড়ায় বন্ধ হয়ে গেল। বাংলার সবচেয়ে বড় ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প— নীলশিল্প— দীর্ঘকাল ধরে ক্রিয়াশীল যে দুটি আর্থ-সামাজিক শক্তির— গ্রামাঞ্চলে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব এবং শিল্পের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি— প্রভাবে বন্ধ হয়ে এল সে-দুটি শক্তিই মুর্শিদাবাদ জেলাতেও ছিল সমভাবেই সক্রিয়। এখানেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা মুর্শিদাবাদ জেলায় নীলচাষ ও নীল বিক্ষোভের ইতিহাস ; কিন্তু তা যে হয়নি তা দেখা যাবে পরের অনুচ্ছেদেই।

॥ দশ ॥

মুর্শিদাবাদ জেলায় নীলকাহিনীর শেষ পর্ব মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীকে নিয়ে। এই কোম্পানী যে ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠানটির উত্তরাধিকারী সেই মেসার্স রবার্ট ওয়াটসন কোম্পানী মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাঞ্চলে নীল বিদ্রোহের পূর্ববর্তী তিন-চার দশক ধরে নীল চাষীদের শোষণ ও অত্যাচারের সম্ভবত সর্বপ্রধান উৎস ছিল। ১৮৫৯ সালের খাজনা আইন এবং ১৮৬০ সালের নীল-বিদ্রোহের পর এই কোম্পানীর নীলচাষ অব্যাহত থাকলেও মূলত জমিদার ও পত্তনিদারের ভূমিকায় কোম্পানীর অত্যাচার নতুন চেহারা নেয়। বিশেষত মুর্শিদাবাদের কালান্তর অঞ্চলের

উঠ্‌বন্দী প্রজাদের সঙ্গে ওয়াটসন কোম্পানীর দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ শুরু হয়। ওয়াটসন কোম্পানীর উত্তরাধিকারী মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী ১৯০০ সাল থেকে নীলচাষ তুলে দিয়ে জমিদারী-সহ নানাপ্রকার ভূমিস্বত্বজাত মুনাফা বৃদ্ধির দিকে নজর দেয় এবং কৃষকদের সঙ্গে ওয়াটসন কোম্পানীর পুরোনো বিবাদ ও মামলা মোকদ্দমাকে আরো জোরদার করে তোলে।[১৬] মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জমিদারী কোম্পানীর প্রধান কাছাড়িগুলো অবস্থিত ছিল ডোমকল, পাট্‌কেবাবি, খড়িবোনা-নশীপুর এবং কক্সনপুরে। এই জেলায় মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন উইলিয়াম স্টেনহাউস ১৯০২ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত, ডোমকল কুঠিবাড়ীতে ছিল কোম্পানীর প্রধান দপ্তর। অত্যন্ত বদমেজাজী এবং অত্যাচারী স্টেনহাউসের সঙ্গে ডোমকল অঞ্চলের কৃষকদের প্রথম বিরোধ দেখা দেয় ১৯০৮-১৯০৯ সালে এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের তৎকালীন প্রখ্যাত অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ই.এম. হুইলারের উদ্যোগে এই বিরোধের মীমাংসা হয়।[১৭] এর পরেই মেদিনীপুর কোম্পানী এগিয়ে আসে এক নতুন নীল পর্বের সূচনা করতে। ১৯১৪ সালের পর মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর উদ্যোগে নদীয়া-রাজসাহি-সহ মুর্শিদাবাদ জেলাতেও নীলচাষের পুনঃপ্রবর্তন ঘটে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় জর্মানী থেকে বৃটিশ শাসনাধীন এলাকায় নীল আসা বন্ধ হয়ে গেল এবং নীলের দাম চারগুণ বেড়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে বাজারে নীলের যোগান বাড়ানোর জন্য বিহারে যেমন নীলকরেরা নীলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষীদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল, বাংলাদেশেও সেইরকম মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী তার জমিদারীর কুঠিগুলোতে পুনরায় নীলচাষ ফিরিয়ে আনতে শুরু করল। মুর্শিদাবাদ জেলায় মেদিনীপুর কোম্পানীর এই নতুন নীল নীতি কার্যকরী করতে স্টেনহাউস সচেষ্ট হলেন এবং ১৯১৭ সালে স্টেনহাউসের কার্যকাল সমাপ্ত হলে নতুন ম্যানেজার অত্যাচারী ই.ডব্লিউ. নিকল এই নীতিকেই অনুসরণ করতে থাকলেন।[১৮] আবার নীলচাষ ফিরে আসতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে নানা কৌশলে চাষীদের দিয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অনেক সময়েই ভয় দেখিয়ে নীলের চাষ বাড়ানোর চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু বৃটিশ শাসনের প্রতি দেশের লোকের মনোভাবে ইতিমধ্যেই যে মৌলিক পরিবর্তন এসে গেছে তার ফলে জেলার বৃটিশ প্রশাসকদের সমর্থনপুষ্ট ইউরোপীয় জমিদারী কোম্পানীর পক্ষে সাফল্যের সঙ্গে নীলের চাষ ফিরিয়ে আনার আর কোনই সম্ভাবনা ছিল না। শুধু তাই নয়, পুনরায় নীলের চাষ ফিরিয়ে আনাকে উপলক্ষ্য করেই যেন লোক-স্মৃতিতে নীলের পুরোনো অত্যাচার ও শোষণের আশঙ্কা আবার দেখা গেল। এর ফলেই আবার নতুন করে দেখা দিল নীল বিক্ষোভ। ১৯১৭ সালে বিহারে নীলকরদের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু হল চম্পারণ সত্যাগ্রহ, ১৯১৯ সাল থেকে শুরু হল বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনেরই তরঙ্গ-আঘাতে বাংলাদেশে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর বিরুদ্ধে শুরু হল কৃষক আন্দোলন— কৃষকদের নীলচাষের বিরোধী প্রতিরোধের ধারা এসে মিশল এর সঙ্গে। মুর্শিদাবাদে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর উদ্যোগে প্রজাদের সঙ্গে ১৯১৮ সাল থেকেই নীল চাষকে কেন্দ্র করে যে বিরোধ ধূমায়িত হচ্ছিল তা ফেটে পড়ল ১৯২১ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে। কোম্পানীর বিরুদ্ধে ঐ সালেরই এপ্রিল মাসে রাজসাহি ও পাবনা জেলায় যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল অল্পদিনেই তা পদ্মাপার হয়ে হাজির হল নদীয়া মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদের উঠ্‌বন্দী প্রজারা নীলচাষ তুলে দিয়ে নতুন যে শর্তে জমি বন্দোবস্তের দাবী তুলল কোম্পানী তা মেনে নিতে অস্বীকার করল ;

এছাড়া, খাজনা বাড়ানো ও প্রজা উচ্ছেদ নিয়ে জমিদার হিসাবে কোম্পানীর বিরুদ্ধে সঞ্চিত অসন্তোষ এসে যুক্ত হল। উপরের চারটি জেলায় মেদিনীপুর কোম্পানীর বিরুদ্ধে এই প্রজা আন্দোলনের নেতা সোমেশ্বর চৌধুরীর উদ্যোগে "কোম্পানীর ডোমকল কুঠিবাড়ির পাশের মাঠে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ফলে সাহেবদের ডোমকল কুঠির কাজ বন্ধ হয়ে গেল।"[৯৯] এইভাবে ইউরোপীয় মালিকানার মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর বিরুদ্ধে নীলচাষ ও অন্যান্য অত্যাচার প্রতিরোধে যে-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল অল্পদিনের মধ্যেই তা খাজনা বন্ধের আন্দোলনে পরিণত হয়ে সুস্পষ্টভাবেই বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে চলে গেল। কৃষক আন্দোলন আর শুধু মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকল না ; এমনকি কাশিমবাজারের মহারাজার মত দেশী জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রসারিত হল— বৃটিশ সরকারকে রাজস্ব দিলে প্রজারা জমিদারকে খাজনা দেবেনা বলে ভয় দেখাল।[১০০] এক বৃহত্তর ও প্রবলতর স্রোতের মধ্যে মেদিনীপুর কোম্পানীর প্রজাদের নীলচাষ বিরোধী আন্দোলন মিশে গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত প্রেরণা ও সমর্থনের ভিত্তিতে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সোমেশ্বর চৌধুরীর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল তা অচিরেই বাংলার কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ তথা খিলাফৎ আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হল। নীলচাষই শুধু বন্ধ হল না, সম্ভবত এই আন্দোলনের ফলেই মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর ৩০% শেয়ার ভারতীয় মালিকদের কাছে বিক্রীত হয়েছিল। এভাবেই সমাপ্তি ঘটেছিল মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নীল-বিক্ষোভের।[১০১]

## ।। এগারো ।।

নীলচাষকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে চাষীদের এই সংগ্রাম দু'একটি ক্ষেত্রে সহিংস হয়ে উঠলেও মোটামুটি ছিল শান্তিপূর্ণ। নীল আন্দোলনের সময় নীলকরেরা গ্রামাঞ্চলে আপন আপন কুঠিতেই ছিল এবং কৃষক অভ্যুত্থানে শুধু মুর্শিদাবাদ কেন সারা বাংলাদেশেই একজনও নীলকর আহত বা নিহত হয়নি। স্থায়ী সৈনাবাস থাকা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদে সৈন্য আনতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেই সৈন্যবাহিনীকে বাস্তবে ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন হয়নি। অন্য দিকে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ভারতীয় মহাবিদ্রোহ দমন করতে হয়েছিল সৈন্যবাহিনী নামিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। নীল সংগ্রামে বস্তুত ছিল নীলচাষীদের রায়তী সত্ত্বের জমিতে নিজেদের ইচ্ছেমত ফসল বোনার স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য এক আত্মরক্ষামূলক আইনী আন্দোলন। গায়ের জোরে নীলকরদের বে-আইনীভাবে নীল বোনানোর চেষ্টার বিরুদ্ধে এটি ছিল এক সচেতন সঙ্ঘবদ্ধ ও মোটামুটি শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ। আর এ প্রতিরোধ মুর্শিদাবাদের মত বিস্ফোরক ঐতিহ্য ও পরিস্থিতিযুক্ত নীল-জেলাতেও সাঁওতাল বিদ্রোহের মত আক্রমণমুখী সশস্ত্র চেহারা নেয়নি। এর অন্যতম কারণ সশস্ত্র প্রতিরোধের মর্মান্তিক পরিণতি। কিন্তু অন্যদুটি কারণের গুরুত্বও উপেক্ষীয় নয় : প্রথমত এ-জেলাতেই চার্লস বি. মাসেইকের মত অত্যাচারী নীলকরদের জেল জরিমানা ইত্যাদি শাস্তি ও মহকুমাশাসক, জেলাশাসক, এমনকি বিভাগীয় কমিশনারের কাছ থেকে পর্যন্ত নীলকর পক্ষপাতিত্বের জন্য কৈফিয়ৎ তলব ইত্যাদি পদক্ষেপের ফলে নীলচাষীদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে ইংরেজ সরকার নীলচাষ ও নীলকর-বিরোধী। মুর্শিদাবাদের মত সারা বাংলাদেশেই নীল সংগ্রাম এই একটি প্রধান কারণেই কখনও

সরকার-বিরোধী রূপ নেয়নি। দ্বিতীয়ত, নীল সংগ্রামে সহানুভূতি, সাহায্য ও নেতৃত্ব দিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদার-জোতদার-মহাজন এবং শহরের উকিল-মোক্তার শ্রেণীব একাংশেব এগিয়ে আসা। স্বভাবতই এর ফলে এই সংগ্রাম মূলত তার শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের চেহারা বজায় বেখেছিল। সুতরাং নীল চাষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উনিশ শতকের এই অসন্তোষ ও প্রতিরোধের সংগ্রামকে 'বিদ্রোহ' আখ্যা না দিয়ে 'বিক্ষোভ' আখ্যা দেওয়াই যুক্তি ও তথ্য সম্মত হত। কিন্তু বাঙালী মানসে 'নীল বিদ্রোহ' শব্দদুটি এত গভীব-ভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে যে কোনই পবিবর্তন সম্ভব নয়।[১০২]

প্রসঙ্গত উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহেব সঙ্গে বিশ শতকের নীল চাষ বিরোধী আন্দোলনের পার্থক্যটি স্মরণীয়। উনিশ শতকের নীল বিক্ষোভে অত্যাচারিত কৃষকদেব স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান একটি পর্যায়ে এসে গ্রামীন ও নাগরিক মধ্যবিত্তদের সাহায্য ও সহযোগিতায় সংগঠন, ভাষা ও আইনগত সমর্থন আদায় কবতে পাবলেও বৃটিশ শাসনেব বিরুদ্ধে যায়নি। বিশ শতকের নীলচাষ বিরোধী আন্দোলনও যে গ্রামীণ নাগবিক সমাজের নানাস্তব নানামুখী সহযোগিতা লাভ করল তাই নয় ; আগেব বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে এক ধাপ এগিয়ে বৃটিশ শাসন-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনেব মধ্যে মিশে গেল।

# চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মুর্শিদাবাদের অর্থনীতি
# (১৭৫৭-১৯৫৫)

॥ এক ॥

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের ভূমি সম্পর্ক বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় রেখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দেখলে এই বন্দোবস্ত কীভাবে একটি বিশেষ কালখণ্ডে এই ভূমি-সম্পর্কের বিন্যাসকে নির্ধারণ করেছিল এবং কেনই বা তা করতে পেরেছিল তা বোঝা যায় না। বরং এই অঞ্চলের সমকালীন সামগ্রিক অর্থনৈতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তাৎপর্য অনেকখানি পরিস্ফুট হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতে বিদেশী ইংরেজ শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থা যে-ভাবে এবং যে বিভিন্ন পর্বের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়েছিল, সেগুলির পটভূমিতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্ভব, গতি প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিলুপ্তিকে বোঝা যায়। ইংরেজ শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থ-ব্যবস্থা মোটামুটি সুস্পষ্ট তিনটি পর্বের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল : ঔপনিবেশিক অবশিল্পায়নের পর্ব (১৭৫৭-১৮৩৬), ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিকরণের পর্ব (১৮৩৬-১৯০৫) এবং ঔপনিবেশিক শিল্পায়নের প্রস্তুতি-পর্ব (১৯০৫-১৯৪৭)। নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে, এই তিনটি পর্বেই জেলাঞ্চলের অর্থ-ব্যবস্থার বিবর্তনে বিদেশী ঔপনিবেশিক স্বার্থই নির্ধারক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এবং এই অর্থ-ব্যবস্থায় জেলাঞ্চলের যে-সকল আর্থিক সামাজিক গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান হয়েছিল, বিদেশী স্বার্থের সঙ্গে তাদের হয় বিরোধমূলক, নয় সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে দেখলে তবেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জেলাঞ্চলের ভূমি-সম্পর্কের ধারায় যে রূপান্তর সাধিত হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবো। এই কথাগুলি মনে রেখেই জেলাঞ্চলের সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার উপরোক্ত প্রতিটি পর্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এই অর্থ-ব্যবস্থার সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনগত ও বাস্তব রূপের সম্পর্ক, এবং প্রতিটি পর্বে জমিদার ও কৃষকের অবস্থার রেখাচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।

॥ দুই ॥

॥ ক ॥

নবাবী আমলে (১৭০৪-১৭৫৭) মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থনীতি পারিবারিক ভিত্তিতে গ্রামীণ কৃষি ও হস্তশিল্প উৎপাদন এবং সুবা বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহরের নাগরিক হস্তশিল্প উৎপাদনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। কৃষি ও হস্তশিল্পের সুসমঞ্জস সম্পর্ক এই অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলেও, এই জেলাঞ্চলের দেশজোড়া খ্যাতির কারণ ছিল এর শিল্প সমৃদ্ধি। বহু শতাব্দী ধরে এখানে প্রধান শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছিল কৃষি নির্ভর কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্র-শিল্প। সুতী বস্ত্রশিল্পেরও ছিল উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। নাগরিক হস্তশিল্পের মধ্যে ছিল হাতির দাঁতের

শিল্প, সোনারূপোর অলঙ্কার, কাঁসা পিতল ও কাগজ শিল্প। বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ ও ভারতীয় বণিকেরা এইসকল শিল্পদ্রব্য ভারতের নানা অঞ্চলে, ইউরোপ ও ইংল্যাণ্ডে এবং অন্যান্য দেশেও নিয়ে গিয়ে বাণিজ্য করতো। এই নবাবী আমলেই বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সারা বাংলার মতো এই জেলায় বাণিজ্যের উপরও তার প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক ভাবেও বাংলার ভাগ্য বিধাতা হয়ে উঠলো। এর ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত দেড়শ বছরের পুরানো ভারত বৃটেন বাণিজ্য সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটলো। প্রথমত, এ-দেশ থেকেই তার বাণিজ্যের মূলধন সংগ্রহ করতে সমর্থ হওয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনিময়ের জন্য এদেশে সোনা রূপো নিয়ে আসা বন্ধ করে দিলো এবং এইভাবে প্রায় বিনামূল্যে দেশজ পণ্যের বহির্গমন শুরু হলো। দ্বিতীয়ত, কোম্পানীর সামরিক রাজনৈতিক প্রাধান্য কোম্পানীর দেশী বিদেশী কর্মচারীদের সুবর্ণ সুযোগ করে দিল তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে বাংলার প্রশাসনিক ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহারের। এই সকল পরিবর্তনের সুবাদেই শুরু হলো সারা বাংলার মতো, মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেরও অবশিল্পায়ন। আন্তর্জাতিক, ভারতীয় এবং বাংলার প্রাদেশিক বাজারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন এক কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের সচেতন অবশিল্পায়নের যে-প্রচেষ্টা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শুরু করলো, ১৭৫৭ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যেই তা সফল হয়েছিল। অবশ্য এই রূপান্তরে ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক কিছু শক্তির ভূমিকাও উপেক্ষণীয় ছিল না। যেহেতু এই পর্বে মুর্শিদাবাদের ভূমি সম্পর্ক এই অবশিল্পায়নের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল, সেইজন্য এই অবশিল্পায়নের পিছনের কারণগুলি জেনে নেওয়া দরকার।[১]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জাতীয় স্বার্থে বৃটেনের রেশমী বস্ত্র-শিল্পের কাঁচামাল যোগানোর জন্য ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্তই ছলে-বলে কৌশলে মুর্শিদাবাদের বিশ্ব বিখ্যাত রেশমী বস্ত্র শিল্পের ধ্বংস সাধন করে এই জেলাঞ্চলে কাঁচা রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে সচেতনভাবে চেষ্টা চালিয়ে গেছিল। এই উদ্দেশ্যসাধনে বিলাতে পার্লামেন্ট থেকে কোম্পানীর কর্তারা যেমন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সেইরকম ভূমিকা নিয়েছিলেন এখানকার ইংরেজ কর্মচারীরাও। জেলার অবশিল্পায়নের পিছনে দ্বিতীয় যে কারণটি কাজ করেছিল, তা হচ্ছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেশী-বিদেশী ছোট বড় কর্মচারীদের দ্বারা রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে গায়ের জোরে নামমাত্র মূল্যে দেশী-বিদেশী বণিকদের বঞ্চিত ক'রে বাণিজ্যপণ্য সংগ্রহ করা ও রপ্তানী করা। পণ্য সংগ্রহে দাদন-প্রথায় এটা সম্ভব হয়েছিল। ১৭৫৭ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত এই ধারাবাহিক অত্যাচার হস্তশিল্পীদের অনেককেই বাধ্য করেছিল জেলাঞ্চল ছেড়ে যেতে অথবা পেশা ত্যাগ করতে। তাছাড়া অবশিল্পায়নের এই প্রক্রিয়াকে ভীষণভাবে জোরদার করেছিল অংশত প্রকৃতি-সৃষ্ট এবং অংশত মনুষ্য সৃষ্ট "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" (১৭৭০-১৭৭১ খ্রীস্টাব্দ)। এই মন্বন্তরে মুর্শিদাবাদ শহরের প্রায় অর্ধেক এবং জেলাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক লোক মারা যাওয়ায় জেলায় কৃষি ও শিল্প উভয়ই বিপর্যস্ত হয়ে গেছিল এবং এই বিপর্যয়ের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছিল এখানকার কাঁচা রেশম ও রেশমী বস্ত্রশিল্প। বিশেষত বিপুলসংখ্যক বস্ত্রশিল্পীর মৃত্যু বংশানুক্রমিক শিল্প দক্ষতার অবলুপ্তি ডেকে আনায় রেশমী বস্ত্র শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছিল, পরে তা আর কখনো পূরণ করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য এই মন্বন্তরের বিপর্যয়ের মধ্যেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সচেষ্ট হয়েছিল

কৃষির বিস্তার ঘটাতে. যাতে তুঁত চাষের প্রসার ঘটে এবং কাঁচা রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। জেলাঞ্চলের কৃষি-অর্থনীতি ও লোকসংখ্যা পূর্বের অবস্থায় ফিরতে প্রায় ত্রিশ বছর সময় লেগেছিল। এছাড়াও মুর্শিদাবাদের অবশিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়েছিল ১৭৭২ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তরের ফলে। নবাব পরিবার, অভিজাত-বর্গ, ব্যবসায়ী ও জমিদারদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ শহরের নাগরিক সমাজ জেলাঞ্চলের বহুপ্রকার সৌখিন হস্তশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিল। রাজধানীর স্থানান্তর এই সকল হস্তশিল্পের পতন ডেকে আনলো। সবশেষে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতি ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে সারা ভারতের মতো মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অবশিল্পায়নকেও ত্বরান্বিত করলো। এখানে সুতী বস্ত্রশিল্পের যে-উপস্থিতি তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো বিলেতী কাপড়ের আমদানিতে, বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে নীলচাষ ও নীল রপ্তানী বৃদ্ধি পেলো জেলা থেকে, এমনকি অবশেষে খোদ ইংল্যান্ডেই সুতী বস্ত্র-শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রেশমী বস্ত্র-শিল্পের পতন ঘটায় জেলাঞ্চলের কাঁচা রেশমের বাণিজ্য সম্ভাবনা ভীষণভাবে হ্রাস পেলো।[২]

এইভাবে ১৭৫৭ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের যে অবশিল্পায়ন ঘটলো, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়লো মুর্শিদাবাদের কৃষি-অর্থনীতি, ভূমি-সম্পর্ক ও গ্রামীণ জীবনের উপর। বেশ কয়েকটি দিকে এই প্রভাব লক্ষ্য করা গেলো। ইতিপূর্বেই নবাবী আমলে কৃষি ও প্রধানত শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি, যোগাযোগের প্রসার, বাণিজ্যবৃদ্ধি এবং অর্থনীতির সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা ও স্বনির্ভরতা ভেঙে বেরিয়ে আসার পরিস্থিতি রচনা করেছিল। কিন্তু নবাবী শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার জন্যই গ্রামগুলি বহির্জগতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় যথোপযুক্তভাবে সাড়া দিয়ে বদলাতে শুরু করেনি। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পর থেকে জেলাঞ্চলের যে অবশিল্পায়ন শুরু হয়েছিল, তার ফলেই গ্রামগুলি ধাপে ধাপে ১৮৩৬ সালের মধ্যে তাদের বিচ্ছিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে প্রাদেশিক ও জাতীয় অর্থনীতির এককমাত্রে পরিণত হলো। দ্বিতীয় আর একটি দিকে অবশিল্পায়নের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের, বেনিয়ান, গোমস্তা, দেওয়ান, মুন্সী, ইত্যাদি দেশীয় সহযোগীদের হাতে অবশিল্পযানের প্রক্রিয়ায় বিপুল অর্থের সঞ্চয় ঘটেছিল এবং এই অর্থের ব্যবহার শুরু হয়েছিল জমিদারী, মধ্যস্বত্ব জোত ও জমি কেনায়। তৃতীয়ত, বৃত্তিচ্যুত হস্তশিল্পীরা কৃষিতে ভিড় জমাতে থাকলো অন্যত্র জীবিকার কোনও বিকল্প সম্ভাবনা না থাকায়। ফলে কৃষির প্রসার ঘটলেও কিছু উন্নতি ঘটলো না, মাথা পিছু বা একর পিছু উৎপাদনশীলতা বাড়লো না। অন্যদিকে কৃষিজীবিদের মধ্যে স্তর-বিভাজন বাড়তে থাকলো এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরের দেখা জেলাঞ্চলে মিলতে থাকলো। তাছাড়া অবশিল্পায়নের ফলে হস্তশিল্পী-কৃষকদের সাধারণ অবস্থা খারাপ হতে থাকায় সরকারের রাজস্ব-সংগ্রহের সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকলো। অবশিল্পায়নের ফলে বাংলার অর্থনীতির ক্রমাবনতি হয়ে চললো, অথচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, বাংলার উন্নতির জন্য নয়, নিজস্ব বাণিজ্য প্রশাসন ও রাজ্যবিস্তারের প্রয়োজনে বাংলার ভূমি-রাজস্বের উপরই নির্ভর করতে থাকলো। এর ফলেই ভূমি-রাজস্বের সংগ্রহের নানা পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো এবং অবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনিবার্য হয়ে উঠলো। রাজস্ব সংগ্রহে সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবনতি এবং অবশিল্পায়নের ভূমিকা বাংলার অধিকাংশ জেলার চাইতেই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।[৩]

॥ খ ॥

জমিদারদের মাধ্যমে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের নবাবী ব্যবস্থাকেই বহাল রাখলেও ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের জমিদারী ব্যবস্থার গুণগত ও সংখ্যাগত রূপান্তর ঘটাতেও শুরু করে। নায়েব দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খাঁর দ্বৈতশাসনকালেই (১৭৬৫-১৭৭২) খরা ও অজন্মা সত্ত্বেও রাজস্ব আদায়ে কোম্পানীর কড়াকড়ির জন্য এই জেলাঞ্চলের বড় বড় জমিদারীগুলিতে ভাঙন শুরু হয়। ইতিমধ্যেই পলাশীর যুদ্ধের কিছু আগে পরে এই জেলাঞ্চলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত বেনিয়ান, গোমস্তা, দালাল, দেওয়ান ইত্যাদিদের নিয়ে গঠিত নতুন যে অর্থবান শ্রেণীটির উদ্ভব ঘটেছিল, ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে সেই শ্রেণীটির হাতেই পুরানো বড় জমিদারীগুলির নানা ভগ্নাংশ চলে আসতে শুরু করলো। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হলো ও ব্যাপকতা লাভ করলো এবং এই বন্দোবস্তের এক দশকের মধ্যেই এই জেলাঞ্চলেও বড় জমিদারীগুলো ভেঙে অসংখ্য ছোট ও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বড় জমিদারীর উদ্ভব ঘটলো। প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রখ্যাত ছাত্রেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন জমিদারশ্রেণীর উদ্ভবের ক্ষেত্রে বৃটিশ-নির্ভর কলকাতার নব্যধনীদের কথাই বলে থাকেন। অথচ সারা বাংলাদেশে কলকাতার পরই নব্যধনীদের এক প্রধান উদ্ভবক্ষেত্র ছিল মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার-বহরমপুর শহরাঞ্চল এবং মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল। এইভাবেই আলোচ্য কালপর্বেই কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা কান্তবাবুর বংশধরদের কাশিমবাজার জমিদারী, জগবন্ধু রায় মহাশয়দের কাশিমবাজার (ছোট রাজবাড়ী) জমিদারী, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরিবারের কান্দি জমিদারী, দেবী সিংহের পরিবারের নশীপুর জমিদারী, দানিশমন্দ নিত্যানন্দ পরিবারের বনওয়ারীবাদ জমিদারী, চোয়ার সুবাধিকারী বা সর্বাধিকারী পরিবারের জমিদারী, মহারাজ নন্দকুমার পরিবারের কুঞ্জঘাটা জমিদারী এবং বহরমপুরের কৃষ্ণকান্ত সেন মহাশয়দের জমিদারীগুলির পত্তন মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেই ঘটে। এইসকল পরিবারের বহুখ্যাত আদিপুরুষেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক-হেতুই যে বিপুল বৈভব ও প্রভাবের অধিকারী হতে পেরেছিলেন, তার ফলেই তাঁদের পক্ষে এই সকল জমিদারীর মালিক হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। এই জমিদারগুলোর সদর দপ্তর মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে হলেও জমিদারীর এলাকা সারা বাংলাদেশের নানা জেলায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিহার ও উড়িষ্যাতে পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। এই সব বড় বড জমিদারীগুলি ছাড়াও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আরো বহু সংখ্যক নতুন জমিদার পরিবারের উদ্ভব ঘটেছিল। সংখ্যাগতভাবে দেখলে বলা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির সময়ে যেখানে পাঁচটি বড় বড জমিদারী ও সম্ভবত কয়েকটি ছোট জমিদারী মাত্রই ছিল, সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এক দশকের মধ্যেই সম্ভবত এক হাজারেরও বেশী জমিদারীর উদ্ভব ঘটেছিল। সম্ভবত, কেননা একদিকে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে জমিদারীগুলির আয়তন বা দেয় রাজস্ব সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না, আবার অন্যদিকে, ১৭৯৩ থেকে ১৮০১ সালের মধ্যে কেবলমাত্র রাজসাহী জমিদারী ভেঙেই ১৬০৩টি জমিদারীর উদ্ভব হয়েছিল তা জানা যায়। অনুমান করা যায় যে, ১৮৩৬ সালের মধ্যে জেলাঞ্চলের জমিদারী সংখ্যা দু'হাজারেরও কিছু কম বা বেশী হয়ে উঠেছিল। এই অনুমানের কারণ হচ্ছে এই যে, ১৮৩৬ সালের

পর থেকে অতি দ্রুত আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার ঘটতে থাকায়, বাণিজ্যিক কৃষি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় এবং ইউরোপীয়রা জমি কিনতে সক্ষম হওয়ায় জমি ও জমিদারীর চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও বেশ কিছু নতুন জমিদারীর পত্তন হয়। এইসকল নতুন জমিদারীর সংখ্যা ধরেই ১৮৪৯-৫০ সালে জেলাঞ্চলে রাজস্ব-প্রদানকারী জমিদারীর সংখ্যা হয় ২৬৫৬টি। সুতরাং ১৮৩৬ সাল নাগাদ ঐ সংখ্যা হাজার দু'য়েক থাকা অসম্ভব ছিল না। এইসকল জমিদারী আয়তনের বিচারে কতগুলি স্তরে বিভক্ত ছিল, অথবা মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে এইসকল জমিদারীর প্রসারসীমা কতটা ছিল, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।[৮]

সংখ্যাগত পরিবর্তনের চাইতেও উল্লেখযোগ্য ছিল জমিদারীগুলির গুণগত পরিবর্তনের দিকটি। আপাতদৃষ্টিতে বিপুল পরিমাণ ভূমি-রাজস্বের নিয়মিত প্রবাহ সুনিশ্চিত করার জন্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করা হয়েছিল একথা মনে হলেও, এই ভূমি-ব্যবস্থার অন্যবিধ উদ্দেশ্যও বর্তমান ছিল। প্রথমত, কর্ণওয়ালিশ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, জমিদারদের মালিকানা স্বত্ব দেওয়ার ফলে তারা নিজেদের স্বার্থেই ইংরেজ সরকারের রাজনৈতিক সহযোগী হয়ে থাকবে, বহিরাক্রমণ বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষপাতী হবে না। এইভাবেই কর্ণওয়ালিশ ইংরেজদের অনুগত-আশ্রিত একটি শ্রেণীকে ইংরেজের বন্ধু ও সমর্থক হিসাবে সারা বাংলাদেশের মত মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেরও গ্রামে-গঞ্জে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই উদ্দেশ্য যে কতটা সফল হয়েছিল তা ১৮২৮-১৮৩৫ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল খোদ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর একটি সরকারী উক্তি থেকেই বোঝা যায়: "ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার প্রশ্নে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এক বিরাট সুবিধা আছে। এর ফলে যে বিপুল সংখ্যক জমিদার উদ্ভূত হয়েছে, তারা বৃটিশ প্রাধান্য বজায় রাখতে প্রচন্ড আগ্রহী, ব্যাপক জনসাধারণের উপরেও তাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য রয়েছে।" মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের ইতিহাসে আলোচ্য পর্বের পরের পর্বটিতেই জমিদারতন্ত্রের এই ভূমিকার সঙ্গে বার বার আমাদের পরিচয় হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পেছনে কর্ণওয়ালিশের অন্য আর একটি উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ-সংস্পর্শে সঞ্চিত দেশীয় পুঁজিমালিকদের বিপুল অর্থকে জমিদারীতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে দিয়ে এদেশে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সম্ভাব্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এক পথের কাঁটাকে সরিয়ে দেওয়া। উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশীয় পুঁজিমালিক ও ব্যবসায়ীদের দেখা যাবে এই-ভাবে জমিদারীর নিরাপদ আভিজাত্যে আশ্রয় নিতে। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে এই প্রবণতার উল্লেখযোগ্য কিছু দিকের সঙ্গে আমরা পরে পরিচিত হবো। তৃতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে-সকল নতুন জমিদারীর উদ্ভব ঘটলো, সেগুলি জমিদারতন্ত্রের এতদিন ধরে চলে আসা চরিত্রের পরিবর্তন ঘটালো। গতিশীল অর্থ (mobile money) সম্পর্কে সচেতন এই পুঁজিমালিক শ্রেণীটির হাতে পড়ে জমিদারীও নতুন রূপ নিল— "Zamindari became more of a profession and less of a position" । সরকারকে নির্দিষ্ট রাজস্ব সময়মতো দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে খুশিমতো খাজনা আদায়ের স্বাধীনতা থাকলো জমিদারদের। বাণিজ্যিক ও শিল্প-নির্ভর পুঁজিবাদের দোটানার মধ্যে অবস্থিত বৃটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের প্রয়োজনে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে দিয়ে এইভাবেই সুপ্রাচীন সামন্তবাদী জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদী উপাদানের মিশ্রণ ঘটেছিল। এই পুঁজিবাদী উপাদানের গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকার জন্যই পরবর্তী দেড়শো বছর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের

কাল পর্যন্ত সামন্ত ব্যবস্থাব পবিবর্তন ঘটে চলেছিল, পবিবর্তন ঘটে চলেছিল চিবস্থাযী বন্দোবস্ত নির্ধাবিত ভূমি-সম্পর্কেব গতি-প্রকৃতিবও। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও জমিদাবতন্ত্রেব এই রূপান্তবেব সঙ্গে আমবা পবিচিত হই।[৫]

চিবস্থাযী বন্দোবস্ত একটি দশক অতিক্রমই কবতে না কবতেই বর্ধমান বাজ তাঁব সমগ্র জমিদাবীকে অনেকগুলি পত্তনি তালুকে ভাগ কবে পত্তনিদাবদেব সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা দেওযাব শর্তে খাজনা বন্দোবস্ত কবলেন এবং এইভাবে সবকাবকে দেয বাজস্বেব নিশ্চযতাবিধান কবতে চেষ্টা কবলেন। কিন্তু পত্তনিদাবেবা আবাব দব-পত্তনিদাব, সে-পত্তনিদাব, দবাদব পত্তনিদাব ইত্যাদি উচ্চ নীচ নানাস্তবে বিন্যস্ত এক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীব উদ্ভব ঘটালো। কোম্পানীব সবকাব তাব বাজস্ব আদাযেব সুবিধার্থে ১৮১৯ সালেব ৮ নং বেগুলেশনেব মাধ্যমে এই পত্তনি-ব্যবস্থাকে বৈধতা দিলো। বর্ধমান জমিদাবীতে প্রবর্তনেব অল্পদিনেব মধ্যেই এই পত্তনিব্যবস্থা সাবা বাংলাদেশেব মত মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও ছডিযে পড়ল। এইভাবেই চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব ফলশ্রুতি হিসাবেই জমিদাবতন্ত্র ও যথার্থ কৃষকদেব মধ্যবর্তী খাজনাব উপস্বত্বভোগী স্তব-বিন্যস্ত আব একটি শ্রেণীব উদ্ভব ঘটলো, যা জমিদাবতন্ত্র থেকে পৃথক হলেও নির্ভবশীল থাকলো জমিদাবদেব উপবই। এতদিন জেলাব গ্রামাঞ্চলে কৃষি-উৎপাদকদেব শোষণেব ব্যবস্থা কাযেম ছিল ভূস্বামী-ব্যবস্থা ও জমিদাবতন্ত্রেব মাধ্যমে। এইবাব ভূস্বামী ও জমিদাবদেব মাঝখানে নতুন আব একটি শোষকশ্রেণী, মধ্যস্বত্বভোগীবা, বহাল হলো। আলোচ্য কালপর্বে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে নীল চাষ এবং ফিলেচাব পদ্ধতিতে কাঁচা বেশম উৎপাদনেব প্রসাব ঘটতে থাকায নীল ও বেশম কুঠিযালেবা কর্মচাবীদেব বেনামীতে লাভজনক খাজনায তালুক পত্তনি নিতে থাকলো। এই নতুন মধ্যস্বত্বভোগীদেব সংখ্যা আবো দ্রুত বৃদ্ধিতে গ্রামীণ ভূস্বামী শ্রেণীবও অনেকে সাহায্য কবলো। জমিদাব ও মধ্যস্বত্বভোগীদেব এই ধবনেব সংখ্যাবৃদ্ধি প্রকৃত কৃষকদেব কাছ থেকে খাজনা হিসাবে নিষ্কাষিত উদ্বৃত্তেব পবিমাণ যেমন বহুগুণে বাডিযে দিলো, সেইবকম উদ্বৃত্ত নিষ্কাষণেব পদ্ধতিকেও কবে তুললো কার্যকবী এবং নির্মম। আব এই উদ্বৃত্ত-নিষ্কাষণেব পদ্ধতি কৃষিকার্যে নিযুক্ত সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বাযত বা কৃষকদেব কবতে থাকলো আবো বেশী সঙ্গতি-সম্পন্ন।[৬]

জেলাঞ্চলেব কৃষকদেব মধ্যে স্তব-বিভাজনেব প্রক্রিযা এই কালপর্বে আবো একধাপ এগিযে গেল। নবাবী আমলে বড় বড জমিদাবী সৃষ্টিব ফলে কৃষকদেব মধ্যে একটি সম্পন্ন স্তব সৃষ্টি হওযাব যে প্রবণতা অধ্যাপক সিবাজুল ইসলাম দেখেছিলেন, এইসমযে তা আবো তীব্রতব হলো। ছিযাত্তবেব মন্বন্তবেব ফলে জেলাঞ্চলেব প্রায এক তৃতীযাংশ এলাকায জনসংখ্যা হ্রাসেব জন্য কৃষিব বিলোপেব ফলে জঙ্গলেব বিস্তাব ঘটেছিল। পববর্তী ত্রিশ বছবে পুনবায জেলাঞ্চলে চাষেব প্রসাব ঘটে এবং এই প্রক্রিযাতে উচ্চ স্তবেব বাযতেবা ক্রমশ জমি জাযগাব পবিমাণ বাডিযে সম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকে। উনিশ শতকেব প্রথম তিন চাব দশকেও পবিপোষক কৃষিব (subsistence agriculture) বাইবে গিয়ে নীল ও তুঁত চাষেব প্রসাব ঘটায সম্পন্ন বায়তদেব গ্রামীণ এই শ্রেণীটি বিলক্ষণ অর্থনৈতিকভাবে ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবশিল্পাযন-জাত বৃত্তিচ্যুতি ও জনসংখ্যাব বৃদ্ধি গ্রামীণ ক্ষেতমজুব শ্রেণীটিব আয়তন-বৃদ্ধি ঘটাতে থাকায উচ্চতব বাযতদেব এই সমৃদ্ধি সম্ভবপব হযে ওঠে। মোটকথা, এই পর্বেই মুর্শিদাবাদেব গ্রামাঞ্চলে সম্পন্ন বায়ত বা "গৃহস্থ"দেব সঙ্গে ক্ষেতমজুবদেব পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়, যদিও এই সম্পন্ন বায়তদেব "জোতদাব" আখ্যাযিত কবাব মতো অর্থনৈতিক

পরিস্থিতির উদ্ভব এই সময়েও ঘটেনি। অন্যদিকে উনিশ শতকের এই প্রথম দশকগুলিতে খাদ্যশস্য-উৎপাদনে নিযুক্ত পরিপোষক কৃষির বাইরে যাওয়ার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেই মাঝারি চাষী ও ছোট চাষী-ভাগীচাষীদের মধ্যে পার্থক্যের সূচনা ঘটতে থাকে। কিন্তু এই পর্বেও কৃষক সমাজের নীচের তলা থেকে জমি-জায়গা অকৃষকদের হাতে চলে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি জেলাঞ্চলে শুরু হয়েছিল— একথা বলা প্রমাণাভাবে সম্ভব নয়।[৭]

আলোচ্যপর্বে জমিদার ও কৃষকদের অবস্থার ও জীবনযাত্রার মানের কিছু পরিচয় অবশ্যই নেওয়া প্রয়োজন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে নতুন জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল, শস্যাদির দাম এবং জমির দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকায় তাদের পক্ষে খাজনা আদায়ের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এইভাবে নতুন জমিদারশ্রেণী বিপুল পরিমাণ অনর্জিত আয়ের অধিকারী হয়েছিল এবং বেহিসাবী বে-পরোয়া খরচাপত্র ও বিলাস ব্যসনে নিমজ্জিত হয়েছিল। জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সামাজিক-ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি জমিদারদের জাঁক-যমক ও অঢেল অর্থ এবং প্রভাব প্রদর্শনের উপলক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। দোল-দুর্গোৎসব তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে একই ধরনের অর্থের প্রদর্শন ছিল অব্যাহত। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল থেকে এই পর্বের কয়েকটি উদাহরণই জেলার জমিদারদের জীবনধারাকে তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট। কান্দীর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যয় করেছিলেন ১৫ লক্ষ টাকা। কান্তবাবুর নাতি কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ রায়ের বিবাহে পনেরোদিন ধরে গভর্নর জেনারেল ও মুর্শিদাবাদের নবাব থেকে শুরু করে হাজার হাজার লোক হাতি-ঘোড়ার প্রদর্শনী, ব্যান্ড পার্টি, আড়াই মাইল লম্বা আতস বাজি, নাচ-গান, যাত্রা সঙ্ ইত্যাদি দেখেছিল। কান্দীর রাজা গয়াকাশীতে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন ২৮টি প্রমোদ তরণীতে সাত-আটশো লোক সঙ্গে নিয়ে। নব্য জমিদারতন্ত্র পুরোনো জমিদারদের দরবারী জাঁকজমকই শুধু অনুসরণ করেনি, তাদের পড়তি অবস্থার সুযোগে তাদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করে অভিজাত হয়ে ওঠার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছিল। পাশাপাশি চলেছিল ঘর-বাড়ি, সাজ-পোষাক, খানাপিনায় ইংরেজদের উৎকট অনুকরণ ও মনোরঞ্জনের প্রয়াস।[৮]

আলোচ্য পর্বেই জেলাঞ্চলের গ্রাম-সমাজ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থায় পৌঁছেছিল। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বৃত্তি বা পেশা থেকে বিচ্যুতি এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবনযাত্রামানের ক্রমাবনতি ছিল জমিদারতন্ত্রের বিলাস-বৈভবের বিপরীতপ্রান্ত। বাড়ির কাজে নিযুক্ত ভূমিহীন একজন মজুর কাপড় ও খোরাকি ছাড়া মজুরী পেতো মাসিক আট আনা বা একটাকা। অধিকতর হতভাগ্যদের চলতো ক্রীতদাস হিসাবে কেনাবেচা। আর যারা ছিল প্রত্যক্ষ উৎপাদক, তারা কোম্পানীর কর্মচারী এবং নীল ও রেশম কুঠিয়ালদের আগাম দাদনের ফাঁসে, জমিদারদের ক্রমবর্ধমান খাজনার জুলুমে, বিশ্ববাজারের ওঠানামায় আর খাদ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান দামের যাঁতাকলে ছিল পিষ্ট। যারা একটু স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে চাইতো, তারা খাদ্যশস্যের বদলে নীল বা তুঁত চাষ অথবা আমবাগানের দিকে ঝুঁকতো। কোলব্রুক লক্ষ্য করেছিলেন, আমবাগান জমির প্রতি কৃষকের আসক্তি বাড়ায় সন্দেহ নেই; এই কৃষকেরা ছিল, অন্তত মুর্শিদাবাদ জেলায়, গ্রামের সম্পন্ন কৃষক। কিন্তু এই সম্পন্ন কৃষকেরাও কোম্পানীর কর্মচারী, জমিদার ও কুঠিয়ালদের হিংস্র লাঠিয়াল বাহিনীর আক্রমণ থেকে একেবারেই নিরাপদ ছিল না। সমকালীন ইংরেজদের সাক্ষ্যেই এই ভয়াবহ অত্যাচারের প্রমাণ থেকে গেছে। গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর উক্তিকে একটু পাল্টে নিয়ে আমরাও বলতে পারি যে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের

সবুজ সমভূমি রেশম তাঁতিদের হাড়ে সাদা হয়ে গেছিল। জরিমানা, হাজত, বেতমারা, ঘরে আগুন দেওয়া, জোর করে চুক্তি করানো, কাপড় বুনতে না দেওয়ার জন্য বুড়ো আঙুল কেটে ফেলা থেকে সন্তানবিক্রয় আত্মবিক্রয় বা ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হওয়ার মতো বহুপ্রকার অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের কাছ থেকে নিঃশেষে উদ্বৃত্ত আহরণ করতো বিদেশী শোষকবৃন্দ এবং তাদের অধিকতর হৃদয়হীন দেশীয় সহযোগী ভূস্বামী জমিদার মধ্যস্বত্বভোগীরা। নজীরবিহীন এই অত্যাচারে মুর্শিদাবাদের গ্রামীণ মানুষ সাধারণভাবে বোবা হয়েই ছিল, কেননা, তারা ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুর খুব নিকটেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অষ্টাদশ শতকের শেষ চল্লিশ বছরে ধরে (১৭৬০-১৮০০) সন্ন্যাসী ফকিরদের ধর্মীয় সামাজিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বে অত্যাচারিত কৃষক ও তাঁতিদের যে ঐক্যবদ্ধ অথচ বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র বিদ্রোহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার, জমিদার ও কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে চলেছিল; তাতে মুর্শিদাবাদের কৃষক ও তাঁতীরাও অংশ নিতে পশ্চাৎপদ থাকেনি। এই বিদ্রোহের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নায়ক মজনু শাহের শিষ্য ও পালিতপুত্র চেরাগ আলি শাহ যে নবাবী, জমিদারতন্ত্র ও কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর উত্তরপ্রান্তিক কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও মাদারী ফকিরদের গোপন সংগঠনের মাধ্যমে সক্রিয় ছিলেন তার বহুতর প্রমাণই রয়ে গেছে। এককথায় মুর্শিদাবাদ জেলার অবশিল্পায়ন ও নতুন ভূমি-সম্পর্কের পরীক্ষা নিরীক্ষা সৃষ্টি করেছিল কৃষক জনতার সশস্ত্র প্রতিরোধ।[১]

## ।। তিন ।।

### ।। ক ।।

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক ইতিহাসে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি ছিল এক যুগ-সন্ধির কাল। পুরোনো অর্থনৈতিক কাঠামোটি ভেঙে পড়েছে, অথচ নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর সুস্পষ্ট রূপরেখা দৃশ্যমান নয় এরকম এক অবস্থায় প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক নানা প্রতিকুল শক্তির আঘাতে জেলার জনজীবন এই কালপর্বে বারে বারে পীড়িত, বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে বৃটিশ বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের যে-নিয়ন্ত্রণ, ক্রমহ্রাসমানভাবে হলেও, ভারতে ক্রমবর্ধমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবনের উপর ছিল, ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের ফলে তার অবসান ঘটলো। ভারত অর্থনৈতিকভাবে সরাসরি শিল্প-নির্ভর বৃটিশ পুঁজিবাদের অধীনে এলো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া কারবার অবাধ-বাণিজ্য-নীতির ফলে রদ হয়ে ভারত ব্যক্তিগত বৃটিশ ব্যবসায়ীদের মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে উঠলো। ভারতের অর্থব্যবস্থাকে শিল্প-নির্ভর বৃটিশ পুঁজিবাদের কাঁচা মাল যোগানোর এবং শিল্প পণ্য বিক্রির বাজার হিসাবে গড়ে তোলার কয়েক দশকের প্রয়াস এর ফলে ব্যাপক ও জোরদার হয়ে উঠলো। মূলত ভারতে একটি আভ্যন্তরীণ বাজার সৃষ্টির মাধ্যমেই এই প্রয়াসকে কার্যকরী করে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হতে থাকলো। ১৮৩৫ সালে অনেক রকমের মুদ্রার বদলে একরকমের মুদ্রার প্রচলন এবং ১৮৩৬ সালে আভ্যন্তরীণ ও শহর-শুল্ক বিলোপ করার মধ্যে দিয়ে এই আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার সূচনা ঘটলো। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে এই আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার কতো দ্রুত প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল, আচার্য যদুনাথ সরকার তার সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। জঙ্গীপুর ঘাটে পণ্যবাহী নৌকার

ক'ছে থেকে ১৮৩৫ সালে যেখানে ৫০,০০০ হাজার টাকা আদায় হতো, সেখানে আভ্যন্তরীণ ও শহর শুল্ক অবলুপ্তির পর ১৮৪০ সালে আদায় হয় ১,৫০,০০০ হাজার টাকা, অর্থাৎ পাঁচ বছরেই তিনগুণ বাণিজ্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার আরো জোরদার হয়েছিল ১৮৪৬ সালে প্রাদেশিক শুল্ক অবলুপ্ত হলে। আলোচ্য পর্বের শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণ অব্যাহত ছিল।[১০]

সারা বাংলার মতো মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও আভ্যন্তরীণ বাজার দ্রুত বিকশিত হয়ে উঠেছিল। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্রমশ উন্নততর হয়ে ওঠার ফলে। ১৮৩৯ সালেই বহরমপুরে বাষ্পীয় নৌকাচলাচলকে স্বাগত জানিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ১৮৪৪ সাল থেকেই কলকাতা হতে পাটনা-এলাহাবাদ পর্যন্ত প্রসারিত বাষ্পীয় নৌ চলাচল ব্যবস্থা মুর্শিদাবাদে গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথী পথে লোক ও মাল পরিবহন ব্যবস্থা সহজতর ও স্বল্পব্যয়সাধ্য করে তোলে। বাষ্পীয় নৌ-চলাচল সুনিশ্চিতভাবে মুর্শিদাবাদের সর্বপ্রধান যোগাযোগ মাধ্যম নৌ-পরিবহনের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদের অর্থনীতিকে গতিশীল করে তুলতে সাহায্য করেছিল। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে নবাবী আমল থেকে চলে আসা রাস্তাগুলি ছিল মূলত সামরিক বাহিনীর রাস্তা, বাণিজ্যিক রাস্তা নয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও জেলাঞ্চলের রাস্তার উন্নতিতে কখনই নজর দেয়নি। ১৮৫৮ সালে সরাসরি বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে রাস্তাঘাটের উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হতে থাকলেও, উল্লেখযোগ্যভাবে কিছুই ঘটতে দেখা যায় না। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে রাস্তাঘাট সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে ১৮৭৪ সাল উল্লেখযোগ্য। এই বছরে খরা ও অজন্মার সময়ে পথকর থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ ক'রে জেলার উল্লেখযোগ্য শহর ও বড় গ্রামগুলির মধ্যে সড়ক যোগাযোগ গড়ে তোলা হয়। জেলার নীল ও রেশম কুঠিয়ালেরা এই রাস্তা তৈরীতে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করে। অবশ্য ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলায় রেলপথের আগমন এবং আভ্যন্তরীণ বাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যে-ভাবে প্রসার ঘটেছিল, তার ফলে রাস্তার উন্নতি আর ফেলে রাখা সম্ভব ছিল না। আলোচ্যপর্বে মুর্শিদাবাদে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে শুরু করে রেলপথের প্রবর্তন। ১৮৫৩ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে প্রবর্তিত হাওড়া-রাজমহল লুপ লাইনের ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ৩০ মাইল পথ জেলার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে যাওয়ার ফলে ঐ এলাকার অর্থনীতিতে রেলপথের প্রভাব পড়তে থাকে। ১৮৬২ সালে নলহাটি-আজিমগঞ্জ ব্রাঞ্চ রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু পণ্য চলাচলের উপর এই রেলপথের সামান্যই প্রভাব পড়ে। ররং রাঢ় মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কিছু কিছু এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এইভাবে বীরভূম দিয়ে যাওয়া লুপ লাইনের প্রভাবে বিকশিত হয়েছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ১৮৫৩-৬০ সালের পর রেলপথ মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চলকে সরাসরি এবং বাগড়ি অঞ্চলকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল। কিন্তু রেলপথের এই প্রভাব বিস্তার সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের যাতায়াত ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ১৯০৫-১৯১৩ সালে ভাগীরথীর উভয় পাড়ে সমান্তরাল দুই রেলপথ প্রবর্তিত না-হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই রয়ে যায় নদীপথই। এইভাবেই মুর্শিদাবাদ জেলায় যাতায়াত-যোগাযোগের এই সম্প্রসারণ সুনিশ্চিতভাবে জেলায় আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার ঘটায় এবং পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে আসে।[১১]

এইভাবে বৃটেনের শিল্প-নির্ভর পুঁজিবাদের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে ১৮৩৬ সালের পর থেকে

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থনীতিতে যে রূপান্তরের সূচনা হলো, তার রূপরেখা অব্যাহত থাকলো প্রায় ১৮৭০ সাল পর্যন্ত। ঐ সময়ে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শিল্পোন্নত দেশ গ্রেট বৃটেন সর্বপ্রথম অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলো এবং সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক মন্দারও মোকাবিলা করতে বাধ্য হলো। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বৃটেনকে তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কাঠামোয় আনতে হলো গুরুতর পরিবর্তন। ফলে অনিবার্যভাবে বৃটেনের উপনিবেশ ভারতের উপর এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়তে থাকল, এই জেলাঞ্চলেও কৃষি ও শিল্প উৎপাদন এবং বিনিময় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে শুরু করলো। ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে জেলার অর্থনীতিতে এই প্রভাবগুলির ফলাফলও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলো। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে জেলাঞ্চলে যে অবশিল্পায়ন লক্ষ্য করা গেছিল তার ফলে মুর্শিদাবাদের রেশমী ও সুতী বস্ত্রশিল্পের যে আন্তর্জাতিক ও ভারতীয় বাজার ছিল, তার অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয়, প্রাদেশিক ও আংশিকভাবে ভারতীয় বাজারের চাহিদা এই দুই শিল্পকেই কিছুটা বাঁচিয়ে রেখেছিল। বিশেষত বিলাত থেকে আমদানি হওয়া সুতো সুতী বস্ত্রশিল্পকে একেবারে নিঃশেষে মুছে যেতে দেয়নি। কিন্তু ১৮৭০ সালের পর শিল্প-নির্ভর বৃটিশ পুঁজিবাদের সংকটমোচনের জন্য একদিকে যে-ভাবে ভারতে মিলের কাপড়ের আমদানী শুরু হলো তাতে রেশমী ও সুতী কাপড়ের স্থানীয় ও প্রাদেশিক বাজারও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। অন্যদিকে এই সময়ে কাঁচা রেশম ও নীল শিল্পেও ক্রমবর্ধমান সংকট দেখা দিলো। ফলে ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে ঘটে গেলো জেলাঞ্চলের দ্বিতীয় অবশিল্পায়ন।[১২]

আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার জেলার কৃষিতে সুনিশ্চিত পরিবর্তন নিয়ে এলো। ১৮৩৬ সালের পূর্বেই জেলার কৃষি তার খাদ্যউৎপাদক পরিপোষক রূপ ছেড়ে তুঁত চাষ ও নীল চাষের মধ্যে দিয়ে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু ১৮১৫ সালের পূর্বে রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে ইউরোপের বাজার সুস্থিত না হওয়ায় কেবলমাত্র ঐ সময়ের পরেই জেলাঞ্চলের কৃষির বাণিজ্যিকরণ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে, এবং ১৮৫০ সালের পর থেকেই এর ফলে চাষের জমির পরিমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৮৩৬ থেকে প্রায় ১৮৬০ সাল পর্যন্ত নীল ও কাঁচা রেশমের আন্তর্জাতিক চাহিদা খুবই ভাল থাকায় কৃষির বাণিজ্যিকরণও যথেষ্ট অগ্রসর হয়। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ ও আন্তর্জাতিক বাজারের সংকট ঐ সময় থেকে প্রায় ১৯০৫ সাল পর্যন্ত জেলার কৃষিতে নীল চাষ ও তুঁত চাষের ভূমিকাকে ক্রমশ ভীষণ সঙ্কুচিত করে দিতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই রেলপথের প্রচলন ঘটায় এবং বৃহত্তর কলকাতায় পাট শিল্পের পত্তন হওয়ায় জেলাঞ্চলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ধান-চাল উৎপাদন ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। অর্থাৎ নীল ও তুঁতের ছেড়ে যাওয়া শূণ্যস্থান বাণিজ্যিক ধানচাল ও পাট দখল করতে থাকে। আলোচ্য পর্বের শেষ পর্যন্তই কৃষির বাণিজ্যিকরণের এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। কৃষির প্রসারের সঙ্গে যেহেতু জনসংখ্যাবৃদ্ধির যোগ বর্তমান সেজন্য আলোচ্য পর্বে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে জনসংখ্যার পরিবর্তনের দিকটিও দেখা দরকার। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের হ্রাসপ্রাপ্ত জনসংখ্যা উনিশ শতকের প্রথম নাগাদ অনেকখানি পরিপূর্ণ হয়ে এলেও, ১৮১৩ সাল নাগাদ কাশিমবাজারের মহামারীর পর জনসংখ্যা হ্রাস পায়, কিন্তু মোটামুটিভাবে ১৮৩৬ সাল নাগাদ জেলাঞ্চলে জনসংখ্যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়কার অবস্থায় পৌঁছায়। এরপরে ১৮৩৬ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত জনগণনার আগে

ও পরে জেলাঞ্চলের জনসংখ্যা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, খুবই ধীরগতিতে ও স্বল্প পরিমাণে হলেও জেলার জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। ম্যালেরিয়া, খরা, মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে এই সময়ে জেলাঞ্চলে যে বিপুল লোকক্ষয় হয়, তা সত্বেও জেলাঞ্চলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এই সময়ে জেলার অর্থনীতির সুনিশ্চিত উন্নতির পরিচায়ক। কিন্তু এই উন্নতি যে জেলার অর্থব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের সমান্তরালে ঘটে চলেছিল, তা আমাদের মনে রাখা দরকার। কৃষির বাণিজ্যিকরণের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত টাকাকড়ি-নির্ভর রাজস্ব-ব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে টাকা পয়সার প্রচলনকে ব্যাপক করে তুলেছিল এবং তার ফলে কৃষি উৎপাদন পারিবারিক ও গ্রামীণ প্রয়োজন-পূরণের বদলে মুনাফার জন্য হতে থাকলো। ফলে স্বনির্ভর গ্রামসমাজ দ্রব্য-বিনিময় নির্ভর যে যজমানী প্রথার উপর নির্ভর করে চলতো তা ভেঙে পড়তে থাকলো। বাইরের বাজারের জন্য গ্রাম বেশী করে উৎপাদন করতে থাকায় গ্রামের লোকেরাও প্রয়োজন পূরণের জন্য বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকলো। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে এইভাবে স্বনির্ভর গ্রামসমাজ ভেঙে পড়লো ১৮৩৬ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যেই। আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসার জেলার কৃষির পাশাপাশি শিল্পেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে এলো। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের রেশমী বস্ত্রশিল্প এবং সুতী বস্ত্রশিল্প ১৮৩৬ সালের মধ্যেই আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রায় মুছে এলেও শিল্প হিসাবে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। স্থানীয় এবং প্রাদেশিক চাহিদা পূরণে তাদের কিছু ভূমিকা থেকেই গিয়েছিল। ১৮৩৬ সালের পর শহরকেন্দ্রিক উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও বিবাহাদি প্রয়োজনে রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদা কিছুটা বেড়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের হস্তচালিত পাট-শিল্পও আধুনিক পাট-শিল্পের উদ্ভব কাল পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। অন্যদিকে ১৮৩৬ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ছিল নীলশিল্পের বাড়বাড়ন্তের যুগ এবং কাঁচা রেশমশিল্পও তার উন্নতি অব্যাহত রেখেছিল ১৮৬০ সাল পর্যন্ত। মোটকথা ১৮৩৬ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে জেলাঞ্চলের অবশিল্পায়ন কিছুটা থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ১৮৭০ সাল থেকে দ্বিতীয় দফার যে অবশিল্পায়ন শুরু হলো, তা ১৯০৫ সালের মধ্যে জেলার গ্রামীণ হস্তশিল্পের যেটুকুও বা বেঁচে ছিল তাকেও নিঃশেষ করে দিল, এমনকি নীল ও কাঁচা রেশম শিল্পের মত অপেক্ষাকৃত নতুন শিল্পেরও প্রায় অবলুপ্তি ঘটলো। কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের পরিবর্তন এবং আনুষঙ্গিক শক্তিগুলির প্রভাব জেলার গ্রাম ও নগর বিন্যাসেরও রূপান্তর নিয়ে এলো। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরের ফলে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জেলাঞ্চলের সুস্পষ্ট অবনগরায়ন (de-urbanization) ঘটতে শুরু করে, মুর্শিদাবাদ শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে এবং নাগরিক হস্তশিল্পগুলিরও পতন শুরু হয়। এই প্রবণতা ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের পরও অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে বৃটিশ প্রশাসন সুদৃঢ় হতে থাকায় ১৮৩৬ সাল থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে অত্যন্ত ধীরগতি পুনর্নগরায়ন (re-urbanization) শুরু হয় এবং তার ফলে বহরমপুর, লালবাগ, কান্দী ও জঙ্গীপুর এই চারটি অপেক্ষাকৃত বড় শহর এবং জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ ও ধুলিয়ান এই তিনটি ছোট শহরের উত্থান ঘটে। পুরোনো মুর্শিদাবাদ শহরের সামাজিক বিন্যাসের সঙ্গে এই নতুন শহরগুলোর সামাজিক বিন্যাসের সুস্পষ্ট পার্থক্য ঘটে। ইংরেজ-নির্ভর যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান জেলাঞ্চলে শুরু হয়েছিল, তাদের স্থানীয় গুরুত্ব ও প্রাধান্যই এই নতুন শহরগুলিতে প্রতিফলিত হলো। কিন্তু বিন্যাসগতভাবে নতুন হলেও জনসংখ্যার বিচারে এই শহরগুলি কোনোক্রমেই উল্লেখযোগ্য থাকলো না। ১৮৩৬

থেকে ১৮৭০ সালেব মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে নগবাযনেব এই রূপান্তব ঘটে গেলো। অর্থাৎ সামগ্রিক ফলশ্রুতিব বিচাবে মুর্শিদাবাদে অবনগবাযনেব প্রবণতাই অব্যাহত থাকলো। এবং অব্যাহত থাকলো ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্তই।[১৩]

দেখা যাচ্ছে, ১৮৩৬ থেকে ১৯০৫ সালেব মধ্যে দুটি সুস্পষ্ট পর্বে জেলাঞ্চলেব অর্থনীতি ভাবত তথা বাংলাব ঔপনিবেশিক অর্থনীতিব একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পবিণত হচ্ছে। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টাব-এব বক্তব্য অনুসবণ কবে বলতে হয যে, ১৮৩৬ থেকে ১৮৭০ সালেব মধ্যেই "The interests of the District have become agricultural rather than manufacturing"। ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ সালেব মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব এই কৃষি-নির্ভব চবিত্র আবো গভীবতা ও ব্যাপকতা লাভ কবে। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনীতিব এই সামগ্রিক রূপান্তবেব পটভূমিতেই এখানকাব ভূমি-সম্পর্কেব গতি-প্রকৃতি বোধগম্য হবে।[১৪]

॥ খ ॥

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত সম্পাদনেব পব থেকে ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সমযকে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত সুস্থিতিকবণেব কাল হিসাবে চিহ্নিত কবা যায। ঐ সমযেব বেগুলেশন ৭ (১৭৯৯), বেগুলেশন ৫ (১৮১২) এবং পত্তনি বেগুলেশন (১৮১৯)— এই তিন আইনেব সাহায্যে একদিকে বাকী খাজনাব দাযে প্রজাবর্গেব মালপত্র ক্রোক কবাব ক্ষমতা দিযে জমিদাবদেব হাত শক্ত কবা হযেছিল, এবং অন্যদিকে পত্তনি-ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিযে জমিদাবদেব নিযমিত বাজস্বদানেব নিশ্চযতাবিধান কবা হযেছিল। পববর্তী কযেক দশকে এই আইনগুলিব রূপাযণেব ফলে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত সুস্থিতি লাভ কবেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে বাযতওযাবী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত (১৮১৯) হওযাব ফলে চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব পুনর্মূল্যাযন জরুবী হযে ওঠে। দেখা যায দুটি ক্ষেত্রে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত ক্রটিযুক্ত : (১) এই বন্দোবস্ত সবকাবেব বাজস্বেব পবিমাণ চিবদিনেব জন্য বেঁধে দিযেছিল, এবং (২) এই বন্দোবস্তে জমিদাবদেব সঙ্গে সম্পর্কেব ক্ষেত্রে বাযতদেব অধিকাব বক্ষাব কোনোই ব্যবস্থা ছিল না। চাবটি আইন ও সেগুলিব বাস্তবে রূপাযণেব মধ্যে দিযে এই দুই ক্রটি দূব কবে চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব সংশোধন কবাব চেষ্টা চলে ১৮৩৬ সাল থেকে ১৯০৫ সালেব মধ্যে। এই চাবটি আইন ছিল ১৮২৮ সালেব নিস্কব জমি অধিগ্রহণ বেগুলেশন, ১৮৫৯ সালেব খাজনা আইন, ১৮৭১ সালেব পথকব আইন এবং ১৮৮৫ সালেব প্রজাসত্ত্ব আইন। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে এই চাব আইনেব পবিপ্রেক্ষিত ও প্রভাবজনিত ফল তুলে ধবাব পূর্বে পূর্ববর্তী আইনগুলি কীভাবে কার্যকবী হচ্ছিল দেখে নেওযা দবকাব।

চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব ফলে পুবানো জমিদাবদেব হাত থেকে নতুন ধবনেব জমিদাবদেব হাতে জমিদাবী হস্তান্তবিত কবাব প্রবণতা ১৮৩৬ সালেব পবও অব্যাহত থাকে। এই সমযে জিযাগঞ্জ-আজিমগঞ্জেব মাড়োযাবী ও অন্যান্য অবাঙালী ব্যবসাযী মহাজন পবিবাবগুলিকেও— যেমন নাহাব, দুধোবিয়া, দুগাব, সিং, নৌলাখা, নেহালিযা ইত্যাদিকে জমিদাবী ক্রযে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ কবতে দেখা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যাপাব হলো এই যে, এইসকল পরিবাবেব অধিকাংশই জমিদাবী কেনাব পবও তাদেব পাবিবাবিক ব্যবসা ও মহাজনী কাববাব যথাবীতি চালু বাখে। শুধু মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলই নয, বাংলা ও আসামেব অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই পবিবাবগুলিব ভূমিকা ব্যাপকতব মনোযোগেব দাবী বাখে। এই

পর্বে নীলকরেরাও মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে জমিদারী কিনতে থাকে এদেশে জমি কেনার অধিকার অর্জন করার ফলে তারা ১৮৬০ সালের মধ্যেই এ জেলায় ২৩টি জমিদারীর মালিক হয়ে ওঠে। নীলকরদের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রে উত্তর মুর্শিদাবাদের নিমতিতা ও কাঞ্চনতলা জমিদারীর উদ্ভবও ঘটে এই সময়ে। জেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য জমিদারীর পত্তনও এই পর্বে ঘটে— মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের জমিদারী। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর কোনো এক সময়ে নবাব নাজিমকে প্রদেয় ১৬ লক্ষ টাকা ভাতার নিয়মিত যোগান সুনিশ্চিত করার জন্য কিছু জমিদারী নবাব নাজিমের অজ্ঞাতসারে তাঁর নামে রেখে দিয়েছিল। সেই সুবাদেই ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে গর্ভণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী নবাব নাজিমকে প্রকাশ্যে রাজকীয় মর্যদা, সম্মান ও সুবিধা-বর্জিত একজন জমিদার হিসাবেই উপস্থাপিত করেন, এবং এ-ব্যাপারটি সম্পূর্ণত আইন-সিদ্ধ হয় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে। এইভাবে আলোচ্যপর্বেই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের জমিদারীগুলির সংখ্যা ও আয়তন যে রূপ লাভ করে, পরবর্তীকালে নানা সময়েও তার প্রান্তিক পরিবর্তনমাত্রই লক্ষ্য করা গেছে। ১৮৪৯-৫০ সালে জেলার জমিদারীর সংখ্যা ছিল ২৬৫৬টি, ১৮৭০-৭১ সালে সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছিল ২৮৫৩টি। ১৮৭৩ সালের মোট ২৮৩৫টি জমিদারীর আয়তন ছিল নিম্নরূপ : ২০,০০০ একরের উপরে ৮টি জমিদারী, ৫০০ থেকে ২০,০০০ একরের মধ্যে ৩৭৮টি জমিদারী এবং ৫০০ একরের কম আয়তনের ২৪৪৯টি জমিদারী। এই সময়ের পরে জেলার কিছু কিছু অংশ বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে ১৯২৮-২৯ সাল নাগাদ দেখা যায় যে জেলার জমিদারীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩৭৮টি। মোটকথা ১৮৩৬ সাল থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে জমিদারীর সংখ্যা যে আড়াই হাজা[illegible]ছু বেশী বা কম ছিল এবং সেগুলির অধিকাংশই যে ছোট জমিদারী ছিল, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে।[১৫]

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে পত্তনি ব্যবস্থাকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে বাংলার বিভিন্ন জেলার মত মুর্শিদাবাদেও জমিদারদের নিম্নবর্তী অথচ জমিদারী ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল খাজনা-আদায়কারী একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হয়। পত্তনি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং নীলকরেরা জেলার অনেক অঞ্চলেই পত্তনিদার হয়ে ওঠে, এমনকি ১৮৬০ সাল নাগাদও দেখা যায় তারা জেলার ২০টি পত্তনি জোতের মালিক। ১৮৩৬ সালের পর জেলার নতুন শহরগুলিকে কেন্দ্র করে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটতে থাকে তাদের অনেকেও মধ্যস্বত্বভোগী এই শ্রেণীটির কলেবর বৃদ্ধি ঘটাতে শুরু করে। বিশেষত মুর্শিদাবাদ জেলার জমিদার ও রায়তদের মধ্যবর্তী পত্তনিদার— দর-পত্তনিদার— সে-পত্তনিদার— দরাদর পত্তনিদার ইত্যাদি চার-পাঁচটি স্তর যুক্ত এক মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী গড়ে ওঠে। পত্তনি-ব্যবস্থা ছাড়াও অন্যান্য কয়েক ধরনের মধ্যস্বত্ব মালিকানাও মুর্শিদাবাদ জেলায় লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭০-৭২ সালে পথকর সম্পর্কিত অনুসন্ধানের ফলে জেলাঞ্চলের মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থার স্পষ্টতর রূপটি ধরা পড়ে। জানা যায় যে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে ভূমি-সম্পর্কিত মালিকানা ব্যবস্থার ৫৫.৭২ শতাংশই মধ্যস্বত্বভোগী এবং এর মধ্যে পত্তনি ৪১ শতাংশ এবং দর-পত্তনি ১২ শতাংশ। এছাড়াও মহালন্দী পরগণায় মাঝকুড়িতালুক, খড়গ্রাম ও মুরারীপুর পরগণায় শিকমি তালুকের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। সরকারী খাসমহালগুলিতে 'জোতদারী' ব্যবস্থাও আর এক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি করে। জেলার সবচেয়ে বড় পরগণা কুমার প্রতাপ রায় নামে ১৩২টি পত্তনি, ৯৪টি দর-পত্তনি,

২৯টি সে-পত্তনি এবং এর চাইতে কিছু কম সংখ্যক দবাদব পত্তনি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পথকর সম্পর্কিত অনুসন্ধানেও মধ্যস্বত্বব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপটি ধরা পড়েছিল তা বলা যায় না। তাহলেও এই অনুসন্ধান জেলার ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে নতুনতর আলোকপাত করতে সক্ষম হয় সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, ১৮৭০ সালে যেখানে জেলা-সমাহর্তা অনুমান করেছিলেন যে জেলার অধিকাংশ জমি এখনও সদব জমিদাবদের হাত থেকে মধ্যস্বত্বভোগীদেব হাতে চলে যায়নি, সেখানে দু' বছর পরে পথকর সম্পর্কিত অধিকতর তথ্যনিষ্ঠ অনুসন্ধানের ফলে ধরা পড়েছিল যে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের জমিদারেবা ইতিমধ্যেই তাদের জমিদারীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে হারিয়ে বসেছিলেন। এই সময়ের পরও মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধি থেমে থাকেনি। ১৮৬৯ সাল থেকে স্থায়ী ইজারার নথীভুক্তির যে-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তার থেকে উনিশ শতকেব শেষ তিন দশকেও এই জেলাঞ্চলে মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যাবৃদ্ধি কতটা হয়েছিল তা বোঝা যায় :

সারণি ১

| বছর | ইজারার সংখ্যা |
|---|---|
| ১৮৭০-৭২ | ১৪০২ |
| ১৮৭৩-৭৫ | ২৫৯২ |
| ১৮৭৬-৭৮ | ২৫২১ |
| ১৮৭৯-৮১ | ৪১৬৯ |
| ১৮৮২-৮৪ | ১১২৭ |
| ১৮৮৫-৮৭ | ১৩১৭ |
| ১৮৮৮-৮৯ | ৫৫৮ |
| ১৮৯১-৯২ | ৭৫৯ |
| ১৮৯৪-৯৬ | ১৩৯৮ |
| ১৮৯৭-৯৯ | ১৫৮৩ |
| মোট | ১৮,৪১৬ |

মনে রাখা দরকার যে এই হিসেবের মধ্যে ১৮৬৯ সালের পূর্ববর্তী এবং অনথীভুক্ত ইজারাগুলিকে ধরাই হয়নি। মোটকথা, এইভাবে জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত মধ্যস্বত্বভোগীদের ক্রমবিস্ফারিত আকার ও আয়তনগত রূপের একটা ছবি পাওয়া যায়। প্রকৃত কৃষক এবং জমিদারদের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীটির পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিচয় পেতে হলে আমাদের যেমন গ্রামীণ ভূস্বামী শ্রেণীর আকার প্রকারের পরিচয় নিতে হবে, সেইরকম প্রথাভিত্তিক ভূমি-বন্দোবস্তের গতিপ্রকৃতির হদিশ নিতে হবে। এর জন্য আমাদের নজর দিতে হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংশোধনের প্রয়োজনে গৃহীত পদক্ষেপগুলির দিকে।[১৬]

দেওয়ানী লাভের পর থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যত বেশী পরিমাণ সম্ভব এবং যত নিয়মিত সম্ভব রাজস্ব আদায়ের জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কোম্পানী বার বার ভূমি-ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছিল। রাজস্ব-সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধির উপায়-পদ্ধতি খুঁজতে গিয়ে কোম্পানী দেখে যে দেওয়ানীভুক্ত মোট জমির চার ভাগের একভাগই

নিস্কবভোগীদেব কবাযত্ত। শুধু তাই নয, আবো বেশ কিছু পবিমাণ জমি সেবামূলক কাজেব জন্য বিলি কবা। এই পবিস্থিতিব পবিপ্রেক্ষিতেই ১৭৭২ সালে ওযাবেন হেস্টিংস, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওযালিশ এবং ১৮১৯ সালে লর্ড হেস্টিংস এইসকল নিস্কব জমিতে সবকাবেব অধিকাবেব কথা অত্যন্ত জোবেব সঙ্গে দাবী কবলেও জনমতেব বিরুদ্ধতায এ-ব্যাপাবে কিছু কবতে পাবেননি। অবশেষে ১৮২৮ সালে এ সম্পর্কে আইন পাশ হলো— ১৮৩৬ সাল থেকে সবকাব কর্তৃক নিস্কব বাজেযাপ্তেব প্রবল প্রচেষ্টা শুরু হলো— যাকে বলা হয Resumption Proceedings। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে ১৮৩৬ থেকে ১৮৪৭ সালেব মধ্যে এই উদ্যোগেব ফলে ৭৪টি নিস্কব মহাল অধিগৃহীত হযেছিল। এব মধ্যে ককুনপুব জমিদাবীভুক্ত সূর্যনাবাযণ বাযেব ৪২৩৬ বিঘা, কাজী জালালুদ্দিন মিযা ও মুন্সী ফৈজুদ্দিন আহমদেব ১৫৫৬ বিঘা এবং গোবিন্দ শর্মা ব্যানার্জিব ৭২০ বিঘা লাখেবাজ জমি বাজেযাপ্তকবণ উল্লেখযোগ্য। এই বড মহালগুলি ছাড়াও ১০০০টি ছোট আযমা জোতও বাজেযাপ্ত হয। মুর্শিদাবাদেব নবাব নাজিমেব ৬১,৪৮২ বিঘা লাখেবাজেবও অনেকটাই অধিগৃহীত হয। মুর্শিদাবাদ জেলাব নিস্কব চৌকিদাবী চাকবান জমিগুলিও অধিগৃহীত হয ১৮৯৪ সালে। এই সকল নিস্কব জমি অধিগ্রহণেব পবও জেলাঞ্চলেব আসাদনগব ও ফতেসিংহ পবগণায বেশ কিছু আইনসিদ্ধ নিস্কবভোগী বযে যায। এই বিভিন্নপ্রকাব নিস্কব জমিগুলি অধিগ্রহণেব পব সবকাব জমিদাবদেব সঙ্গে এগুলিব খাজনা বন্দোবস্ত কবে। এইভাবে সবকাবেব কিছু আযবৃদ্ধি ঘটে। সবকাবী আযবৃদ্ধিতে ১৮৭১ সালেব বোড সেস্ আইনও কিছুটা সাহায্য কবে। এই সকল নিস্কব বাজেযাপ্তেব ফলে কযেকশ মুসলিম পবিবাব, যাবা গ্রামীণ ভূস্বামী শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত ছিল, ক্ষতিগ্রস্ত হয। ফ( ্বামী শ্রেণীব আযতন কিছুটা হ্রাস পেলেও অন্য একটি কাবণে ভূস্বামী শ্রেণীব সামগ্রিক আযতন যে বৃদ্ধিই পায, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায। চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব ফলে "বাঙালী সমাজেব প্রতিটি স্তবে জমি কিনে সামাজিক মর্যাদা লাভেব এক অপ্রতিবোধ্য আকাঙ্ক্ষা পবিলক্ষিত হয।" এব ফলে ১৮৩৬ সালেব পব থেকে যাবা ইংবেজী শিখে বিভিন্ন পেশা ও চাকবীতে জেলা সদব ও মহকুমা শহবগুলিতে নিজেদেব স্থান কবে নিচ্ছিলেন, তাবা জমিজমা কিনতে থাকেন ও তাঁদেব বোজগাবেব একটি অংশ জমিতে লগ্নী কবতে থাকেন। এব ফলেও ভূস্বামী শ্রেণীভুক্ত এক-ধবনেব মধ্যস্বত্বভোগীব উদ্ভব ঘটে— অনুপস্থিত জমিদাবেব মতই 'অনুপস্থিত বাযত'। আব এই অনুপস্থিত বাযতদেব অধিকাংশই হলো হিন্দু সম্প্রদায-ভুক্ত। উপবোক্ত আলোচনায দেখা যাচ্ছে যে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত বজায বেখে সবকাবেব আযবৃদ্ধিব প্রচেষ্টা গ্রামীণ শ্রেণী-বিন্যাসেব উপবই গভীব প্রভাব ফেলেছিল।[১৭]

প্রজাস্বত্বেব প্রশ্নে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত সংশোধনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপটি গৃহীত হযেছিল ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানীব শাসন সমাপ্ত হযে সবাসবি বৃটিশ শাসন প্রবর্তনেব পব ১৮৫৯ সালে খাজনা আইন (Rent Act) এব মাধ্যমে। ঠিক কোন্ পবিপ্রেক্ষিতে এই আইনটি বচিত হযেছিল সে-সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও, প্রজাস্বত্ব উপেক্ষাব ব্যাপাবে চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব ত্রুটি দূব কবাব প্রযোজনে প্রশাসনিক বিবেচনা, তিতুমীবেব আন্দোলন— কোল বিদ্রোহ— ফাবাজি আন্দোলন— তবীকা-ই-মহম্মদীযা আন্দোলন— সাঁওতাল বিদ্রোহ— নীল অসন্তোষ— ভাবতীয মহাবিদ্রোহ ইত্যাদিব মধ্যে দিযে বিস্ফোবিত ব্যাপক প্রজা-অসন্তোষ দূব কবাব একটি উদ্যোগ গ্রহণ, নীলকব স্বার্থে জমিদাবদেব নিযন্ত্রণ প্রচেষ্টা অথবা বাস্তবত নীল ও বেশমেব যোগানদাব সম্পন্ন কৃষক বা বাযত স্বার্থেব নিশ্চয়তাবিধান— এই সকল

উপাদানেরই যে এই আইনটি রচনার ক্ষেত্রে কিছু প্রভাব ছিল, একথা বলা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে এই সকল উপাদানের অস্তিত্বই লক্ষ্য করা যায়। ফলে খাজনা আইন এই জেলাঞ্চলে কৃষি অর্থনীতি ও ভূমি সম্পর্কের রূপান্তরে এক সুদূর-প্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়।[১৮]

খাজনা আইনের প্রভাবগুলি চিহ্নিত করার পূর্বে এই আইন কী করতে চেয়েছিল দেখা যাক। এই আইন তিনটি সংস্কার আনতে চেয়েছিল। প্রথমত খাজনার দুটি উপাদান, অর্থাৎ চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-নির্ধারিত খাজনা এবং পরবর্তীকালে সংযোজিত আবওয়াব— এই দুইয়ের মধ্যে আবওয়াব বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল, অথচ ফসলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে খাজনাবৃদ্ধির ক্ষমতা জমিদারদের হাতে রেখে দিয়েছিল, জমিদার ও প্রজার মধ্যে পাট্টা ও কবুলিয়ত অদলবদলের ব্যবস্থা করেছিল এবং খাজনা নির্ধারণে আদালতের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বাকী খাজনার দায়ে প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছিল এবং প্রজাকে বাধ্যতামূলকভাবে জমিদারের কাছারীতে হাজির করার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তৃতীয়ত, রায়তদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে তাদের খাজনা তিনভাবে নির্ধারণের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই তিন শ্রেণীর রায়ত ছিল : স্থায়ী স্বত্বযুক্ত নির্দিষ্ট খাজনাদানকারী রায়ত, দখলীস্বত্বযুক্ত বৃদ্ধিযোগ্য খাজনাদানকারী রায়ত এবং দখলীস্বত্ববিহীন রায়ত। এই তিনশ্রেণীর রায়তের মধ্যে দখলীস্বত্ববিহীন রায়তের খাজনা নির্ধারণের পুরোপুরি স্বাধীনতা জমিদারদের থাকলো এবং এই রায়তেরা আইনেরও কোনপ্রকার সংরক্ষণ পেলো না। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে এই তিনটি ক্ষেত্রেই খাজনা আইনের ফলশ্রুতি আমরা বিচার করে দেখতে পারি।

এই আইন রচনার এক দশকের কিছু পরে ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার তাঁর 'এ স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্‌ অ্যাকাউন্ট অব্‌ বেঙ্গল, ডিস্ট্রিক্টস অব মুর্শিদাবাদ এ্যান্ড পাবনা' বইয়ে প্রথম জনগণনা সমীক্ষালব্ধ তথ্যাবলী ও মুর্শিদাবাদের তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে এই পরিবর্তনের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। এই আইনের ফলে সারা জেলায় সাধারণভাবে খাজনাবৃদ্ধি ঘটেনি এবং জমিদারদের খেয়ালখুশীমতো অস্বাভাবিক খাজনাবৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে গেছিল— একথা জানালেও হান্টারের উক্ত বইয়েই বিপরীত প্রমাণও মেলে। রায়তদের উপর জমিদারদের জোরজুলুম ও বলপ্রয়োগ যে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছিল, তা বলা যায় না। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩০ জন স্থায়ী রায়ত হিসাবে এবং ১১১ জন দখলীস্বত্বযুক্ত রায়ত হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবত এই দুই প্রকার রায়তের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। অত্যাচারী জমিদারেরা মামলামোকদ্দমা, জালজুয়াচুরি ও বলপ্রয়োগের সাহায্যে স্থায়ী রায়তদের দখলীস্বত্বযুক্ত রায়তে এবং দখলীস্বত্বযুক্ত রায়তদের দখলীস্বত্ববিহীন রায়তে পরিণত করে চলেছিল এবং এইভাবে খাজনাবৃদ্ধি ঘটাচ্ছিল। অন্যদিকে এই সময় থেকেই জমিদারেরা খাজনাবৃদ্ধির বদলে মোটা সেলামীর বিনিময়ে মধ্যস্বত্বভোগী জোত হিসাবে তাদের জমিদারীর বন্দোবস্ত করতে শুরু করেছিল এবং অনেক স্থায়ী ও দখলীস্বত্বযুক্ত রায়ত এই সুযোগে মধ্যস্বত্বভোগীতে পরিণত হতে শুরু করেছিল। জেলা সমাহর্তার মতে, রায়তদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল দখলীস্বত্ববিহীন ইচ্ছাধীন রায়ত, যদিও এই তিন ধরনের রায়তের আনুপাতিক সংখ্যা জানা ছিল না। অবশ্য এই সময়ের পরে ১৮৭০-১৮৮০ সালের মধ্যে রায়তী জোতের বণ্টন থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে রায়তদের অন্য ধরনের স্তর-বিভাজনের কিছুটা পরোক্ষ ইংগিত পাওয়া যায় :

**সারণি-২**

| বার্ষিক খাজনার পরিমাণ | অধীন জোতের শতাংশ |
|---|---|
| ১০০ টাকার উপরে | ০.১৬ |
| ৫০-১০০ টাকা | ০.৭৯ |
| ২০-৫০ টাকা | ৫.৫৬ |
| ৫-২০ টাকা | ২৬.৩৪ |
| ৫ টাকার নীচে | ৬৭.১৫ |

১৮৫৯ সালের খাজনা আইনের অন্য একটি তাৎপর্যের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। সারা বাংলার মতো মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলেও ১৮১৩ সালের পর থেকেই নীলকরেরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং ১৮৩৬ সালের পর থেকে প্রচন্ড প্রতাপশালী হয়ে ওঠে ১৮৫০ সালের মধ্যে। অথচ এই গোটা সময়টা জুড়েই নীলকরদের সঙ্গে জমিদারদের সম্পর্ক ভালই ছিল এবং গ্রামাঞ্চলে জমিদারদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ১৮৫০ সালের পর গ্রামে নীলকরদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, জমিদারদের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। কিন্তু ১৮৬০ সালে নীল বিদ্রোহের ফলে আবার নীলকরদের হাত থেকে মহাজনদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর শুরু হয়। নীল বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ব্লেয়ার ক্লিং বলেছেন : "বাংলার গ্রামাঞ্চলে নীলবিদ্রোহের পরের দশকটি যখন চাষীরা নীলকরদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছিল, অথচ মহাজনদের খপ্পরে পড়েনি, তখনই ছিল সবচাইতে সুখের সময়।" খাজনা আইনের ফলে রায়তেরা স্বীকৃত স্বত্বের অধিকারী হওয়ায় মহাজনদের পক্ষে তাদেরকে টাকা ধার দেওয়া সহজ হয়েছিল, আর ১৮৭৯-৮০ সাল নাগাদ ঋণের টাকা আদায়ের জন্য মহাজনদের পক্ষে রায়তদের ফসল ক্রোক করা আইনত অসম্ভব হয়ে পড়ায় রায়তদের মধ্যে মহাজনের কাছে জমি রেখে ঋণ নেওয়া শুরু হয় এবং অকৃষকদের হাতে জমির হস্তান্তর বৃদ্ধি পায়। খুব কম ক্ষেত্রেই এই মহাজনেরা ছিল একটি পৃথক শ্রেণী। ১৮৩৬ সালের পর থেকেই সম্পন্ন রায়তেরা অনেকে বাণিজ্যিক কৃষির প্রসারের ফলে নীল, রেশম বা খাদ্যশস্যের ব্যবসার দিকে ঝুঁকতে থাকে, অনেকে ফসল ধার দেওয়ার ব্যবসা শুরু করে, অনেকে মহাজনীতে টাকা খাটাতে থাকে। ১৮৫৯ সালের পর সম্পন্ন কৃষকদের মহাজনী কারবারের বাড়বাড়ন্ত হতে থাকে এবং এই কৃষকেরা অনেক সময় মধ্যস্বত্বজোতেরও মালিক হয়ে উঠতে থাকে। শুধু সম্পন্ন কৃষকেরাই নয়, নেহালিয়া বা নিমতিতার জমিদারদের মতো কোনও কোনও জমিদারও মহাজনী কারবারের দিকে আকৃষ্ট হয়। ১৮৭০ সালের পর থেকে এই শ্রেণীটি গ্রামাঞ্চলে সুনিশ্চিতভাবে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করায় রায়তদের অন্য স্তরগুলি ক্রমশ এই শ্রেণীটির নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করে। এ-ভাবেই জেলাঞ্চলে সম্পন্ন রায়তেরা পরিণত হয় জোতদার শ্রেণীতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আঁদ্রে বেতাই 'জোতদার' শ্রেণীর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে যার উদাহরণ দিয়েছেন, তা এই জোতদার নয়, বরং আয়মা ও লাখেরাজ জমির মালিক পরশ্রমজীবি আমাদের দ্বারা চিহ্নিত ভূস্বামী-শ্রেণীটি সম্পর্কেই সে সংজ্ঞা প্রযোজ্য। জেলার গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের জায়গায় এই নতুন শ্রেণীটি প্রাধান্য অর্জন করলেও নীলকরেরা কিন্তু উবে গেলো না, তারা নীল উৎপাদন ছেড়ে জবরদস্ত জমিদার হয়ে ওঠার দিকে নজর দিলো।[১১]

খাজনা আইনই জেলাব কৃষকদেব মধ্যে স্তব-বিভাজনকে অনেকটা এগিযে দিলো। ১৮৩৬ সালেব পব থেকেই কৃষকদেব মধ্যে স্তব-বিভাজন ধীবে ধীবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। খাজনা আইন তাকে শুধু স্বীকৃতিই দিলো না, আবো দ্রুত ব্যাপক কবে তুললো। বঙ্কিমচন্দ্র হান্টাবকে প্রদত্ত তাঁব প্রতিবেদনে এই বিভাজন প্রক্রিযাকেই তুলে ধবেছেন : 'জোত' নাম থেকেই বোঝা যায যে কৃষকেব নির্দিষ্ট খাজনাব জমি হিসাবেই এগুলিব উদ্ভব হযেছিল ; পবে নানা কাবণে এই কৃষকেবা জমি চাষ বন্ধ কবে প্রকৃত চাষীদেব কাছে এই জমিগুলি বন্দোবস্ত কবেছে। স্থাযী বন্দোবস্তেব অধিকাবী হিন্দু কৃষকদেব প্রধান অংশই প্রায চাষী শ্রেণীব মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হযেছে। সমৃদ্ধিশালী হিন্দু চাষী সর্বদাই চেষ্টা কবে চাষীব জীবনবৃত্ত থেকে বেবিযে আসতে এবং পববর্তী উচ্চতব সামাজিক মর্যাদায আসীন হতে। যখনই তাব পক্ষে সম্ভব হযে ওঠে, সে তাব জমি বন্দোবস্ত কবে দেয এবং পবিশ্রমী কর্মীটি সম্মানিত নিষ্কর্মায (respected drone) পবিণত হয। এই পর্যবেক্ষণ মুসলমানদেব সম্পর্কে কম পবিমাণে প্রযোজ্য।

১৮৫৯ সালেব খাজনা আইনকে বাংলাব জমিদাবেবা যেভাবে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবে বেআইনী কার্যকলাপ অব্যাহত বাখে, তাব ফলে ব্যাপক প্রজা-অসন্তোষ সৃষ্টি হয এবং ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে পাবনা জেলায কৃষক বিদ্রোহ ঘটে যায। এব পবেও কৃষকেবা বাংলাব নানা অঞ্চলে জমিদানদেব বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু কবায খাজনা আইনেব সংশোধন অনিবার্য হযে ওঠে। ফলে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইন বচনা কবে পূর্বেব আইনেব ত্রুটিগুলি এইভাবে দূব কবাব চেষ্টা হয : প্রথমত, খাজনা বৃদ্ধিব একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধাবণ কবে দেওযা হয, যাতে জমিদাবদেব খাজনাবৃদ্ধিব প্রবণতাকে নিযন্ত্রণ কবা যায। দ্বিতীযত, বাকী খাজনাব দাযে জমিদাবদেব পক্ষে বাযতদেব সম্পত্তি ক্রোক কবা অধিকতব শক্ত হয এবং আদালতেব ডিক্রী ব্যতীত প্রজাউচ্ছেদ বন্ধ কবা হয। তৃতীযত, জবীপেব মাধ্যমে বাযতেব জমি ও স্বত্বেব নথীভুক্তি ও বিবৃতিব ব্যবস্থা কবা হয। চতুর্থত, দখলীস্বত্বভুক্ত বাযতেব সংজ্ঞাব সম্প্রসাবণ ঘটানো হয, যাতে বাযতদেব বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠ অংশই দখলীস্বত্বযুক্ত বাযত হিসাবে স্বীকৃতি পায। অন্যদিকে দখলীস্বত্ববিহীন বাযতদেব বক্ষাব কোনই ব্যবস্থা হয না। পঞ্চমত, দখলীস্বত্বযুক্ত বাযতবা জমিদাবদেব অনুমতি ছাড়াই জমি ক্রয বিক্রযেব অধিকাব লাভ কবে। ফলে দখলীস্বত্বেব কেনা-বেচাব বাজাব জেঁকে ওঠে, জমিব কেন্দ্রীভবন বাড়তে থাকে, বাযতদেব হাত থেকে জমি হস্তান্তবিত হতে শুরু কবে। ষষ্ঠত, প্রথা ও প্রথাগত অধিকাব-ভিত্তিক নিম্ন বাযতদেব অস্তিত্ব স্বীকাব কবে নেওযা হলেও তাদেব স্বার্থবক্ষাব কোনোই ব্যবস্থা বাখা হয না।[২০]

১৮৮৫ সালেব প্রজাস্বত্ব আইনেব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হলো এই যে, তা দখলীস্বত্বযুক্ত বাযতদেব মধ্যে তো বটেই, সাধাবণভাবে গ্রামীণ সমাজেব মধ্যেই স্তব-বিভাজন প্রক্রিযাটিকে অত্যন্ত ত্ববান্বিত কবে তুললো এবং একথা মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও ছিল সমভাবে প্রযোজ্য। সামগ্রিক ভাবে জমিদাবদেব, বিশেষত ছোট জমিদাবদেব, পূর্বেব ক্ষমতা অনেকখানি কমে এলো— মধ্যস্বত্বভোগীবা এবং দখলীস্বত্বেব বাযতেবা ক্রমশ শক্তিশালী হযে উঠতে থাকলো। অবশ্য কিছু কিছু জমিদাবেব দাপট এই পর্বেও যে থেকে গেছিল, তা বোঝা যায এই সকল জমিদাবদেব পশ্চিমা দাবোয়ান-লাঠিযাল বাহিনীব বহব দেখলে। উপবোক্ত স্তব-বিভাজনেব ফলেই দখলী-স্বত্বেব বাযতদেব অনেকে ধনী চাষী বা জোতদাবদেব সংখ্যাবৃদ্ধি কবতে থাকলো, বিপবীত প্রান্তে ছোট ছোট দখলীস্বত্বেব বাযত ও স্বত্ববিহীন বাযতদেব নিযে গবীব চাষীদেব বৃদ্ধি ঘটলো আব এই দুই গোষ্ঠীব মাঝখানে মাঝাবি চাষীদেব স্বরূপও স্পষ্টতব

হযে উঠতে থাকলো। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেও জমিব কেন্দ্রীভবনেব এই ছবি ধবা পড়ে ১৮৮৮ সাল নাগাদ দুটি গ্রামে নিবিড অনুসন্ধানেব ফলে। একটি গ্রামে একটি মাত্র পবিবাবেব হাতে ২৫% এবং অন্য দুটি পবিবাবেব হাতে ১৯% গ্রামেব জমি কেন্দ্রীভূত দেখা যায, যেখানে গ্রামেব বাকী ৯২% কৃষক পবিবাবেব হাতে ৩ বিঘা থেকে ৮ বিঘা গড আযতনেব মাত্র ৫৬% জমিব মালিকানা। অন্যদিকে জেলাব অধিকাংশ কৃষকেব পক্ষেই যেহেতু একটি মাত্রই হালবলদ বাখা সম্ভব হয, সেজন্য তাদেব এক প্রধান অংশই ১২ থেকে ১৬ বিঘাব মতো জমিব অধিকাবী। বাযতদেব মধ্যেকাব এই স্তব-বিভাজনেব ফলেই একদিকে ধনী চাষীদেব অনেকে মধ্যস্বত্বভোগী হযে উঠতে থাকলো, আবাব গবীব চাষীদেব অনেকেই হযে পডতে থাকলো নিম্নবায়ত বা ভাগচাষী, ভাগচাষীবা পবিণত হতে থাকলো ক্ষেতমজুবে। প্রজাস্বত্ব আইনেব ফলে মোটামুটিভাবে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সালেব মধ্যেই এই সকল পবিবর্তনেব ফলশ্রুতি সুস্পষ্ট হযে উঠলো।[২১]

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে ভাগচাষপ্রথা চিবস্থাযী বন্দোবস্ত, এমনকি নবাবী আমলেবও পূর্বে থেকে, চলে এসেছিল গ্রামীণ অর্থনীতিতে 'যজমানী প্রথা'-কে কেন্দ্র কবে। ১৮৩৬ সালেব পব থেকেই নতুন ধবনেব নগবাযন, মধ্যবিত্ত পেশাব বিপুল সম্প্রসাবণ এবং কৃষকদেব মধ্যে স্তব-বিভাজনেব বিস্তৃতি ইত্যাদি কাবণে ভাগচাষ প্রথাও যথেষ্ট বেডে যায। ১৮৭০ সাল নাগাদ হাণ্টাব সাহেব জেলাব সকল অঞ্চলেই যথেষ্ট সংখ্যক ভাগচাষীদেব লক্ষ্য কবেন। তাঁব মতে "ভাগচাষীবা কৃষিজীবি জনসাধাবণেব এক বিশেষ শ্রেণী, তাবা যথার্থ ক্ষেতমজুবও নয, আবাব তাদেব নিজেদেব কোন চাষেব জমিও নেই। যে জমিতে তাবা চাষ কবে তাতে একধবনেব অধিকাব তাদেব আছে, যা মূলত উৎপন্ন ফসলেব বিভাজনকে কেন্দ্র কবে।" দেখা যাচ্ছে ভাগচাষীবা একটি পৃথক কৃষিজীবি গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ কবেছে, এবং তা কবেছে সুপ্রাচীন প্রথাব ভিত্তিতে, আইনগত স্বীকৃতিব দ্বাবা নয। ১৮৮৫ সালেব প্রজাস্বত্ব আইন নিম্নবাযতদেব স্বীকৃতি দানেব মাধ্যমে ভাগচাষীদেব আইনগত স্বীকৃতিব দিকে প্রথম পদক্ষেপ নেয, যদিও এই শ্রেণীটিব স্বার্থ-সংবক্ষণেব তাগিদ দেখা দিযেছিল আবো পবে। হাণ্টাব সাহেব ১৮৭০ সাল নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে ক্ষেতমজুব শ্রেণীটিবও উদ্ভব লক্ষ্য কবেছেন। সংখ্যায তাবা যথেষ্ট হলেও এই শ্রেণীটিব বৃদ্ধিব সম্ভাবনা হাণ্টাবেব নজবে পডেনি, যদিও এই সময় থেকেই শ্রেণীটিব দ্রুত বৃদ্ধি শুরু হযেছিল। ক্ষেতমজুব শ্রেণীটি জমিব মালিক ছিল না, অথবা কোনোভাবে জমি বন্দোবস্তও নিতো না। নগদে বা শস্যে, দৈনিক বা মাসিক মজুবীব বিনিময়ে চাষেব কাজে নিযুক্ত হতো, বিশেষভাবে তুঁতেব ক্ষেতে। একদিকে বৃত্তিচ্যুত হস্তশিল্পীবা যেমন এদেব সংখ্যা বাডাচ্ছিল, অন্যদিকে খাদ্যশস্যেব মূল্যবৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান ঋণগ্রস্ততা ভাগীচাষীদেব ক্ষেতমজুবে পবিণত কবতে শুরু কবেছিল। ক্ষেতমজুব শ্রেণীটি কতো দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা জানা যায একটি তথ্য থেকে : ১৮৮৮ সালে মুর্শিদাবাদ জেলাব পশ্চিমে বাঢ় অঞ্চলে ক্ষেতমজুবেবা ছিল কৃষিজীবিদেব ১০% থেকে ১৫%, সেখানে পূর্ব মুর্শিদাবাদেব বাগডি ও কালান্তব অঞ্চলে এদেব সংখ্যা ছিল কৃষিজীবিদেব ৩০%। নীচেব দিকে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুব এই দুটি শ্রেণী স্পষ্টতব রূপ লাভ কবাব ফলে মাঝাবী চাষী ও ছোট চাষীব মধ্যেকাব পার্থক্যগুলিও স্পষ্টতব হযে উঠলো। ১৮৮৫ সালেব পব থেকেই জেলাঞ্চলেব গ্রামীণ সমাজ-বিন্যাসেব এই রূপবেখা ফুটে উঠতে শুরু কবে এবং ১৯০৫ সালেব মধ্যেই গ্রামীণ শ্রেণী বিন্যাস পূর্ণতা পায়।[২২]

আলোচ্য কালপর্বে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে কৃষি-নির্ভব শ্রেণীগুলিব জীবনমানেব দিকে দৃষ্টিপাত কবলে পবস্পব বিবোধী দুই বিপবীত চিত্রেব মুখোমুখি হওযা যায। জমিদাব-মধ্যস্বত্বভোগী-ভূস্বামী এই ত্রি-স্তবযুক্ত পবশ্রমজীবী দেশীয শোষক শ্রেণীটিব জীবনযাত্রাব মান বিলাসবাহুল্যে যে দীপ্যমান হযে উঠেছিল তাই নয, নতুন শহবগুলিব বাইবে গ্রামাঞ্চলেও নীল ও বেশম কুঠিযালদেব অনুকবণে ঘববাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, পোষাক আশাক, আমোদপ্রমোদ সমস্ত কিছুব মধ্যেই এক আশ্চর্য ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক দাসত্বেব ছাপ পডেছিল এবং জীবনযাত্রাব বহুক্ষেত্রেই বিদেশী শোষক ও শাসকদেব সঙ্গে নানা বিষযেই সহযোগিতা নজবে পড়াব মতো ছিল। বিশেষভাবে জেলাঞ্চলে ইংবাজী শিক্ষা প্রচলনেব সঙ্গে এই শ্রেণীব যৌথ উদ্যোগ স্মবণীয উদাহবণ হযে আছে। জেলাঞ্চলেব সদব ও মহকুমা শহবগুলিতেও কলকাতাব মতোই পুনর্জাগবণ বা বেনেশাঁব স্রোতোধাবাগুলিব সন্ধান কবলে দেখা যাবে ইংবেজ-সংসর্গকে কেন্দ্র কবেই সেগুলি আবর্তিত হযেছে। এই উজ্জ্বল ছবিব বিপবীতে মুর্শিদাবাদেব সংখ্যাগবিষ্ঠ ছোটচাষী-ভাগচাষী-ক্ষেতমজুবদেব ত্রিস্তবযুক্ত শ্রমজীবি শ্রেণীটিব জীবনযাত্রামান ছিল প্রতিবেশী জেলাগুলিব চাইতে যথেষ্ট খাবাপ। জেলায খাদ্যশস্যেব উচ্চমূল্য, মজুবীব নিম্নহাব এবং মহাজনেব কাছে ঋণবদ্ধতাব ফলে বিশেষভাবে ক্ষেতমজুবদেব অবস্থা ছিল শোচনীয। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব অমবসৃষ্টি 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধে এই জেলাতেই বসেই ১৮৭১-৭২ সালে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব উষ্ণস্পর্শ দিযে এই শ্রমজীবি কৃষক শ্রেণীভুক্ত হাসিম সেখ, বামা কৈবর্ত্ত ও পবাণ মণ্ডলেব জীবনযাত্রাব অবিস্মবণীয ভাষাচিত্র আমাদেব দিযে গেছেন: "প্রজা ধবিযা লইযা গিযা কাছাবিতে আটক বাখা, মাবপিট কবা, জবিমানা কবা, কেবল খাজনা বাকীব জন্য হয এমত নহে। যে সে কাবণে হয।" "পবাণেব আব এক পযসা নাই, কোথা হইতে এত টাকা দিবে ? যদি জমি বেচিয়া দিতে পাবিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেল, অথবা দেশত্যাগ কবিযা পলাযন কবিল।" এই অত্যাচাবেব মাবাত্মক প্রভাব পডল কৃষকেব জীবনমানে: "হাসিম সেখ আব বামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহবেব বৌদ্রে, খালি মাথায, খালি পাযে, এক হাঁটু কাদাব উপব দিযা দুইটা অস্থিচর্ম বিশিষ্ট বলদে, ভোঁতা হাল ধাব কবিযা আনিয়া চষিতেছে....। উহাদেব এই ভাদ্রেব বৌদ্রে মাথা ফাটিযা যাইতেছে, তৃষ্ণায ছাতি ফাটিযা যাইতেছে, তাহাব নিবাবণ জন্য অঞ্জলি কবিযা মাঠেব কর্দ্দম পান কবিতেছে; ক্ষুধায প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ি গিযা আহাব কবা হইবে না, এই চাষেব সময। সন্ধ্যাবেলায গিযা উহাবা ভাঙ্গা পাতবে বাঙ্গা বাঙ্গা বড বড ভাত, লুন, লঙ্কা দিযা আধপেটা খাইবে। তাহাব পব ছেঁড়া মাদুবে, না হয ভূমে, গোহালেব একপাশে শযন কবিবে— উহাদেব মশা লাগে না। তাহাবা পবদিন প্রাতে আবাব সেই একহাঁটু কাদায কাজ কবিতে যাইবে— যাইবাব সময, হয জমিদাব, নয মহাজন, পথ হইতে ধবিযা লইযা গিযা দেনাব জন্য বসাইযা বাখিবে, কাজ হইবে না। নযত চষিবাব সময জমিদাব জমিখানি কাড়িযা লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসব কি কবিবে ? উপবাস— সপবিবাবে উপবাস।" বঙ্কিমচন্দ্রেব এই ভাষাচিত্র বচনাব পবে থেকে বিংশ শতাব্দীব শুরু পর্যন্ত প্রায তিন দশক জুড়ে বাংলাব নিম্নবর্গেব মানুষেব বাস্তব অবস্থা নির্ধাবণেব জন্য যে-সকল সবকাবী উদ্যোগ নেওযা হযেছিল তাব থেকেই দেখা যায যে ঐ সমযে সাধাবণ মানুষেব দাবিদ্র্য ক্রমশ যেমন বাড়ছিল সেইবকম তাদেব ক্রযক্ষমতাও ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। অর্থাৎ তাদেব অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্র-বর্ণিত পবিস্থিতি অপেক্ষা অধিকতব শোচনীয হয়ে উঠেছিল।[২৩]

আলোচ্য পর্বে মুর্শিদাবাদেব কৃষক-সাধাবণ ইংবেজ নীলকব-বেশম কুঠিযাল এবং দেশী জমিদাব মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামীদেব অমানুষিক শোষণ ও অত্যাচাব অবশ্যই বিনা প্রতিবাদে নত মস্তকে মেনে নেযনি। বিশেষত ১৮৩৬ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্তই ছিল এ জেলায ব্যাপক কৃষক অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহেব কাল। এই সমযে জেলাব গ্রামাঞ্চলে যে প্রবল অর্থনৈতিক বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিল, পড়ন্ত প্রাক ধনতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামোব মধ্যে তা ধর্মীয উজ্জীবন আন্দোলনেব মধ্যে দিযে তবীকা-ই-মহাম্মদীযা ও ফাবাজি আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ কবে। সাঁওতাল বিদ্রোহে জেলাব উত্তবাঞ্চল এবং নীল বিদ্রোহে জেলাব উত্তব ও পূর্বাধ উত্তাল হযে উঠেছিল। ১৮৭০ থেকে ১৯০৫ সালেব মধ্যে কৃষকদেব প্রতিবোধ ক্রমে ক্রমে আইনী রূপ গ্রহণ কবলেও এবং মামলা-মোকদ্দমাব মধ্যে দিযে প্রকাশিত হতে শুরু কবলেও সব সমযই যে এব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ও নয। স্বামী অখন্ডানন্দেব 'স্মৃতি-কথা' থেকে জানা যাচ্ছে, ১৮৯৭ সালে ন-পুকুব-বেলডাঙ্গা অঞ্চলে নদীযা জমসেবপুবেব জমিদাব বাবুদেব "এক গোমস্তাব অত্যাচাবে উৎপীড়িত প্রজাসাধাবণ দিন দুপুবে সেই গোমস্তাকে কাছাবি থেকে টেনে মাঠে নিযে গিযে ঠেঙিযে মেবে ফেলে", আব মহাবাণী স্বর্ণমযীব বেলডাঙ্গা "মহলেব প্রজাবা তাঁহাব নাযেব গোমস্তাব ভীষণ অত্যাচাবে বিদ্রোহী হইযা খাজনা দেওযা বন্ধ বাখিযাছে।" মোট কথা আলোচ্য পর্বেব কোনো সমযেই জেলাব অত্যাচাবিত কৃষকদেব প্রতিবাদ প্রতিবোধ একেবাবে স্তব্ধ হযে যায়নি।[২৪]

## চার

॥ ক ॥

মুর্শিদাবাদ জেলাব অর্থনৈতিক ইতিহাসেব তৃতীয পর্বটি ১৯০৫ সালে শুরু হযে ১৯৪৭ সালে পবিসমাপ্ত হতে পাবত, কেননা, দেশেব স্বাধীনতাব সঙ্গে সঙ্গে এই জেলাও ঔপনিবেশিক নাগপাশ থেকে অপাতদৃষ্টিতে মুক্ত হযেছিল। কিন্তু পলাশীব যুদ্ধেব পবেও যেমন প্রাক্ পলাশী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব ধাবাবাহিকতা ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বহমান ছিল, ঠিক সেইবকমই মুর্শিদাবাদ জেলাতেও স্বাধীনতাব পূর্বেব অর্থনৈতিক কাঠামোব রূপবেখাটিও মোটামুটি বিদ্যমান ছিল ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। ঔপনিবেশিক আমলে ঔপনিবেশিক স্বার্থে মুর্শিদাবাদেব অর্থনীতিব যে-কাঠামোটি সংবচিত হযেছিল সেই কাঠামোটিকে বাতিল কবে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব পত্তন ঘটানো দেশেব বাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হওযাব পবই সম্ভব ছিল। একথাও ঠিক যে স্বাধীনতাব অব্যবহিত পবে কৃষি ও শিল্প এই উভয ক্ষেত্রেই কিছুটা গতিশীলতা সঞ্চাবিত হযেছিল। কিন্তু এই গতিশীলতা এত তীব্র ও ব্যাপক কিছু ছিল না যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব ঔপনিবেশিক কাঠামোকে সহজেই ভেঙে ফেলতে পাবে। ফলে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৫ সালেব মধ্যে স্বাধীন দেশেব বাষ্ট্রীয উদ্যোগও কৃষি-প্রধান মুর্শিদাবাদেব ভূমি-সম্পর্কেব ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা-সৃষ্ট অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাকেই আইনগত রূপমাত্র দিযেছে, আইনেব মাধ্যমে আমূল সমাজ-পবিবর্তনে কোনও নির্ধাবক ভূমিকা গ্রহণ কবতে অগ্রসব হযনি। এই সাধাবণ পবিপ্রেক্ষিতেই আমবা ১৯০৫ থেকে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক বিবর্তনেব আলোচনা কবতে পাবি তিনটি কাল-পর্যাযে ভাগ কবে : ১৯০৫-১৯৩০,

১৯৩০-১৯৪৭ এবং ১৯৪৭-১৯৫৫।

১৯০৫ সাল বাংলাব ইতিহাসে প্রভূত বাজনৈতিক গুরুত্বেব অধিকাবী হলেও মুর্শিদাবাদ জেলাব ইতিহাসে অর্থনৈতিক তাৎপর্যেব ইঙ্গিতবহ। ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সালেব মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীবথীব পূর্বপাড়ে এবং ১৯১১ থেকে ১৯১৩ সালেব মধ্যে ভাগীবথীব পশ্চিমপাড়ে ভাগীবথীব সমান্তবাল দুটি বেলপথ চালু হওযায এই জেলা বৃটিশ সাম্রাজ্যেব দ্বিতীয বৃহত্তম বন্দব-নগবী কলকাতাব সঙ্গে সবাসবি যুক্ত হলো। এতদিন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদেব যোগাযোগ ব্যবস্থায নদীপথেব যে প্রাধান্য ছিল তা অন্তর্হিত হযে বেলপথেব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওযায এ-জেলাব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পবিবর্তনেব সূচনা হলো, বিশেষভাবে বেলপথ মুর্শিদাবাদেব পশ্চিমাঞ্চলকে মুক্ত কবে দিলো। বেলপথেব প্রবর্তন এ-জেলাব অর্থনীতিতে যে গতিশীলতা সঞ্চাব কবে তা ত্ববান্বিত হযে ওঠে সড়ক উন্নযন, সাইকেল, মোটবযান এবং সাইকেল-বিক্সাব মত যানবাহনেব প্রবর্তনেব ফলে। এই সকল পবিবর্তনেব পিছু পিছু চালকল তেলকলেব মত ছোটখাট আধুনিক যন্ত্রশিল্পও জেলাব অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু কবে। মাছেব ব্যবসা, তবিতবকাবীব ব্যবসা, দুধ ও দুধজাত দ্রব্যাদিব ব্যবসা, গরুছাগল ও আমেব ব্যবসা, বিশেষভাবে পাটেব ব্যবসাব প্রসাব এ-জেলায ঘটতে দেখা যায। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদেব অর্থনীতিতে আমদানী কবা ভোগ্য দ্রব্যেব ব্যাপক ব্যবহাবও ক্রমশ লক্ষ্যণীয হযে ওঠে। এসবেব ফলে মুর্শিদাবাদেব অর্থনীতিতে বাজাবেব প্রভাব ও পণ্যউৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেলো। নীল, তুঁতেব মতো কৃষিপণ্যেব বদলে ধান-গম-আলু ও পাটেব চাষ বৃদ্ধি পেতে থাকল। জেলাব কোনও কোনও অঞ্চলে ফুলকপি বাঁধাকপিব চাষও শুরু হল। মোটামুটি ভাবে ১৯০০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ধানপাটেব দাম উর্দ্ধমুখী হওযায কৃষি উৎপাদনেব চেহাবা নতুন রূপ নিতে থাকল। কিন্তু এই সময়ে মুর্শিদাবাদেব অর্থনীতিতে অন্য দুটি বিপবীত শক্তিব ক্রিযাব ফলে জেলাব অর্থনৈতিক উন্নযন অগ্রসব হওযাব বদলে ব্যাহতই হল। দেখা যায় ১৯০১ থেকে ১৯৩১ সালেব মধ্যে একদিকে জেলাব জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেযেছে ২২.৯%, অথচ অন্যদিকে ১৮৯১ থেকে ১৯৩১ সালেব মধ্যে চাষেব জমি হ্রাস পেযেছে ২০%। মুর্শিদাবাদ জেলাব বাগড়ি অঞ্চলে উনিশ শতকেব মাঝামাঝি থেকেই নদীবাঁধ সড়ক ইত্যাদি যথেচ্ছ নির্মাণেব ফলে নদী-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হযে পড়ায় জমিব উর্ববতা হ্রাস পায এবং ম্যালেবিযাব মড়ক ছড়িয়ে পড়ায় বহুলোক মাবা যায়, বহুলোক গ্রাম ছেড়ে পালায এবং যাবা থাকে তাবা ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়ে। ফলে কৃষিব এই অবনতি ঘটে। কিন্তু এই অবনতি সত্বেও দেখা যায যে, প্রায ১৯৩১ সাল পর্যন্তই জেলাব গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে ঘনতা এবং জনসংখ্যাব প্রতি ১০০০ জনেব মধ্যে কৃষি নির্ভব লোকেব অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত কবা যায যে, গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যাব যে চাপ বাড়ছে তাবা কৃষিতেই আশ্রয খুঁজে পাচ্ছে তাই কৃষি-নির্ভবতাব অনুপাতও বাড়ছে। মোটামুটিভাবে বলা যায, চাষেব এলাকা কমে এলেও লোকে কৃষিকেই বেশী কবে আঁকড়ে ধবছে। এই আঁকড়ে ধবাব এক প্রধান কাবণই যে ছিল জেলাঞ্চলে অবশিল্পায়নেব দীর্ঘদিন ধবে চলে আসা প্রবণতা সে বিষযে সন্দেহেব কোনই অবকাশ নেই। ববং বলা যায় যে ১৯০৫ সাল থেকে ব্যাপকভাবে বেলপথ প্রবর্তনেব ফলে এ-জেলায় তৃতীয় দফাব অবশিল্পায়ন শুরু হযেছিল।[২৫] এ জেলাব সবচেযে বড় ও সুপ্রতিষ্ঠিত

বেশমী সুতোকাটা ও কাপড় বোনাব অকৃষি শিল্পটি সবকাবী ও বেসবকাবী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কি ভাবে বিলুপ্ত হযে যাচ্ছিল নীচেব সংখ্যাতথ্যেই তা বোঝা যায :

**সারণী-৩**

**১৯০১, ১৯১১ ও ১৯২১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশমসূত্রকার ও তন্তুবায়দের যৌথ সংখ্যা :**

| ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ |
|---|---|---|
| ১৪৫৫৯ | ১৪০৭৮ | ১৫৭৩ |
| | (শতকবা হ্রাস-৩.৩০) | (শতকবা হ্রাস- ৮৮.৮৩) |

এই অবস্থাব পবিবর্তন শুরু হল ১৯৩০ সালেব পব থেকে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনীতি বিশ্বব্যাপী মন্দা, দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশেব মন্বন্তবেব জন্য ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয অপ্রতিবোধ্য বাহ্য প্রভাবেব ফলে। ধান ও পাটেব দাম হঠাৎই পড়ে যাওযাব ফলে এবং খাদ্যশস্যেব অভাবিতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধিব জন্য মুর্শিদাবাদেব কৃষি অর্থনীতি বিপর্যস্ত হযে যায। শুধু কৃষি অর্থনীতিই নয, প্রতিটি অকৃষি পেশাবই ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। মুর্শিদাবাদেব বেশমশিল্পেব যে-টুকুও বা অবশিষ্ট ছিল, এই পর্বেব শেষে দেখা যায, তাবও প্রায পতন ঘটছে— ১৯২১ সালে জেলায যেখানে এই শিল্পে ১৫৭৩ জন নিযুক্ত ছিল ১৯৫১ সালে তাব সংখ্যা কমে দাঁড়ায ৯২০ জন। পাশাপাশি আবো বহুবকম গ্রামীণ কুটিব ও হস্তশিল্পেব পতনও ঘটে চলে। অন্যদিকে আবাব এই পর্বেই দেখা যায যে ১৯৫১ সালে গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে জনবসতিব ঘনতা পূর্বেব চাইতে বেড়ে ৭৭৩ হযেছে কিন্তু প্রতি ১০০০ জনে কৃষি-নির্ভবতাব অনুপাত কমে ৬৯২ হযেছে। অর্থাৎ বর্ধিত জনসংখ্যা আব কৃষিতে আশ্রয খুঁজে পাচ্ছে না। "লোকে জীবিকা পাক আব নাই পাক, গ্রাম ছেড়ে শহবে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে", জেলাব বাইবে যথেষ্ট সংখ্যায কাজ কবতে যাওয়া শুরু কবছে।[২৬]

মুর্শিদাবাদ জেলাব অর্থনীতিব এই অন্ধকাব পর্বেব কিছুটা পবিবর্তন শুরু হয ১৯৪৭ সাল থেকে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৫ সালেব মধ্যে স্বাধীনতা-উত্তব যুগে স্বদেশী শাসনে কৃষি ও শিল্পে উন্নতিব জন্য সচেতন পদক্ষেপ নেওযা শুরু হয এবং ভাবতেব পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনাব প্রভাব-স্রোত জেলাঞ্চলেও পৌঁছাতে থাকে। বাস্তা ঘাটেব প্রভূত উন্নতি ঘটায লোকজন ও যানবাহনেব চলাচল বৃদ্ধি পায এবং কৃষিপণ্যেব বাজাবজাত হওযাব সুযোগ বেড়ে যায়। এব ফলে জেলাঞ্চলে কাঠ, বাঁশ, লটকানা ফসল, আম, লিচু, গরু, ছাগল, মুবগিব বিক্রয এবং ব্যবসাব বৃদ্ধি ঘটে। ধান-পাটেব উৎপাদন বৃদ্ধি পায। কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পেব ক্ষেত্রেও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহাবেব ফলে কিছু কিছু পবিবর্তন ঘটতে শুরু কবে। কিন্তু এইসকল পবিবর্তনেব ফলে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলেব অর্থনৈতিক কাঠামো তথা ভূমি-সম্পর্কেব বিন্যাসে কোনোই পবিবর্তন আসে না, ববং ভূমি-সম্পর্কেব মধ্যে দীর্ঘদিন ধবে গড়ে উঠতে থাকা কিছু প্রবণতা

আবো শক্তিশালী ও জোবদাব হয়ে ওঠে, আগামী দিনেব অর্থনৈতিক ও বাজনৈতিক কার্যক্রমেব ক্ষেত্র প্রস্তুত কবে।[২৭]

।। খ ।।

মুর্শিদাবাদ জেলায সামগ্রিক অর্থনীতিব অর্ধ-শতাব্দী-ব্যাপী (১৯০৫-১৯৫৫) এইসকল পবিবর্তনেব পবিপ্রেক্ষিতে চিবস্থাযী বন্দোবস্ত-সৃষ্ট ভূমি-সম্পর্কেব কাঠামোব দিকে তাকালে দেখা যাবে যে এই পর্বে এসে এই ব্যবস্থাটি এক গভীব সংকটেব মধ্যে পড়ে গেছে এবং এই ব্যবস্থাকে সংশোধনেব সাহায্যে আব টিকিযে বাখা সম্ভব হচ্ছে না। সুতবাং চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব বিলুপ্তিব জন্য প্রযোজনীয আইনগত, প্রশাসনিক ও বাজনৈতিক পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীব প্রথম থেকেই একথা পবিষ্কাব হযে উঠতে থাকে যে ১৮৫৯ সালেব খাজনা আইন ও ১৮৮৫ সালেব প্রজাস্বত্ব আইনেব মাধ্যমে চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব সংশোধনেব সাহায্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাব অপ্রতিবোধ্য ফলশ্রুতি হিসাবে উদ্ভূত সমস্যাবলী ও শক্তিগুলিব মোকাবেলা প্রায অসম্ভব। বিশেষত কৃষি-নির্ভব নতুন যে শ্রেণীদুটিব আবির্ভাব ঘটেছে— ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুব— তাদেব ক্রমবর্ধমান গতিশীল শোষিত চবিত্রেব সঙ্গে চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব মত শোষণমূলক একটি ব্যবস্থাকে খাপ খাইযে নেওযা অসম্ভব হযে পড়ে। জাযমান এই সংকটেব উপলব্ধিই মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে জমিদাব- মধ্যস্বত্বভোগীদেব খাজনা-আদাযকাবী চবিত্রে গুরুত্বপূর্ণ পবিবর্তন নিযে আসতে শুরু কবে। ইতিপূর্বেই ১৮৮৫ সালেব পব থেকেই মাঝাবি ও ছোট চাষীদেব জমি ঋণ-গ্রস্ততাব দাযে হস্তান্তবিত হযে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুবে পবিণত হওযাব যে প্রবণতা আমবা লক্ষ্য কবেছিলাম, আলোচ্য পর্বে সে-প্রবণতা তো অব্যাহত থাকলো, কিন্তু নতুন যে ব্যাপাবটা ঘটতে শুরু কবলো তা হল : ছোট চাষীদেব হস্তান্তবিত এই জমি জমিদাব ও মধ্যস্বত্বভোগীদেব খাস-খামাব ও বাযতী জোতেব পবিমাণ বাড়িযে তুলতে শুরু কবল, ধনী চাষী বা মহাজনদেব হাতেই আব জমি-মালিকানাব কেন্দ্রীভবন সীমাবদ্ধ থাকলো না। এই প্রবণতা পববর্তী সমযে ক্রমশ আবো জোবালো হযে উঠতে থাকল। এ-সম্পর্কিত তথ্যাবলী অপ্রতুল ; বিভিন্ন দশকেব জনগণনাব তথ্যেব মধ্যেও সামঞ্জস্যবিধান কবা শ্রমসাধ্য ; ক্ষেত্র-বিশেষে জেলা-ভিত্তিক তথ্যেব অভাবে প্রদেশ-ভিত্তিক তথ্যেব সাহায্যে অনুমান অপবিহার্য। এইসকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম কবে উপবোক্ত প্রবণতা সম্পর্কে আমবা সামান্য যে-টুকু জানতে পাবছি তা এবকম :[২৮]

**সারণি-৪**

**১৯০১-১৯৩১ সালে বাংলার কৃষিজীবিদের বিভিন্ন বর্গের অনুপাত :**

| | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|---|
| খাজনা গ্রহীতা | ৩.৬০ | ৩.৪২ | ৪.০৩ | ৭.৯৭ |
| চাষী ও ভাগচাষী | ৮৭.৪০ | ৮০.১৯ | ৮৩.৮৬ | ৬২.৯৬ |
| ক্ষেতমজুব | ৯.০০ | ১৬.৩৯ | ১২.১১ | ২৯.০৭ |

### সারণি-৫
### ১৯১১-৩১ সালে বাংলায় মোট কৃষিকর্মীদের বিভিন্ন বর্গের অনুপাত ছিল :

| | ১৯১১ | ১৯২১ | ১৯৩১ |
|---|---|---|---|
| খাজনা-গ্রহীতা | ৪.১৩ | ৪.০২ | ৭.৯০ |
| চাষী ও ভাগচাষী | ৮৫.৭৬ | ৮৩.৭৪ | ৬২.৪৪ (=৫৩.৬৩-চাষী ৮.৮১-ভাগচাষী) |
| ক্ষেতমজুব | ১০.১০ | ১২.২৩ | ৩০.৭৬ |

সাবা বাংলা-ব্যাপী উপবোক্ত প্রবণতাব পবিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে এইভাবে বাখা যায :

### সারণি-৬
### ১৯২১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রজাস্বত্বের ভিত্তিতে কৃষিকর্মীদের বর্গ-বিভাজনের অনুপাত :

| জমিদাব | প্রজা | ক্ষেতমজুব |
|---|---|---|
| ৪.১৫ | ৬৮.৯৯ | ২৬.৮৬ |

**১৯৩১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় অর্থনৈতিক মানদণ্ডে কৃষি-কর্মীদের বিভিন্ন বর্গের অনুপাত :**

| খাজনা-গ্রহীতা | মালিক-কৃষক | প্রজা | ক্ষেতমজুব | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|
| ৬.১৫ | ৪১.৯১ | ৪.৭১ | ৪৫.৫৫ | ১.৬৮ |

### সারণি-৭
### ১৯২৪-৩২ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী, রায়ত ও অধীনস্থ রায়তদের অধীনে কৃষি-জমির অনুপাত :

| জমিদাব | মধ্যস্বত্বভোগী | বায়ত | অধীনস্থ বাযত |
|---|---|---|---|
| ৪.০৬ | ১০.৬১ | ৭৬.৬২ | ৮.৭১ |

**১৯২৪-৩২ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় মালিকানাধীন জমির বিভিন্ন পরিমাণের স্তর (একরে) :**

| জোতসংখ্যাব শতাংশ | ০-১ | ১-২ | ২-৩ | ৩-৪ | ৪-৫ | ৫-এব উর্দ্ধে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ৬৮.৯ | ১৫.৭ | ৬.৪ | ৩.২ | ১.৮ | ৪.০ |
| জমিব পবিমাণেব শতাংশ | ১৮.৬ | ১৮.০ | ১২.৭ | ৯.০ | ৬.৬ | ৩৪.৭ |

উপবোক্ত তথ্যাবলীব জঙ্গল থেকেও আমবা কতকগুলি সাধাবণ প্রবণতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কবতে পাবি : প্রথমত, ছোট-চাষী-প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলায ১৯০১-১৯৩১ সালেব মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে একদিকে খাজনা-গ্রহীতা জমিদাব ও মধ্যস্বত্বভোগীদেব সংখ্যা ও আর্থিক সামর্থ্য ধীবগতিতে এবং অন্যদিকে ক্ষেতমজুবদেব সংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সংখ্যা কমে যাচ্ছে বাযত/প্রজা/চাষীদেব। দ্বিতীযত ছোটচাষীবা ভাগচাষী এবং ভাগচাষীবা ক্ষেতমজুবে পবিণত হওয়াব ফলে এটা ঘটছে এবং এই তিনটি বর্গেব মধ্যে পার্থক্য নির্ধাবণ কষ্টকব হযে উঠছে। তৃতীযত ছোটচাষীদেব হাত-ছাড়া-হওযা জমি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে জমিদাব ও মধ্যস্বত্বভোগীদেব হাতে, আবাব মধ্যস্বত্বজোতও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে জমিদাব ও ধনী চাষীদেব হাতে। এই তৃতীয সিদ্ধান্তটি সমর্থিত হচ্ছে আবো কিছু তথ্যাবলীব দ্বাবা :[২৯]

**সাবণি—৮**

**১৯০০-১৯৩৫ সালেব মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় মধ্যস্বত্বজোতের হস্তান্তর (হাজাব)**

| ১৯০০-১৯০৫ | ১৯০৫-১৯১০ | ১৯১০-১৯১৫ | ১৯১৫-১৯২০ | ১৯২০-১৯২৫ | ১৯২৫-১৯৩০ | ১৯৩০-১৯৩৫ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০.৬৭ | ০.২২ | ০.৩৪ | ০.৭৪ | ০.৯৪ | ৩.৫২ | ১৩.৮৫ |

**সারণি—৯**

**১৯০৩-১৯১১ সালের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় মধ্যস্বত্বজোতের ক্রেতাদের অনুপাত :**

| মহাজন, ব্যবসাযী ও ঋণদাতা | জমিদাব | মধ্যস্বত্ব-ভোগী | বাযত | অন্যান্যবা |
|---|---|---|---|---|
| ৯.১৫ | ৩৭.৩২ | ৩.৫৩ | ৩১.৬৯ | ১৮.৩১ |

সুতবাং উপবেব আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯০০-১৯০১ থেকে ১৯৩০-১৯৩১ সালেব মধ্যে একদিকে জমিদাব ও মধ্যস্বত্বভোগীদেব খাসখামাব, মধ্যস্বত্বজোত ও বাযতী জোতেব পবিমাণ বেড়ে চলেছে এবং অন্যদিকে বেড়ে চলেছে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুবেব সংখ্যা। এই পবিপ্রেক্ষিতেই ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইনেব সংশোধনেব মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানেব জন্য আংশিক প্রচেষ্টা হলেও তা শেষপর্যন্ত জমিদাব-মধ্যস্বত্বভোগীদেব বাধায বানচাল হয়ে গেল। ববং এই আইনে দখলীস্বত্বযুক্ত বাযতদেব কিছু সুবিধা হলো, যে-বাযতেবা ইতিমধ্যেই মধ্যস্বত্বজোত কিনতে শুরু কবেছিল। ফলে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুবদেব বঞ্চিত কবে উদ্বৃত্ত নিষ্কাষণেব ক্রমবর্ধমান মৌলিক সমস্যাটি সমাধানেব কোনই পথ এই পর্বে মিলল না।[৩০]

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-অর্জন পর্যন্ত সমযে সাবা বাংলাদেশেব মতই মুর্শিদাবাদ জেলাব অর্থনৈতিক জীবনেব ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে ভূমি-সম্পর্কেব উপব, দুটি ঘটনাব পড়ল সুদুব-প্রসাবী প্রভাব—বিশ্বব্যাপী মন্দা (১৯৩০-৩৪) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশেব মন্বন্তব (১৯৩৯-৪৫, ১৯৪৩)। ত্রিশেব দশকেব প্রথম দিকেব মন্দা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কবল ছোট ও মাঝাবি চাষীদেব—খাদ্যশস্য-সহ সকল কৃষিজ পণ্যেব দাম পড়ে গেল ভীষণভাবে

এবং ঋণলাভের স্বাভাবিক ধারাটি রুদ্ধ হয়ে পড়ল, অথচ খাজনার দাবী বা মজুরীর হার তুলনামূলকভাবে বেশীই থাকল। এই পরিস্থিতিতে ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেল ছোট ও মাঝারি চাষীদের ঋণগ্রস্থতা, জমিজমাদি বন্ধক দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত জমির হস্তান্তর। এই হস্তান্তরিত জমি পরিমাণ বাড়াতে থাকল জমিদারদের খাস খামারের ও রায়তী জোতের এবং ধনী চাষীদের জমিজমার।[৩১] মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত শস্যঋণ সম্পর্কে জেলার সেট্‌লমেন্ট রিপোর্টের (১৯৩৮) মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক: "এই জেলার প্রায় প্রতিটি কৃষিকাজ-প্রধান গ্রামে ঋণদানের এই সাধারণ পদ্ধতি প্রচলিত। গ্রামের বড় গোলাদারেরা এই ব্যবসার জন্যই তাদের খামারবাড়িতে ধান ও ডালশস্যাদি সঞ্চয় করে। চাষীদের অধিকাংশই বছরের কিছু অংশ যখন বাহিরের কোন কাজ থাকে না অথবা শস্যাদি সঞ্চয়ও থাকে না তখন এই পদ্ধতিতে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। স্বল্প-উৎপাদনের অস্বাভাবিক বৎসরগুলিতে তারা আরো বেশি বেশি করে ধার করতে বাধ্য হয়। অবশেষে যখন তাদের ঋণের পরিমাণ তাদের জমির দামকে ছাড়িয়ে যায় তখন তারা বাধ্য হয় তাদের জমি গোলাদারদের বিক্রী করে দিতে।"[৩২] এককথায় মুর্শিদাবাদের ভূমি-ব্যবস্থার কাঠামোতে মাঝামাঝি জায়গাটা সরু হয়ে পড়তে থাকল, অন্যদিকে স্ফীত হয়ে উঠল উপরের দিকে জমিদার-ধনীচাষীদের অংশটি এবং নীচের দিকে ছোটচাষী-ভাগচাষী-ক্ষেতমজুরেরা। ত্রিশের দশকের এই মন্দার মোক্ষম আঘাতটি এসে পড়ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-সৃষ্ট জমিদারতন্ত্রের উপর। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থাকে লাভজনক রাখা শক্ত হয়ে উঠছিল এবং এর ফলে খাজনা-গ্রহীতা এই দুটিস্তরের মধ্যে খাসখামার ও রায়তী জোত বাড়ানোর ক্ষীণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কিন্তু মন্দার ঝটিকা-প্রবাহে ১৯৩০ সালের পর জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল খাজনা আদায়কারী হিসাবে তাদের মুখ্য ভূমিকা বজায় রাখা, কেননা, ঋণগ্রস্থ প্রজাদের পক্ষে খাজনা দেওয়াই অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকল। ফলে খাসখামরের ও রায়তী জোতের মালিকানা অর্জনের মধ্যে দিয়ে এরা কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে এগিয়ে এল। মন্দা-সৃষ্ট এই পরিস্থিতিতে ছোট চাষী-মাঝারি চাষীরা ভীষণ শ্রেণী-সচেতন ও জঙ্গী হয়ে উঠল, সংগঠিত ও আন্দোলনমুখী হতে থাকল। এই বাস্তব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার চাপে চিরস্থায়ী বন্দেবস্ত শুধু যে অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল তাই নয়, ক্রমশ পরিপুষ্ট হয়ে উঠ্‌তে থাকা ধনী চাষী বা জোতদার শ্রেণীকে পূর্ণ আইনগত স্বীকৃতি দিতে হল ১৯৩৮ সালে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে। পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই ভূমি-ব্যবস্থার নিচের দিকের স্তরগুলির কথা ভেবে ঋণসালিশী বোর্ড গঠনের ব্যাপক ব্যবস্থা হল (১৯৩৫ সালে রচিত আইনের ১৯৪০ সালের সংশোধনী), মহাজনী আইন সংশোধিত হল (১৯৪০) এবং ভাগচাষীদের আইনগত অধিকারদানের প্রচেষ্টা শুরু হল (বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল, ১৯৪৭)। সর্বোপরি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হল ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারী-মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থা বিলোপ করার (জমিদারী ক্রয় ও প্রজাস্বত্ব বিল, ১৯৪৭)। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা ক্ষেতমজুরদের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য বিবেচনাযোগ্য বলেই গণ্য হল না।[৩৩] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে পড়ায় ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদের অর্থনীতির উপর তার অভিঘাত এসে পড়তে শুরু করেছিল। কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে

ক্রমবর্ধমান যে বিভাজন ইতিপূর্বেই লক্ষ্য কবা গিয়েছিল যুদ্ধ এবং মন্বন্তবেব প্রভাবে তা বেড়ে গেল বহুগুণে। এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা-সম্পর্কিত তথ্যাবলীকে আমবা কযেকটি সাবণিব মাধ্যমে তুলে ধবতে পাবি[৩৫] :

**সারণি-১০**

**মধ্যস্বত্ব ও রায়তী জোতের বিক্রয় বা হস্তান্তর**

| বছব | সেকশন ১২(৩) ও ১৮ | সেকশন ২৬ |
|---|---|---|
| ১৯২৯/৩০ | পাওযা যায না | পাওযা যায় না |
| ১৯৩০/৩১ | ২২৩৩ | ৬৬৭৫ |
| ১৯৩১/৩২ | ২৪১১ | ৭০৮৬ |
| ১৯৩২/৩৩ | ২৯২২ | ৭২৭৮ |
| ১৯৩৩/৩৪ | ২৯১৪ | ৬৯১০ |
| ১৯৩৪/৩৫ | ৩৩৭০ | ৭৫২৫ |
| ১৯৩৫/৩৬ | ৩৩৪০ | ৭৩৬৫ |
| ১৯৩৬/৩৭ | ২৯০২ | ৬৬৭১ |
| ১৯৩৭/৩৮ | ৩১২৬ | ৬৩৪৫ |
| ১৯৩৮/৩৯ | ২৯৭৭ | ২৮০০ |
| ১৯৩৯/৪০ | ৩৪৯৮ | — |

১৯৩০-৩৮ সালেব মধ্যে বাৎসবিক বেজিস্ট্রেশনেব মাধ্যমে বাযতী জোত হস্তান্তবিত হযেছিল ৮.৫৬ শতাংশ।

**সারণি-১১**

**১৯৪০ সালের মুর্শিদাবাদে পরিবারের সদস্য, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের দ্বারা চাষ করা জমির অনুপাত :**

| পবিবাবেব সদস্য | ভাগচাষী | ক্ষেতমজুব |
|---|---|---|
| ৫৮.৯ | ২৫.৮ | ১৫.৩ |

**১৯৪০ সালের মুর্শিদাবাদে কৃষক পরিবারের মধ্যে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের অনুপাত :**

| প্রধানত ভাগচাষী | প্রধানত ক্ষেতমজুব |
|---|---|
| ১০.৯ | ৪০.৮ |

**১৯৪০ সালের মুর্শিদাবাদে বিভিন্ন পরিমাণ জমির সত্বাধিকারী পরিবারগুলির অনুপাত :**

| ২ একবেব কম | ২-৩ একব | ৩-৪ একব | ৪-৫ একব | ৫-১০ একব | ১০ একবেব উপবে |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩৮.৩ | ১০.১ | ৯.৩ | ৭.৫ | ১৬.৯ | ৭.৭ |

**সারণি-১২**

**১৯৪৫-৪৬ সালের নমুনা সমীক্ষা অনুসারে মুর্শিদাবাদ-সহ বাংলার দশটি জেলার ভাগচাষের অধীন জমি ও ভাগচাষী পরিবারগুলির অনুপাত :**

| ভাগচাষের অধীন জমির শতাংশ | ভাগচাষী পরিবারের শতাংশ |
|---|---|
| ২৯.০ | ৫৬ |

**সারণি-১৩**

**১৯৫১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষি-নির্ভর বর্গসমূহের লোকসংখ্যা :**

| বর্গসমূহ | সংখ্যা | আশ্রিত-সহ পরিবারের মোট জনসংখ্যা |
|---|---|---|
| জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগী | ২০১৭ | ৯৩২৫ |
| নিজচাষী | ১,৫৬,০০১ | ৭১১৪৫৯ |
| | ১৯৭০৭৮ | |
| ভাগচাষী | ৪১০৭৭ | ১৮২৩৪০ |
| ক্ষেতমজুর | | ২৮৩,৩৮৯ |

**সারণি-১৪**

**১৯৬১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষিকর্মী বর্গসমূহের লোকসংখ্যা :**

| | |
|---|---|
| নিজচাষী ও ভাগচাষী | ২৯৪০০৪ জন |
| ক্ষেতমজুর | ১৩০৭৬৪ জন |

উপরোক্ত সারণিগুলি থেকে আমরা সাধারণ কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি : প্রথমত, জমিদার-মধ্যস্বত্ব [illegible] চাষীদের হাতে মাঝারি ও ছোট চাষীদের জমি হস্তান্তরিত হতে থাকায় ভাগচাষী [illegible] মজুর এই উভয়বর্গের লোকেদেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু ভাগচাষীদের চাইতে ক্ষেতমজুরদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়ে থাকে অনেক বেশি পরিমাণে। ক্ষেতমজুরদের এই সংখ্যাবৃদ্ধিতে প্রবহমান অবশিল্পায়নের যে কিছু ভূমিকা ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ভাগচাষীদের সংখ্যাবৃদ্ধি চল্লিশের দশকে যত বেশি পরিমাণে হয়েছিল পরে তা স্তিমিত হয়ে আসতে থাকে, কিন্তু ক্ষেতমজুরদের বৃদ্ধি ভীষণ দ্রুততার সঙ্গেই চলতে থাকে, যদিও কোনও কোনও মহল থেকে যথোপযুক্ত তথ্যাদি ছাড়াই ক্ষেতমজুরদের তুলনায় ভাগচাষীদের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করার চেষ্টা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে সমৃদ্ধশালী ধনীচাষী বা জোতদারদের সঙ্গে ছোটচাষী-ভাগচাষী-ক্ষেতমজুরদের বিরোধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে হয়ে উঠল তীব্রতর। যুদ্ধের ফলে কৃষিপণ্যের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে থাকল। যুদ্ধের শেষ নাগাদ দেখা গল যে জমিদারদের খাস-খামার ও রায়তী জোতের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ছোটচাষী-ভাগচাষীরা পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর পরিমাণে শস্যঋণের এবং জমি ভাগে পাওয়ার জন্য সমৃদ্ধ শ্রেণী দুটির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতির জন্যই ১৯৪৭ সালে তাদের মিত্র ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে নিয়ে ভাগচাষীরা যখন উত্তর ও পূর্ববঙ্গে 'তেভাগা' আন্দোলনে সামিল হয়েছে তখন পশ্চিমবঙ্গে এই আন্দোলন সেরকম সাড়া ফেলতে পারেনি। আর মুর্শিদাবাদ জেলার তো কথাই নেই! তেভাগা আন্দোলনের ফলে যখন বাংলার কোন কোন জেলায় ভাগচাষীরা জোতদারের ধান কেড়ে নিয়েছে, কোথাও ধান কাড়া না হলে তীব্র আন্দোলন হয়েছে, কোথাও মূলত প্রচার হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলাকে এসবের কোনকিছুই স্পর্শতো

কবেইনি, ববং উল্টে অন্য জায়গাব তেভাগা আন্দোলনেব বিরূপ ফল ভোগ কবতে হযেছে এখানকাব নির্ভবশীল ছোট চাষী-ভাগ চাষীদেব, বিশেষ সাগবদিঘী নবগ্রাম থানায। ভাগচাষীদেব বিশেষ স্বার্থেব লডাই তেভাগা আন্দোলনে সামিল হলেও ক্ষেতমজুবদেব বিশেষ স্বার্থেব স্বীকৃতি, দাবী বা আন্দোলনেব কথা কোন পক্ষেবই মনে পডল না। চিবস্থাযী বন্দোবস্ত-সৃষ্ট ভূমি সম্পর্ককে এই সকল অপ্রতিবোধ্য চাপ ও পবিবর্তনেব মুখোমুখি দাঁড কবিযে দিযেই ১৯৪৭ সালেব ১৫ই অগাস্ট অবসান ঘট্‌লো ঔপনিবেশিক বৃটিশ শাসনেব।[৩৫]

বৃটিশেব বেখে যাওযা এই দাযভাবকে বহন কবেই এবং স্বাধীন ভাবতেব স্বীকৃত পূর্ণবযস্কেব ভোটাধিকাব-যুক্ত সংসদীয গণতন্ত্রেব পবিপূর্ণ সুবিধা আদাযেব জন্যই পশ্চিমবঙ্গ সবকাব ১৯৪৯ সালেব বর্গাদাব-সম্পর্কিত জরুবী বিধি (১৯৫০ সালে আইনে রূপান্তবিত), ১৯৫৩ সালে জমিদাবী অধিগ্রহণ আইন এবং ১৯৫৫ সালে ভূমি-সংস্কাব আইন বচনা কবল। এই সকল আইনেব মাধ্যমে সুনিশ্চিত কবাব চেষ্টা হল : (১) ভাগচাষী বা বর্গাদাবদেব নথীভুক্তি, (২) ক্ষতিপূবণ দিযে জমিদাবী ও মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থাব বিলোপ সাধন, (৩) বাযত ও নিম্ন বাযতদেব কিছু অধিকাব দান এবং (৪) উর্দ্ধসীমাব অতিবিক্ত জমি সবকাবী নিযন্ত্রণে এনে ভূমিহীন ক্ষেতমজুবদেব মধ্যে বন্টন। এইভাবেই শুরু হযেছিল পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীতে উদ্ভূত সামন্ত-ব্যবস্থা বা জমিদাবতন্ত্রেব অবসান ঘটিযে বাষ্ট্রেব সঙ্গে কৃষকদেব সবাসবি সম্পর্ক স্থাপনেব ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা। কিন্তু স্বাধীনতাব মূহূর্ত থেকেই খাস-খামাব ও বাযতী জমিব মালিকানায ক্রমশ পুষ্ট হয়ে ওঠা জমিদাব-মধ্যস্বত্বভোগীবা এবং ধনী চাষী বা জোতদাবেবা ভূমি ব্যবস্থায সম্ভাব্য পবিবর্তনেব আতঙ্কে ছোটচাষী-ভাগচাষীদেব বিরুদ্ধে তাদেব আক্রমণকে জোবদাব কবেছিল এবং উপবেব আইনগুলিব সাববস্তুকে সাফল্যেব সঙ্গে নানা পদ্ধতিতে বানচাল কবে দিতে সক্ষম হযেছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায ১৯৪৯-৫০ সালে জেলাশাসক দু'মাসেব চেষ্টায নবগ্রাম-সাগবদিঘি থানায ধাঙড-সাঁওতাল-ওঁবাও-নিম্নবর্ণেব হিন্দু ভাগচাষীদেব স্বার্থে বর্গাদাব-সম্পর্কিত জরুবী বিধিটি এবং ছোটচাষীদেব ঋণগ্রস্থতা সম্পর্কিত ১৯৪০ সালেব আইনটি কার্যকবী কবলে জমিদাব-ঋণদাতা-বর্গামালিকবা ক্ষুব্ধ হযে ওঠেন এবং জেলাশাসক "বাতাবাতি জেলা হতে অপসাবিত হন।" জমিদাব ও মধ্যস্বত্বভোগীবা নতুন আইনেব ফলে তাদেব খাজনা-আদাযকাবী ভূমিকা হাবালো বটে, কিন্তু শতাব্দীব প্রথম থেকেই জমা-কবা খাস-খামাব ও বায়তী জমিব মালিকানাব ভিত্তিতে পুবোনো ধনী চাষী বা জোতদাবশ্রেণীব একপ্রস্থ নযা স্তব হিসাবে দেখা দিল— জোতদাবদেব সংখ্যা ও শক্তিবৃদ্ধিই শুধু ঘটলো না, ক্ষতিপূবণেব টাকা এবং জমিব উর্দ্ধ সীমাব সুযোগ নিযে নিজেদেব অধিকতব মেদবৃদ্ধি কবতে সক্ষম হল, ছোটচাষী-ভাগচাষী-ক্ষেতমজুবদেব শোষণ অব্যাহত থাকল। ছোটচাষী-ভাগচাষীবা আপাতত লাভ কবল কিছু কাগুজে অধিকাব, আব তুলনামূলকভাবে বেশী শোষিত ও বঞ্চিত, বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও ক্রমবর্ধমান ক্ষেতমজুবেবা কার্যত বযে গেল সবকাব ও বাজনৈতিক দলগুলিব হিসাবেব বাইবে, প্রায-বিস্মৃত, উপেক্ষিত ও অবক্ষিত। চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব পতন ঘটলো ; সম্পূর্ণ নতুন আব এক চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব পত্তন হলো।[৩৬]

মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব অন্তিম পর্বে এই ব্যবস্থা সংখ্যাগবিষ্ঠ শ্রমজীবি কৃষকদেব উপব যে শোষণ ও অত্যাচাব নামিযে এনেছিল, তাব বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিবোধেব কথা দিযেই আমাদেব আলোচনা পবিসমাপ্ত কবা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীতে জেলাব কৃষকদেব এই আন্দোলন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীব সশস্ত্র সংঘর্ষেব গণ-আন্দোলনেব

সংগ্রাম এবং সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত গণ-আন্দোলনেব রূপ নিযেছিল। এই শতাব্দীব প্রথম তিন দশকে এই জেলাব কৃষকদেব দুটি সংগ্রাম স্মবণীয হযে আছে। গত শতাব্দী থেকেই বেলডাঙ্গাব কৃষকদেব সঙ্গে কাশিমবাজাব জমিদাবীব যে বিবোধ চলছিল, এই শতাব্দীতেও তা সুদীর্ঘ আইনী সংগ্রাম বা মামলা মোকদ্দমাব রূপ নিযেছিল, এবং অবশেষে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনেব কালে বৃটিশ সবকাবকে বাজস্ব দিলে কাশিমবাজাব জমিদাবীব প্রজাবা খাজনা দেওযা বন্ধ কবাব জন্য আন্দোলন তুলেছিল। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে বিংশ শতাব্দীব শুরু থেকে জমিদাবী অত্যাচাব ও শোষণেব যে ইতিহাস মেদিনীপুব জমিদাবী কোম্পানী তাব তিন অত্যাচাবী প্রতিনিধি ডোমকল কুঠিব ম্যানেজাব ডব্লিউ. স্টেনহাউস, ই.পি. ডব্লিউ. নিকল এবং সি. ব্লুমফিল্ডেব কার্যকলাপেব মধ্যে দিযে বচনা কবেছিল, তা বাববাবই কৃষক প্রতিবোধেব সম্মুখীন হযেছিল। উঠবন্দী ও অন্যান্য প্রজাদেব উচ্ছেদ প্রচেষ্টা, খাজনা বাড়ানো, নীলচাষেব প্রবর্তন ইত্যাদিকে কেন্দ্র কবে যে প্রজা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, মধ্যেই তা খাজনা-বন্ধেব আন্দোলনেব রূপ নিযেছিল অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনেব কালে ১৯২১ সালেব জুলাই-আগস্ট মাসে। পববর্তীকালেও প্রায জমিদাবী বিলোপেব সময পর্যন্ত এই জমিদাবী কোম্পানীব সঙ্গে কৃষক-প্রজাবা চালিযেছিল আইনেব লড়াই।

এবপব ত্রিশেব দশকেব শুরু থেকে মুর্শিদাবাদেব মাটিতে বিনা ক্ষতিপূবণে জমিদাবী বিলোপেব দাবী উঠতে থাকে এবং দশকেব দ্বিতীযার্ধ থেকেই এই জেলায কৃষক সংগঠন সমূহ গড়ে উঠতে শুরু কবে। প্রথমে কমিউনিস্ট লীগ বা আব.সি.পি.আই এব নেতৃত্বে সংগঠন শুরু হলেও অচিবেই সি পি আই গড়ে তোলে তাব কৃষকসভাব জেলা শাখাটি। এই কৃষক সংগঠনগুলি সভা-সমাবেশ-মি ইত্যাদি নানা দাবীতে সংগঠিত কবলেও আশ্চর্যজনকভাবে ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুবদেব স্বার্থে কোনও আন্দোলন কবা থেকে, এমনকি প্রচাব কবা থেকেও, বিবত ছিল। এমনকি সাবা বাংলাদেশে যখন তেভাগা আন্দোলন দাবানলেব মত ছড়িযে পড়েছিল, পূর্বে আলোচিত অন্তর্নিহিত কিছু বাধ্য-বাধকতাব জন্য মুর্শিদাবাদে তা দানা বাঁধতেই পাবেনি। স্বাধীনতাব পবও দ্বিতীয দফাব তেভাগা আন্দোলনও উপযুক্ত দলীয নেতৃত্বেব অভাবে সাগবদিঘি-নবগ্রামেব মাঠেই মাবা গিযেছিল। কিন্তু কেন ? শোষিত অত্যাচাবিত কৃষকদেব পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রেণী-সংগ্রামে ঝাঁপিযে পড়াব উদাহবণ এ-জেলায এই সমযেও কম ছিল না : প্রভাবশালী জমিদাবদেব বিরুদ্ধে হিজলেব হাসিল হাজী, ভাবতাব অত্যাচাবী মহাজন-জমিদাব হাজী পবিবাবেব বিরুদ্ধে ফযেজুদ্দীন-আজিজুলেব আন্দোলন, সাগবদিঘিব জঙ্গী আদিবাসী কৃষকনেতা লবা মাঝিব তেভাগা আন্দোলন শুরু কবাব প্রস্তুতিপর্ব— যৌথউদ্যোগ-ভিত্তিক এইসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই পর্বে মুর্শিদাবাদ জেলায কৃষক আন্দোলন তাব অতীতেব ঐতিহ্য ধবে বাখতে পাবেনি। উত্তব-ত্রিশ কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনগুলিব নেতৃত্ব বাজনৈতিক দলেব ছত্রছাযায চলে এসেছিল। এই দলীয নেতাবা মূলত মধ্য ও ক্ষুদ্র কৃষকস্বার্থ-ভিত্তিক মধ্যবিত্তদেব মধ্যে থেকে আসাব জন্যই ভাগচাষী-ক্ষেতমজুবদেব স্বার্থে আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ক্রমবর্ধমান ক্ষেতমজুবদেব জেলাব কৃষক সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলাব মূল ভিত্তি হিসাবে এবং নেতৃত্বে গ্রহণ কবাব ব্যাপাবে ব্যর্থতাই প্রায় অর্ধশতাব্দী পবে আজও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদেব কৃষক আন্দোলনকে পঙ্গু কবে বেখেছে।[৩৭]

১৯০৫ থেকে ১৯৫৫ সালেব মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থা তাব বৈষম্য ও শোষণমূলক চবিত্রেব জন্য যে প্রতিবাদ-প্রতিবোধ কৃষক-সংগ্রামেব ধাবা সৃষ্টি

কবেছিল সে-প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেব আলোচনা অবশ্যই কবা দবকাব। ১৯০৫ থেকে ১৯৫৫ সাল ছিল একটি ব্যর্থ ও একটি সফল বঙ্গভঙ্গ প্রচেষ্টাব যুগ এবং আমবা জানি এই প্রচেষ্টা বাংলাব হিন্দু-মুসলমান বিবোধ ও সাম্প্রদাযিকতা বৃদ্ধিব এক প্রধান কাবণ। আলোচ্য পর্বে মুর্শিদাবাদ জেলাব কৃষক সংগ্রামেব উপব ক্রমবর্ধমান এই সম্প্রদাযিক বাজনীতিব প্রভাব কতখানি পড়েছিল ? এই প্রশ্নেব উত্তব দিতে হলে আমাদেব কতকগুলি তথ্যেব প্রতি নজব দেওযা দবকাব। ১৯০১ সাল থেকেই দেখা যাচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ একটি মুসলমান-প্রধান জেলা হযে উঠেছে এবং প্রতি দশকেই মুসলমানদেব সংখ্যা হিন্দুদেব তুলনায ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি-ব্যবস্থাব স্তব-বিন্যাস্যেব দিক থেকে এই প্রবণতাব বিচাব কবলে দেখা যাচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ জেলাব জমিদাব-ভূস্বামী-মধ্যস্বত্বভোগীদেব দুই তৃতীযাংশেবও অধিক ছিল হিন্দুবা এবং এই শ্রেণীটিব আযতন মাত্র প্রান্তিকভাবে বাড়লেও অর্থনৈতিক সামর্থ্য যথেষ্টই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ধনী-চাষী-জোতদাবদেব মধ্যে হিন্দু-মুসলমানদেব সংখ্যা ছিল প্রায সমান-সমান, হযতো মুসলমানদেব সংখ্যা সামান্য বেশী। কিন্তু ছোটচাষী-ভাগচাষী-ক্ষেতমজুবদেব দুই তৃতীযাংশেব বেশীই ছিল মুসলমান এবং জেলায মুসলমান জনসংখ্যাব বৃদ্ধিব অর্থই ছিল এই বঞ্চিত শোষিত শ্রেণীটিব বৃদ্ধি। অর্থাৎ সাবা বাংলাদেশেব মতই শোষক শ্রেণীগুলিব মধ্যে হিন্দু-প্রাধান্য এবং শোষিত শ্রেণীগুলিব মধ্যে মুসলমান-প্রাধান্য মুর্শিদাবাদ জেলাতেও সাম্প্রদাযিক বাজনীতিব প্রসাবেব ক্ষেত্র প্রস্তুত বেখেছিল এবং এই জেলাব কৃষক-সংগ্রামেব উপব তাব ছাযাপাতেব যথেষ্টই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আশ্চর্যেব ব্যাপাব এই যে ১৯৩৩ সালে বেলডাঙ্গাব ছোট সাম্প্রদাযিক দাঙ্গাটি বাদ দিলে মুর্শিদাবাদ জেলা সাম্প্রদাযিক সম্প্রতিব এক উল্লেখযোগ্য উদাহবণ হিসাবে গণ্য হযে এসেছে।

এই সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি এ-জেলায কেন বজায থেকেছে সে-সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা অনেকে দিযেছেন। একটি ব্যাখ্যা অনুসাবে এই সময়ে মুর্শিদাবাদেব নবাব বাহাদুব ওযাসিফ আলী মীর্জা সাহেব হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রসাবে সংগঠিত উদ্যোগ গ্রহণ কবায জেলাব সংখ্যাগবিষ্ঠ মুসলিমদেব উপব তাব ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। এই ব্যাখ্যাব দুটি প্রধান অসুবিধা হল এই : এই শতাব্দীতে নবাব বাহাদুব পবিবাব মুর্শিদাবাদ জেলাব সবচেযে বড মুসলিম জমিদাব পবিবাব হিসাবে যে ভূমিকা নিযেছিল তা হিজলেব মত কোন কোন এলাকায মুসলমান চাষীদেব ক্ষেত্রেও ছিল সুনিশ্চিতভাবে শোষণমূলক; এই পবিবাবে ওযাসিফ আলী মীর্জা সাহেবেব পবেব প্রজন্মেব কাজেম আলী মীর্জা, ইস্কান্দাব আলী মীর্জা ইত্যাদিব উপব সুনিশ্চিতভাবে মুসলিম লীগেব সাম্প্রদাযিক বাজনীতিব প্রভাব পডেছিল; সুতবাং এই পবিবাবেব প্রভাব জেলাব সংখ্যাগবিষ্ঠ মুসলমানদেব মধ্যে সাম্প্রদাযিক সম্প্রীতি সৃষ্টি কবেছিল একথা বলা শক্ত। দ্বিতীয ব্যাখ্যা অনুসাবে জেলাব মুসলিম ধর্মীয ঐতিহ্যেব মধ্যেই এই সম্প্রীতিব ব্যাখ্যা মেলে। জেলাব মুসলমানদেব বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠ অংশ সমন্বযবাদী সুন্নী হানাফি উপ-সম্প্রদাযভুক্ত হওযায এবং অতিক্ষুদ্র শিযা উপ-সম্প্রদাযেব প্রভাবশালী নবাব পবিবাবেব সঙ্গে এই হানাফি উপ-সম্প্রদাযেব ঘনিষ্ট মেলবন্ধন থাকায জেলায় ওযাহাবী ঐতিহ্যবাহী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতব জঙ্গী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী আহলে হাদিস্ উপ-সম্প্রদায়টিব ব্যাপক প্রভাব জেলাব মুসলিম বাজনীতিতে পবেনি এবং এইজন্যই সাম্প্রদাযিক-সম্প্রীতি ক্ষুন্ন হয়নি। এই ব্যাখ্যাবই একটি অংশ হিসাবে জেলাব হিন্দু-মুসলিম বাউল-ফকিবদেব জোবালো সমন্বয়বাদী ঐতিহ্যেব ভূমিকাব কথাও বলা হয়। কিন্তু যেখানে অর্থনৈতিক জীবনে বিবোধেব সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল সেখানে ধর্মীয়

ঐতিহ্যগত কারণে বিরোধ লাগেনি এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। তৃতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু মধ্যবিত্তদের বিপুল আয়তনের তুলনায় প্রতিষ্ঠাকামী মুসলমান মধ্যবিত্তদের শোচনীয় আয়তন-স্বল্পতা বিরোধ-সৃষ্টির কারণ হতে পারেনি। তাছাড়া, বিশের দশক থেকেই ব্রজভূষণগুপ্ত-আব্দুস সামাদ অনুসৃত অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারাটি ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে উভয় সম্প্রদায়েরই মধ্যবিত্তদের মধ্যে অধিকতর জোরালো হয়ে ওঠায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় থাকতে পেরেছিল। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটির সাহায্যে জেলার বিপুল সংখ্যক কৃষিজীবি মানুষের আচরণকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের মনে হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই শেষপর্বে, বিশেষত ১৯৩০ সালের পর থেকে, জেলার ছোটচাষী-ভাগচাষী-ক্ষেতমজুরেরা যে-ভাবে জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগী- ধনীচাষী-জোতদার জোটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, যেভাবে দিনের পর দিন মানুষগুলি এত আর্থিক বৈষম্য সহ্য করে চলেছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও শোষক উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে যাদের সংগঠিত আন্দোলন জেলায় দানা বেঁধেই উঠতে পারেনি, ঠিক সেই কারণের জন্যই সম্প্রদায়িক রাজনীতিও এখানে সেইরকম প্রভাব ফেলতে পারেনি যেমন ফেলেছিল নোয়াখালির কৃষকদের উপর। আমরা যদি মুর্শিদাবাদের কৃষি-নির্ভর নিম্নবর্গের ভূমিকার সঙ্গে অন্য ব্যাখ্যাগুলিকে যুক্ত না করি তাহলে এখানকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যথার্থ স্বরূপ বোঝা যাবে বলে মনে হয় না।[৩৮]

# বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' : অন্তর্দ্বন্দ্বের উৎস-সন্ধানে

## এক

বাংলার চিন্তাচর্চার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির সম্যক গুরুত্ব যথোচিতভাবে নির্ধারিত হয়েছে বলে মনে হয় না। বিশেষত, এই প্রবন্ধটির পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠাকে বঙ্কিমচন্দ্রেরই অপর একটি প্রবন্ধ, 'সাম্য', অনেকখানি আড়াল করে দিয়েছে। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বৈষম্য ও বহুমুখী শোষণের শিকার বাংলার কৃষকদের বাস্তব জীবনসংগ্রামকে অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতির উত্তপ্ত স্পর্শে তথ্যনিষ্ঠভাবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছিলেন। আবার অন্যদিকে বাংলার এই বৈষম্যপীড়িত কৃষকদের অবস্থাই তাঁকে বেশী করে আকৃষ্ট করেছিল সাম্যের আদর্শের প্রতি; দেশী বিদেশী ঐতিহ্যের ভাণ্ডার থেকে সাম্যনীতির ব্যাখ্যামূলক ধ্যানধারণাগুলি আহরণ করলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'সাম্য' প্রবন্ধটির অনেকখানি জায়গা জুড়েই ছিল বাংলার কৃষকদের দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ-বঞ্চনার কাহিনী। বাংলা ভাষায় সাম্যের আদর্শ ও নীতি সম্পর্কিত এই প্রথম ও সম্ভবত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আলোচনাটি ভাবপ্রবণ ও কল্পনা প্রবণ বাঙালী মানসিকতার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই গণ্য হতে পারে। কিন্তু 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটিতে অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বস্তুনিষ্ঠার যে পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজ বাস্তবকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করার যে সকল প্রমাণ বিদ্যমান, তাতে রচনাটি বাঙালীর চিন্তা চেতনার এক নব পর্যায়ের ইংগিতবহ হয়ে উঠেছে, শুধুমাত্র সাধারণ পাঠকের আগ্রহের সৃষ্টিতেই এর ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাংলা ভাষায় কৃষক সমস্যা সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' লিখেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র কয়েক সংখ্যায়। বিজ্ঞানমনস্ক অক্ষয়কুমারের বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা-ভাবনার ঐতিহ্য আরো সমৃদ্ধ রূপে 'বঙ্গদেশের কৃষক' বহন করলেও, সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বিশ্ববিদ্যার নানা শাখাপ্রশাখার যে বহুবর্ণ দ্যুতি-বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা যায়, অক্ষয়কুমারের পূর্বোক্ত রচনাটিতে তার একান্ত অভাব। এখানেই 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির গুরুত্ব। কিন্তু বাংলার শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সাম্যের আদর্শের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ফলে স্বভাবতই বাস্তববিমুখ বাঙালী পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' অপেক্ষা 'সাম্য' অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শন-পত্রিকার প্রথম বর্ষ পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ এই চার সংখ্যায় আগস্ট, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে মার্চ, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত 'সাম্য' প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শন-এর দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় মে, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে জুলাই, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এবং চতুর্থ বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় অক্টোবর-নভেম্বর ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২] ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে 'সাম্য' প্রকাশিত হয়; 'এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ (১২৮০ ও ১২৮২ সালের)

বঙ্গদর্শনেব সাম্য শীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পবিচ্ছেদ ঐ পত্রে (১২৭৯ সালে) প্রকাশিত 'বঙ্গদেশেব কৃষক' নামক প্রবন্ধ হইতে নীত।"[৩] পববর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে 'সাম্যটা সব ভুল' এবং তিনি সাম্যেব মত প্রত্যাহাব কবে নেন ও গ্রন্থটিব প্রচাব বন্ধ কবে দেন। কিন্তু আবো পবে, তাঁব মৃত্যুব বৎসব দুই পূর্বে (১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে), বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয ভাগ, গ্রন্থটি প্রকাশ কবেন। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধটি বিষযবস্তুব কোনো পবিবর্তন ছাড়াই পুনর্মুদ্রিত হয। অবশ্য এই পুনর্মুদ্রনেব সময় প্রবন্ধটিব যুক্তিক্রম ও কাঠামোগত ঐক্যেব কিছুটা হানি ঘটে, প্রবন্ধটিব শেষ দুটি পবিচ্ছেদেব পাবস্পবিক স্থানান্তব ঘটানোয। পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধটিব মুখবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জানান, 'অর্থশাস্ত্র-ঘটিত ইহাতে কযেকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে কবি না। কিন্তু অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন্ কথা ভ্রান্তি, আব কোন কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত কবা দুঃসাধ্য। অতএব কোনপ্রকাব সংশোধনেব চেষ্টা কবিলাম না।"[৪] অর্থাৎ 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধটিব কিছু কিছু বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র পববর্তীকালে ভ্রান্ত বলে মনে কবলেও প্রবন্ধটি তিনি সাম্যেব মত প্রত্যাহাব কবে নেননি, ববং পুনবায অবিকৃতভাবে মুদ্রিত কবেছিলেন। কিন্তু কেন? বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধটি হুবহু পুনর্মুদ্রণেব সপক্ষে ছ'টি যুক্তি দেখিযেছিলেন; এব মধ্যে চাবটি যুক্তি ছিল লেখাটিব প্রকাশনা অথবা প্রভাব নিযে এবং বাকী দুটি যুক্তি ছিল লেখাটিব বিষযবস্তু সম্পর্কিত। শেষেব এই দুটি যুক্তি হচ্ছে এই বকম: (১) "ইহাতে পঁচিশ বৎসব পূর্বে দেশেব যে অবস্থা ছিল, তাহা জানা যায। ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তাব ইহা কাজে লাগিতে পাবে।" (২) "ইহাতে কৃষকদিগেব যে অবস্থা বর্ণিত হইযাছে তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপবিবর্তিতই আছে। যতগুলি উৎপাতেব কথা আছে তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অন্তর্হিত হয নাই।"[৫] সহজেই বোঝা যায যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধটিতে বচনা কালেব সমসাময়িক দেশেব অবস্থাব পবিপ্রেক্ষিতে কৃষকদেব অবস্থাব বর্ণনা ও বিশ্লেষণ উপস্থিত কবেছিলেন এবং তা কবেছিলেন এই বর্ণনাব দলিলমূল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হযেই। 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধটি চাবটি পবিচ্ছেদে বিভক্ত: দেশেব শ্রীবৃদ্ধি, জমিদাব, আইন ও প্রাকৃতিক নিযম। এই চাবটি পবিচ্ছেদেব মধ্যে চতুর্থটি, প্রাকৃতিক নিযম, আর্থ-সামাজিক নিয়মেব প্রতিপাদক একটি তত্ত্ব উপস্থাপন কবেছে; আব তৃতীয পবিচ্ছেদ, আইন, বেশ কিছুটা অংশে একটি ঐতিহাসিক বিবৃতি-মাত্র। অর্থাৎ প্রবন্ধটিব বর্ণনামূলক মূল লক্ষ্যটি রূপাযিত হযেছে প্রথম, দ্বিতীয এবং অংশত তৃতীয পবিচ্ছেদে। প্রবন্ধটিতে যে-তত্ত্ব উপস্থাপিত হযেছে অথবা যে-ইতিহাস বিবৃত হযেছে নিঃসন্দেহে তা ছিল বর্ণনামূলক মূল লক্ষ্যটিব পবিপূবক। এই কথাগুলি স্মবণে বেখে আমবা প্রবন্ধটিব বিভিন্ন অংশেব উৎস-সন্ধানে অগ্রসব হতে পাবি। এই উৎসসন্ধান অবশ্যই প্রবন্ধটিব গুরুত্ব নিরূপণেব জন্য।

বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধটিব উৎস-সন্ধান কবতে গিয়ে প্রথমেই আমবা প্রবন্ধটিব সেই অংশগুলিব প্রতিই নজব দিলে আলোচনাব সুবিধা হয় যে-গুলি বঙ্কিমচন্দ্রেব সমকালে বাংলাব কৃষকদেব অবস্থাব বর্ণনা-বিশ্লেষণেব বদলে এই অবস্থাব ঐতিহাসিক বিবর্তনেব পবিচয় দিয়েছে, অথবা কৃষকদেব অসাম্য ও দাবিদ্র্যেব দীর্ঘকালীন কাবণগুলিকে চিহ্নিত কবতে চেষ্টা কবেছে। প্রবন্ধটিব তৃতীয় অধ্যায়, 'আইন', অংশত বাংলাব ভূমি-সম্পর্কিত আইনেব ঐতিহাসিক

বিবর্তনের রূপরেখা রচনার মধ্যে দিয়ে কৃষকদের তৎকালীন অবস্থার পটভূমিটি তুলে ধরেছে। প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণের সময়ে একটি পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন যে তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র-রচিত 'বঙ্গীয় প্রজা' (Bengal Ryots— Their Rights & Liabilities) গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ এই অধ্যায়টিতে সঙ্কলিত হয়েছে। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্রের বইটির দুটি অংশের মধ্যে ঐতিহাসিক অংশটিই রাজস্ব আইন সমূহের সংক্ষিপ্তসার দ্বিতীয় অংশের চাইতে সমকালে অধিকতর প্রশংসিত হয়েছিল ; এই ঐতিহাসিক অংশে সঞ্জীবচন্দ্র বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ নং আইন প্রণয়ন-পর্যন্ত বৃটিশ শাসকবর্গ রায়তের স্বার্থরক্ষায় যে-সকল আইনগত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করেছিল তার বিবরণ দিয়েছিলেন, যদিও বিষয়টির সঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্রের পরিচয় বাস্তব-অভিজ্ঞতা অপেক্ষা পঠনপাঠনের উপরই বেশী নির্ভরশীল ছিল। নিজ প্রবন্ধের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অগ্রজের এই উল্লেখযোগ্য গবেষণাকে সঙ্গত কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রধান উৎস হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। প্রসঙ্গত আইনের কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁর ব্যাপক অধ্যয়নের ছাপও এই পরিচ্ছেদটিতে থেকে গেছে।[৬] 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদ (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণের তৃতীয় পরিচ্ছেদ), 'প্রাকৃতিক নিয়ম', পূর্ববর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে আলোচিত বাংলার কৃষকের সমকালীন ঐতিহাসিক অবস্থার পিছনের গভীরতর কারণগুলিকে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে বাংলার কৃষকের অবস্থার বিবরণ দিয়ে তার থেকে আরোহী পদ্ধতি (inductive method) অনুসারে কোনো সাধারণ নিয়ম খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা না করে, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র কতকগুলি ধারণাকে স্বীকার করে নিয়ে এই সকল ধারণার সাহায্যেই অবরোহী পদ্ধতিতে (deductive method) বাংলার কৃষকের অবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই ধারণাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহ করেছিলেন ডব্লিউ. ই এইচ্ লেকী (১৮৩৮-১৯০৩), হেনরী টমাস বাক্ল (১৮২১-১৮৬২) ও জন স্টুয়ার্ট মিল্ (১৮০৬-১৮৭৩)-এর চিন্তাভাবনা থেকে। লেকীর 'এ হিস্ট্রী অব্ দি রাইজ অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স অব্ র‍্যাশনালিজম ইন ইউরোপ' (১৮৬৫) থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে সম্পদের সঞ্চয়ের ফলেই সভ্যতার সৃষ্টি হয়। এই সিদ্ধান্তকে আরো বিস্তৃত করার জন্য তিনি বাক্লের মতামতের সাহায্য নিয়েছিলেন। বাক্লের 'হিস্ট্রী অব্ সিভিলাইজেশন ইন্ ইংল্যান্ড' (১৮৫৭-১৮৬১) বইটির প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় চরিত্র গঠনে ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাবের মূল সূত্রগুলি আলোচিত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকল সূত্রের আলোকে ভারতের জাতীয় চরিত্র বর্ণিত হয়েছিল। বাক্ল সভ্যতার বিকাশকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সম্পদের সঞ্চয় ও বন্টনের উপর আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি ও খাদ্যের নির্ধারক প্রভাবের কথা বলেছিলেন; তাঁর মতে ভারতে এই সকল প্রাকৃতিক প্রভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শ্রমজীবিদের দারিদ্র্যের উদ্ভব ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর আলোচ্য পরিচ্ছেদে বাক্ল-এর বই-এর এইসকল কথা প্রায় অনুবাদই করে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বক্তব্যকে আরো দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করার জন্য মিল্-এর 'প্রিন্সিপল্‌স্ অব্ পলিটিক্যাল ইকনমি' (১৮৪৮) গ্রন্থের সাহায্য নিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন, কীভাবে শ্রমজীবিদের মজুরী ধীরে ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে হ্রাস পায় এবং বাংলাদেশেও পেয়েছে। মোট কথা, এই পরিচ্ছেদে

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাব কৃষকেব দাবিদ্র, অজ্ঞতা এবং দাসত্বেব পিছনেব প্রাকৃতিক কাবণ বা 'নিযম'-কে বুঝতে চেষ্টা কবেছিলেন, যাতে বাষ্ট্রীয বা সামাজিক কর্মপ্রচেষ্টাব সাহায্যে এগুলি দূব কবা যায।[৭]

এবাবে 'বঙ্গদেশেব কৃষক'-এব যে-অংশে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব সমকালেব কৃষকদেব অবস্থাব বর্ণনা ও বিশ্লেষণ কবেছেন সেই অংশেব উৎসেব প্রতি নজব দেওযা যেতে পাবে। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব সৃষ্ট জমিদাবতন্ত্রেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ ভাবে যুক্ত থাকলেও বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদেব অনেকেই বামমোহনেব সময থেকেই বাংলাব বায়ত বা কৃষকদেব প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ কবে আসছিলেন। বাংলাব কৃষক-সমস্যাব প্রতি সচেতনতা এবং কৃষক-প্রীতিব পবিচয এঁবা বেখে গেছেন ইংবেজী ও বাংলা ভাষাব মাধ্যমে নানা উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে এবং সামযিকপত্র-সংবাদপত্রেব নানা প্রতিবেদনে। এই সকল বচনাব প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রেব উপব পডেছিল এমন অনুমান সমালোচকবর্গ কবেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য লেখাগুলি হলে : প্যাবীচাঁদ মিত্রেব 'দি জেমিন্দাব অ্যান্ড দি বাযত' (ক্যালকাটা বিভিউ, ১৮৪৬), অক্ষয কুমাব দত্ত-ব 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগেব দূববস্থা' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৫০), বেভাবেন্ড লালবিহাবী দে বচিত একটি প্রবন্ধ (ক্যালকাটা বিভিউ, জুন, ১৮৫৯), কিশোবীচাঁদ মিত্রেব 'দি বাযত অ্যান্ড দি জেমিন্দাব' (ইন্ডিযান ফিল্ড, ১৮৫৯), প্যাবী মোহন মুখার্জীব 'অন দি কনডিশন অব্ দি বেঙ্গল বাযত' (ট্রানজ্যাকশন্স্ অব্ দি বেঙ্গল সোসাল সাযেন্স অ্যাসোশিযেশন, ১৮৭০), এবং কেশবচন্দ্র সেনেব 'প্রজাদিগেব দুববস্থা' ও 'প্রজাপীডন' (সুলভ সমাচাব, ১৮৭০)।[৮] কোন কোন সমালোচক আবাব এই সকল বচনাব পাশাপাশি বাংলাব কৃষি ও ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে নানা সবকাবী বিপোর্টেব সঙ্গে দাযিত্বশীল সবকাবী কর্মচাবী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রেব ঘনিষ্ঠ পবিচযেব উপবও জোব দিতে চেযেছেন।[৯] 'বঙ্গদেশেব কৃষক'-এব উৎস হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রেব উপব এইসকল প্রবন্ধ বা বিপোর্টেব প্রভাবই যে যথেষ্ট নয, এই উপলব্ধিব ফলেই আবাব কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রেব দীর্ঘ সবকাবী চাকবীব বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই এই প্রবন্ধেব উৎস হিসাবে উল্লেখ কবেছেন।[১০] কিন্তু এঁবাও আবাব তাঁব চাকবী জীবনেব সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাব নিবিখে এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রেব চিন্তাভাবনাব বিশ্লেষণ কবতে ব্যর্থ হযেছেন। আমবা বঙ্কিমচন্দ্রেব চাকবী জীবনেব সুনির্দিষ্ট কিছু অভিজ্ঞতাব আলোকে 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধটিকে বোঝাব চেষ্টা কববো। সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধটিব আলোচনায অদ্যাবধি উপেক্ষিত কিছু উপাদানেব প্রতিও দৃষ্টি আর্কষণেব চেষ্টা কবা যাবে। কিন্তু এগুলি কবাব পূর্বে প্রবন্ধটিব উপব অন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাবেব কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা জরুবী।

## দুই

বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধে বাংলাব ভূমি-ব্যবস্থাব বিবর্তন ও প্রকৃতি, জমিদাবদেব অত্যাচাব-অবিচাব এবং কৃষকদেব শোচনীয দুববস্থাব এক প্রাণবন্ত বেখাচিত্র আমবা পাই। বিশেষত কৃষকদেব দুববস্থাব বর্ণনা ও বিশ্লেষণ মিতাভাষণেব মধ্যে দিযেও জীবন্ত হযে উঠতে পেবেছে বাংলাব কৃষকেব প্রতিনিধি স্থানীয় তিনটি কাল্পনিক চবিত্রেব উপস্থাপনায় : চবিত্র

তিনটি হলো হাসিম শেখ, বামা কৈবর্ত ও পবাণ মন্ডল। প্রবন্ধেও এক জাযগায বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "পবাণ মন্ডল কল্পিত ব্যক্তি— একটি কল্পিত প্রজাকে উপলক্ষ কবিযা প্রজাব উপব সচবাচব অত্যাচাব-পবাযণ জমিদাবেবা যতপ্রকাব অত্যাচাব কবিযা থাকেন, তাহা বিবৃত কবাই আমাদেব উদ্দেশ্য।"[১১] একই বকম কল্পিত চবিত্র হাসিম শেখ ও বামা কৈবর্ত— এই দুই কল্পিত চবিত্রকেও উপলক্ষ কবে বাংলাব কৃষকেব উদয়াস্ত পবিশ্রম ও চিবন্তন দাবিদ্রোব জীবন্ত ছবি এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। একটি প্রবন্ধেব আঁটোসাঁটো অবযবে এই তিনটি কাল্পনিক চবিত্র আমদানী কবাব ফলেই আলোচ্য সমস্যাটিকে তিনি পাঠকমনেব একেবাবে গভীবে পৌঁছে দিতে পেবেছিলেন। প্রবন্ধেব মধ্যে এই তিনটি চবিত্র আমদানী কবতে গিযে বঙ্কিমচন্দ্র কি কোন আদর্শ বা মডেলেব দ্বাবা প্রভাবিত হযেছিলেন ? আমাদেব অনুমান বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে বেভাবেন্ড লালবিহাবী দে বচিত Govinda Samanta (1874) বইটিব গোবিন্দ সামন্ত চবিত্রেব দ্বাবাই প্রভাবিত হযেছিলেন। কেন আমবা এধবনেব অনুমানেব পক্ষে, তা ব্যাখ্যা কবা যেতে পাবে।

লালবিহাবীব 'Govinda Samanta' এবং বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বঙ্গদেশেব কৃষক' এই দুটি লেখাই কর্মোপলক্ষ্যে লালবিহাবী ও বঙ্কিমচন্দ্র উভযেবই বহবমপুব-বাস কালে বচিত। লালবিহাবী ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দেব সেপ্টেম্বব থেকে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দেব জানুযাবী পর্যন্ত বহবমপুব কলেজিযেট স্কুলেব প্রধান শিক্ষক ও বহবমপুব কলেজেব ইংবেজী ভাষা ও সাহিত্যেব অধ্যাপক ছিলেন।[১২] অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র বহবমপুবে ডেপুটি কালেক্টব ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটেব পদে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দেব ২৯ শে নভেম্বব থেকে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দেব ৩বা মে পর্যন্ত কর্মবত ছিলেন।[১৩] বহবমপুবে ঐ সমযে কর্মোপলক্ষ্যে সমাগত এবং স্থানীয বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যসেবীদেব অভূতপূর্ব সমাহাব ঘটেছিল। এঁদেব উদ্যোগেই ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে বহবমপুব গ্রান্ট হল ক্লাব নামে সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয। এই সভাব সম্পাদক ও প্রধান কর্মী ছিলেন লালবিহাবী এবং সহ-সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই সভায সদস্য ও অনুবাগীদেব স্ব-বচিত বচনা পাঠ ও আলোচনা সমালোচনা চলতো এবং এই সূত্রেই লালবিহাবীব 'Govinda Samanta' ও বঙ্কিমচন্দ্রেব 'বঙ্গদেশেব কৃষক' বচনা দুটিব সম্পর্কেব সন্ধান মিলবে।[১৪] ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দেব প্রথমে উত্তব পাড়াব জমিদাব জযকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায (১৮০৮-১৮৮৮) ইংবেজী অথবা বাংলা ভাষায "Social and Domestic Life of the Rural Population and Working Classes of Bengal" বর্ণনা কবে বচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেব জন্য ৫০০ টাকা পুবস্কাব ঘোষণা কবেন। এই "উপন্যাসযুক্ত প্রবন্ধ" ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দেব জানুযাবী মাসেব মধ্যে প্রতিযোগিতাব জন্য জমা দিতে বলা হয। এই প্রতিযোগিতাব জন্য লালবিহাবী ইংবাজী ভাষায এবং বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায উপন্যাস বচনা কবেছিলেন।[১৫] পুবস্কাব ঘোষণা ও লেখা জমা দেওযাব নির্ধাবিত সময থেকে সহজেই অনুমান কবা যায় যে দু'জনেব উপন্যাসই মূলত ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে বচিত হযেছিল। প্রতিযোগিতায লালবিহাবীব বচনাটি পুবস্কৃত হয এবং ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে লন্ডন থেকে 'Govinda Samanta, the history of a Bengal Raiyat' নামে দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়।[১৬]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে লালবিহাবীব গ্রন্থটিব বচনাকাল ও নাম সম্পর্কে বাংলাব বিদগ্ধ

মহলে ব্যাপক বিভ্রান্তি বিদ্যমান এবং এই বিভ্রান্তির দূরীকরণ, বর্তমান আলোচনার সূত্রে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও, অবশ্যই করণীয়। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে লালবিহারীর Bengal Peasant Life ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। সম্প্রতি সুকুমার সেন লিখেছেন, "লালবিহারী তখন Bengal Peasant Life (১৮৭৪) বইটি লিখেছেন" ; দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' (২য় সংস্করণ, ১৯৮৭) গ্রন্থের দুটি বাক্যাংশে বলা হয়েছে: "লালবিহারীর Bengal Peasant Life (১৮৭২) রচনা" (পৃ. ২৪) এবং "লালবিহারী তাঁর Bengal peasant Life (১৮৭৫) বা তারই পরিবর্ধিত রূপ Govinda Samanta গ্রন্থে" (পৃ. ৩০)।[১৭] বিদগ্ধজনের এই সকল বক্তব্যের কিছু অসঙ্গতির প্রতি সবিনয়ে দৃষ্টি আর্কষণ করছি। প্রথমত, উপরোক্ত প্রতিযোগিতার জন্য লালবিহারী বাংলার কৃষকের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন নিয়ে যে ইংরাজী উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন তা রচিত হয়েছিল বহরমপুরে এবং সুনিশ্চিতভাবে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে। কেননা, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই রচনাটি প্রতিযোগিতার জন্য জমা দিতে হয়েছিল এবং ঐ জানুয়ারী মাসেই লালবিহারীকে বহরমপুর ছেড়ে কর্মান্তরে হুগলী চলে যেতে হয়েছিল। অর্থাৎ উপন্যাসটির রচনাকাল ১৮৭২, ১৮৭৪ অথবা ১৮৭৫ হওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিযোগিতায় প্রদত্ত লালবিহারীর রচনাটির নাম যে "Bengal Peasant Life" ছিল তার একান্ত প্রমাণাভাব। বরং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী রচনাটি তিনটি অতিরিক্ত পরিচ্ছেদ সহ ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে লন্ডন থেকে যে "Govinda Samanta, the history of a Bengal Rayiat" নামে দুই খন্ডে প্রকাশিত হয় সেটিই রচনাটির আদি নাম হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। বিশেষত, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে হুগলী থেকে লালবিহারীর সম্পাদনায় Bengal Magazine পত্রিকার প্রকাশ শুরু এবং ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ঐ পত্রিকায় পাবনার কৃষক বিদ্রোহের সমর্থনে ARCYDAE ছদ্মনামে রমেশচন্দ্র দত্ত রচিত "An Apology for the Pabna Rioters" প্রকাশ এবং ঐ ১৮৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দেই বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রকাশ— এই সব সত্ত্বেও লালবিহারী তাঁর পুরস্কার-প্রাপ্ত রচনাটিকে পরিবর্ধিত রূপে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে Govinda Samanta নামেই প্রকাশ করায় এই নামটিকেই রচনাটির আদিনাম বলে গ্রহণ করতে হয়। তৃতীয়ত, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের দুর্লভ পুস্তক শাখায় (Rare Books Section) রক্ষিত Bengal Peasnat Life গ্রন্থটির ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের সংস্করণটি নামপত্রের পরপৃষ্ঠায় বইটির প্রথম সংস্করণ দুই খন্ডে 'Govinda Samanta' নামে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়ার তথ্যের পরেই উল্লিখিত : New Edition ('Bengal Peasant Life'), 1878।[১৮] সুতরাং ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দেই বইটির আদিনাম Govinda Samanta পরিবর্তন করে, Bengal Peasant Life রাখা হয় এবং বইটি এই নামেই পরবর্তীকালে স্কুলপাঠ্য হওয়ায় এই নামটিই ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এবং পর পর বইটির অনেকগুলি সংস্করণ হয়। এইভাবে অনিবার্য প্রসঙ্গান্তর থেকে আমরা মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরতে পারি : Govinda Samanta এবং বঙ্গদেশের কৃষক-এর সম্পর্ক।

দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর সম্পাদিত পূর্বে উল্লিখিত বইটির ৬৯-৭৫ পৃষ্ঠায় আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে Govinda Samanta বইটির প্রথম খন্ডের অনেকটাই

লালবিহাবী সম্পাদিত 'অরুণোদয' পত্রিকায ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এবং লালবিহাবীবই বচনা বলে অনুমিত 'চন্দ্রমুখীব উপাখ্যান' উপন্যাসটিব প্রায আক্ষবিক ইংবাজী অনুবাদ। এই বক্তব্য মেনে নিলে সিদ্ধান্ত কবতে হয যে লালবিহাবী অল্প আযাসে এবং অল্প দিনেই Govinda Samanta প্রথম খন্ড বচনা কবেছিলেন। অর্থাৎ ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দেব প্রথম কযেক মাসেই বইটিব অন্তত প্রথম দিকটি বচিত হযেছিল। অন্যদিকে, বঙ্কিমচন্দ্রও উপবে আলোচিত প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যেই ১/৫/১৮৭১ তাবিখ থেকে একমাস ছুটি নিযে দিনে বাতে পবিশ্রম কবে বচনা কবেন 'উভযেবই দোষ'। কিন্তু প্রতিযোগিতাব পুবস্কাবটি বিশেষ সুপাবিশ-ক্রমে লালবিহাবীই পাবেন এ কথা জানাব পব বঙ্কিমচন্দ্র 'উভযেবই দোষ' অনেকখানি পাল্টে লেখেন 'বিষবৃক্ষ' এবং তা ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দেব এপ্রিলে 'বঙ্গ দর্শন' প্রথম সংখ্যা থেকেই ধাবাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে।[১৯] প্রতিযোগিতাব ফলাফল প্রকাশে বিলম্বেব জন্য লালবিহাবীব বচনাটি প্রকাশিত হয পবে, ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে। এই প্রসঙ্গেই সুকুমাব সেন লিখেছেন, "লালবিহাবী তখন Bengal Peasant Life (১৮৭৪) বইটি লিখছিলেন... এবং বোধ কবি কিছু কিছু অংশ আলোচনা সভায পাঠ হতো। সেই বচনাটি বঙ্কিমচন্দ্রেব শিল্পী মানসে কিছু আলোড়ন এনেছিল বলে মনে হয। ... তাব ফলে তাঁব উপন্যাস বচনাব ভাবে ভঙ্গীতে পবিবর্তন দেখা গেল।"[২০] অর্থাৎ বোমান্স বচনা ছেড়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' লিখেছিলেন লালবিহাবী-বচিত Govinda Samanta গ্রন্থটিব পবোক্ষ প্রভাবেই। এই একই প্রভাব 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধেও দেখা যায না কি? লালবিহাবী তাঁব বই-এব ১ম খন্ড ১ম অধ্যাযে জানাচ্ছেন যে সমতল বাংলাব এক সাধাবণ কৃষকেব সাদামাটা ও সবল জীবনেব কাহিনীই তিনি এখানে বলাব চেষ্টা কবেছেন। সুকুমাব সেনেব উপবোক্ত বক্তব্য মেনে যদি বলা যায যে লালবিহাবীব গোবিন্দ সামন্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে সামাজিক উপন্যাস বচনায় আগ্রহী কবে তুলেছিল, তাহলে একথা বলা কি অযৌক্তিক হবে যে বাংলাব কৃষকেব প্রতিনিধি স্থানীয গোবিন্দ সামন্তেব আদর্শেই বঙ্কিমচন্দ্র হাসিম শেখ, বামা কৈবর্ত ও পবাণ মন্ডলকে তাঁব 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধে হাজিব কবেছিলেন? বিশেষত, Govinda Samanta প্রথমাংশ যখন বচিত হওযাব পব পবই গ্রান্ট হল সাহিত্য সভায পঠিত হযেছিল এবং যখন এব মাত্র কযেক মাস পবেই 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধটিব বচনাও শুরু হযেছিল তখন এ বকম অনুমান অসঙ্গত হবে কি? প্রসঙ্গত বঙ্কিমচন্দ্রেব উপব লালবিহাবীব বচনাব ছাযাপাত বা প্রভাব সম্পর্কে বিশেষভাবে মনে বাখা প্রযোজন যে বহবমপুব গ্রান্ট হল সাহিত্য সভাকে কেন্দ্র কবে আনুমানিক ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দেব মাঝামাঝি সময থেকে দু'জনেব মধ্যে মনোমালিন্যেব পূর্বে তাঁদেব ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল পাবস্পবিক শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতিবই এবং সে সমযে অগ্রজ সাহিত্য কর্মী হিসাবে লালবিহাবীব প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রেব চিন্তা ভাবনাব উপব স্বভাবতই পড়ে থাকতে পাবে। বাঙালীব খেলাধূলা ও উৎসব-পার্বণ, লোক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, শিক্ষায চুঁইযে পড়াব তত্ত্ব বর্জন কবে জনশিক্ষা সমর্থন, জনকল্যাণ সম্পর্কে হিতবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, এবং সর্বোপবি বাংলাব বাযতদেব দুঃখ দুর্দশাব প্রতি গভীব সহানুভূতি— এই সকল বিষয়ে লালবিহাবীব অগ্রবর্তী বচনাবলী পববর্তী সময়ে এই সকল বিষযেই বঙ্কিমচন্দ্রেব চিন্তা ভাবনা বা বচনাবলীব উপব কোনই ছায়াপাত কবেনি এমন কথা বলা শক্ত।[২১] যদি স্বীকাব কবা যায় যে গোবিন্দ সামন্ত চবিত্রেব প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব প্রবন্ধে উপবোক্ত তিনটি চবিত্র আমদানী কবেছিলেন তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায় : বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাব কৃষকেব প্রতিনিধি হিসাবে হাসিম শেখ, বামা কৈবর্ত ও পবাণ মন্ডল এই তিনজনকে কেন বেছে নিলেন, কেন গোবিন্দ

সামন্তর মত কোনো একজনকে বাংলার কৃষকের প্রতিনিধি হিসাবে হাজির করলেন না ?

লালবিহারী বাংলার কৃষকের সাধারণ জীবনের কাহিনী বর্ণনার জন্য বেছে নিয়েছিলেন গোবিন্দ সামন্তকে— গোবিন্দ ছিল বর্ধমান জেলার সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধি স্থানীয় কৃষিজীবী জাত (Caste), উগ্র ক্ষত্রিয় বা আগুরি সম্প্রদায়ের লোক।[২২] বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার কৃষকের প্রতিনিধি হিসাবে যে হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত ও পরাণ মণ্ডলকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তারা কি বর্ধমান জেলার মত বাংলার অন্য কোনো জেলার প্রতিনিধি স্থানীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজীবী জাত্-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল ? আমরা এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষকদের বিশেষ ও বাস্তব জীবন সমস্যাকে ভিত্তি করেই তিনি বঙ্গদেশের কৃষকের দুরবস্থা সম্পর্কিত সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এই জন্যই মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বার্ধ বাগড়ি অঞ্চলের শেখ মুসলমান ও কৈবর্ত কৃষিজীবী জাত্-সম্প্রদায় দুটির প্রতিনিধি হিসাবে হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্তকে বেছে নিয়েছিলেন, যেমন বেছে নিয়েছিলেন পরাণ মণ্ডলকে মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমার্ধ রাঢ় অঞ্চলের প্রতিনিধি স্থানীয় কৃষিজীবী সদ্গোপ জাত্-সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে।[২৩] আমাদের এই অনুমান সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর মত বহুমুখী আক্রমণের লক্ষ্য হবে জেনেই আমরা আমাদের অনুমানেব সমর্থক প্রমাণ গুলি এবারে উপস্থাপন করতে পারি।

## তিন

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির চারটি পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল অগাস্ট, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মার্চ, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল ঠিক কোন্ সময়ে ? বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগে পুনর্মুদ্রিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির প্রথম পরিচ্ছেদের পাদটীকায় বলা হয়েছে, "যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হয়, তখন census হয় নাই"।[২৪] বঙ্কিমচন্দ্রেব তৎকালীন কর্মস্থল মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম জনগণনা বা census দীর্ঘ প্রস্তুতির পর অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী রাত্রে।[২৫] সুতরাং এ-অনুমান অযৌক্তিক হবে না যে বঙ্গদেশের কৃষক বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকেই লিখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রবন্ধটি যে একনাগাড়েই লেখা হয়নি তার প্রমাণ মেলে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বরে প্রকাশিত এই পবিচ্ছেদটিতে একজায়গায় পরিচ্ছেদটির অবশিষ্ট অংশের তথ্যসূত্র হিসাবে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে আগস্টের 'ইণ্ডিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকার উল্লেখ লক্ষ্যনীয়।[২৬] অর্থাৎ এই পরিচ্ছেদটি ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরেই রচিত হওয়ার সম্ভাবনা। বাকী দুটি পরিচ্ছেদ রচিত হয়েছিল নভেম্বর ১৮৭২ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তা বোঝা যায় এগুলির প্রকাশের কাল থেকে। প্রবন্ধটির বিভিন্ন অংশের রচনাকাল নির্ণয় প্রয়োজন পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত প্রমাণগুলি পেশ করার জন্যই।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে এই সময়ে, নভেম্বর ১৮৬৯ থেকে মে, ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর জেলা-প্রশাসনের উচ্চতর পদে কর্মরত ছিলেন। চাকরী জীবনে মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি ও কৃষক তথা ব্যাপক জনজীবনের সমস্যাবলীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কিছু কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।" ১৮৬৯-৭০

সালের ল্যাণ্ড রেভেনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে তাঁকে আন্‌কভেন্যান্টেড অফিসারদের মধ্যে দক্ষতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার গুণে সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় ব্যক্তি বলে অভিনন্দিত করা হয়েছিল।"[২৭] ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে যে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল সেই বন্যার উত্তুঙ্গ অবস্থায় ডেপুটি কালেক্টর বঙ্কিমচন্দ্র জেলার ব্যাপক অঞ্চলে ঘুরে এসে বন্যার ফলে জেলার কৃষির লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়েছিলেন।[২৮] বাংলার অন্যান্য জেলার মত মুর্শিদাবাদ জেলারও পরিসংখ্যানগত সমীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডব্লিউ.ডব্লিউ. হান্টারের পাঁচগুচ্ছ প্রশ্নাবলীর উত্তরও বঙ্কিমচন্দ্র দেন ১৮৭০-৭১ সালে, কালেক্টর মি. হ্যাঙ্কে এবং জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. জেফ্রির সঙ্গে।[২৯] জেলার আর্থিক-সামাজিক জীবন সম্পর্কে সরকারী চাকরী-সূত্রে শুধু অভিজ্ঞতা অর্জনই নয়, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জেলার বাস্তব সমস্যাবলীর বুদ্ধিগত বৈজ্ঞানিক অনুশীলন বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশ্নাবলীর উত্তরমালা রচনার মধ্যে দিয়েই শুরু করেছিলেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিক থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম জনগণনা বা census- এর প্রস্তুতির পর্ব শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ব্যক্তিগতভাবে সদর বহরমপুর মহকুমার অভ্যন্তরে নানা জায়গায় গিয়ে পুলিশ-প্রদত্ত গ্রাম্য মোড়লদের তালিকার যথার্থতা যাচাই করেন। তাছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট এবং বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ে জেলার অভ্যন্তরে নানা জায়গায় গিয়ে জনসাধারণ ও তথ্য-সংগ্রাহকদের নিকট জনগণার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং এ সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক ধারণাগুলি দূর করতে সমর্থ হন। শুধু তাই নয়, মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম জনগণনা সম্পর্কিত প্রশাসনিক কাজকর্মের প্রধান অংশটিই ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সম্পন্ন করেন বঙ্কিমচন্দ্র।[৩০] হান্টারের প্রশ্নগুচ্ছের উত্তরদানের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের যে তথ্য-নির্ভর যথার্থ বিজ্ঞান-সম্মত উপলব্ধি বঙ্কিমচন্দ্রের শুরু হয়েছিল তাঁর জনগণনা সম্পর্কিত কাজকর্ম যে তাঁকে আরো ব্যাপক ও গভির করে তুলেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এর অল্প কিছুকাল পরেই, সম্ভবত ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপর রোড্‌সেস্ (road cess) সম্পর্কিত কাজকর্মের ভার চাপান হয়। রোডসেস সম্পর্কিত কাজের প্রকৃতিই এরকম ছিল যাতে এই কাজ করতে গিয়ে জেলার ভূমি-ব্যবস্থার স্তর-বিন্যাস সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তুলতেই হতো ; ফলে এই কাজও তাঁর পক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি অর্থনীতিকে বোঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে উঠেছিল।[৩১] কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার আর্থ-সামাজিক জীবন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তব-নিষ্ঠ উপলব্ধি ও অনুসন্ধান যে এখানেই থেমে থাকেনি এবং বুদ্ধিগত দিক দিয়ে উন্নততর পর্যায়ে উঠেছিল, তার পরিচয় বিধৃত থেকে গেছে ডব্লিউ.ডব্লিউ. হান্টার-রচিত "এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল : ভলিউম নাইন : ডিস্ট্রিক্টস অব্ মুর্শিদাবাদ অ্যান্ড পাবনা" গ্রন্থের মুর্শিদাবাদ-সম্পর্কিত অংশটিতে। হান্টারের এই পরিসংখ্যানগত বিবরণের অন্তর্ভুক্ত মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত অংশটি মূলত ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর প্রদত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের রিপোর্টের অনুসরণে রচিত।[৩২] শুধু তাই নয়, মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষি ও কৃষকের অবস্থা, হিন্দু জাত্ সমূহ, আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি এবং ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কেও হান্টার তাঁর বইয়ে প্রথম জনগণনার রিপোর্টের পাশাপাশি ডেপুটি কালেক্টরের বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রই হান্টারের বইয়ে উল্লিখিত একমাত্র ডেপুটি কালেক্টর।[৩৩] হান্টারের বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অথবা ডেপুটি কালেক্টর উল্লেখে প্রদত্ত বিবরণগুলির কিছু অংশ অনুবাদ করে দিলে সহজেই বোঝা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি বস্তুনিষ্ঠভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার আর্থিক ও সামাজিক জীবনকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রিপোর্ট অনুসারে মুর্শিদাবাদের জমি বিলি-বন্দোবস্তের চারটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায় : (১) যে-সকল জমির খাজনা সরাসরি সরকারে দেওয়া হয় ; (২) যে-সকল জমি মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে ; (৩) কৃষকদের ও নানা রকমের জমি ; (৪) নিস্কর বা নামে মাত্র খাজনার জমি। এই চার প্রকার জমি বন্দোবস্তের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগী ও কৃষকদের জমি সম্পর্কে বিবরণের এই অংশটি উল্লেখযোগ্য, "মুর্শিদাবাদ জেলায় সাধারণত জোত শব্দটি প্রযুক্ত হয় সেই প্রকার জমি বন্দোবস্ত বোঝাতে, অন্যত্র যেগুলিকে মৌরসী, গাঁথি বা হাওলা ইত্যাদি বলা হয়। এই প্রকার জমি-বন্দোবস্ত বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য এবং নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে ভোগ্য। 'জোত' নাম থেকেই বোঝা যায় যে কৃষকের নির্দিষ্ট খাজনার জমি হিসাবেই এ-গুলির উদ্ভব হয়েছিল ; পবে নানা কারণে এই কৃষকবা জমি চাষ বন্ধ করে প্রকৃত চাষীদের কাছে এই জমিগুলি বন্দোবস্ত করেছে। স্থায়ী বন্দোবস্তের অধিকারী হিন্দু কৃষকদের প্রধান অংশই প্রায় চাষী শ্রেণীর মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। সমৃদ্ধিশালী হিন্দু চাষী সর্বদাই চেষ্টা কবে চাষীর জীবনবৃত্ত থেকে বেবিযে আসতে এবং পরবর্তী উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় আসীন হতে। যখনই তাব পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে, সে তার জমি বন্দোবস্ত করে দেয় এবং পবিশ্রমী কর্মীটি সম্মানিত নিস্কর্মায় (respected drone) পরিণত হয়। এই পর্যবেক্ষণ মুসলমানদেব সম্পর্ক কম পবিমাণে প্রযোজ্য।" এই বক্তব্যেবই জের হিসাবে তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ কৃষকদের ও নানারকমের জমি-সম্পর্কিত বিবরণের এই অংশটি ও আমাদের দৃষ্টি আর্কষণ কবে : "কৃষকদেব বন্দোবস্ত নেওয়া জমিগুলোকে তিনটি ভাগে সাজানো যায় এবং বর্তমান আইনেই তা স্বীকৃত, আর এইরকম সাজানোই বাস্তবের দিক থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ— (১) নির্দিষ্ট হারে খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া জমি ; (২) বৃদ্ধিযোগ্য খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া দখলিস্বত্বযুক্ত জমি ; (৩) জমিদারের ইচ্ছানুযায়ী খাজনায় বন্দোবস্ত নেওয়া জমি।" "পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এই সকল স্থায়ী জোতের অনেকগুলিই মধ্যস্বত্বভোগী জোতে পরিণত হয়েছে, কেননা, এই সকল জমির মালিকরা মধ্যস্বত্বভোগীর অবস্থান পছন্দ করেছেন ও তাদের অল্পস্বল্প জমিখণ্ডগুলি নিম্নতর চাষীদের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। এ-বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে এই সকল প্রজাদের বহুজনেরই নির্দিষ্ট খাজনায় জমিভোগের আইনসম্মত অধিকার থাকলেও জমিদারেরা তাদের কেবলমাত্র দখলদার রায়তের নিম্ন অবস্থানে নামিয়ে এনেছে। নীতিহীন জমিদারেরা এইসকল প্রজাদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে খাজনাও আদায় করেছে এবং দুর্ভাগ্যবশত জমিদারেরা এ-কাজ করেছে জালিয়াতি অথবা বলপ্রয়োগের সাহায্যে। প্রায়শই শুধমাত্র জমিদারের দাবিটুকুই যথেষ্ট ; কেননা, চাষীরা তাদের অধিকারের উপর জোর দেওয়াকে এবং জমিদারের ইচ্ছার বিরোধিতাকে অর্থহীন মনে করে। এমনকি যখন তত্ত্বগতভাবে অধিকারগুলিকে মানা হয়, তখনও স্থায়ী মালিককে বাস্তবে বে-আইনী বা অস্বীকৃত অথচ অপ্রতিরোধ্য অর্থ-আদায়ের দ্বারা অন্যদের সমস্তরে নামিয়ে আনা হয়। এই সকল কারণের জন্যই স্থায়ী জোতগুলির মোট পরিমাণ অতি দ্রুত কমে আসছে।" "কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই জমিদারদের স্বেচ্ছাধীন প্রজা, তবে সমগ্র কৃষক সমাজের তারা কত অংশ তা বলা অসম্ভব।"[৩৪] হান্টারের বই-এর আরো কিছু কিছু অংশে মুর্শিদাবাদের কৃষক ও কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন কিছু মন্তব্য আছে যেগুলিকে সরাসরি বঙ্কিমচন্দ্র বা ডেপুটি কালেক্টরের বক্তব্য বলে চিহ্নিত করা হয়নি। কিন্তু পরিস্থিতিগত প্রমাণে বলা যায় যে এ-সকল মন্তব্যও বঙ্কিমচন্দ্রের পর্যবেক্ষণের ফল।

যেমন, "প্রতিবেশী জেলাগুলোর তুলনায় মুর্শিদাবাদ জেলায় খাদ্যের মূল্য অনেক বেশী, অথচ মজুরির হার কম। কৃষকেরা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রামীণ ঋণদাতা বা মহাজনদের নিয়ন্ত্রণে; মজুরির উপর নির্ভরশীল জনসাধারণের নিম্নতম স্তরটির অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয়।" "বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে একজন কৃষকের সাধারণ পোষাক হচ্ছে একটি সাধারণ মোটা ধুতি।" "একজন কৃষকের সাধারণ খাদ্য হচ্ছে মোটা চালের ভাত ও ডাল, মাছ বা তরিতরকারী বিরল বিলাসিতা মাত্র।"[৩৫]

এবারে মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষির সঙ্গে যুক্ত সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সম্পর্কে ডেপুটি কালেক্টর বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যগুলি দেখা যেতে পারে: "হিন্দু কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হচ্ছে চাষা কৈবর্তরা। সকল কৃষকের মতই তারা দরিদ্র কিন্তু জেলেদের মত অবজ্ঞাত নয়।... এটা উল্লেখযোগ্য যে চাষা কৈবর্তরা জেলে কৈবর্তদের থেকে পৃথক জাতের হলেও প্রায় সর্বদাই গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামে বাস করে, যদিও কখনই জেলে নয়।" "আদিতে গোপালক জাতের একটি শাখা হলেও বর্তমানে সদ্গোপরা সাধারণ চাষী মাত্র এবং কৃষকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। ডেপুটি কালেক্টর 'গোপ' নামে আর একটি জাতের উল্লেখ করেছেন যারা গোপালন ছেড়ে দিয়ে চাষী ও গৃহভৃত্যের পেশা নিয়েছে।" "জেলায় আর কোন মুসলিম পরিবার নেই (নবাব নাজিমের পরিবার ছাড়া) যার সঙ্গে প্রধান হিন্দু জমিদারদের পদমর্যাদা বা সম্পদের তুলনা চলে।" "ডেপুটি কালেক্টর জানাচ্ছেন যে ইসলাম ধর্ম জনগণের মধ্যে আর ছড়াচ্ছে না।... দরিদ্র কৃষকদের অনেকেই ফারাজি বা ওহাবি, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন প্রকার ধর্মান্ধতা নেই। ধর্মান্ধদের দেখা যদি কোথাও মেলে তা মিলবে মুসলমান সমাজের উচ্চতর স্তরগুলিতে।" মুসলমান সমাজের উচ্চতর স্তরগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এ-ধরণের মন্তব্যের হেতুও যে মুর্শিদাবাদে তাঁর কার্যকালের অভিজ্ঞতা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। হুগলী কলেজে ছাত্রাবস্থা থেকেই বাংলার উর্দু-ভাষী মুসলিমদের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় তা সুদৃঢ় হয়েছিল মুর্শিদাবাদের উর্দু-ভাষী নবাব পরিবারের সঙ্গে সরকারী কর্মচারী হিসাবে যোগাযোগের ফলে। তাঁর এই সকল অভিজ্ঞতা উর্দু-ভাষী মুসলমান দের সম্পর্কে যে বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল তা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করেছিল একদিকে ওহাবী আন্দোলনে মুর্শিদাবাদের অভিজাত মুসলিমদের ভূমিকা সম্পর্কে বিচারালয়ের রায় ও হান্টার সাহেবের রচনাদি থেকে এবং মুসলমান জীবনের সঙ্গে সরকারী কার্যোপলক্ষে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে। সত্য কথা বল্‌তে কি মুর্শিদাবাদের অভিজ্ঞতাই বঙ্কিমচন্দ্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা-ভাষী মুসলমানদের সঙ্গে সংখ্যালঘু উর্দু-ভাষী মুসলমানদের পার্থক্য এবং বিরোধ সম্পর্কে যেমন সচেতন করে তুলেছিল, সেইরকম সচেতন করে তুলেছিল এই সত্য সম্পর্কেও যে বাংলা-ভাষী বাঙালীদের অর্ধেকই মুসলমান। প্রায় একশো বছর পরে 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সর্ব-প্রথম বাঙালী বঙ্কিম আবিষ্কৃত বাঙালী মুসলমানের এই ভূমিকা তার ঐতিহাসিক পরিণতি লাভ করে।[৩৬]

বঙ্কিমচন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমি-বন্দোবস্ত সম্পর্কে যে প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন, তা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং মুর্শিদাবাদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে তা কত সঠিকভাবে তুলে ধরেছিল, তার বড় প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে এল এস এস ও'ম্যালি, আই সি এস রচিত 'মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' (পৃ. ৭৬ এবং ১৫৭-১৬৩)[৩৭] এবং ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে অশোক মিত্র আই সি এস. রচিত 'সেন্সাস হ্যান্ডবুক: মুর্শিদাবাদ" (পৃ. xxxviii—xl) [৩৮] গ্রন্থ দুটিতে মুর্শিদাবাদের ভূমি-বন্দোবস্ত সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ দুটির দিকে

দৃষ্টিপাত কবলে। হান্টাবেব বইযে অন্তর্ভুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রেব বিববণটি মোটামুটি অনুসবণ কবেই কিছু সংযোজন-সহ পববর্তী সমযেব অনুচ্ছেদ দুটি বচিত। মুর্শিদাবাদেব কৃষি-নির্ভব সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রেব তথ্যাবলী পববর্তী সর্বাধুনিক জেলা গেজেটিযাবও মুর্শিদাবাদেব এই বাস্তবতাকে তুলে ধবেছে।[৩৯]

বঙ্কিম-গবেষণায ডঃ বিমান বিহাবী মজুমদাব ও চিত্তবঞ্জন বন্দোপাধ্যায 'আনন্দমঠ'-এব উৎস-সন্ধান কবতে গিযে মহবাষ্ট্রেব বিপ্লবী বাসুদেব বলবন্ত ফড়কেব জীবন কাহিনীব প্রভাবেব কথা বলেছেন যদিও "এ বিষযে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।"[৪০]

'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধটিব উপব সবকাবী কর্মচাবী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রেব বুদ্ধি চর্চাব যে সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল, সে-কথা অনেক বেশী শক্ত জমিতে দাঁড়িযে বলা সম্ভব। তাঁব যে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও আর্থ সামাজিক তথ্য-সংগ্রহ তাঁব বচিত সবকাবী প্রতিবেদনটিতে বিধৃত্ত হযেছে, সেগুলিই যে সাধাবণীকৃত রূপ নিযে 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধে সাহিত্যিক উপস্থাপনাব মধ্যে দিযে জাযগা কবে নিয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয না প্রতিবেদনটিব উপবে উদ্ধৃত্ত অনুদিত অংশগুলিব সঙ্গে 'বঙ্গদেশেব কৃষক' বচনাটিব প্রথম ও দ্বিতীয অনুচ্ছেদ দুটিকে মিলিযে পড়লে। পাশাপাশি এই দুটি বচনাব সমান্তবাল রূপাযণেব অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটিও বুঝতে চেষ্টা কবা দবকাব। কেননা, যদি আমবা তা বুঝতে ব্যর্থ হই তাহলে বঙ্কিম-মানসেব সমকালীন গতি প্রকৃতিও আমাদেব বোধগম্য হবে না। **"বৈজ্ঞানিক প্রথা এই যে, বিশেষেব লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ কবিতে হয়"**[৪১]**— জ্ঞানার্জনেব আবোহী পদ্ধতিব এই মূল সূত্রটির অনুসবণেই যে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশেব একটি জেলা মুর্শিদাবাদেব কৃষক-জীবনের ভ নর্ভর বিশ্লেষণ থেকে বঙ্গদেশের কৃষকদের সমকালীন অবস্থাব 'সাধারণ লক্ষণ' নির্দেশ করেছিলেন আমাদেব তা মনে হয়েছে।** আমাদেব এই ধবণেব সিদ্ধান্তেব সমর্থক প্রমাণগুলি পেশ কবাব পূর্বে "বঙ্গদেশেব কৃষক" প্রবন্ধেব উপব প্রাসঙ্গিক আলোকপাত কবে এবকম দুটি উপেক্ষিত উৎস সম্পর্কে আলোচনা দবকাব।

## চার

কল্পিত চবিত্র পবাণ মন্ডলকে কেন্দ্র কবে বাংলাব কৃষকদেব উপব জমিদাবদেব বহুমুখী অত্যাচাবেব বেখাচিত্র এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু এই কল্পিত চিত্র পাঠকবর্গেব কাছে বিশ্বাসযোগ্য হযে উঠবে না সম্ভবত একথা ভেবেই তিনি সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে জমিদাবী অত্যাচাবেব একটি বাস্তব বিববণ তাঁব প্রবন্ধে তুলে দিযেছেন। তাঁব এই বিববণেব তথ্য সূত্রটিও নির্দেশ কবেছেন : ইন্ডিয়ান অবজার্ভাব, ৩১ শে আগষ্ট, ১৮৭২, পৃষ্ঠা-১৩১। ঐ তাবিখেব ইন্ডিয়ান অবজার্ভাব পত্রিকাব ১৩০-১৩২ পৃষ্ঠায 'মুফস্সিল জেমিন্দাবস' নামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব বিববণটি সংগ্রহ কবেছিলেন। বঙ্গদেশেব কৃষক-এব উক্ত অংশটিব সঙ্গে ইন্ডিযান অবজার্ভাবেব এই সংবাদটি তুলনা কবলে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপাব নজবে আসে : বঙ্গদেশেব কৃষক-এব মুখ্য প্রতিনিধি স্বরূপ কল্পনাপ্রসূত পবাণ মন্ডলেব সামাজিক চবিত্র থেকে আলোচ্য সংবাদটিব উৎস বাস্তব গ্রামটিব কৃষকদেব সমাজ-বিন্যাসেব ভিন্নতা। এই গ্রামটি হচ্ছে পূর্ববঙ্গেব কোন একটি জেলাব পাট্টাচোবা (Pattachora) গ্রাম— যেখানে বাবো থেকে পনেবোটি না-সম্পন্ন-না-দবিদ্র কৃষক পবিবাব এবং প্রায় সমসংখ্যক দবিদ্রতব

ভাগচাষী খেতমজুব পবিবাবেব বসতি। গ্রামেব জমিদাব অনাবাসী হিন্দু 'মহাশয' পবিবাবেব পাঁচ শবিক এবং গ্রামেব সংখ্যাগবিষ্ঠ কৃষক শেখ মুসলমান (কলকাতা জাতীয গ্রন্থাগাবেব সংবাদপত্র শাখায বক্ষিত ইন্ডিযান অবজার্ভাব পত্রিকাব উক্ত সংখ্যাব অর্ধ ছিন্ন অংশটিতে ভোলাই শেখ, ছোটা বাউল শেখ, নওদা বাউল শেখ, কলম শেখ, কপিন শেখ, বোলাই শেখ, বাদশা শেখ ও একাবব শেখ— এই আটজনেব নাম পাওযা যায।) বন্যায ভাসমান যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন এই গ্রামেই জমিদাবেব গোমস্তা পেযাদাবা সেপ্টেম্বব মাসে প্রধানত আসন্ন পূজাব পার্বনি ও জমিদাবেব মেযেব বিযেব খবচেব জন্য দু'দফায চুযান্ন টাকা দু'আনা ও চল্লিশ টাকা আদায কবতে হাজিব হয, ঠিক যখন বন্যায গ্রামেব সব পাকা ধানই নষ্ট হযে গেছে এবং চাষীদেব গক-ছাগলও ঠান্ডায ও অনাহাবে মাবা যাচ্ছে। আলোচ্য উদাহবণটিতে আর্থিক শোষণেব সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সামাজিক-ধর্মীয শোষণেব যে পবিচয ধবা পড়েছে, মুসলমান কৃষকদেব উপব হিন্দু জমিদাবেব পুজোব খবচ ও মেযেব বিযেব খবচ আদাযেব যে হিসাব-নিকাশ মিলেছে, তা-ও আবাব চবম আর্থিক দুববস্থাব মধ্যে, তা কোনভাবেই কল্পিত চবিত্র পবাণ মন্ডলেব বাবমাস্যাব মধ্যে প্রতিফলিত হযনি।[৪২] বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধেব প্রথম অধ্যাযে বঙ্কিমচন্দ্র কাল্পনিক চবিত্র হাসিম শেখ ও বামা কৈবর্তকে হাজিব কবেছিলেন; এই দুই চবিত্রকে তিনি বাংলাব হিন্দু ও মুসলমান কৃষকেব প্রতিনিধি হিসাবে আবো গুরুত্ব দিযে ও বিস্তাবিতভাবে আঁকতে পাবতেন। কিন্তু প্রবন্ধটিব দ্বিতীয অধ্যাযে তা না কবে তিনি নতুন একটি কাল্পনিক চবিত্র পবাণ মন্ডলকে আমদানী কবলেন। শুধু তাই নয, সাবা বৎসবে পবাণ মন্ডল কীভাবে জমিদাবী অত্যাচাবেব শিকাব হযে শেষ পর্যন্ত "যদি জমি বেচিযা দিতে পাবিল, তবে দিল, নচেৎ জেলে গেলে, অথবা দেশত্যাগ কবিযা পলাযন কবিল",[৪৩] এই চূড়ান্ত পবিণতিব প্রতিটি পর্বকে তুলনাহীন মিতভাষণেব মধ্যে দিযে আমাদেব চোখেব সামনে জীবন্ত কবে তুলেছিলেন। যখন এই পবাণ মন্ডলেব কাহিনীকে বাস্তবতাদানেব জন্য তিনি 'ইন্ডিযান অবজার্ভাব'-এব সূত্র উল্লেখ কবেছেন, তখন শেখ-মুসলমান-প্রধান পাট্টাচোবা গ্রামে জমিদাবী অত্যাচাবেব সেই বাস্তব-ঘটনাব কাহিনী রূপে কৃষক চবিত্রেব প্রতিনিধি হিসাবে সামাজিক বাস্তবতাব অনুসবণে একজন শেখ মুসলমানকে বেছে নেওযাই কি যুক্তি সঙ্গত ছিল না? বিশেষত, প্রবন্ধেব প্রযোজনেই যখন চবিত্র আমদানী কবতে হযেছে? প্রথম অধ্যাযেব হাসিম শেখই তো এই ভূমিকা পালন কবতে পাবতো, নতুন কবে পবাণ মন্ডলকে আমদানী কবাব প্রযোজন কেন হলো?

অন্য আব এক দিক থেকে বিচাব কবে দেখলেও এই একই প্রশ্ন আমাদেব সামনে এসে দাঁড়ায। কোনো একটি বিশেষ গ্রামেব বাস্তবতাব ভিত্তিতে সমগ্র বঙ্গদেশেব কৃষকদেব প্রতিনিধিস্থানীয় কোনও চবিত্রকে বাছাই কবা সম্ভব বা উচিত কি? উচিত অবশ্যই নয় যদি দেখা যায় যে বাংলাব কৃষকেব সমাজ-বিন্যাসেব সামগ্রিক রূপ থেকে ভিন্নতব কোন সমাজ-বিন্যাস গ্রামটিব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে-পাট্টাচোবা গ্রামেব জমিদাবী অত্যাচাবেব উদাহবণ তাঁব প্রবন্ধে ব্যবহাব কবেছেন, তা যে মুসলমান-কৃষক-প্রধান অথচ মূলত হিন্দু জমিদাবেব অধীন প্রায় সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী তৎকালীন ভূমি ব্যবস্থাব এক প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রাম (representative village) এ-বিষয়ে কি সন্দেহেব অবকাশ আছে? বলা হতে পাবে যে বাংলাব কৃষক-সমাজেব ও ভূমি-ব্যবস্থাব সামগ্রিক সামাজিক বিন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রেব হয়তো সে-সময়ে কোনও ধাবণা ছিল না, সেইজন্যই তিনি পাট্টাচোবাব গ্রামেব উদাহবণকে

প্রতিনিধি-স্থানীয বলে গ্রহণ কবতে পাবেননি। কিন্তু এ-সম্পর্কিত তথ্যাবলীব আলোকে এই বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য নয। বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধেব চতুর্থ অধ্যাযটি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওযাব পবেব মাসেই (চৈত্র, ১২৭৯) উক্ত পত্রিকাতেই প্রকাশিত 'বঙ্গদেশেব লোকসংখ্যা' প্রবন্ধে প্রমাণ থেকে গেছে যে বাংলাদেশেব কৃষকদেব সামাজিক বিন্যাস সম্পর্কে তথ্য-নির্ভব বস্তুনিষ্ঠ ধাবণা 'বঙ্গদেশেব কৃষক' বচনাব অন্তত শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্রেব অবশ্যই ছিল।[৪৪]

আমাদেব অনুমান, এই প্রবন্ধটি স্বযং বঙ্কিমচন্দ্রেব বচনা এবং জনগণনাব কাজ সম্পর্কে তাঁব আগ্রহেব পবিচযবাহী। বঙ্কিমচন্দ্রেব লেখা থেকেই জানা যায যে তাঁব অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র বাবাসাতে স্পেশাল সাব-বেজিস্ট্রাব থাকাকালে সেখানে প্রথম জনগণনা পবিচালনাব দাযিত্ব পালন কবেছিলেন।[৪৫] তিনি আলোচ্য প্রবন্ধটিব লেখক হতে পাবতেন। কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্রেব বচনা-সংগ্রহ 'সঞ্জীবনীসুধা'-তে প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত না হওযায এ ধবনেব সিদ্ধান্ত কবা যায় না। বঙ্কিম মন্ডলীতে এ ধবনেব একটি প্রবন্ধ বচনাব উপযুক্ত অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য সঞ্জীবচন্দ্র ছাড়া সম্ভবত একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রেব নিজেবই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে কোথাও লিখে যাননি যে জনগণনাব কাজে তিনি কখনও গুরুত্বপূর্ণ দাযিত্ব পালন কবেছিলেন ; কিন্তু আমবা দেখেছি যে মুর্শিদাবাদ জেলায প্রথম জনগণনাব কাজ মুখ্যত তিনিই সম্পাদন কবেছিলেন।[৪৬] একথা অনুমান কবা অসংগত হবে না যে বঙ্কিমচন্দ্রেব দ্বাবা জনগণনাব এই দাযিত্ব পালন বঙ্গীয সমাজবিজ্ঞান সভাব সঙ্গে ১৮৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দে দুটি বক্তৃতা সূত্রে তাঁব যোগাযোগেব পবোক্ষ ফলশ্রুতি। এ ধবনেব অনুমানেব কাবণ হচ্ছে এই যে উক্ত সভাব অন্যতম সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রেব পবিচিত বাজকর্মচাবী এইচ বিভার্লি সাহেবই উক্ত সভায 'ইউটিলিটি অব সেন্সাস' নামে একটি বিখ্যাত নিবন্ধ পাঠ কবেছিলেন এবং বাংলাব জনগণনাব প্রথম কমিশনাব হযেছিলেন। এছাড়া-ও জনগণনা সম্পর্কে জনমনেব সন্দেহ ও বিরূপতা দূবীকবণে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দব পব থেকে যিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন সেই নবাব আব্দুল লতিফ খান বাহাদুবও ছিলেন ঐ সমযে উক্ত সভাবই কার্যকাবী সমিতিব সদস্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রেব সুপবিচিত।[৪৭] এই সকল যোগাযোগ যে জনগণনাব কাজে বঙ্কিমচন্দ্রেব মনে বিশেষ আগ্রহেব সৃষ্টি কবে থাকবে এটাই ছিল স্বাভাবিক। আমাদেব মনে হয বঙ্কিমচন্দ্রেব এই আগ্রহেব ফলেই আলোচ্য 'বঙ্গদেশেব লোকসংখ্যা' প্রবন্ধটিব বচনা।

অন্যদিকে, লেখাটিব মধ্যেই প্রমাণ থেকে গেছে যে এটি বঙ্কিমচন্দ্রেবই বচিত। পৌষ, ১২৮০ সালেব বঙ্গদর্শনে মীব মোশাবফ হুসেনেব 'গোবাই ব্রিজ অথবা গৌবী সেতু' কাব্যটিব সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব সেই বহু উল্লিখিত উক্তিটি, "বাঙ্গালা, হিন্দু মুসলমানেব দেশ— একা হিন্দুব দেশ নহে" সঙ্গতভাবেই সুপবিচিত।[৪৮] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রেব এই উক্তি যে ভাবাবেগপ্রসূত কোন মন্তব্য নয়, এটি যে একটি তথ্য-নির্ভব, জনগণনাব ফলাফল-নির্ভব সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্ত যে এই উক্তিটি কবাবও বৎসব খানেক পূর্বেই তিনি কবেছিলেন, তাব প্রমাণ বৎসবখানেক পূর্বে প্রকাশিত আলোচ্য 'বঙ্গদেশেব লোকসংখ্যা' প্রবন্ধটিব নীচেব অংশটিতেই থেকে গেছে : "অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিজ বাঙ্গালায হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমান। মুসলমান অপেক্ষা পাঁচ লক্ষ মাত্র অধিক হিন্দু আছে। তবে হিন্দুদিগেব প্রাধান্য এই যে, মুসলমানেবা প্রায় কৃষক, এবং সামান্য শ্রেণীব লোক। ভদ্রলোক অধিকাংশই হিন্দু, কিন্তু তাই বলিয়া এই বঙ্গদেশকে কেবল হিন্দুব দেশ বলা যায না। যেমন ইহা হিন্দুব দেশ, সেইরূপই ইহা মুসলমানেব দেশ।"[৪৯] কিন্তু আমাদেব অনুমান সঠিক হলেও এবং 'বঙ্গদেশেব লোকসংখ্যা' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রেব বচিত হলেও বাংলাদেশকে সমানভাবে হিন্দু ও মুসলমানেব দেশ মনে কবাব ব্যাপাবটি যে

একান্তভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ভাবনা, অনুভূতি বা মৌলিকতার নির্দেশক নয় এ-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ কম। আমরা ইতিপূর্বেই বঙ্কিম-প্রদত্ত তথ্যসূত্র অনুসারে 'ইন্ডিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সেই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যাই উপরোক্ত উক্তি তথা আলোচ্য প্রবন্ধটির বেশ কিছু মালমশলা বঙ্কিমচন্দ্রকে জুগিয়েছিল। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের 'ইন্ডিয়ান অবজার্ভার'-এ প্রকাশিত 'দি পপুলেশন অব্ বেঙ্গল' (পৃ. ১৪৫) নিবন্ধটি এবং ৫ ই অক্টোবর ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত 'অকেশনাল নোট্‌স্' (পৃ. ২০৫) ও 'অফিসিয়াল রেকর্ডস (পপুলেশন অব বেঙ্গল)' অনুচ্ছেদ দুটির সঙ্গে আলোচ্য প্রবন্ধটির তুলনা করলে তা বোঝা যায়। বাংলাদেশ সমানভাবে হিন্দু ও মুসলমানের দেশ এই মন্তব্যটিও উপরোক্ত 'অকেশনাল নোট্‌স'-এর ভিত্তিতেই করা হয়েছিল। বাংলাদেশের জনসংখ্যায় হিন্দু মুসলমানের অনুপাত সম্পর্কে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের জনগণনা নতুন আলোকপাত করে। ঐ সময়ের পূর্বে এরকম ধারণা প্রচলিত ছিল যে হিন্দুরাই বাংলাদেশে সুনিশ্চিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। জনগণনার ফলে দেখা গেল বাংলার জনসংখ্যায় হিন্দু মুসলমান প্রায় সমান সমান। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'ইন্ডিয়ান অবজার্ভার'-এ মন্তব্য করা হয়েছিল : "If Western Bengal and Behar are peculiarly Hindoo, the populous districts of the Delta and Eastern Bengal are as peculiarly Muhammadan" এই মন্তব্যের ভিত্তিতেই বাংলার মুসলমানদেরও বাংলার হিন্দুদের মত সমানভাবেই দেশের অধিবাসী বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছিলেন এমন অনুমান করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্বীকৃতি মুসলিমদের সম্পর্কে তাঁর মনোভাবে এক নতুন ইতিবাচক মাত্রা যোগ করলেও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে এই মনোভাবের উপযুক্ত প্রতিফলন আমরা দেখিনা।

দেখা যাচ্ছে যে খুব বাস্তব সম্মতভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের জানা ছিল যে বাংলার জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ মুসলমানেরা প্রধানতই 'কৃষক এবং সামান্য শ্রেণীর লোক'। সুতরাং বাংলার কৃষকের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন কৃষককে বেছে নিতে হলে সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বাগ্রে সে কৃষক সুনিশ্চিতভাবেই হওয়ার কথা ছিল বাংলার একজন মুসলমান কৃষক। এরকম একজনকে— হাসিম শেখকে— প্রবন্ধের মধ্যে আনলেও কৃষক-প্রতিনিধির মুখ্য ভূমিকা তাকে না দিয়ে দেওয়া হলো পরাণ মন্ডলকে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন ওঠে, বঙ্কিমচন্দ্র এরকমটা কেন করলেন ? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলির পর্যালোচনা ও সঠিক মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু তার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা প্রয়োজন।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে আমরা এতাবৎ উপেক্ষিত 'ইন্ডিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকাটির প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করেছি। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হলে 'অবজার্ভার'-এ যে মন্তব্য করা হয় তাতে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটিরই বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায় (১৬ ই নভেম্বর, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ ; পৃ. ৩০২)। এই আলোচনার এক জায়গায় প্রবন্ধটি সম্পর্কে বলা হয়েছে : "Here it endorses much that has appeared in the columns of the Indian Observer" স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শন', চৈত্র ১২৮২, সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "ইংরেজরা বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না ; কিন্তু এক্ষণে গতাসু ইন্ডিয়ান অবজার্ভার বঙ্গদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজার্ভার ও ইন্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম একপ আর কোন ইংরেজী পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই।" ইন্ডিয়ান অবজার্ভার সাপ্তাহিক পত্রিকাটি ফেব্রুয়ারী

১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ও ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে লুপ্ত হয়। পত্রিকাটি সিভিল সার্ভিস, আর্মি ও আনকাভিনান্টেড সার্ভিসের মুখপত্র হিসাবে কাজ করত এবং এর আপোষহীন সুর ও পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষা বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[৪৯ক] বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজনে ইন্ডিয়ান অবজার্ভার পত্রিকার জীর্ণ ছিন্ন খন্ডিত সংখ্যাগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে প্রবন্ধকারের মনে হয়েছে যে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনার উপর উক্ত পত্রিকার গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল এবং এ-বিষয়ে বঙ্কিম গবেষকদের সত্বর সবিশেষ মনোযোগী হওয়া একান্তভাবে দরকার, কেননা, পত্রিকার পুরানো সংখ্যাগুলিই চিরতরে লোপ পেতে বসেছে।

## পাঁচ

কেন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের কৃষক-সাধারণের প্রতিনিধি রূপে হাসিম শেখকে তাঁর প্রবন্ধের কেন্দ্রস্থ চরিত্র হিসাবে গড়ে তুললেন না— এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কেউ কেউ মনে করছেন, বাংলার মুসলিম-প্রধান জেলাগুলির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় বা যোগাযোগ না থাকাই এর কারণ।[৫০] বঙ্কিমচন্দ্র বৃটিশ আমলের পুরোনো বাঙ্গালা প্রদেশের তেরটি জেলায় সরকারী চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই উপলক্ষ্যেই উক্ত জেলাগুলিতে ঘোরাফেরা করেছিলেন। জেলাগুলি ছিল হিন্দুপ্রধান। ফলে হিন্দু-প্রধান জেলাগুলির হিন্দু-প্রধান মফঃস্বল শহরগুলিতে কর্মরত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে প্রধানত হিন্দু ভদ্রলোক এবং কিছুটা হিন্দু কৃষকদেরই ভালভাবে জানা সম্ভব হয়েছিল। এইজন্যই তিনি দরিদ্র অত্যাচারিত বাংলার কৃষকের প্রতিনিধি হিসাবে পরাণ মন্ডলকেই এঁকেছেন— হাসিম শেখকে নয়। যদিও তাঁর সমকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই যে ছিল মুসলিম তা তিনি জানতেন। এই যুক্তি মানতে হলে কেন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে পরাণ মন্ডল ছাড়াও হাসিম শেখ এবং রামা কৈবর্ত এই দুটি চরিত্রের অবতারণ করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমাদের মনে হয়েছে যে মুর্শিদাবাদের কৃষকজীবনের আদলে সারা বাংলাদেশের কৃষক জীবনের ছবি আঁকতে গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর প্রবন্ধে তিনটি চরিত্রের আমদানী করতে হয়েছিল। আর এর ফলেই বাংলার কৃষকের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে প্রধানত হাসিম শেখের উপস্থাপন সম্ভব হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে সমগ্রভাবে বাংলার কৃষকদের সামাজিক বিন্যাস ও মুর্শিদাবাদের কৃষকদের সামাজিক বিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল— বাংলার কৃষকদের মধ্যে মুসলিম কৃষকদের ছিল সংখ্যার ও গুরুত্বের আধিক্য, অথচ, তুলনায় মুর্শিদাবাদে মুসলিম কৃষকদের পাশাপাশি হিন্দু কৈবর্ত ও সদগোপ কৃষকদের ভূমিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেকখানি বেশীই ছিল।[৫১] ফলে তাঁর প্রবন্ধে রামা কৈবর্ত ও পরাণ মন্ডলকে তিনি যতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন হাসিম শেখকে তা দেননি— অথচ সামাজিক দিক দিয়ে সারা বাংলার কৃষকের প্রতিনিধিত্বের দাবী হাসিম শেখেরই ছিল অন্য দু'জনের চাইতে বেশী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীকে কোনো কোনো সমালোচক অন্যভাবে বিচার করেছেন। সারোয়ার জাহান লিখেছেন, "হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা নিগৃহীত বিত্তহীন প্রজাশ্রেণীর দুই প্রতিনিধি হিসাবেই দেখেছেন।" ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন, "পরাণ মন্ডল বা রামা কৈবর্তের জন্য বঙ্কিমের যতটুকু দরদ, হাসিম শেখের জন্যও ততটুকু। এখানে কোন হিন্দু-মুসলমান ভেদ নাই।" শ্রদ্ধেয়

সমালোচকদের এই মূল্যায়ন স্বীকার করে নিয়েও দেখা যাচ্ছে যে বাংলার কৃষকের যোগ্য ও যথাযথ প্রতিনিধি হিসাবে হাসিম শেখ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তার উপযুক্ত স্বীকৃতি অথবা গুরুত্ব পায়নি, সহানুভূতি বা দরদ যথেষ্ট পেলেও। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে হাসিম শেখকে শুধু যে তার যথাযোগ্য গুরুত্বই দেন নি তাই নয়; তার প্রতি বিরূপ ও প্রতিকূল মনোভাবের প্রমাণও রেখেছেন এই উক্তির মধ্যে, "রামা কৈবর্তের জমিটুকু ভাল সে এক টাকা হারে খাজনা দেয়। হাসিম শেখ সেই জমি চায়— সে দেড় টাকা হার স্বীকার করিতেছে। জমিদার রামাকে উঠিতে বলিলেন।"[৫২] সম্ভবত ওই উক্তিটি প্রসঙ্গেই বাংলাদেশের এক প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছেন, "জমিদার ও কৃষকের দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্পষ্ট করে দেবার জন্য হিন্দু মুসলমানের দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার অবশ্যই সুবিধাজনক ছিল। সে কাজ করা হয়েছে, পরাণ মন্ডল ও হাসিম শেখকে শত্রু করে তোলা হয়েছে পরস্পরের।"[৫৩] কিন্তু এই ধরনের মন্তব্য সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর অতি-সরলীকরণই ঘটায়। এ-ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর জটিলতা বোঝা যায় একথা স্মরণে রাখলে যে মুর্শিদাবাদের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত তাঁর প্রতিবেদনে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক সম্মানের লোভে কীভাবে হিন্দু কৃষকেরা নিস্কর্মায় পরিণত হচ্ছে এবং কর্মঠ মুসলিম কৃষকদের হাতে অর্থনীতির সাধারণ নিয়মে জমি চলে যাচ্ছে তার কথা বলেছেন।[৫৪] বঙ্গদেশের কৃষকে এটাই যেন রামা কৈবর্তের ভাল জমির প্রতি হাসিম শেখের লোভের রূপ নিয়েছে— সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রবণতা দুই প্রতিনিধি-চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের ইংগিতবহ হয়ে উঠেছে, অথবা, চরিত্র দুটিকে এই বিরোধের ইংগিতবহ করে তোলা হয়েছে। মোটকথা, মুর্শিদাবাদের কৃষকদের বঙ্গদেশের কৃষকদের প্রতিনিধি-স্থানীয় ধরে নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ফলেই এই বিপত্তি দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই ধরনের ব্যাখ্যার সাহায্যে ও কি আমরা যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজছি তার সন্তোষজনক উত্তরটি পাচ্ছি? হাসিম শেখের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবে কি মুসলিমদের সম্পর্কে তাঁর অসচেতন মানসিক প্রবণতাও প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, না, তাঁর সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলশ্রুতি এই? এই জিজ্ঞাসার জবাব পেতে হলে অবশ্যই আমাদের বঙ্গদেশের কৃষক রচনার সমকালে মুসলিমদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর বিতর্কিত সমস্যাটির প্রসঙ্গে আরো গভীরভাবে যেতেই হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ সাহিত্য-জীবনের বিবর্তনকে কয়েকটি সুস্পষ্ট পর্বে ভাগ করা যায় এবং এই পর্বগুলির প্রত্যেকটিরই কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যগুলি ও দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়নের সময়ে তাঁর সাহিত্য জীবনের এই সকল বিভিন্ন পর্বে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী বা মন্তব্যগুলি ঠিক কী ধরনের নির্দিষ্ট রূপ নিয়েছিল তা প্রতিটি পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহের পরিপ্রেক্ষিতেই যাচাই করে দেখা দরকার। কেননা, এসম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব সকল পর্বেই একরকম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের এই পর্বগুলির সময়সীমা সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যে মতপার্থক্য বর্তমান। আমরা এইভাবে পর্বগুলির সময়সীমা নির্ধারণ করেছি: ১৮৬৩-১৮৬৯, ১৮৬৯-১৮৭৫, ১৮৭৫-১৮৮০ এবং ১৮৮০-১৮৯৪।[৫৫]

**তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্ব (১৮৬৩-১৮৬৯) টি সৃজনশীল কথা সাহিত্যিক অর্থাৎ ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স-রচয়িতা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশের কাল।** এসময়ে তাঁর মানসিক বাতাবরণ সম্পর্কে যে পরোক্ষ সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় যে তখন তাঁর জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাব ছিল এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নির্ভর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

প্রয়োগে তিনি আগ্রহী ছিলেন। এই পর্বে প্রাবন্ধিক চিন্তানায়ক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রেব কোনো পবিচয় নেই; সুতবাং মুসলিম-প্রসঙ্গে তাঁব সচেতন সবাসবি সুসংবদ্ধ চিন্তা ভাবনাব পবিচয়ও আমবা এসময়ে পাইনা। কিন্তু তাঁব বচিত Raj Mohan's Wife দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী এই চাবটি কথা কাহিনীব বর্ণনাংশ ও মুসলিম চবিত্রগুলিব চিত্রণেব মধ্যে মুসলিম-প্রসঙ্গে এবং বাংলাব ইতিহাসে মুসলিমদেব ভূমিকা বিষযে বঙ্কিমচন্দ্রেব মনোভাবেব পবোক্ষ পবিচয মেলে। যদিও এই সকল কথা কাহিনীতে মুসলিম সমাজেব উচ্চবর্গেব মানুষদেবই পাত্রপাত্রী হিসাবে দেখা যায, তাহলেও তাদেব সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রেব বিরূপ মনোভাবেব পাশাপাশি জোবালো ইতিবাচক মনোভাবেব পবিচযও এখানে পাওযা যাচ্ছে; কিন্তু বাংলাব ইতিহাসে মুসলিমদেব ভূমিকা সম্পর্কে যে সকল ইংগিত এই লেখাগুলিতে থেকে গেছে তা যে কিছুটা নেতিবাচক এ-বিষযেও সন্দেহ নেই। মুসলিম-প্রসঙ্গে ইংবেজ আমলে প্রধানত ইংবেজদেব দ্বাবা গড়ে তোলা ইতিহাস-চর্চাব নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীব পবোক্ষ প্রভাব এই পর্ব থেকেই বঙ্কিম মানসে লক্ষ্যনীয হযে উঠতে থাকে। তাঁব সাহিত্য জীবনেব পববর্তী পর্বে তাঁব মানসিকতাব এই ধাবাটিই সুস্পষ্ট সচেতনতা ও পবিপুষ্টতা লাভ কবে "ভাবত কলঙ্ক" প্রবন্ধে।[৫৬]

**বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যজীবনে দ্বিতীয় পর্বটি (১৮৬৯-১৮৭৫) ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ**। এই পর্ব সম্পর্কেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ও সজনীকান্ত দাস মন্তব্য কবেছেন, "বঙ্কিম-জীবনেব বহবমপুবেব এই কযেক বৎসব বাংলা সাহিত্যেব স্বর্ণযুগ।"[৫৭] এই পর্বেই কথা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছুটা আড়াল কবে দিযে ও বদলে দিযে প্রকাশ ঘটেছিল বহুমুখী চিন্তানাযক, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রেব। একদিকে চাকবী সূত্রে বাস্তব অবস্থাব অভিজ্ঞতাব প্রভাব এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যেব জীবনমুখী ও প্রগতিশীল দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজবিজ্ঞানেব প্রভাব বিপুল পবিমাণে ও গভীব ভাবে তাঁব চিন্তা-চেতনাকে এসময়ে প্রভাবিত কবেছিল। তাছাড়াও একালে যাঁদেব ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন তাঁদেব প্রায প্রত্যেকেই ছিলেন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক। এসবেব ফলে এই কালে বঙ্কিমচন্দ্রেব যে ভাবমূর্তি প্রকাশ পেযেছিল তা ছিল প্রায-নাস্তিক, বিজ্ঞান-সচেতন, সাম্যবাদী, ব্যক্তি স্বাধীনতায বিশ্বাসী, সমাজ-বাস্তবতাব অনুসন্ধানী, জন স্টুয়ার্ট মিলেব শিষ্য বাংলাভাষাব সব্যসাচী লেখক এক প্রগতিশীল চিন্তাবিদেব। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রেব সাহিত্য জীবনেব পববর্তী কালেব ইতিহাস ছিল এই ভাবমূর্তি থেকেই ক্রমশ পিছু হঠাব ইতিহাস। যে বাস্তবতা-বোধ এবং সমতা স্বাধীনতা উদাবতাব স্পর্শ তাঁব এই দ্বিতীয পর্বেব বচনাবলীতে সহজেই নজবে পড়ে, স্বভাবতই মুসলিম-প্রসঙ্গেও তাব পবিচয অনেক বেশী স্পষ্টভাবে এবং অনেকখানি জাযগা জুড়ে অবশ্যই আছে এবং **বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের আর কোনো পর্বেই মুসলিমদের প্রসঙ্গে তাঁর এতোখানি উদার ও ইতিবাচক অবস্থান উপন্যাস এবং প্রবন্ধাদিতে খুঁজে পাওয়া যায় না।**[৫৮] কিন্তু এবই পাশাপাশি আবাব মুসলিম প্রসঙ্গে এই পর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রেব সচেতন, নেতিবাচক, বিরূপ ও কথাসাহিত্য-বহির্ভূত চিন্তাভাবনাব পবিচযও আমবা পাচ্ছি।

আলোচ্য পর্বে মুসলিম-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব ইতিবাচক ও নেতিবাচক মনোভাবেব যে দ্বন্দ্ব, তাব উৎস আমবা খুঁজে পাব ভাবতে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁব বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটিব মধ্যে। ১৮৫৭ সালেব ভাবতীয় মহাবিদ্রোহেব পবেব দশ বছবে ভাবতে জাতীযতাবাদী-চেতনা অতি দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে। ইংবেজ-শাসনেব অধীনে বাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ ভাবতে একদিকে

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থাব অভূতপূর্ব বিকাশ ও বিশ্ববিদ্যালয-স্তব পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষাব প্রসাব এবং অন্যদিকে মহাবিদ্রোহেব ফলে সৃষ্ট ঐক্য-চেতনা ও বিদেশী-বিবোধিতাব ঐতিহ্য—এই দুটি কাবণেই জাতীযতাবাদী-চেতনা এত দ্রুত ছড়িযে পড়েছিল।[৫৯] অতীতেব জন্য গৌবববোধ এবং এক নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাব আকাঙ্খা ছিল এই চেতনাব অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই ভাবতেব এই জাতীযতাবাদেব অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্টত প্রকাশ পেতে থাকে; এক এক জন চিন্তাবিদ জাতীযতাবাদেব স্বৰূপ উপলব্ধি কবতে থাকেন এক এক ভাবে। এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রেব উপলব্ধিতেও জাতীযতাবাদেব স্বৰূপ এক বিশিষ্ট চেহাবা নিযেছিল।

জাতীযতাবাদ-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রেব চিন্তাধাবাব দুটি দিক ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি জাতীযতাবাদেব স্বৰূপ সম্পর্কিত এবং অন্যটি জাতীযতাবাদেব সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কিত। জাতীযতাবাদেব স্বৰূপ বা জাতিসত্তা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রেব যে ধাবণা গড়ে উঠেছিল, তাতে এই সত্তা ছিল একটি জনগোষ্ঠীব কিছু বাহ্য বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক আত্ম-স্বার্থ-সাধক ও আত্মোন্নতি-পবাযণ আগ্রাসী ৰূপ। একটি জনগোষ্ঠীব অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তি যখন নিজ নিজ ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিযে গোষ্ঠী-চেতনায উদ্বুদ্ধ হয এবং এব ফলে গোষ্ঠীটি যখন 'এক পবামর্শী, এক মতাবলম্বী' হযে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন কবতে থাকে, তখন জাতিপ্রতিষ্ঠাব প্রথম ভাগ সম্পন্ন হয। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত অনেক জাতি পৃথিবীতে আছে। এই বকম প্রতিটি জাতিব স্বার্থ পবস্পব-বিবোধী; ফলে এক জাতিব সদস্যদেব মঙ্গলে অন্য জাতিব সদস্যদেব মঙ্গল হওযা সম্ভব নয। "অনেক স্থানে তাহাদেব মঙ্গলে আমাদেব অমঙ্গল। যেখানে তাহাদেব মঙ্গলে আমাদেব অমঙ্গল, সেখানে তাহাদেব মঙ্গল যাহাতে না হয, আমবা তাহাই কবিব। ইহাতে পবজাতি-পীডন কবিতে হয, কবিব। অপিচ, যেমন তাহাদেব মঙ্গলে আমাদেব অমঙ্গল ঘটিতে পাবে তেমনি আমাদেব মঙ্গলে তাহাদেব অমঙ্গল হইতে পাবে। হয হউক, আমবা সেজন্য আত্মজাতিব মঙ্গল সাধনে বিবত হইব না; পবজাতিব অমঙ্গল সাধন কবিযা আত্মমঙ্গল সাধিতে হয, তাহাও কবিব। জাতি-প্রতিষ্ঠাব এই দ্বিতীয ভাগ।"[৬০]

জাতি-সত্তাব আগ্রাসী স্বৰূপ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রেব এইবকম ধাবণা জাতি-সত্তাব সামাজিক ভিত্তি ভাষা, না ধর্ম, এবিষযে তাঁব দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থানেব সঙ্গে যুক্ত হওযাব ফলে বঙ্কিমচন্দ্রেব জাতীযতাবাদী-চেতনা তাব বিশেষ ৰূপটি লাভ কবেছিল। জাতি-স্রষ্টা জনগোষ্ঠী ভাষা-ভিত্তিক একথা স্বীকাব কবলে ভাবতবাসী নানা ভাষাভাষী পবস্পব-বিবোধী অনেক ক'টি জাতিতে ভাগ হযে পড়ে; আবাব এই জনগোষ্ঠী ধর্ম-ভিত্তিক একথা স্বীকাব কবলেও ভাবতবাসী নানা ধর্মাবলম্বী পবস্পব-বিবোধী অনেক ক'টি জাতিতে পবিণত হয। এই কাবণেই জাতি-সত্তাব ভাষা-ভিত্তিব স্বীকৃতি বঙ্কিমচন্দ্রকে কখনও কবে তুলেছে বাঙালী জাতীযতাবাদেব প্রবক্তা, আবাব জাতি-সত্তাব ধর্ম-ভিত্তিব স্বীকৃতিব ফলে কখনও তিনি হযে উঠেছেন হিন্দু জাতীযতাবাদী। বঙ্কিম যখন বাঙালী জাতীযতাবাদী তখন মুসলিমদেব সম্পর্কে তাঁব দৃষ্টিভঙ্গী ইতিবাচক, তিনি যখন হিন্দু জাতীযতাবাদী তখন মুসলিমদেব সম্পর্কে তাঁব অবস্থান সুনিশ্চিতভাবে নেতিবাচক ও বিবোধিতা-মূলক।

আলোচ্যপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রেব চিন্তাভাবনায় বাঙালী জাতীয়তাব ধাবণাটি ক্রমশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠাব পরিপ্রেক্ষিতেই মুসলিম প্রসঙ্গে তাঁব ইতিবাচক অবস্থান বা মন্তব্যগুলিকে আমবা বুঝতে পাবি। যোগেশচন্দ্র বাগল সঠিকভাবেই এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙালী-চেতনাব বিকাশেব ব্যাপারটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন।[৬১] বাঙালী সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে

তাঁর ক্রমবর্ধমান এই আগ্রহই মুসলিম-প্রসঙ্গে উদার ও সহানুভূতিশীল অবস্থান গ্রহণের অনেক উপাদানের প্রতি সুনিশ্চিতভাবে তাঁব দৃষ্টি আর্কষণ করেছিল। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সভায় বাঙালী হিন্দুদের উৎসব সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তার পরদিনই ঐ সভাতে রেভারেন্ড জেম্‌স্ লঙ বাংলার মুসলিমদেব সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে অবিলম্বে দুটি রচনাই প্রকাশিত হয়েছিল।[৬২] ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যখন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টাবের শুরু করা পরিসংখ্যানগত সমীক্ষার কাজের সঙ্গে সবকারী কর্মচারী হিসাবে যুক্ত হয়েছেন, তখনই প্রকাশিত হয় হান্টার সাহেবের বিখ্যাত বই "দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স্।"[৬৩]

এ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র যখন একদিকে মুর্শিদাবাদের ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণনা কেন্দ্রিক তাঁব বস্তুনিষ্ঠ ধারণা গড়ে তুলছেন এবং অন্যদিকে 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রকাশ করে চলেছেন, সেই সময়ে 'ইন্ডিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকায় ২বা নভেম্বর, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'দি মুসলমান্‌স্ অব্ দি ডেল্টা' (পৃঃ ২৭৫-২৭৬) নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে হান্টার সাহেবের উপবোক্ত বইটিতে বাংলার মুসলমানদের উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং হিন্দু বিবোধিতা সম্পর্কে যে সকল বক্তব্য রাখা হয়েছিল সেগুলিকে যুক্তিতথ্য দিয়ে খন্ডন করা হয় এবং বাংলা ভাষা-ভাষী হিন্দু মুসলমানেব সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাস্তবতাকে তুলে ধবা হয়। এই তিনটি রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব সুনিশ্চিত পরিচয় তাঁর চিন্তাভাবনাব উপব ছায়া ফেলেছিল বিশেষভাবে, অল্পকাল পবে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাব হিন্দু-মুসলমান পবস্পবের সঙ্গে সহৃদয়তা শূন্য বলে যে মত প্রকাশ কবেছিলেন তার উপর হান্টাব সাহেবের প্রভাব যেমন স্পষ্ট, অন্যদিকে সেইবকম মুর্শিদাবাদেব মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁব বিবরণে এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চায মুসলমান লেখকদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যেব মধ্যে 'ইন্ডিয়ান অবজার্ভাব'-এর নিবন্ধটির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও মুর্শিদাবাদেব কৃষক তথা বাংলাব কৃষককে নিয়ে চাকরীসূত্রে তাঁর চিন্তাচর্চা যে বাংলার বিপুল সংখ্যক মুসলিমদেব দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত ও সহানুভূতিশীল করবে, এটাও স্বাভাবিক ছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে পাতন তত্ত্ব (Filtration Theory) বর্জন কবে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে জনশিক্ষার পক্ষাবলম্বন করেছিলেন তাতেও পরোক্ষে কৃষক মুসলিমদের শিক্ষার অধিকারের দাবীর প্রতিই সমর্থন জানানো হয়েছিল, আব ভবিষ্যতের বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠার দিকে এই জনশিক্ষাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ।[৬৪] এসব ছাড়া এই পর্বে মুসলিমদের সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক মনোভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ থেকে গেছে তিনটি জায়গায়: এক, চৈত্র, ১২৭৯ সালের (মার্চ-এপ্রিল, ১৮৭২) বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা' প্রবন্ধের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটিতে (অনুচ্ছেদ পাঁচ)[৬৫] দুই, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সরকারের কাছে বহরমপুর থেকে গণিকাবৃত্তি সম্পর্কে যে প্রতিবেদন পাঠিয়ে ছিলেন তাতে হিন্দু সমাজ অপেক্ষা মুসলমান সমাজের উদারতার এবং স্ত্রীলোকের প্রতি অধিকতর অনুকূল বিবাহ-ব্যবস্থা ও সামাজিক রীতিনীতির সপ্রশংস উল্লেখ করেছিলেন। তিন, পৌষ, ১২৮০ সালের (ডিসেম্বর-জানুয়ারী, ১৮৭৩) বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত মীর মোশারফ হুসেনের 'গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু' কাব্যটির সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর উক্তিটিতে, "বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ— একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক— পরস্পরের সহিত সহৃদয়তা শূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে।

যতদিন উচ্চশ্রেণীব মুসলমানদিগেব মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে, যে তাঁহাবা ভিন্ন দেশীয, বাঙ্গালা তাঁহাদেব ভাষা নহে, তাঁহাবা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফাবসীব চালনা কবিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা, জাতীয ঐক্যেব মূল ভাষাব একতা।"[৬৬] কিন্তু এইভাবে ভাষাব একতাকে জাতীয ঐক্যেব মূল বলে স্বীকাব কবলে বাঙালী জাতীযতাবাদকেও পাশাপাশি ভাবতেব অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীগুলিব জাতীযতাবাদকেও স্বীকাব কবতে হতো, ফলে ভাবতবাসী বহু ভাষাভাষী পবস্পব-বিবোধী আত্ম-স্বার্থপবাযন অনেক ক'টি জাতিতে বিভক্ত হযে পডতো। মনে হয, এই কাবণেই বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা-ভিত্তিক জাতি-সত্তাব ধাবণাকে ভাবতীয পবিপ্রেক্ষিতে বর্জন কবেছিলেন। একথা মনে কবাব কাবণ আছে যে, জাতি-সত্তাব স্বরূপ-সন্ধানে জন স্টুযার্ট মিলেব প্রভাবই বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাষা-ভিত্তিক জাতীযতা সম্পর্কে এইবকম নেতিবাচক অবস্থানে পৌঁছে দিযেছিল।[৬৭] যদি বঙ্কিমচন্দ্রেব কাছে জাতীযতাবাদেব স্বরূপ প্রকৃতিগতভাবে আত্মস্বার্থপবাযণ ও আগ্রাসী বলে উপলব্ধ না হতো, যদি বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীব সুসমঞ্জস সহাবস্থানেব ভিত্তিতে গডে-ওঠা বহুজাতিক ভাবতীয সমাজ-সত্তাব ধাবণাটি তিনি গ্রহণ কবতেন, তাহলে বাংলাব মুসলমানেব সম্পর্কে যেধবণেব ইতিবাচক মন্তব্য উপবে কবেছেন, গোটা ভাবতেব বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানদেব ক্ষেত্রেও তা প্রসাবিত হতে পাবতো।

বঙ্কিম-মানসেব জটিলতা ও অন্তর্বিবোধেব সম্পর্কে আমাদেব সচকিত হযে উঠতে হয যখন দেখি আলোচ্য পর্বেই বাঙালী জাতীযতাব প্রতি তাঁব ক্রমবর্ধমান অনুবাগ ও আনুগত্যেব পাশাপাশি তিনি হিন্দু জাতীযতাবাদেবও প্রধান তাত্ত্বিক প্রবক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ কবেছেন। বঙ্গদর্শনেব প্রথম সংখ্যাতেই বৈশাখ, ১২৭৯ সালে (এপ্রিল-মে, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে) প্রকাশিত 'ভাবত কলঙ্ক' প্রবন্ধে এই ভূমিকায তাঁকে দেখা যাচ্ছে; বঙ্গদর্শনেব দ্বিতীয বর্ষে ভাদ্র, ১২৮০ এবং আশ্বিন, ১২৮০ সালে (আগস্ট-সেপ্টেম্বব ও সেপ্টেম্বব-অক্টোবব, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে) প্রকাশিত 'প্রাচীন ও আধুনিক ভাবতবর্ষ' প্রবন্ধেব দুটি পবিচ্ছেদও (পববর্তীকালে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'ভাবতেব স্বাধীনতা এবং পবাধীনতা' ও 'প্রাচীন ভাবতেব বাজনীতি' নামে অন্তর্ভুক্ত) একই চিন্তাভাবনাব অনুবর্তন লক্ষ্য কবা যায।[৬৮] বঙ্কিমচন্দ্রেব এই বচনাগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ভাবতীয পবিপ্রেক্ষিতে ভাষাব বদলে ধর্মকেই জাতীয ঐক্যেব ভিত্তি বলে গণ্য কবেছেন এবং এব ফলেই এই বচনাগুলিতে ভাবতীয=হিন্দু এই সমীকবণে উপনীত হযেছেন। হিন্দু জাতীযতাবাদী এই অবস্থান থেকেই তিনি বলেছেন, "আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, বাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আবো লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেবই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমাব মঙ্গল। যাহাতে তাহাদেব মঙ্গল নাই, আমাবও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুব যাহাতে মঙ্গল হয, তাহাই আমাব কর্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুব অমঙ্গল হয, তাহা আমাব অকর্তব্য।"[৬৯] বঙ্কিমচন্দ্রেব এই বকম সচেতন হিন্দু জাতীযতাবাদী অবস্থানেব বহিঃপ্রকাশ তাঁব সাহিত্য জীবনেব এই পর্বে এই সকল প্রবন্ধেব মধ্যে ঘটলেও, দেখা যায, এ সমযে তাঁব মানসিকতাব সামগ্রিক পবিমণ্ডলটি মূলত এই অবস্থানেব বিবোধী থাকায তাঁব সাহিত্যকর্মে এ সমযে হিন্দু জাতীযতাবাদী প্রভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী মুখ্য হযে উঠতে পাবেনি। এমনকি তাঁব সাহিত্য জীবনেব পববর্তী পর্বে, ১৮৭৫-১৮৮০ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যেও, এই প্রভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুব মত আড়ালেই থেকেছে। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে হিন্দু জাগবণ ও উজ্জীবনেব প্রবল প্রবাহ যখন বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে শুরু কবেছে, কেবল তখনই হিন্দু

জাতীয়তাবাদের 'ঋষি' হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বহুমুখী সাহিত্য কর্মের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন, এই জাগরণ ও উজ্জীবনের বৌদ্ধিক নেতা ও মুখপাত্র হিসাবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রেরও প্রায় একদশক পূর্ব থেকেই 'ব্রাহ্ম' রাজনারায়ণ বসু বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের মধ্যে দোলাচল চিন্তায় থাকার পর অবশেষে ভাষার বদলে ধর্মকে জাতি-স্রষ্টা জনগোষ্ঠীর ভিত্তি হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন ; কিন্তু জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ভিন্নতর, সহযোগিতামূলক ধারণার জন্য রাজনারায়ণ যেখানে "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব" প্রচার করেও বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের উপর নির্ভরশীল এক ভাবতীয় জাতি-সত্তাব ধারণায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতে সক্ষম হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে সুনিশ্চিতভাবে ব্যর্থ হন।[৭০] শুধু তাই নয়, ভাষা ও ধর্মেব উর্দ্ধে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতিসত্তার যে ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ও সহপাঠী কেশবচন্দ্র সেনের চিন্তা-ভাবনায় এক দশক আগে থেকেই দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তাঁর সাহিত্য জীবনের আলোচ্য দ্বিতীয় পর্বে তো বটেই, পবেও কখনও সেই অবস্থানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।[৭১] 'ভারত' ,'ভারতবর্ষীয়' ইত্যাদি শব্দ বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যবহাব কবলেও তাঁর সাহিত্য জীবনেব এই পর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু জাতীযতাবাদেব প্রকৃত জনক এবং তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকাব হিসাবে আত্মপ্রকাশ কবেছিলেন।[৭২] তাঁব সাহিত্য জীবনেব পববর্তী দুটি পর্বেও তাঁর এই ভূমিকাকেই ক্রমশ আবো সম্প্রসাবিত ও ব্যাপকভাবে অনুসবণ করতে তাঁকে দেখা যায়। আবো দেখি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাতে এই হিন্দু জাতীযতাবাদ ছিল আত্মস্বার্থপবাযণ ও আগ্রাসী— স্ব-জাতির মঙ্গলসাধনে পরজাতিপীড়ন অথবা পরজাতিব অমঙ্গল সাধনেও তৎপর।

সুতরাং, ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার ধাবণাব ফলে মুসলিমদেব সম্পর্কে ইতিবাচক অবস্থানের প্রমাণ তাঁর সমসাময়িক রচনায় বিদ্যমান, অথচ একই সঙ্গে ধর্ম-ভিত্তিক জাতীযতাবাদকে তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করে নেওয়ায় এই ইতিবাচক অবস্থান বর্জন করে মুসলিমদেব সম্পর্কে সুস্পষ্ট নেতিবাচক, বিরূপ ও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর পবিচয় রাখতেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে।

আমরা ইতিপূর্বে এই অনুমান করেছি যে, জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ধারণাটি বর্জন করেছিলেন। কিন্তু ধর্ম-ভিত্তিক জাতি-সত্তার ধারণা কেন এবং কীভাবে তাঁর মধ্যে গড়ে উঠল ? আমরা ইংগিত করেছি যে, তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বেই ইংরেজ-সৃষ্ট ইতিহাস বিদ্যার প্রভাব তাঁর চিন্তা ভাবনায় পরিস্ফুট হয়েছিল। এই প্রভাবের সূত্রেই তাঁর ধর্ম-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করা যাবে।[৭৩] অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বৃটিশ প্রাচ্যবিদেরা ইতিহাস-চর্চার যে ঐতিহ্য ভারতে গড়ে তুলেছিলেন, যে ঐতিহ্য এলফিন্স্টোন ও জেমস্ মিলের ইতিহাস-গ্রন্থাবলীর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ছিল, তাতে একদিকে বৃটিশ শাসনের তুলনায় পূর্ববর্তী মুসলিম শাসনকে অত্যাচারমূলক এবং অন্যদিকে প্রাক্-মুসলিম শাসনকে হিন্দু আখ্যা দিয়ে উন্নততর প্রমাণ করার ঝোঁক ছিল।[৭৪] ইংরেজ সৃষ্ট এই ধরনের ইতিহাস রামমোহনের সময় থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালের অনেকের মতই তাঁকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণযোগ্য : "অনেক ইংরেজ গ্রন্থকার, কখন স্পষ্টাক্ষরে, কখন ইঙ্গিতক্রমে, অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন, যে মুসলমানেরা যখন দেশে রাজা ছিল, তখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার সমস্ত করিয়াছিল ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে

মুসলমানদিগেব প্রতি গূঢ় বিদ্বেষবীজ বপন কবিযা দিতেছেন। আধুনিক ইংবাজী শিক্ষিত যুবকদিগেব হৃদযে মুসলমান জাতি এবং মুসলমান ধর্মেব প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিযাছে পূর্বকালেব পাবস্য ভাষায সুশিক্ষিত, সদাচাব সম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগেবও মনে তাহাব অর্দ্ধাংশ দেখা যাইত না।"[৭৫] ছাত্র জীবন থেকেই ইংবেজ সৃষ্ট এবকম ইতিহাসেব সঙ্গে সুপবিচয এবং আগ্রহেব সম্পর্ক থাকায বঙ্কিমচন্দ্রেব ইতিহাস-চেতনায হিন্দু-মুসলিম বিভাজনেব যে দৃষ্টিভঙ্গী তাঁব অনেকটা অজ্ঞাতসাবেই অনুপ্রবিষ্ট হযেছিল, সেই ইতিহাস-চেতনাই তাঁব জাতি-সত্তাব ধাবণা ও জাতীযতাবোধকে গভীব ভাবে প্রভাবিত কবেছিল, একে ধর্ম-ভিত্তিক কবে তুলেছিল। তাঁব ইতিহাস-চেতনা-জাত এই পূর্ব সংস্কাবই, মিলেব ভাষা ভিত্তিক জাতিসত্তা সম্পর্কিত নেতিবাচক চিন্তা ভাবনাব সঙ্গে যুক্ত হযে, তাঁব জাতীযতাবাদকে ভাবতীয জাতীযতাবাদে পবিণত হতে দেযনি, হিন্দু জাতীযতাবাদে পবিণত কবেছিল, এবং মুসলিম-প্রসঙ্গে তাঁব নেতিবাচক মানসিকতাটি গড়ে তুলেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রেব সাহিত্য জীবনেব আলোচ্য এই দ্বিতীয পর্বে মুসলিম-প্রসঙ্গে তাঁব দৃষ্টিভঙ্গীটিকে আব এক দিক থেকে দেখা যায। আমবা দেখেছি বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্বেই বঙ্গদর্শনে লিখেছিলেন যে, হিন্দু মুসলমান তাঁব সমযে পবস্পবেব প্রতি সহৃদযতা শূণ্য হযে পড়েছে, অথচ বাংলাব প্রকৃত উন্নতিব জন্য হিন্দু মুসলমানেব ঐক্য প্রযোজন। তিনি মনে কবেছিলেন যে, হিন্দু মুসলমানেব এই পাবস্পবিক বিরূপতা দূব কবে ঐক্য স্থাপনেব জন্য প্রযোজন উচ্চ শ্রেণীব মুসলমানদেব "আববি ফাবসি-চালনা" ছেড়ে বাংলা ভাষাব চর্চা কবা। ইতিপূর্বে আলোচিত মুর্শিদাবাদেব ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁব প্রতিবেদনেও তিনি মন্তব্য কবেছেন যে, ধর্মান্ধতা নিম্নশ্রেণীব নয, উচ্চ শ্রেণীব মুসলমানদেব মধ্যেই দেখা যায। তাঁব এই সকল মন্তব্য থেকে অনুমিত হয যে, তিনি মুসলিম সমাজকে উচ্চ নীচ দুই ভাগে ভাগ কবাব পক্ষপাতী ছিলেন এবং মুসলিমদেব সম্পর্কে তাঁব নেতিবাচক উক্তিগুলি সম্ভবত উচ্চ শ্রেণীব মুসলিমদেব সম্পর্কেই প্রযোজ্য। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিমদেব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য কবাব সমযে এই সকল মন্তব্য যে কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীব মুসলিমদেব প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য, একথা প্রাযশই উল্লেখ কবেননি। সুতবাং তাঁব দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ভিন্নতব ব্যাখ্যাব সুযোগ থেকেই গেছে।[৭৬] কিন্তু এব চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাব হলো হিন্দু মুসলিম অসদ্ভাবেব দাযিত্ব যেভাবে তিনি কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীব মুসলমানদেব উপব চাপিযে দিযেছেন সেটি। দুই সম্প্রদাযেব মধ্যে বিরূপতা সৃষ্টিব ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীব মুসলমানদেব দ্বাবা 'আববি-ফাবসি চালনা'-ব কিছু ভূমিকা থাকলেও এটিই যে বিরূপতা সৃষ্টিব মুখ্য কাবণ ছিল না, এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্রেব মত বাস্তব সচেতন মনীষীব চোখে পড়েনি এটাই আশ্চর্য। বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভালভাবেই জানতেন যে, বাংলাব 'কৃষিজীবী ও সামান্য অবস্থাব লোক'-দেব অধিকাংশই মুসলমান এবং জমিদাব, ব্যবসাযী, ভদ্রলোকেদেব অধিকাংশই হিন্দু। আব আমাদেব আলোচ্য 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধেই তিনি দেখিযেছেন, বাংলাব কৃষকেব চিবস্থাযী দুর্দশাব কাবণ চিবস্থাযী বন্দোবস্ত ও তাব সৃষ্ট জমিদাবকুল। কিন্তু এতটা জানাব পবও বঙ্কিমচন্দ্রেব পক্ষে এ উপলব্ধিতে পৌঁছানো সম্ভব হযনি যে, বাংলাব হিন্দু মুসলমানেব পাবস্পবিক বিরূপতা সৃষ্টিব পিছনে মুসলিম উচ্চশ্রেণীব আববি-ফাবসি-চালনা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল হিন্দু উচ্চ তথা মধ্যশ্রেণীব শোষণমূলক জমিদাবী শ্রেণী স্বার্থকে উটপাখিব মত আঁকড়ে ধবে থাকা। বাংলা চর্চাব মধ্যে দিয়ে আববি-ফাবসি-চালনাব ক্ষতিকব প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়াব পথ বাংলেও, বঙ্কিমচন্দ্র শোষণমূলক চিবস্থাযী বন্দোবস্তেব ক্ষতিকব প্রভাব থেকে

মুক্ত হওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত পথ আমাদের দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির অনিবার্য যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ করে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রবতর্ন সমর্থন করা। অথচ প্রবন্ধটিতে কৃষকদের প্রতি যথেষ্ট দরদের পরিচয় দিলেও বঙ্কিমচন্দ্র তার উল্টোটাই করলেন। সমাজ বিপ্লবের ভয়ে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত ও তার সভ্যতা-সংস্কৃতিকে রক্ষার তাগিদে বঙ্কিমচন্দ্র রায়তওয়ারী বন্দোবস্তকে সমর্থন করতে অগ্রসর হয়েও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন।[৭৭] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করার মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কার্যত প্রধানত হিন্দু জমিদার ও উচ্চশ্রেণীর দ্বারা মুসলিম কৃষকদের শোষণ ও দুর্দশাকেই চালু রাখা সমর্থন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কোনও সচেতন মুসলিম-বিরোধী মনোভাব থেকেই এই সমর্থন রেখেছিলেন তা নয়— নিজের অর্থনৈতিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এটি বোঝা যায় অল্প কিছুদিন পরে মীর মোশারফ হোসেন রচিত 'জমিদার-দর্পণ' নাটকের বঙ্কিম কৃত সমালোচনায়— শ্রেণী-স্বার্থেই সেখানে মুসলমান জমিদারের বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজার নাটুকে অসন্তোষকেও তিনি সমর্থনযোগ্য মনে করতে পারেননি এবং নাটকটির প্রচার-বন্ধের পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৭৮] বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র স্ব-শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থের উর্দ্ধে শেষ পর্যন্ত উঠতে পারেননি বলেই বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনৈক্যের প্রধান কারণ হিসাবে জমিদারীপ্রথা-নির্ভর হিন্দু উচ্চশ্রেণীর ভূমিকাটিকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য এই ব্যর্থতা একা বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, তাঁর সময়ের পূর্ব থেকেই দেশভাগের সময় পর্যন্ত বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের সামগ্রিক এবং মুখ্য ব্যর্থতা।[৭৯]

তাঁর সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্বে (১৮৬৯-১৮৭৫) মুসলিম-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিকতার সমগ্র পরিমন্ডলটিকে দেখার পর তুলনার প্রয়োজনে এর পরবর্তী দুটি পর্বকেও এক নজরে দেখে নেওয়া যায়। **দ্বিতীয় পর্বটি বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনীশক্তির জোয়ারের কাল হয়ে থাকলে তৃতীয় পর্বটি (১৮৭৫-১৮৮০) সুনিশ্চিতভাবে ছিল ভাঁটার সময়।** কেননা, এই পর্বে তাঁর রচনাকর্মের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল এবং পুরনো লেখার প্রকাশ বা পুনঃপ্রকাশের দিকেই তাঁর দৃষ্টি গিয়েছিল। এই পর্বটি তাঁর মনোজগতে অন্তবর্তী এক রূপান্তরের কাল হিসাবে দেখা দিয়েছিল।[৮০] এই পর্বেই নাস্তিক বঙ্কিম, বিজ্ঞান-সচেতন বঙ্কিম, সাম্যবাদী বঙ্কিম, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মিল-শিষ্য বঙ্কিম ক্রমশ ধীরে ধীরে নব্য হিন্দু বঙ্কিম অধ্যাত্মচেতন বঙ্কিম, সমাজ-বৈষম্যে বিশ্বাসী বঙ্কিম, ব্যক্তির উপর সমাজ-প্রাধান্যের বিশ্বাসী কোঁৎ-শিষ্য বঙ্কিমে বদলে যেতে শুরু করেন। এই পর্বে তাঁর মানসিক রূপান্তর অত্যন্ত ধীরগতিতে হয়েছিল বলেই মুসলিম-প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী পর্বের দ্বিধাগ্রস্ত স্ব-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীরই মোটামুটি অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। **এই রূপান্তরের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পরে তাঁর সাহিত্য জীবনের চতুর্থ পর্বে ১৮৮০-১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আমরা এই নতুন রূপে বঙ্কিমকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি।** তাঁর সাহিত্য-জীবনের এই অন্তিম পর্বে আবার তাঁর সৃজনী শক্তিতে দ্বিতীয় পর্বের মতই জোয়ারের বেগ দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের বঙ্কিমের থেকে প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর ভিন্ন মেরুর এক বঙ্কিমের ভাবমূর্তি নিয়ে তিনি দেখা দেন।[৮১] এইপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা ও ইংরেজী রচনাবলীর প্রধান অংশ জুড়েই ছিল হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য-বিচার এবং শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি-বিস্তার। এই প্রচেষ্টার সচেতন ফলশ্রুতি ছিল ইসলাম-ধর্ম ও সংস্কৃতির তুলনামূলক হীনতা প্রতিপাদন। পাশাপাশি এই পর্বে রচিত আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম ও রাজসিংহ উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর রচিত

'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধের (১৮৭২) ভাবনা-চিন্তার কথা-সাহিত্যিক রূপায়ন, লক্ষ্য করা গিয়েছিল— হিন্দু জাতীয়তা-স্থাপন, হিন্দু রাষ্ট্র গঠন, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ, গো-হত্যা বন্ধ করা থেকে শুরু থেকে নিরীহ মুসলমান গ্রামবাসীদের নির্বংশ করার জন্য মুসলিম-বিরোধী দাঙ্গার উত্তেজক ভাষাচিত্র রচনা পর্যন্ত যে সম্প্রদায় সংকীর্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় আমরা এখানে পাই তা থেকে মুসলিম প্রসঙ্গে এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা-মনোভাবের মূলধারা যে বিরূপতা ও বিদ্বেষ-পরায়ণ হয়ে উঠেছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না। এই পর্বে বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনায় বাঙালী মুসলমানের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বৈষম্যময় পৌরাণিক ধর্মের পাশে সাম্যময় ইসলামের উল্লেখ (১৮৮২), 'গৌরদাস বাবাজীর ঝুলির' হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভালোর স্বীকৃতি (১৮৮৫), সীতরাম উপন্যাসে (১৮৮৫-৮৭) চাঁদশা ফকিরের উদার-মানবিক কথাবার্তা অথবা রাজসিংহ উপন্যাসের (১৮৯৩) উপসংহারে হিন্দু-মুসলমানের সমতা প্রতিপাদক বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে মুসলমানদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিবাচক মনোভাবের পূর্বতন ধারাটি তার অত্যন্ত ক্ষীণ তাত্ত্বিক রূপ নিয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সমকালীন ক্রমবর্ধমান উগ্র হিন্দু পুনরুত্থানবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক বাতাবরণের বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর নেতিবাচক মন্তব্য ইংগিত আক্রমণের প্রবল বন্যা-প্রবাহে। এবং এর ফলশ্রুতিতে উদীয়মান বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল সোচ্চার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার। তাঁর সাহিত্য জীবনের এই অন্তিমপর্বে আত্মপ্রকাশিত নতুন রূপের এই বঙ্কিমকে সাধারণভাবে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা না দেওয়া সত্যের বিকৃতিমাত্র।[৮২]

উপরের সুবিস্তৃত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের যে দ্বিতীয় পর্বে তাঁর পক্ষে মুসলিমদের সম্পর্কে সবচাইতে সহানুভূতিশীল, উদার ও ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ তাঁর বুদ্ধিগত জীবনের দিক থেকেই সম্ভব হয়েছিল, সেই পর্বেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি নেতিবাচক মনোভাবের একটি জোরালো প্রবাহও বিদ্যমান ছিল— আর এই নেতিবাচক মনোভাবের অনেকটা যেমন ছিল অসচেতন, সেইরকম বেশ কিছুটাই আবার ছিল সচেতন ও উদ্দেশ্যমূলক। তাঁর সাহিত্য জীবনের এই পর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি। ফলে এই প্রবন্ধে মুসলিম-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনের ছাপ স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে।

'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার কৃষকের দুঃখ দুর্দশা ও শোষণ-বঞ্চনার প্রাণবন্ত ছবি আঁকার জন্য বাংলার কৃষকের প্রতিনিধি হিসাবে রেভারেন্ড লালবিহারী দে বর্ণিত গোবিন্দ সামন্তর মত কোন একটিমাত্র চরিত্রকে হাজির করেননি, নিয়ে এসেছিলেন তিনটি চরিত্রকে যাদের মধ্যে দু'জন হিন্দু এবং একজন মুসলমান কৃষক। বাংলার কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং তারা অর্থনৈতিক শোষণের পাশাপাশি হিন্দু জমিদারদের সামাজিক-ধর্মীয় শোষণের শিকার হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে হাজির-করা মুসলমান কৃষক হাসিম শেখের যে ভাষাচিত্র এঁকেছেন, তাতে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের এই জীবন ও সমস্যাবলীর যথাযথ প্রতিফলন ঘটেনি। একথা যদি স্বীকার করেই নেওয়া হয় যে, মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষকদের সম্পর্কে চাকরীসূত্রে অর্জিত নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধের তিনটি কৃষক চরিত্রের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, তাহলেও এই তিনজনের মধ্যে হাসিম শেখকে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম কৃষকের যথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে মুখ্য চরিত্র রূপে আঁকলেই তো তাঁর বক্তব্য আরো বাস্তবানুগ হতে পারতো, বিশেষত,

যখন তাঁব প্রবন্ধেব বক্তব্যকে বাস্তবানুগ বলে প্রমাণ কবাব জন্য সমসাময়িক সংবাদপত্রেব সূত্র-নির্দেশও তিনি কবেছেন। 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধেব অর্ধশতাব্দীবও বেশী পবে বাংলাব ভূমি-ব্যবস্থাব প্রায় অপবিবর্তিত কাঠামোব আর্থিক সামাজিক জীবনেব পবিপ্রেক্ষিতেই বচিত শবৎচন্দ্রেব 'মহেশ' গল্পেব গফুব জোলা চবিত্রেব সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র-অঙ্কিত হাসিম শেখ-এব চবিত্রেব তুলনা কবলে সহজেই বোঝা যায়, কোথায় হাসিম শেখ বাংলাব সংখ্যাগবিষ্ঠ কৃষকেব প্রতিনিধি-স্থানীয় চবিত্র হয়ে উঠতে পাবেনি।[৮৩] মহেশ গল্পে কৃষকেব উপব জমিদাবেব অর্থনৈতিক শোষণেব সংগে মুসলমান কৃষকেব উপব হিন্দু জমিদাবেব সামাজিক ও ধর্মীয় শোষণেব অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গবীব ভাগচাষী গফুব জোলাকে ভিটেমাটি ছেড়ে যে পবিণতিব দিকে ঠেলে দিয়েছে, ছোট চাষী হাসিম শেখ-এব জীবনে তাব একান্ত অনুপস্থিতিই হাসিম শেখ-কে বঙ্গদেশে কৃষকেব যোগ্য ও যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে দেয়নি।

তাঁব সাহিত্যজীবনেব যে পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশে কৃষক' বচনা কবেছিলেন, সেইপর্বে মুসলিম-প্রসঙ্গে তাঁব দৃষ্টিভঙ্গীতে যে পবস্পব বিবোধী দুটি ধাবা আমবা লক্ষ্য কবেছি, হাসিম শেখেব চবিত্র চিত্রণে তাবই প্রতিফলন ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রেব মানসিকতায় বাঙালী জাতীয়তাবাদেব ধাবা বাংলাব হিন্দু কৃষকেব প্রতিনিধি বামাকৈবর্ত ও পবাণ মন্ডলেব পাশাপাশি বাংলাব মুসলিম কৃষকেব প্রতিনিধি হাসিম শেখেব দুঃখ-দুর্দশা ও শোষণেব প্রতিও নজব দিতে এবং সহানুভূতিশীল হতে তাঁকে আগ্রহী কবেছে; কিন্তু তাঁব মানসিকতায় সমান্তবাল ভাবে উপস্থিত হিন্দু জাতীয়তাবাদেব জোবালো ধাবাটিব জন্যই বাংলাব সংখ্যাগবিষ্ঠ মুসলিম কৃষকেব অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হলেও, তাদেব যথাযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে হাসিম শেখেব চবিত্র চিত্রণ তিনি কবতে পাবেননি। বঙ্কিমচন্দ্রেব এই ব্যর্থতাব পিছনে তাঁব অসচেতন মানসিক প্রবণতাব যেমন ভূমিকা ছিল, সেই বকম এই ব্যর্থতাব অনেকখানিই যে 'ভাবত কলঙ্ক'-এব বচয়িতা আগ্রাসী হিন্দু জাতীয়তাব উগ্র সমর্থক বঙ্কিমচন্দ্রেব সচেতন মনোভাবেবই ফল, এ বকম অনুমান কি অসঙ্গত ও অন্যায় হবে?

## ছয়

'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধেব উৎস-সন্ধানে অগ্রসব হয়ে এতক্ষণ আমবা প্রবন্ধটিব চিন্তা চেতনাব নানা উপাদানেব যে সকল প্রভাব সমূহকে চিহ্নিত কবেছি সেগুলি মূলতই প্রবন্ধটিব বিষয়বস্তু সম্পর্কিত (Substantive)। কিন্তু প্রবন্ধটিতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে সকল সিদ্ধান্তে বঙ্কিমচন্দ্র পৌঁছেছিলেন, সেগুলি যে জ্ঞানচর্চাব এক সুনির্দিষ্ট বীতি পদ্ধতি অনুসবণ কবেই, তাব প্রমাণও প্রবন্ধটিব মধ্যেই ছড়ানো আছে। প্রবন্ধটিব উপব এই সকল পদ্ধতি বিষয়ক (methodological) প্রভাবগুলিকেও আমবা চিহ্নিত কবতে পাবি। সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রেব দার্শনিক অবস্থান, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁব চিন্তা-ভাবনা এবং দুটি সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিদ্যাব প্রকৃতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁব ধ্যানধাবণাব ক্ষেত্রগুলিতেই আমবা এই সকল প্রভাবেব পবিচয় পাব।

বহবমপুবে বাসকালেই (১৮৬৯-১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে) বঙ্কিমচন্দ্রেব কতকগুলি বিখ্যাত দার্শনিক প্রবন্ধ বচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল: Buddhism and the Sankhya Philosophy (Calcutta Review, 1871), The Confessions of a Young Bengal (Mookherjee's Magazine, 1872), The Study of Hindu Philosophy, (Do, 1872), সাংখ্যদর্শন

(বঙ্গদর্শন, ১৮৭২-৭৩, জন স্টুয়ার্ট মিল (বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪)। কিছু পবে বহবমপুব থেকে চলে আসাব পব লিখিত দুটি প্রবন্ধেও একই দার্শনিক চিন্তাব ধাবাবাহিকতা লক্ষ্য কবা যায় : জ্ঞান সম্বন্ধে দার্শনিক মত (বঙ্গদর্শন, ১৮৭৫) ও মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম (বঙ্গদর্শন, ১৮৭৫)। এই সকল প্রবন্ধাবলীব মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবতীয এবং ইউবোপীয দার্শনিক ঐতিহ্যেব একটি সুস্পষ্ট বিশ্লেষণই শুধু আমাদেব সামনে বাখেননি, এই দুই ঐতিহ্যেব মূল্যাযণ তথা নিজেব তৎকালীন দার্শনিক অবস্থানকেও তুলে ধবেছেন। তাঁব বিশ্লেষণ অনুসাবে ভাবতীয দার্শনিক ঐতিহ্যেব একটি ধাবায চার্বাক, সাংখ্য, বৌদ্ধ ও ন্যায দর্শনকে বাখা যায, অন্য ধাবাটিতে মীমাংসা ও মাযাবাদ-সহ বেদান্ত দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত কবতে হয ; ইউবোপীয দার্শনিক ঐতিহ্যেবও অনুরূপ দুটি ধাবাব একটি হচ্ছে চার্বাকাদি ভাবতীয চিন্তাধাবাব স্বগোত্রীয লক, হিউম, মিল ও বেনেব প্রত্যক্ষবাদ, এবং অন্যটি হচ্ছে কান্ট ও তাঁব সমর্থক অন্যান্য দার্শনিকদেব প্রত্যক্ষ প্রতিবাদী আভ্যন্তবিক দর্শনেব ধাবা। এই সকল প্রবন্ধাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্র ভাবতীয ও ইউবোপীয দুই দর্শনেব ঐতিহ্যেবই প্রত্যক্ষবাদী ধাবাব প্রতি দৃঢ সমর্থন জ্ঞাপন কবে জানিযেছেন যে, অন্য ধাবাটিব চাইতে এই প্রত্যক্ষবাদী ধাবাটিই অধিকতব ফলপ্রসূ ও যুক্তিযুক্ত।[৮৪] এই অবস্থানেব ফলে "বঙ্কিমেব বৈজ্ঞানিক চেতনা ও প্রখব যুক্তিবাদিতা অজ্ঞেযবাদ ছাডিযে প্রায নিবীশ্ববাদেব সীমানায পৌঁছেছে। তাঁব মতে, সত্যেব একমাত্র মাপকাঠি প্রমাণ এবং প্রমাণেব ভিত্তি প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা।"[৮৫]

বঙ্কিমচন্দ্রেব এই প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক অবস্থানই তাঁকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে আগ্রহী কবে তুলেছিল। এই আগ্রহেবই প্রমাণ পাওযা যায আলোচ্য সমযে বচিত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁব বিজ্ঞান-বিষযক প্রবন্ধাবলীতে। বিজ্ঞানেব প্রকৃতি, পদ্ধতি ও ভূমিকা সম্পর্কেও তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য বেখেছিলেন এই সকল বচনায। যে-সকল জটিল নিযমে জড প্রকৃতি শাসিত, যে-সকল নিযমেব ফলেই জগতেব রূপান্তব ঘটে চলেছে, সেই নিযমগুলি সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞানই বিজ্ঞান ; বিজ্ঞান "বলিতে পাবে যে সকলই নিযমেব বলে ঘটিযাছে— ক্ষণিক ইচ্ছাধীন নহে।" বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিব বিশেষত্ব তাঁব কাছে ছিল প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব সাহায্যে বিশেষেব পর্যবেক্ষণ ও পবীক্ষাব মাধ্যমে সাধাবণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা, বিশেষ কার্য ও বিশেষ কাবণেব নিত্য সম্বন্ধ আবিস্কাব কবাব সাহায্যেই জগৎপ্রবাহেব নিযমেব বাজত্বেব পবিচয লাভ কবা। বিজ্ঞানেব ভূমিকা ব্যাখ্যা কবে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য কবেছিলেন "বিজ্ঞানেব সেবা কবিলে বিজ্ঞান তোমাব দাস ; কিন্তু যে বিজ্ঞানেব অবমাননা কবে বিজ্ঞান তাহাব কঠোব শত্রু", "এই বিজ্ঞানবলেই আধুনিক ইউবোপীযগণ এই পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন কবিযাছেন", "ইউবোপীযেবা বিজ্ঞানবলে এই ভাবতবর্ষ জয কবিযাছেন। বিজ্ঞানবলেই ইহা বক্ষা কবিতেছেন।"[৮৬] শুধুমাত্র জড প্রকৃতিব নিযমাবলী বোঝাব জন্য নয, বঙ্গদর্শন সম্পাদনাব যুগে (১৮৭২-১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে) তিনি এমন কিছু কাজ কবেছেন ; যেখানে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন তথা ধর্মেব আলোচনাতেও বিজ্ঞান অথবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিব প্রসঙ্গ এসে গেছে।"[৮৭]

বঙ্কিমচন্দ্রেব দার্শনিক অবস্থান এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁব সমাজ-বিষয়ক আলোচনাকেও সমাজ-বিজ্ঞানেব রূপ দিযেছিল। 'বঙ্গদেশে কৃষক' প্রবন্ধে আমবা স্পষ্টত এটাই ঘটতে দেখি। প্রবন্ধটিব প্রথম অনুচ্ছেদেব এক জায়গায বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "বঙ্গদর্শনেব জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম" ; প্রবন্ধটিব অন্যত্র ও দুই জায়গায় 'সমাজতত্ত্ববিদ'

শব্দটি ব্যবহৃত হযেছে; পববর্তী পুনঃপ্রকাশেব কালে তিনি প্রবন্ধটিব শিবোভাগে মন্তব্য কবেছিলেন, "অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কযেকটা কথা আছে"।[৮৮] শুধু তাই নয, বিদ্যা হিসাবে সমাজতত্ত্ব ও অর্থবিদ্যাব প্রকৃতিব ইংগিতবহ দুটি মন্তব্যও এখানে দেখা যায— সমাজতত্ত্ব প্রসঙ্গে, "এখানে 'ন্যুন্নাধিক' শব্দটি ব্যবহাব কবিবাব বিশেষ তাৎৎপর্য আছে" এবং অর্থবিদ্যা প্রসঙ্গে, "অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কোন্ কথা ভ্রান্তি, আব কোন কথা ধ্রুব সত্য, ইহা নিশ্চিত কবা দুঃসাধ্য।" এ অনুমান অসঙ্গত নয যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশেব কৃষক' বচনা কবতে গিযে সচেতনভাবে অর্থশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব এই দুই বিদ্যাব অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসবণ কবেই তাঁব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে সাধাবণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা কবেছিলেন। এই দুই বিদ্যা এবং এদেব অনুসন্ধান পদ্ধতিব সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব পবিচিতিব পবিপ্রেক্ষিতটি সংক্ষেপে মনে বাখলে এ বিষযে সন্দেহেব অবকাশ থাকে না।[৮৯]

হুগলী মহসিন কলেজে ১৮৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দেই প্রাক্ স্নাতক স্তবে ছাত্রাবস্থায বঙ্কিমচন্দ্র অর্থশাস্ত্র বা Political Economy এবং তর্কশাস্ত্র বা Logic পডেছিলেন।[৯০] পাঠ্য অর্থশাস্ত্র বিষযটিতে কাব বই পডতে হতো জানা না গেলেও অনুমান কবা যায যে, বিলাতী ক্লাসিকাল অর্থনীতিব মূল বক্তব্যেব সঙ্গে তাঁব পবিচয ঘটেছিল ; বিশেষত, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত স্টুযার্ট মিলেব Principles of Political Economy (1848) অতি দ্রুত খাস ইংল্যান্ডেই অর্থশাস্ত্রেব প্রধান পাঠ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হওযায অনুমতি হতে পাবে যে, মিল্ -এব অর্থনীতি-ভাবনাব সঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্রেব ঐ সমযেই পবিচয ঘটেছিল। ক্লাসিকাল অর্থনীতিব যে বনিযাদ অ্যাড' স্মিথ ও বিকার্ডো স্থাপন কবেছিলেন, তাব একটা সর্বদিকব্যাপী সুসংহত ও সবলীকৃত রূপ ব এই বইটিতে ছিল।[৯১] হুগলীতে ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্র তর্কশাস্ত্রে হোযাট্‌লিব বই-এব সঙ্গে মিল-এব Logic (1843) পডেছিলেন ; মিল-এব এই বই থেকে সমাজ বিষযে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি সুনিশ্চিতভাবে অবহিত হযেছিলেন।[৯২] ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব প্রথম বৎসবেব বি এ পবীক্ষার্থী (১৮৫৮) বঙ্কিমচন্দ্র পৃথক বিযয হিসাবে অর্থশাস্ত্র বা অর্থনীতি না পডলেও, তাঁদেব ইতিহাস-পাঠ্যক্রমে অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ছাত্রেবা পডতেন মিল্-এব বই।[৯৩] সুতবাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র বৃটিশ ক্লাসিকাল অর্থনীতি, বিশেষভাবে, জন স্টুর্যাট মিলেব অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনাব দ্বাবা প্রভাবিত হযেছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দেব পব মিল্ প্রখ্যাত ফবাসী চিন্তাবিদ্ অগাস্ট কোম্‌ৎ (১৭৯৮-১৮৫৭)-এব চিন্তাধাবাব প্রভাবে আসেন। এই প্রভাবেব ফল মিলেব পূর্বোক্ত Principles বইটিতে প্রকাশিত। বহু ব্যাপাবে কোম্‌ৎ-এব মতেব বিবোধী হলেও কোমতেব প্রভাবেই মিল অর্থশাস্ত্রকে সমাজ-সম্পর্কিত একটি ব্যাপকতব বিদ্যাব অংশবিশেষ হিসাবে দেখা শুরু কবেন এবং সম্পর্কিত অনুসন্ধানে পর্যবেক্ষণ-নির্ভব empirical method-কেই মূলত গ্রহণযোগ্য মনে কবতে থাকেন।[৯৪] বঙ্কিমচন্দ্র মিলেব অর্থনীতিভাবনাব ক্লাসিকাল বিষয়বস্তু এবং পর্যবেক্ষণ-নির্ভব পদ্ধতি এই দুটি দিকেব দ্বাবাই গভীবভাবে প্রভাবিত হযেছিলেন। মিল্ তাঁব অর্থনৈতিক চিন্তাব শেষ পর্যাযে ক্লাসিকাল অর্থনীতিব বক্তব্য থেকে সবে আসতে শুরু কবেছিলেন। মিলেব মৃত্যুব পব এ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "মিলেব কল্পনা এই যে পৃথিবীব ভূ-সম্পত্তিব উপসত্ব ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে ; ইহাব কিয়দংশ কেবলমাত্র সভ্যতাব উন্নতিজনিত ; তাহাতে কাহাবও আয়াস বা অর্থব্যয় হয় না, কিন্তু কেবল কতিপয় ভূম্যাধিকাবীই তাহাব ফলভোগী হয়েন। যদ্যপি উপস্বত্বেব এই বর্দ্ধিত অংশ বাজহস্তে সমর্পিত হয়, তবে

ক্রমশ বাজকবেব লাঘব হইয়া বাজ্যস্থ তাবৎ লোকেই ইহাব কিছু কিছু অংশ পাইতে পাবেন।"[১৫] বাযতওযাবী ভূমি-ব্যবস্থাব সপক্ষে মিল্-এব এই তাত্ত্বিক যুক্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপেক্ষা কবতে পাবেননি। বস্তুত মিলেব অর্থনৈতিক চিন্তাব নানা উপাদান সমূহ 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধে প্রতিফলিত হযেছিল বলেই বিশ বছব পবে প্রবন্ধটিব পুনঃপ্রকাশেব সময বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে, এতে অর্থশাস্ত্রঘটিত কযেকটা কথা আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধটিকে 'সমাজতত্ত্ব'-বিষযক বলে আখ্যা দিযেছিলেন, 'সমাজবিজ্ঞান' শব্দটি ব্যবহাব কবেননি ; পববর্তী কালে তাঁব 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থেও Sociology বা সমাজতত্ত্ব শব্দটি ব্যবহৃত হযেছে।[১৬] বোঝা যায শব্দটিব প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রেব দুর্বলতা ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্কিচন্দ্র অগাস্ট কোম্‌ৎ ব্যাখ্যাত দৃষ্টবাদ (Positivism) মতেব সঙ্গে এবং 'সমাজতত্ত্ব' আখ্যাটিব সঙ্গে পবিচিত হন। সেই সময থেকে প্রায ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব দৃষ্টবাদী বন্ধুবান্ধবদেব সঙ্গে মাঝে মধ্যে আলোচনা কবলেও এবং বঙ্গদর্শনে দৃষ্টবাদ বিষযক আলোচনাকে জাযগা কবে দিলেও তিনি স্বযং দৃষ্টবাদেব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব দিকটি ছাড়া অন্য কোনও দিকেব দ্বাবা প্রভাবিত হননি। এই সমযে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাপক ও গভীবভাবে জন স্টুযার্ট মিলেব চিন্তাধাবাব দ্বাবা প্রভাবিত থাকায দৃষ্টবাদেব সেই অংশটুকুই গ্রহণ কবেছিলেন, যা তাঁব কাছে মিলেব চিন্তাভাবনাব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হযেছিল। মনে হয, এব ফলেই সমাজ-বিষযক একটি নতুন বিজ্ঞান-সম্মত বিদ্যা বোঝাতেই কোম্‌ৎ-প্রচাবিত সমাজতত্ত্ব (Sociology) শব্দটিব প্রতি তাঁব কিছু দুর্বলতা গড়ে উঠেছিল। মনে বাখা দবকাব যে, কোম্‌ৎ-প্রচাবিত দৃষ্টবাদেব প্রগতি বিবোধী ধর্মীয ও সামাজিক ভাবনাব প্রভাব ৰূপান্তবিত বঙ্কিমচন্দ্রেব উপব ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দেব পবই গভীবভাবে পড়েছিল, এই সমযেব পূর্বে নয।[১৭] কিন্তু 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রবন্ধে তিনি যে সমাজতত্ত্ব শব্দটি সমাজবিজ্ঞান বোঝাতেই ব্যবহাব কবেছিলেন তা মনে কবাব কতকগুলি সঙ্গত কাবণ আছে। প্রথমত, ঐ সমযে মিল্-এব চিন্তাভাবনাব প্রতি তাঁব অনুবাগেব জন্য কোম্‌ৎ-প্রভাবিত মিলেব অনুসবণে সমাজেব বিজ্ঞান-সম্মত অনুসন্ধান বোঝাতে সমাজতত্ত্ব শব্দটিব ব্যবহাব স্বাভাবিক ছিল। দ্বিতীযত, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁব পবম স্নেহভাজন বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায বচিত 'সমাজবিজ্ঞান' প্রবন্ধে বিদ্যা হিসাবে সমাজবিজ্ঞানেব বিশ্লেষণ ও মূল্যাযন থেকে অনুমান কবা যায যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব লেখায সমাজতত্ত্ব শব্দটি এই সমাজবিজ্ঞান বোঝাতেই ব্যবহাব কবেছিলেন।[১৮] আমাদেব মনে হয এ দুটি কাবণ ছাড়াও অনেক বেশী জোবালো একটি পবিস্থিতিগত কাবণেব জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব প্রবন্ধে সমাজবিজ্ঞান বোঝাতেই 'সমাজতত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহাব কবেছিলেন। এই পবিস্থিতিগত কাবণটিব বিশ্লেষণ ছাড়া ঐ সমযে বঙ্কিমচন্দ্রেব চিন্তাব পবিমন্ডলটি ভালভাবে বোধগম্য হবে না। এক কথায বলতে গেলে এই কাবণটি সম্পর্কে বলতে হয যে, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দেব মহাবিদ্রোহেব পব বেভাবেন্ড জেমস্ লঙ (১৮১৪-১৮৮৭) কলকাতায সমাজবিজ্ঞান চর্চাব ব্যাপাবে যে উদ্যোগী ভূমিকা ও ব্যাপক কর্মপ্রচেষ্টা গ্রহণ কবেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাব প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত বাখতে পাবেননি।[১৯]

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডে National Association for the Promotion of Social Science প্রতিষ্ঠিত হয় কিছুটা অগাস্ট কোমতেব কল্পিত Sociology বা সমাজতত্ত্বেব আদর্শে, কিন্তু মূলত বৃটেনেব প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক ঐতিহ্য-পুষ্ট সমাজসমীক্ষাব দীর্ঘকালীন চর্চাব ভিতেব উপব দাঁড়িযে। ইংল্যান্ডে সমাজ-বিজ্ঞান চর্চাব এই প্রচেষ্টাব প্রভাবেই কলকাতায় লঙ সাহেবেব

উদ্যোগে ও নেতৃত্বেই সদ্য বিজ্ঞান-পর্যায়ে উন্নীত সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞানের অনুশীলন ও অনুসন্ধান শুরু হয় ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে বেথুন সোসাইটির একটি শাখার মাধ্যমে। লঙ্ সাহেব অক্লান্ত পরিশ্রম করে ভারতবাসীদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধানের জন্য ৫০০ টি প্রশ্ন রচনা করেন ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে এবং স্বয়ং তথ্য-সংগ্রহে সচেষ্ট হন। "পুঁথিগত বিদ্যা নয়, গভীর ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ সমাজ-বিজ্ঞানের অনুশীলনে অপরিহার্য।... অন্তর্মুখী শিক্ষার জন্য প্রাচীন হিন্দুদের চিন্তা অবরোহী (deductive) হয়েছে; ফলে বেকনের আরোহী (inductive) পদ্ধতি উপেক্ষিত হয়েছে। এখন যুগের পরিবর্তন হয়েছে।[১০০] এই রকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই লঙ সাহেব এদেশে সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্বয়ং নীলকর-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত ও বিচারে দণ্ডিত হওয়ার ফলে তাঁর এই উদ্যোগ সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং লঙ্ বিলাত যাত্রা করেন (১৮৬২)। এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর লঙ্ সাহেবের সমাজ-বিজ্ঞান চর্চার কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। অবশ্য বঙ্কিমের সহপাঠী কেশবচন্দ্র সেন এবং সুহৃদ প্রধান 'নীল দর্পন'-কার দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে কৃষক-বন্ধু লঙের ঘনিষ্ঠতা বঙ্কিম মানসে পরোক্ষ ছায়াপাত করে থাকতে পারে।

লঙ্ সাহেবের প্রথম প্রচেষ্টার থেকে দূরে থাকলেও কিন্তু লঙ্ যখন দ্বিতীয় বারের জন্য (১৮৬৬-১৮৭২) কলকাতায় এলেন এবং সমাজ বিজ্ঞান-চর্চায় তাঁর আরব্ধ কাজকে পরিপূর্ণতা দিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু করলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রও এই উদ্যোগ থেকে আর নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। লঙ্ সাহেব ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে বড় বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজে প্রদত্ত তাঁর "Social Science— its utility for India" নামের বিখ্যাত বক্তৃতায় প্রস্তাব করেন গ্রেট বৃটেনে সমাজ-বিজ্ঞান সভার আদর্শে বঙ্গদেশে একটি সভা স্থাপনের।[১০১] তাঁর এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে আলাপ আলোচনা চলে, তার ফলেই অবশেষে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা (The Bengal Social Science Association) গঠিত হয়। ঐ বৎসরই Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত Social Science in India প্রবন্ধে পাদরি লঙ্কেই এদেশে সমাজবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। লঙ্ সাহেব যে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন শুধু তাই নয়, এই সভার দেশীয় সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র এবং তাঁর ভাই উক্ত সভার অন্যতম সদস্য কিশোরীচাঁদ মিত্রের সঙ্গেও লঙের দীর্ঘকালীন যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল।[১০২] একদা-বরদাস্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এই কিশোরীচাঁদ-সম্পাদিত Indian Field পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ইংরেজী ভাষায় রচিত Raj Mohan's Wife প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে, আর বাংলা উপন্যাস রচনায় টেকচাঁদ ঠাকুর অর্থাৎ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত) যে গভীরভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা এক ঐতিহাসিক সত্য।[১০৩] স্বভাবতই বোঝা যায় যে, প্যারীচাঁদ- কিশোরীচাঁদের সঙ্গে এই যোগাযোগই বঙ্কিমচন্দ্রকে সমাজ-বিজ্ঞান সভার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। এর ফলেই বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ-বিজ্ঞান সভায় দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন— (১) ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারী The Origin of Hindu Festivals এবং (২) ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী A popular Literature for Bengal।[১০৪] এই দুটি প্রবন্ধই সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা এবং প্রথম প্রবন্ধটির আলোচনা কালে লঙের উপস্থিতি এবং দ্বিতীয়টির উপাদান হিসাবে লঙের রচিত এ প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাদির তালিকা তিনটির পরোক্ষ ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

রেভারেন্ড লঙের দ্বারা সৃষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানচর্চার পরিমন্ডলটি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধুমাত্র কলকাতাতেই আকৃষ্ট করেছিল তাই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে এসেও, রেভারেন্ড লঙেরই উৎসাহে বহরমপুরেও সমাজ-বিজ্ঞান-চর্চার যে-প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, সেই পরিমন্ডলেই সামিল হয়েছিলেন। লঙ্ ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন বাংলার মুসলমানদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে। সেই সময়েই তিনি বহরমপুরেও এসেছিলেন এবং স্বল্পকাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর কলেজের আইনের ক্লাসে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ অধ্যাপক রাসবিহারী ঘোষের বক্তৃতায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সে-সময়ে ঐ কলেজেই বাংলার দেশীয় খ্রীশ্চান সমাজে সুপরিচিত এবং কলকাতা বেথুন সোসাইটি সূত্রে লঙেরও পূর্ব-পরিচিত রেভারেন্ড লালবিহারী দে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। এই লালবিহারীর সাহায্যেই লঙ্ বহরমপুরে সামজবিজ্ঞান চর্চার প্রচেষ্টা চালু করেন। লঙ্ বহরমপুরেও উত্তরপাড়া, কৃষ্ণনগর ও সিউড়ীর মত সমাজ-বিজ্ঞানের তথ্য-সংগ্রহে জন্য একটি সোসাইটি গঠন করেছিলেন।[১০৫] একথা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, বহরমপুরের সোসাইটির প্রাণ-পুরুষ ছিলেন লালবিহারী, কেননা, ঐ ১৮৬৭-৬৮ খ্রীস্টাব্দেই অর্থাৎ লালবিহারীর বহরমপুর বাস কালেই কলকাতায় পুর্নগঠিত বেথুন সোসাইটির সমাজতত্ত্ব শাখার সভাপতি ও সম্পাদকও হয়েছিলেন যথাক্রমে লঙ্ এবং লালবিহারী।[১০৬] বহরমপুরে সমাজবিজ্ঞান চর্চার এই ধারাটি যাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল ; সেই লালবিহারীই ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসার পর প্রতিষ্ঠিত গ্রান্ট হল সাহিত্য-সভারও কেন্দ্রীয় পুরুষ। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান চর্চার একটি পরিমন্ডলের সঙ্গে বহরমপুরে এসেও বঙ্কিমচন্দ্র যুক্ত ছিলেন। বাংলার কৃষকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য লালবিহারী-রচিত Gobinda Samanta এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' এই দুটি রচনার পিছনেই যে এদেশে সমাজ-বিজ্ঞান-চর্চার উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিদ্যমান ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।[১০৭] সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে 'সমাজতত্ত্ব' শব্দটি সমাজবিজ্ঞান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছিল। কেবলমাত্র ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীতে 'সমাজতত্ত্ব' শব্দটি ভিন্নতর অর্থে— সমাজবিজ্ঞান না বুঝিয়ে কোম্‌তের সমাজ-সম্পর্কিত বিশেষ ধরনের নৈতিক মতবাদ বোঝাতে— ব্যবহৃত হতে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শুধু সমাজবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেই নয়, 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের সঙ্গে জড়িত আরো দুটি বিষয়েও লঙ্ সাহেবের চিন্তাভাবনার প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর পড়ে থাকতে পারে একথা মনে করার কারণ আছে। প্রথমত 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাইতে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত অধিকতর কাম্য ছিল— বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যের পিছনেও লঙের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরণন লক্ষ্যণীয়, যদিও তাঁর দূরবর্তী ভাবগুরু জন স্টুয়ার্ট মিলের চিন্তা-ভাবনার ছাপও এখানে কিছুটা আছে।[১০৮] দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-চেতনার উপরও লঙের চিন্তা-ভাবনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। লঙ তাঁর একটি বিখ্যাত রচনায় ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে লিখেছিলেন যে মানবজাতির "ইতিহাস রাজা পুরোহিত যুদ্ধবেত্তাদের ইতিহাস নয়— এই ইতিহাস মানুষের ইতিহাস, জনগণের ইতিহাস। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে ভারতবর্ষের জনগণের কোনো ইতিহাস নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাস রাজা-পুরোহিত-যুদ্ধ বেত্তাদের যুদ্ধ, চক্রান্ত ও কুটনীতির ইতিহাস।"[১০৯] ভারত ও বাংলার ইতিহাস-সম্পর্কে আবাল্য যে-সংস্কার বঙ্কিমচন্দ্রের গড়ে উঠেছিল, তা ছিল বৃটিশ-প্রশাসন প্রবর্তিত এই রাজা-রাজড়ার ইতিহাসের, অথচ বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অল্প যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেগুলিতে

লণ্ডেব নির্দেশিত জনগণেব সামাজিক ইতিহাসই বচনাব চেষ্টা তিনি কবেছিলেন।[১১০] বঙ্কিমচন্দ্রেব ইতিহাস-দৃষ্টি প্রসঙ্গে এই দুই ধবনেব ইতিহাসেব প্রভাব তাঁব ভাবনা-প্রবাহকে যে ভিন্ন ভিন্ন খাতে চালিত কবেছিল, বিশেষভাবে মুসলিমদেব সম্পর্কে তাঁব মনোভাবেব উপব যে এব প্রভাব পড়েছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ নেই। বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধেব মধ্যেও সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁব এই সচেতনতাব সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান।[১১১]

বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধটিব পিছনে অর্থশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস-চর্চাব বীতি-পদ্ধতিব যে প্রভাব পড়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব সত্যানুসন্ধানেব হাতিযাব হিসাবে তাঁব স্বদেশী সমাজেব দিকে তাকানোব চশমা হিসাবে এ বিদ্যাগুলিকে যে ভাবে ব্যবহাব কবেছিলেন তাব থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায যে, এই বিদ্যাগুলিব উদ্ভব, প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তাঁব মনে জাগেনি। শিল্প-বিপ্লবোত্তব ধনতান্ত্রিক বৃটিশ সমাজেব আভ্যন্তবীণ প্রযোজনে সেই সমাজকে জানা-বোঝা-ব্যাখ্যাব জন্য সমাজ-সম্পর্কিত যে সকল বিদ্যাব উদ্ভব ঘটেছিল, সেগুলিব বীতি-পদ্ধতি অনুসবণ কবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমি যুক্ত আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ধনতান্ত্রিক ও আধুনিক শিল্পাযনেব প্রায-স্পর্শশূণ্য বাংলাদেশেব সমাজকে আদপেই বোঝা ও ব্যাখ্যা কবা সম্ভব কী না, এ-জিজ্ঞাসা বঙ্কিমচন্দ্রকে সে-ভাবে পীড়িত কবেনি। 'জাতীযতাবাদী' বঙ্কিমচন্দ্রেব দৃষ্টিভঙ্গীব এই সীমাবদ্ধতাব উৎস যে তাঁব নিজস্ব ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটেব মধ্যে নিহিত সে-বিষযে সন্দেহ নেই।'[১১২] এই প্রসঙ্গে স্মবণীয যে, ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দেব পববর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র ইউবোপীয প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌গণেব তীব্র বিরূপ সমালোচনা কবেছিলেন; কিন্তু, এই সমালোচনা ছিল অতীতেব হিন্দু-গৌববেব অবস্থান থেকে; তাঁব পক্ষে সমভাবে মুসলিম-শাসন কালেব মধ্যযুগেব ভাবত সম্পর্কে ইউবোপীয ঐতিহাসিকদেব বচনাবলীব তীব্র সমালোচনা কবা কখনই সম্ভব হযনি, সম্ভব হযনি সাধাবণভাবে ধর্ম-নিবপেক্ষ জাতীযতাবাদী অবস্থান গ্রহণ কবা।[১১৩]

## সাত

বঙ্গদেশেব কৃষক পুনর্মুদ্রণেব সমযে বচনাটি পুনর্মুদ্রণেব অন্যতম কাবণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "ইহাব পব হইতে কৃষকদিগেব অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইযাছে, ইহাতে তাহাব প্রথম সূত্রপাত, সুতবাং পুনর্মুদ্রিত হইবাব এ প্রবন্ধ একটু দাবি দাওযা বাখে।" সাধিত উন্নতিব স্বরূপও তিনি বিশ্লেষণ কবেছিলেন, 'বঙ্গদেশেব কৃষক'-এ দেশীয কৃষকদিগেব যে অবস্থা বর্ণিত হইযাছে, তাহা আব নাই। জমিদাবেব আব সেরূপ অত্যাচাব নাই। নতুন আইনে তাঁহাদেব ক্ষমতাও কমিযা গিযাছে। কৃষকদিগেব অবস্থাবও অনেক উন্নতি হইযাছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায, প্রজাই অত্যাচাবী, জমিদাব দুর্বল।"[১১৪]

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদেব অবস্থা নিযে সমাজে যে-আন্দোলনেব কথা বলেছেন, তা ছিল ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দেব পাবনাব কৃষক বিদ্রোহ এবং তাব প্রভাবজ প্রায এক দশক ব্যাপী বাংলাব বিভিন্ন জেলাব কৃষক আন্দোলন; তিনি যে 'নতুন' আইনেব কথা বলেছেন, সে আইন ছিল এই আন্দোলনেব ফলে বচিত ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দেব বঙ্গীয প্রজাস্বত্ব আইন। 'বঙ্গদেশেব কৃষক' প্রকাশিত হওযাব পব থেকে কৃষকদেব অবস্থা নিযে সমাজে আন্দোলন শুরু হযেছিল এ-কথা বলাব মধ্যে দিযে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই এ দুটি ঘটনাব মধ্যে কোনও প্রকাব কার্য-কাবণ সম্পর্কেব

ইংগিত কবেন নি, দুটি ঘটনাব কালগত পবম্পবাকেই তুলে ধবেছেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্গদেশেব কৃষক প্রকাশিত হযেছিল ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দেব আগস্ট থেকে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দেব মার্চ মাসেব মধ্যে ; অন্যদিকে, পাবনাব কৃষক বিদ্রোহ শুরু হযেছিল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দেব মে মাস থেকে, চবম পর্যাযে পৌঁছেছিল জুন-জুলাই মাসে এবং আপাতদৃষ্টিতে স্তিমিত হযে এসেছিল অক্টোবব মাস থেকে, যদিও ইতিমধ্যেই এই বিদ্রোহেব প্রভাবে বাংলাব অন্যান্য জেলায সূচনা হযেছিল কৃষক আন্দোলনেব।[১১৫]

পাবনা বিদ্রোহ বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধেব প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ প্রভাবে ঘটেনি, বাংলাব কৃষি-অর্থনীতিব তৎকালীন কিছু সুনির্দিষ্ট কাবণেব জন্যই এই বিদ্রোহ এবং এব পববর্তী আন্দোলন দেখা দিযেছিল। কিন্তু সুনির্দিষ্ট কাবণ থাকলেও ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে হঠাৎই এই বিদ্রোহেব সূচনা হয নি। ঐ সকল কাবণেব সম্মিলিত ফলাফলেই এমন একটি পবিস্থিতিব উদ্ভব হযেছিল যা অনিবার্য কবে তুলেছিল এই বিদ্রোহকে। অন্যভাবে বলা যায, পাবনা বিদ্রোহেব অব্যবহিত পূর্বে এব একটি সুস্পষ্ট প্রস্তুতিপর্ব লক্ষ্য কবা যায। আমবা সবিনযে নিবেদন কবতে চাই যে, পাবনা বিদ্রোহেব এই প্রস্তুতিপর্বেব সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধটি বচনাব এক ধবনেব ঘনিষ্ঠ পবোক্ষ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। ইতিপূর্বেই বর্তমান প্রবন্ধেব 'তিন' সংখ্যক অনুচ্ছেদে আমবা দেখিযেছি যে, বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধেব প্রথম পবিচ্ছেদ ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দেব শেষ দিকে লিখতে শুরু কবলেও দ্বিতীয পবিচ্ছেদটি বা তাব শেষাংশ লিখিত হযেছিল ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দেব সেপ্টেম্বব-অক্টোবব মাসে। এ কথা মনে কবাব কাবণ আছে যে, প্রথম পবিচ্ছেদ বচিত হওযাব দীর্ঘদিন পবে দ্বিতীয এবং পববর্তী পবিচ্ছেদগুলি বচিত হওযাব পিছনে পাবনা বিদ্রোহেব প্রস্তুতিপর্বেব প্রভাব পডেছিল। বঙ্গদেশেব কৃষক বচনাব অব্যবহিত পবেই, পাবনা বিদ্রোহ চলা কালেই, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন তাঁব বিখ্যাত 'সাম্য' প্রবন্ধাবলী ; এই প্রজাবিদ্রোহেব উত্তপ্ত স্পর্শই যেন ধবা পডেছে এই প্রবন্ধাবলীতে।[১১৬]

কী ভাবে পাবনা বিদ্রোহেব প্রস্তুতি পর্বেব প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রেব চিন্তা-ভাবনাব উপব পডেছিল এবাবে আমবা তা খতিযে দেখতে পাবি। প্রথমেই পাবনা বিদ্রোহেব প্রস্তুতি পর্ব সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি পেশ কবা যেতে পাবে। পাবনা জেলাব সিবাজগঞ্জ মহকুমাব ইসফশাহী পবগণা উনিশ শতকেব ত্রিশেব দশকে নাটোবেব বাজাদেব মালিকানা থেকে কলকাতাব ঠাকুব, ঢাকাব বন্দ্যোপাধ্যায, সলপেব সান্যাল, স্থলেব পাকডাশী ও পোবজনাব ভাদুডি এই পাঁচটি বড জমিদাব পবিবাবেব মালিকানায আসে। কিন্তু এই নতুন জমিদাবদেব সঙ্গে পবগণাব বাযত-প্রজাদেব সম্পর্ক প্রথম থেকেই ভাল ছিল না। নিজেবা জঙ্গল হাসিল কবে নিযে বাযত প্রজাবা বসতি স্থাপন কবতো বলে নাটোব জমিদাবদেব আমলে ইসফশাহী পবগণাব খাজনা ছিল বেশ কম। কিন্তু নতুন জমিদাবেবা প্রজাদেব কাছ থেকে কম খাজনাব ঘাটতি পুষিযে নিতে থাকল বহুবকম 'আবওযাব' বা সেস্ (cess) আদায কবে। কিন্তু এতেও জমিদাবদেব অর্থলোভ তৃপ্ত না হওযায তাবা জমিব মাপ কমিযে খাজনা বৃদ্ধি কবতে থাকল। ইসফশাহীব এই সব নতুন জমিদাববা হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাহায্যে বেআইনীভাবে প্রজাদেব কাছ থেকে আদায অব্যাহত বাখায এই পবগণাব খাজনাব হাব যেমন পার্শ্ববর্তী অন্যান্য পবগণাব চেযে বেশী হযে দাঁড়িযেছিল, সেই বকম কৃষক অসন্তোষও এখানে তীব্রতব হযে উঠছিল।[১১৭]

এই অবস্থায ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দেব বাজস্ব আইনে জমিদাবদেব একদিকে যেমন প্রজাকে নোটিস-সাপেক্ষে খাজনা বৃদ্ধিব অধিকাব দেওযা হলো, অন্যদিকে সেইবকম সকল প্রকাব

'আবওয়াব' আদায় বিলোপ করা হলো এবং জমিতে দখলী রায়ত-স্বত্ব স্বীকার করা হলো। কিন্তু প্রজা-স্বার্থের অনুকূল রাজস্ব আইনের এই সকল ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা সম্ভব তো হলোই না, বরং খাজনা বৃদ্ধির দেওয়ানী মামলায় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে জমিদারেরা হেরে যেতে থাকায় জমিদার-প্রজার সম্পর্ক তিক্ততর হয়ে উঠতে থাকল।[১১৮] বাংলার জমিদার-প্রজার এই ক্রমবর্ধমান চাপা বিরোধও উত্তেজনা বাংলার নতুন লেফটেনান্ট-গভর্নর কর্মদক্ষ ও সংস্কার উৎসাহী স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের প্রাদেশিক শাসনপর্বে (১৮৭১-১৮৭৪) প্রকাশ্যে এসে দাঁড়াল।[১১৯] এই বিরোধের প্রথম বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেল ইসফশাহী পরগণাতেই।

ক্যাম্বেল প্রশাসনের কিছু প্রশাসনিক নীতির সঙ্গে পাবনা জেলার পরিস্থিতি বিস্ফোরক হয়ে ওঠার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের রাজস্ব আইন কার্যত কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার বদলে জমিদারদের হাতকেই শক্ত করেছিল। বিশেষত এই আইনের সুযোগ নিয়েই জমিদারেরা গোটা প্রদেশেই এন্তার খাজনা বৃদ্ধি করতে শুরু করেছিল। এর ফলে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান প্রজা বিক্ষোভের জন্য সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর থেকে ক্রমশ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা নানা রকম বেআইনী 'আবওয়াব' বা সেস্ (cess) বিষয়ক সমস্যা। আইন-সম্মত খাজনার ক্রমবৃদ্ধির উপর এই বেআইনী 'আবওয়াব'-এর বোঝা কৃষকদের কাছে হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। এ-ছাড়াও দীর্ঘায়ত ও বিতর্কিত একটি সমস্যা ছিল। স্থানীয় উন্নয়নের জন্য জমিদারদের উপর কোনো কর আরোপ করলে তা জমিদারদের দেয় খাজনা সম্পর্কে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শর্তাদি লঙ্ঘন করবে কী না, এই বিতর্ক বহুদিন ধরে চলেছিল এবং তার ফলে এ-বিষয়ে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ভারত সচিব স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জমিদারদের উপর কর আরোপের সিদ্ধান্ত নিলে এ-বিষয়ে পদক্ষেপ জরুরী হয়ে উঠেছিল। কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ক্যাম্বেল এই সকল প্রশাসনিক নীতিকেই কার্যকরী করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এবং এই সরকারবী উদ্যোগের ফলে পাবনার জমিদারেরা যে-ধরনের ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছিল নিঃসন্দেহে তার ফলেই উদ্ভব ঘটেছিল পাবনা বিদ্রোহের প্রস্তুতিপর্বের।[১২০]

জর্জ ক্যাম্বেল বাংলার লেফ্টেনান্ট-গর্ভনর হয়ে আসার পর প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে রোড সেস্ আইন (Road Cess Act) রচনা করে। এই আইন অনুসারে রোড সেস্-এর পরিমাণ নির্ধারনের জন্য জমিদারী ও অন্যান্য ভূমিস্বত্বের পরিমাণ ও আয় সম্পর্কে রিটার্ণ দেওয়া মালিকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক করা হলো। কিন্তু রিটার্ণ থেকে জমিদারদের বেআইনী আদায়ের ব্যাপারটি প্রকাশিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। ফলে, বাংলার জমিদারকুল আতঙ্কিত বোধ করতে থাকলেন।[১২১] এই সময়ে কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকায় পাবনার সিরাজগঞ্জে জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হলে লেফটেনান্ট গর্ভনর ক্যাম্বেল স্বয়ং হঠাৎ সিরাজগঞ্জে উপস্থিত হয়ে প্রজার উপর অত্যাচারের সত্যতার প্রমাণ পেলেন।[১২২] এর ফলেই তাঁর আদেশে ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সরকারী কর্মচারীরা পাবনা জেলায় অনুসন্ধান চালিয়ে জমিদারদের আদায় করা বেআইনী 'আবওয়াব' সমূহের একটি তালিকা তৈরী করলো।[১২৩] এছাড়াও এ সময়ে পাবনা জেলায় রোড সেস্ আইন সম্প্রসারণেরও সম্ভাবনা দেখা দিল। এই রকম অবস্থায় ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে একদিকে ঠাকুর জমিদারেরা আইনসম্মত এক বছরের নোটিস না দিয়েই টাকায় প্রথমে আট আনা ও পরে আরো চার আনা খাজনা বৃদ্ধি করলেন এবং অন্যদিকে ব্যানার্জী জমিদারেরা

বেআইনী 'আবওয়াব' আদায় এবং জমির মাপের কারচুপিকে আইনানুগ রূপ দেওয়ার জন্য প্রজাদের কাছ থেকে কবুলিয়ৎ লিখিয়ে নিতে শুরু করলেন।[১২৪] জমিদারদের এইসব কার্যকলাপের ফলে প্রজারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেও বর্দ্ধিত খাজনা দিতে ও কবুলিয়ৎ লিখে দিতে থাকল। কিন্তু কবুলিয়তের শর্তাদির কঠোরতা, বিশেষভাবে জমিদারদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে দখলি স্বত্ব ছাড়তে হবে এই স্বীকৃতি, অল্পদিনের মধ্যেই কিছু প্রজাকে বিচারালয়ে যেতে বাধ্য করলো এবং ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রজাপক্ষ জমিদারদের বিরুদ্ধে একটি মামলায় জেলা আদালতে জিতে গেল।[১২৫] এর ফলে অন্য প্রজারাও সাহসী হলো কবুলিয়ৎ লিখে দেওয়া অস্বীকার করতে। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চের মধ্যে প্রজারা আরো মামলায় জিতে, বর্দ্ধিত খাজনা দেওয়া বন্ধ করে, অপহৃত রায়তকে মুক্ত করে, জমিদারদের শাস্তির ব্যবস্থা করে জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অবস্থায় এসে পৌঁছলো।[১২৬] অবশেষে এপ্রিল মাস থেকে রায়তরা প্রতিরোধের জন্য সংগঠিত হতে শুরু করলো এবং মে মাস থেকে পাবনা বিদ্রোহ দেখা দিল। এ ভাবেই পাবনা বিদ্রোহের বৎসরাধিক কালের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হলো।

পাবনা বিদ্রোহের পূর্ববর্তী বৎসরাধিক কাল ধরে পাবনা জেলায় জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে উঠেছিল এবং বাংলা সরকার এবিষয়ে যে সম্পূর্ণ সচেতন ও ওয়াকিবহাল ছিল, তার অবিসম্বাদী প্রমাণ সরকারী নথিপত্রেই থেকে গেছে। শুধু তাই নয়, পাবনার পরিস্থিতি যে ব্যাপক অসন্তোষ, অশান্তি বা প্রতিরোধের সৃষ্টি করতে পারে এই সম্ভাবনা সম্পর্কে বাংলার প্রাদেশিক সরকারের উচ্চতম মহল পর্যন্ত যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। পাবনা বিদ্রোহের পূর্বেই এই ধরনের সম্ভাবনার কথা, সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও, অন্তত দুজন দায়িত্বশীল সরকারী মুখপাত্র বলেছিলেন। একজন, বাংলার জমিদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত, ম্যাকনীল— জমিদারদের আরোপিত 'আবওয়াব' বিলোপের চেষ্টা হলে ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা পাবনা বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে বলেছিলেন।[১২৭] অন্যজন স্বয়ং ছোটলাট জর্জ ক্যাম্বেল— ১৮৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দের প্রশাসনিক রিপোর্টে জমিদারদের বেআইনী কার্যকলাপের ফলে অসন্তোষ ও প্রতিরোধের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন।[১২৮] পাবনার রায়ত-জমিদার সম্পর্কের এই ধরনের সম্ভাবনার উপলব্ধি প্রশাসনের উচ্চতম স্তর পর্যন্ত প্রসারিত থাকায় এ অনুমান অযৌক্তিক হবে না যে, পাবনা জেলা যে-রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত ছিল সেই বিভাগের সদর দপ্তরে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে প্রথম থেকেই ওয়াকিবহাল তথা সর্তক ছিলেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর, তখন পাবনার মত মুর্শিদাবাদ জেলাও ছিল রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরেই ছিল রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের সদর দপ্তর। সেই সময়ে বিভাগীয় কমিশনার কাজ করতেন প্রাদেশিক সরকার ও জেলা শাসকের মধ্যবর্তী পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের একটি সংস্থা হিসাবে। তাঁর প্রশাসনিক দায়িত্বের মধ্যে ছিল তাঁর অধীনস্থ জেলাশাসকদের দপ্তরগুলির বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জেলার কর্মচারীবৃন্দের কাছ থেকে সংবাদ-সংগ্রহ, এইসকল সংবাদ উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো, অর্থের বণ্টন করা, বিভাগ সম্পর্কে বাৎসরিক ও সাময়িক প্রতিবেদন পেশ করা। অর্থাৎ সে-সময়ে জেলার পরিস্থিতির উপর নজরদারির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের দপ্তরের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। রাজশাহী বিভাগের

অধীনস্থ পাবনা জেলাব ক্ষেত্রেও এব ব্যতিক্রম ছিল না।[১২৯] আব সে আমলে বহবমপুবেব মত একটি ছোট মফঃস্বল শহবে জেলা-প্রশাসনেব বাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপাবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় কর্মচাবী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রেব সঙ্গে বিভাগীয় কমিশনাব এবং তাঁব দপ্তবেব যে বেশ ঘনিষ্ঠ বেসবকাবী সম্পর্ক থাকবে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। এ সম্পর্ক সবকাবী স্তবেও বেশ ভালভাবেই ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দেব ১৫ই এপ্রিল থেকে কযেক মাস বহবমপুবস্থ বাজশাহী বিভাগে কমিশনাবেব পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টান্ট হিসাবে কাজ কবেছিলেন।[১৩০] ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে পাবনা বিদ্রোহেব সমকালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাস্থ্যভঙ্গেব জন্য তিন মাস ছুটি প্রার্থনা কবলে জেলাশাসক তাঁকে ছেড়ে দিতে বাজী হননি, বহবমপুবস্থ বিভাগীয কমিশনাবকে ধবলে তিনিও তাঁকে ছাড়েন নি, কিন্তু বঙ্কিমেব ইচ্ছামত যতবাব হোক Casual leave তাঁকে দিতে বাজী হযেছিলেন।[১৩১] স্পষ্টতই বোঝা যায মুর্শিদাবাদ জেলা-প্রশাসনে বঙ্কিমচন্দ্র যে অপবিহার্য ছিলেন এ সত্য জেলাশাসক এবং বিভাগীয কমিশনাব উভযেই বুঝতেন। বাজশাহী বিভাগেব কমিশনাব বঙ্কিমচন্দ্রেব পূর্ব-পবিচিত E W Molony এই সমযেই বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য কবেছিলেন, "A very good, experienced and clever officer"।[১৩২] এই E W Molony-এব বিচাববুদ্ধি সম্পর্কে ছোটলাট জর্জ ক্যাম্বেলেব ছিল যথেষ্ট আস্থা এবং এঁব সম্পর্কেই ক্যাম্বেল মন্তব্য কবেছিলেন 'একজন শক্ত নিবাপদ ও নির্ভবযোগ্য কর্মচাবী' হিসাবে এবং এঁকেই আমবা পবে দেখি পাবনা বিদ্রোহ সম্পর্কেও অনুসন্ধান কবতে। বঙ্কিমচন্দ্রেব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছাড়াও কমিশনাবেব কাছে তাঁব এই বিশেষ গুরুত্ব ও স্বীকৃতি লাভেব অন্য একটি কাবণও থাকাব সম্ভাবনা। লেফ্‌টেনান্ট-গর্ভনব জর্জ ক্যাম্বেল স্বযং বহবমপুব পবিদর্শনে এসে বঙ্কিমচন্দ্রেব কাজকর্ম দেখে 'সাতিশয তুষ্ট' হযেছিলেন— বঙ্কিমচন্দ্র তখন বোড সেস্-এব কাজকর্মে বিশেষভাবে জড়িত এবং এই কাজই ছিল ক্যাম্বেল-প্রশাসনেব সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।[১৩৩]

বহবমপুবস্থ বাজশাহী বিভাগেব কমিশনাব দপ্তবেব সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেব এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেব প্রতি এতখানি নজব দেওযাব কাবণ হচ্ছে এই যে, বাজশাহী বিভাগেব অন্তর্গত জেলা পাবনাব কৃষক বিদ্রোহেব প্রস্তুতিপর্ব তথা বিদ্রোহপর্ব এই দুই পর্বেব ঘটনাপ্রবাহই এই দপ্তবেব মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্রেব গোচবীভূত হওযাব সমূহ সম্ভাবনা ছিল। ইতিহাসেব সাম্প্রতিক গবেষণায তুলে ধবা হযেছে যে, জর্জ ক্যাম্বেলেব প্রশাসনেব সক্রিয সাহায্য এবং সহযোগিতাব জন্যই পাবনাব কৃষকদেব এই বিদ্রোহ সংঘটিত হতে পেবেছিল।[১৩৪] পাবনা জেলায জর্জ ক্যাম্বেলেব বাজস্ব-সংস্কাব নীতিকে কার্যকবী কবাব জন্য প্রযোজনীয তথ্য-সংগ্রহ, নীতিব রূপাযণ তথা ঘটনাপ্রবাহেব বিবর্তনেব নজবদাবি ও পর্যালোচনা বহবমপুবস্থ বাজশাহী বিভাগীয কমিশনাবেব অফিস থেকেই উক্ত অফিসেব দাযিত্বকর্তব্যেব অংশ হিসাবেই কবা হযেছিল। প্রাদেশিক সবকাবেব নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীব উপলব্ধি ও তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা বিভাগীয স্তবে জেলা স্তব অপেক্ষা অনেক ভালভাবে হওযাব কথা। এই পবিস্থিতিতে পাবনাব ক্রমবর্ধমান কৃষক অসন্তোষ এবং সে-বিষয়ে প্রাদেশিক সবকাবেব মূল্যাযন সম্পর্কে বোড সেস্-এব কাজকর্মে নিযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রেব পক্ষে কমিশনাব দপ্তব-মাধ্যমে ওযাকিবহাল হওযা খুব স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব ছিল। এই কাবণেই পাবনায় জাযমান এক কৃষক বিদ্রোহেব পূর্বগামী পদধ্বনিই যেন বঙ্কিমচন্দ্রেব কানে পৌঁছেছিল— এবং বঙ্গদেশেব কৃষক প্রবন্ধে তাবই ছাযাপাত।

পাবনাব কৃষক অসন্তোষ থেকে বিদ্রোহেব সম্ভাবনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রেব পক্ষে সচেতন

হয়ে ওঠার একটি প্রধান কারণ ছিল বাংলা সরকারের রাজস্ব সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া রোড সেস্ নীতি মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐ সময়ে রূপায়ণের ক্ষেত্রে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। নবীনচন্দ্র সেনের রচনায় দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "বহরমপুরে বদলি হইয়া গেলাম। একে তো রোড সেস্ ইত্যাদি একরাশি কার্যের ভার কালেক্টর ব্যাটা জিদ্ করিয়া বঙ্গদর্শন ও আমার লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে maliciously আমার ঘাড়ে চাপাইল।"[১৩৫] অনুমান করা যায়, ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্গদর্শন প্রকাশের অল্প কিছু পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপর রোড সেস্-এর কাজ চাপানো হয়েছিল। রোড সেস্ আরোপিত হওয়ার পূর্বেই এ-সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানের প্রতিক্রিয়াতেই জমিদারেরা যথেষ্ট খাজনা-বৃদ্ধি শুরু করে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র রোড সেস্-সম্পর্কিত কাজের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার আলোতেই ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখলেন, "রোড সেস্ এই প্রবন্ধ লিপির সময় পর্যন্ত গবর্ণমেন্ট কোথাও হইতে আদায় করেন নাই। কিন্তু জমিদারেরা কেহ কেহ আদায় করিতেছেন। আদায় করিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহা টাকায় এক পয়সার অধিক হইতে পারে না। এক জেলায় একজন জমিদার ইহার মধ্যে টাকায় চারি আনা আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন প্রজা দিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া পীড়ন আরম্ভ করিলেন। প্রজা নালিশ করিলে, এবার আসামী 'আইন অনুসারে' খালাস পাইল না। জমিদার মহাশয় এক্ষণে শ্রীঘরে বাস করিতেছেন।"[১৩৬] জমিদার-প্রজার বিস্ফোরক সম্পর্ক ঘটনা প্রবাহের গতিকে কোন্ দিকে নিয়ে যেতে পারে ১৮৭২-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই রোড সেস্ নিয়ে কাজকর্ম করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝে গেছেন। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসেও দেখা যাচ্ছে যে রোড সেস্-এর পুরানো কাজ তখনও তিনি করছেন।[১৩৭] এমনকি বহরমপুর থেকে বারাসাতে বদলি হওয়ার অল্পদিন পরেই ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদের প্রতিবেশী জেলা মালদহে বঙ্কিমচন্দ্রকে ফিরে আসতে হয়েছিল রোড সেস্-এর কাজের দায়িত্ব নিয়ে।[১৩৮] দেখা যাচ্ছে, লেফ্টেনান্ট-গর্ভনর জর্জ ক্যাম্বেলের কৃষকমুখী নীতির রূপায়ণে রাজশাহী বিভাগের দুটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা মুর্শিদাবাদ ও মালদহে সরকারী কর্মচারী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রথম থেকে এই ভূমিকার ফলেই আসন্ন কৃষক বিদ্রোহের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার সম্ভাবনা তাঁর যথেষ্টই ছিল।

ক্যাম্বেল-প্রশাসনের কৃষক-মুখী নীতির রূপায়ণই শুধু নয়, সম্ভবত এই নীতিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার ব্যাপারেও বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধ থেকেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। আয়ার্ল্যান্ডের ভূমি-ব্যবস্থার একদা গবেষক-ছাত্র কৃষক-বন্ধু জর্জ ক্যাম্বেল ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে বাংলার লেফ্টেনান্ট-গর্ভনর হিসাবে তাঁর কার্যকালের শুরু থেকেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমেই বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে টিকিয়ে রেখে অথচ কৃষক-স্বার্থে রাজস্ব-সংস্কারে অগ্রসর হয়েছিলেন। কৃষক-বন্ধু ক্যাম্বেল কৃষকদের স্বার্থরক্ষার্থে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দের খাজনা আইনের সংশোধনের বদলে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তক কর্ণওয়ালিশ কোডের সংশোধনের কথা বলেছিলেন— বাংলার ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য সাধনে ক্যাম্বেল ব্যর্থ হয়েছিলেন রক্ষণশীল জমিদারী-সমর্থক ভারত-সচিব ডিউক অব্ আর্গিল এবং ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের বিরোধীতায়। ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বজায় রাখা আর কৃষক-স্বার্থ রক্ষা করার মধ্যে রফা করতে হয়েছিল।[১৩৯]

কৃষকমুখী দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত জমিদারী প্রথাকে রক্ষা করার ব্যাপারে ক্যাম্বেল-প্রশাসনের এই মনোভাবই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধের মধ্যেও প্রতিফলিত। বঙ্গদেশের কৃষক প্রকাশেরও প্রায় বৎসরখানেক পরে, পাবনা বিদ্রোহের পরিস্থিতিতে, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ক্যাম্বেল-প্রচারিত সরকারী নীতি-সম্পর্কিত বিখ্যাত ঘোষণাটিতেও অনুরূপ মনোভাবই প্রকাশিত হতে দেখা যায় : "The Government cannot and will not interfere with the rigthts of property as secured by law that they must pay what is legally due from them to those to whom it is legally due ।" উক্ত ঘোষণার অন্য একটি অংশও উল্লেখযোগ্য : "It is perfectly lawful to unite in a peaceable manner to resist any excessive demands of the Zamindars but is not lawful to unite to use violence and intimidation ।"[১৪০] এই অংশটি উল্লেখযোগ্য, কেননা, এই ঘোষণারই অব্যবহিত পরে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে, মীর মোশারফ হোসেন রচিত 'জমিদার-দর্পণ' নাটক সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের সম্ভাব্য উৎস এটিই। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি হলো এইরকম : "বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি, এই পত্র প্রজার হিতৈষী। এবং প্রজার হিতকামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জেলায় প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিস্প্রয়োজনীয়।"[১৪১] এই মন্তব্য কতখানি বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত মনোভাব ও মূল্যায়নের ফল আর কতখানি সরকারী নীতির প্রতিফলন তা বোঝা দুষ্কর।

বাংলায় ক্যাম্বেল-প্রশাসনের অনুসৃত নীতি ও কাজকর্মের সংগে সামগ্রিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ-কথা মনে হতে পারে যে, শুধুমাত্র একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে নয়, জর্জ ক্যাম্বেলের সংগে ব্যক্তিগত পরিচয় এবং তাঁর অনুসৃত নীতির সংগে একধরনের দৃষ্টিভংগীগত একাত্মতা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের কৃষক-সহ তাঁর নানা চিন্তা ভাবনার রসদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ক্যাম্বেল-প্রশাসনের আমলে প্রথম জনগণনা এবং রোড সেস্-এর কাজকর্ম বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছিল— এবং দুটি ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন।[১৪২] ক্যাম্বেল-প্রশাসন জমিদার-প্রজা বিরোধে প্রজাপক্ষের সমর্থন করায় এবং উচ্চশিক্ষার বদলে জনশিক্ষা সমর্থন করায় বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। এই দুই ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র ক্যাম্বেল প্রশাসনের নীতিকেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই সমর্থন বঙ্কিমচন্দ্র কর্মচারী হিসাবে সরকারী দপ্তরের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি, তাঁর চিন্তামূলক প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে বাঙালী শিক্ষিত সাধারণের কাছেও এই বক্তব্যকে তুলে ধরেছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় এগুলি তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসেরও বস্তু ছিল।

উপরে আলোচিত ক্যাম্বেল-প্রশাসনের নীতি-সমূহের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যে একাত্মতা লক্ষ্য করা গেছে, এই প্রশাসনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য নীতি সম্পর্কে তাঁর সেরকম সুস্পষ্ট কোনও প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। এই বিষয়টি হচ্ছে মুসলিমদের সম্পর্কে ক্যাম্বেল-প্রশাসনের নীতি।[১৪৩] বৃটিশ শাসনের শুরু থেকে মুসলিমদের সম্পর্কে অনুসৃত বৈরিতামূলক নীতি বর্জন করে ভাইসরয় লর্ড মেয়োর শাসনকালে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ভারত সরকার মুসলিমদের প্রতি সহানুভূতি-সূচক এক নতুন নীতির সূচনা করেছিল। এ-সম্পর্কিত নির্দেশ জর্জ ক্যাম্বেলের শাসনকালে বাংলা সরকারের কাছে এসে পৌঁছেছিল।

ক্যাম্বেল বাংলাব মুসলিম শিক্ষাব ব্যাপাবে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে অগ্রসব হয়েছিলেন এবং দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন যে, বাংলাব বিপুল সংখ্যক মুসলমানবা সাধাবণ শিক্ষাব ক্ষেত্রে একান্তভাবেই পশ্চাৎপদ। ক্যাম্বেল বাংলাব শিক্ষানীতিতে উচ্চ শিক্ষাব জায়গায় জনশিক্ষাকে যে অগ্রাধিকাব দিয়েছিলেন তা ছিল মূলত সাধাবণ মুসলিমদেব আধুনিক শিক্ষাব আঙিনায় টেনে আনাব জন্য। জনশিক্ষা প্রসাবেব এই নীতিব পাশাপাশি ক্যাম্বেল মুসলিম উচ্চশ্রেণীব পছন্দসই আববি-ফাবসি শিক্ষাব প্রসাবেব ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ কবেছিলেন, মহসীন ফান্ডেব টাকা বিভিন্ন মাদ্রাসাব ও মুসলিম ছাত্রদেব ব্যয় নির্বাহেব জন্য খবচেব ব্যবস্থা কবেছিলেন। মুসলিম শিক্ষা বিষয়ে ক্যাম্বেল-প্রশাসনেব এই নীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রেব তৎকালীন মনোভাবেব পবোক্ষ ইংগিত পাওয়া যায় জনশিক্ষা সম্পর্কে তাঁব ইতিবাচক ও উচ্চশ্রেণীব মুসলিমদেব বাংলাব বদলে আববি-ফাবসি চালনা সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য থেকে। কিন্তু এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রেব সুস্পষ্ট মতামতেব পবিচয় কোথাও মেলে না।

সাধাবণভাবে বলা চলে যে, বাজস্ব-সম্পর্কিত ব্যাপাবে ক্যাম্বেল প্রশাসনেব নীতিব প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রেব যে ধবনেব সর্বাঙ্গীণ সমর্থন ছিল, মুসলিমদেব বিষয়ে এই প্রশাসনেব নীতি সম্পর্কে তিনি ততখানি উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদেব বিশেষ ভাবে মনে বাখা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্রেব সমগ্র সাহিত্য জীবনে মুসলিমদেব সম্পর্কে তাঁব সব চাইতে ইতিবাচক যে সকল মন্তব্যেব সঙ্গে আমবা পবিচিত হই, তা এই ক্যাম্বেল প্রশাসনেব আমলেই, ১৮৭১-১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যেই, বহবমপুবে তাঁব কার্যকালেই কবা হয়েছিল।[১৪৪]

আমাদেব আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র ক্যাম্বেল প্রশাসনেব সকল নীতি সম্পর্কে সমানভাবে আগ্রহী ছিলেন না। মনে হয়, এ বিষয়ে তাঁব আগ্রহ যেমন অংশত ব্যক্তিগত মত বিশ্বাসেব দ্বাবা নির্ধাবিত হয়েছিল, সেই বকম অংশত লেফ্‌টেনান্ট গর্ভনব ক্যাম্বেলেব সঙ্গে তাঁব ব্যক্তিগত পবিচয় ও যোগাযোগেব দ্বাবাও নির্ধাবিত হয়েছিল। বাংলাব ছোটলাট হওয়াব পূর্বে ক্যাম্বেল এক সময় কলকাতা হাইকোর্টেব অন্যতম বিচাবপতি ছিলেন।[১৪৫] সে সময়ে বিখ্যাত ঠাকুবাণী দাসীব মামলায় (১৮৬৫) প্রজাদেব পক্ষে যে বায় সংখ্যাগবিষ্ঠ বিচাবকেবা দিয়েছিলেন, ক্যাম্বেল ছিলেন সেই বিচাবপতিদেব একজন এবং প্রজাপক্ষে এই বায়দানেব ব্যাপাবে বিচাবপতিবা যে বঙ্কিমচন্দ্রেব অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রেব Bengal Ryots বইটিব দ্বাবা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা স্বয়ং বঙ্কিমই লিখে গেছেন।[১৪৬] দু'জনেব পবিচয়েব এটি একটি সূত্র হয়ে থাকতে পাবে। বিশেষত ক্যাম্বেল নিজেও কৃষক সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং আইবিশ কৃষকদেব উপব তাঁব গবেষণা ছিল। ক্যাম্বেলেব এই ধবনেব দৃষ্টিভঙ্গী বঙ্কিমচন্দ্রকে আকৃষ্ট কবে থাকতে পাবে। বঙ্কিমচন্দ্র বহবমপুবে থাকাকালে ক্যাম্বেল বহবমপুব পবিদর্শনে এসে বঙ্কিমচন্দ্রেব কাজকর্মে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট হওয়ায় দু'জনেব সম্পর্ক দৃঢ়তব হওয়াব কথা। শম্ভুচন্দ্র মুখার্জীকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রেব একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে ক্যাম্বেল তাঁকে ভালভাবেই জানতেন।[১৪৭] শম্ভুচন্দ্রকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে তিনি ক্যাম্বেলেব গুণাগ্রাহী নন একথা জানানোব পবেও শম্ভুচন্দ্রেব পত্রিকায় ক্যাম্বেলেব বিশেষ ধবনেব কার্টুন প্রকাশেব বিবোধিতা কবেছিলেন।[১৪৮] এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রকে মন্তব্য কবতে দেখা যায় যে, বাংলা পত্রপত্রিকায় ক্যাম্বেলেব পব তিনিই সম্ভবত সবচেয়ে সমালোচিত ব্যক্তি।[১৪৯] আবো পবে গ্রে ও ক্যাম্বেলেব শাসনকালেব যে তুলনামূলক পর্যালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র কবেছিলেন, তাতে ক্যাম্বেলেব প্রতি তাঁব ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাব যথেষ্ট পবিচয় থেকে গেছে।[১৫০] এই সমস্ত

কিছু থেকে এই সিদ্ধান্ত করতেই হয় যে, শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারী হিসাবেই নয়, প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তিটির প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতাও ক্যাম্বেল প্রশাসনের নীতির প্রতি তাঁকে সহানুভূতিশীল করেছিল। কিন্তু তাই বলে বঙ্কিমচন্দ্রের মত স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিত্ব যে নিজস্ব ব্যক্তিগত মত বিশ্বাস ত্যাগ করে এই ধরনের অবস্থান গ্রহণ করবেন তা মনে করার কারণ নেই।

দক্ষ সরকারী কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ভাবনার যে-স্ফুরণ আমরা বাংলায় ক্যাম্বেল প্রশাসনের আমলে লক্ষ্য করি, তার থেকে এই ধরনের সিদ্ধান্ত অনুচিত হবে না যে, এই প্রশাসনের অনুসৃত নীতিসমূহ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা-বিকাশের ক্ষেত্রে একটি জোরালো অনুঘটকের কাজ করেছিল। বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের এই মানসিক বাতাবরণের পটভূমিতেই রচিত।

## টীকা ও নির্দেশিকা

### চেনা মুর্শিদাবাদ : অচেনা ইতিবৃত্ত

১. প্রতিভা রঞ্জন মৈত্র— *মুর্শিদাবাদ : ইতিহাস-চর্চা; গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা (বহরমপুর), ১৯৮৮। পৃঃ অ-৬৪।*

২. প্রবোধচন্দ্র সেন— *বাংলার ইতিহাস-সাধনা (কলকাতা, ১৩৬০) ; পৃ. ৬৫-১০২।* প্রতিভা রঞ্জন মৈত্র— *পূর্ববৎ ; পৃ. ৬৫-৬৮।*

৩. সুধীর রঞ্জন দাস— *কর্ণসুবর্ণ-মহানগরী, বঙ্গদেশের বিস্মৃত রাজধানী (কলকাতা, ১৯৯২) ; পৃ. ৯৩-১০৯।*

৪. *বিশ্বেশ্বর রায়— সেন্সাস ১৯৬১, পশ্চিমবঙ্গ, ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ (কলকাতা) ; পৃ. ২৬-৩৬।* প্রণব রঞ্জন রায়— *পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটীয়ার্স : মুর্শিদাবাদ (বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য) গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় ; পৃ. ২৮-৮৩ (কলকাতা, ১৯৭৯)।*

৫. বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়— *পশ্চিমবঙ্গের পুরাসম্পদ : মুর্শিদাবাদ (কলকাতা ১৯৮২) ;* কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যরঞ্জন বক্সী— *মুর্শিদাবাদের বাঢ় এলাকা (বহরমপুর, ১৯৮৩) ;*
বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— *গৌড়বঙ্গের রাজ্যসীমা ও বর্তমান মুর্শিদাবাদ ; গণকণ্ঠ, বিশেষসংখ্যা, ১৯৮৭ ;* খাজিম আহমেদ— *বঙ্গে মুসলীম অনুষঙ্গ : মুর্শিদাবাদ ; গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৭ ;*
অশোক কুমার সরকার— *মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো ; গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮।*

৬. একটি জেলা হিসাবে মুর্শিদাবাদের অস্তিত্ব ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল থেকে। ঐ সময় থেকে আজ পর্যন্ত জেলার সীমার কেবলমাত্র প্রান্তিক পরিবর্তনই ঘটেছে। এই অবস্থায় ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ে, যখন মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও নির্দিষ্ট সীমা গড়ে ওঠেনি, সেই সময় থেকে এই অঞ্চলটিকে বোঝানোর জন্যই 'মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মোটামুটিভাবে দক্ষিণে অজয় নদ, পূর্বে গঙ্গা-পদ্মা, উত্তরে তেলিযাগড়ি গিরিসংকট থেকে গঙ্গা এবং পশ্চিমে বর্তমান বীরভূম জেলার পূর্বাঞ্চল এই সমগ্র এলাকাটি বোঝাতেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ গঙ্গা-পদ্মা গৌড়ের উত্তর-পূর্বের কালিন্দী-মহানন্দা প্রবাহ-পথ ছেড়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের বর্তমান প্রবাহ-পথে সরে' আসায় ঐ সময় থেকে 'মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চল' বলতে বর্তমান মালদহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশকে আর বোঝানো হয়নি।

৭. প্রবোধচন্দ্র সেন— *পূর্ববৎ ; পৃ.২৭-৪১।*

৮. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত— *প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা (কলকাতা, ১৩৮৮) ; পৃ. ৭-৮, ৪৫-৭০।* ডঃ অতুল সুর— *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (কলকাতা, ১৯৮৬) ; পৃ.৩৩-৩৯,*

*৫৬-৭১।— বাঙলার সামাজিক ইতিহাস (কলকাতা, ১৯৭৬); পৃ. ১-২৯।*
অশোক কে. ঘোষ— *হিস্ট্রি অব্ দি বেঙ্গলীজ : দি আন্রেকর্ডেড পিরিয়ড; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "হিস্ট্রি অ্যান্ড সোসাইটি : এসেজ্ ইন্ অনার অব্ প্রফেসর নীহার রঞ্জন রায়" (কলকাতা, ১৯৭৮) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃ. ৪১৯-৪২৮।*

৯. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত— *পূর্ববৎ; পৃ. ৭১-৯১।*
অশোক কে. ঘোষ— *পূর্ববৎ; পৃ. ৪২৮-৪৩২।*
*সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়— গ্রাম বাঙলার গড়ন ও ইতিহাস (কলকাতা, ১৯৮২); পৃ. ১-১৭।*
তাপস বসু— *বাংলা দেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য (কলকাতা, ১৪০০ সাল); পৃ. ১-১১।*
রণবীর চক্রবর্তী— *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে (কলকাতা, ১৩৯৮ সাল); পৃ. ১৩-৩১।*

১০. ৯ নং *নির্দেশিকার অনুরূপ।*
সমরেন্দ্রনাথ সেন— *বিজ্ঞানের ইতিহাস, প্রথম খন্ড (কলকাতা, ১৯৫৫); পৃ. ১২-৫৫।*
ই. গর্ডন চাইল্ড— *ম্যান মেকস্ হিমসেল্ফ (গ্রেট ব্রিটেন, ১৯৬৬); পৃ. ৬৬-১০৪।*
ই. গর্ডন চাইল্ড— *হোয়াট হ্যাপেনড্ ইন হিস্ট্রি (গ্রেট ব্রিটেন, ১৯৬৭); পৃ. ৫৫-৭৬।*

১১. সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়— *পূর্ববৎ।*
ই. গর্ডন চাইল্ড— *সোস্যাল ইভোলিউশন (গ্রেট ব্রিটেন, ১৯৫১); পৃ. ৪০-৭৩।*

১২. ডঃ অতুল সুর— *সিন্ধু সভ্যতার স্বরূপ ও অবদান (কলকাতা, ১৯৮০); পৃ. ৭-৪৭।*
ডঃ অতুল সুর— *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন; পৃ. ৭২-৮৯,*
১৩. ডব্লিউ. ডব্লিউ, হার্ন্টার— *দি অ্যানালস্ অব রুরাল বেঙ্গল (লন্ডন, ১৮৮৩); পৃ. ৫৩-৭৯।*
অতুল সুর— *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (কলকাতা, ১৯৭৭); পৃ. ১-৫২।* নীহার রঞ্জন রায়— *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব; ১ম খন্ড; (কলকাতা, ১৩৫৬ সাল); পৃ. ২৯-৮৩। ২য় খন্ড; পৃ. ৯১৫-৯২৬।* অজিত বি. মজুমদার— *দি স্টোরি অব্ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্ অব্ ল'জ ইন বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৬৬); পৃ. ৬-১১।* রাধাকমল মুখোপাধ্যায়— *ওরিজিনস্ অব্ দি ইন্ডিয়ান ভিলেজ সিস্টেম; ইন্ডিয়ান ইন্হেরিটেন্স, ভল্যুম ৩ (বোম্বাই, ১৯৫৬) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃ. ১৫-২৪।*
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়— *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য (কলকাতা, ১৩৪৫ সাল); পৃ. ১-৫৫।*
সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়— *কোল জাতির সংস্কৃতি; সাংস্কৃতিকী (১ম খন্ড) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃ. ৬৩-৯৬।*
শোভারাণী চক্রবর্তী— *বর্তমান বঙ্গসমাজে যাদুবিদ্যা ও লোকায়ত বিশ্বাসের ধারা (কলকাতা, ১৯৭৬); পৃ. ১-৪৪, ৬৭-৯১।*
আব্দুল হাফিজ— *লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ (ঢাকা, ১৯৭৮); পৃ. ৯-১৯।*

১৪. পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত— *পূর্ববৎ; পৃ. ৯২-১২৮।*
সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়— *গ্রাম বাঙ্গলার গড়ন ও ইতিহাস; পূর্ববৎ; পৃ. ৮-১৫।*

অতুল সুব— *সিন্ধু সভ্যতাব স্বরূপ ও অবদান— পূর্ববৎ; পৃ. ২৩-৪৭।* নীহাব বঞ্জন বায়— *পূর্ববৎ। ২য় খন্ড। পৃ. ৯১৬-৯২৬।* অতুল সুব— *হিন্দুসভ্যতাব নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য (কলকাতা, ১৩৮৮ সাল); পৃ. ১৭-২৬।*

১৫. বণবীব চক্রবর্তী— *পূর্ববৎ; পৃ. ৩৩- ৬৭।* ওয়াল্টাব কবেন— *দি ডেভেলপমেন্ট অব্ দি টাউন ইন্ আ্যনশেন্ট ইন্ডিয়া; হিস্ট্রি অ্যান্ড সোসাইটি (পূর্ববৎ); পৃ. ২২৯-২৩৭। সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা। বর্ষ ৬৮। সংখ্যা ১-৪। ভাবতেব গ্রাম-জীবন, পৃ. ১-১৫. ২৮-৪০।* আহমদ শবীফ— *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব (কলকাতা, ১৯৯২); পৃ. ২১-৩২।*

১৬. নির্মল কুমাব বসু— *ট্রাইবাল ইকনমি; "কালচাব অ্যান্ড সোসাইটি ইন্ ইন্ডিয়া" (কলকাতা, ১৯৬৭) গ্রন্থভুক্ত; পৃ. ১৭৪-১৮০।* ডঃ দীনেশচন্দ্র সবকাব— *প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকাব ভাষা; সাংস্কৃতিক ইতিহাসেব প্রসঙ্গ, দ্বিতীয খন্ড (কলকাতা, ১৩৮৯); পৃ. ১১৩-১১৭।* প্রণব বঞ্জন বায— *পূর্ববৎ; পৃ. ২৮।* ডঃ *এন্ ডি. ভট্টাচার্য— এ স্টাডি ইন্ সেট্‌লমেন্ট জিওগ্রাফি ইন্ দি ডিস্ট্রিক্ট অব মুর্শিদাবাদ; সেন্সাস ১৯৬১: ওযেষ্ট বেঙ্গলে ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক: মুর্শিদাবাদ (বি. বায সম্পাদিত) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃ. ১৪৭-১৪৮।*

১৭. অতুল সুব— *বাংলাব সামাজিক ইতিহাস; পূর্ববৎ; পৃ. ৩৪-৩৬।* অজিত বি. মজুমদাব— *পূর্ববৎ।* ডঃ অতুল সুব— *বাঙলা ও বাঙালীব বিবর্তন; পূর্ববৎ; পৃ ৫৬-৭১।* আব. এস. শর্মা— *ওবিজিন অব্ দি স্টেট ইন ইণ্ডিযা; (বোম্বাই, ১৯৮৯); পৃ. ৩০-৪১।*

১৮ সুনীতি কুমাব চট্টোপাধ্যায— *বাঙ্গালীব সংস্কৃতি (কলকাতা, ১৯৯০); পৃ. ৩৬-৪২।* সুকুমাব সেন— *বাঙ্গালা সাহিত্যেব ইতিহাস, প্রথম খন্ড (কলকাতা, ১৯৯১); পৃ. ৪ ৫।* ডঃ জযন্ত কুমাব ঘোষাল— *মুর্শিদাবাদেব স্থান নাম; গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮।*

১৯. ওযাল্টাব কবেন— *পূর্ববৎ।* ডঃ দীনেশ চন্দ্র সবকাব— *পালপূর্ব যুগেব বংশানুচবিত (কলকাতা, ১৯৮৫); পৃ. ৩১-৪৪, ৬৭-৯২, ১৫৪-১৬১।* বিনয ঘোষ— *পশ্চিমবঙ্গেব সংস্কৃতি (কলকাতা, ১৯৫৭); পৃ. ৪০-৪৫।* ডি. ডি কোশাম্বী— *অ্যান্ ইন্‌ট্রোডাকশন্ টু দি স্টাডি অব্ ইন্ডিযান হিস্ট্রি (বোম্বাই, ১৯৮৮); পৃ. ১১০-১৪৩।*

২০. *১৯নং নির্দেশিকাব অনুরূপ।* প্রবোধচন্দ্র বাগচী— *দেশ-বিদেশেব সংস্কৃতি (কলকাতা, ১৯৮৮); পৃ. ২২- ২৫।*
কমল বন্দোপাধ্যায ও সত্যবঞ্জন বক্সী— *মুবশিদাবাদেব বাঢ এলাকা (বহবমপুব, ১৯৮৩); পৃ. ১২-১৭।*
ক্ষিতিমোহন সেন— *চিন্ময বঙ্গ (কলকাতা, ১৯৫৮): পৃ. ৯-৩৯।* ডঃ অতুল সুব— *বাঙলা ও বাঙালীব বিবর্তন (পূর্ববৎ); পৃ. ১০২-১১২।* গাযত্রী সেন মজুমদাব— *বুদ্ধিজম ইন্ অ্যানশেন্ট বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৮৩); পৃ. ১।*

২১. সুনীতি কুমাব চট্টোপাধ্যায— *দি ওবিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব্ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোযেজ (রূপা হ্যাণ্ডবুক ইম্প্রেশন, ১৯৮৫), পার্ট ১; পৃ. ৬২-৯১।*
ডি. ডি. কোশাম্বী— *পূর্ববৎ; পৃ. ১৪৪-২৩৯।*

২২. ডি. ডি কোশাম্বী— *দি কালচাব অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অব্ অ্যানশেন্ট ইন্ডিযা ইন্*

*হিস্টোরিক্যাল আউটলাইন (নিউ দিল্লী, ১৯৮২) ; পৃ. ১২০-১২৮।*

২৩. ডি. ডি. কোশাম্বী— *পূর্ববৎ ; পৃ. ১২৯-১৩২, ১৩৯-১৪৬।* ওয়াল্টার রুবেন— *পূর্ববৎ।*

২৪. নীহার রঞ্জন রায়— *পূর্ববৎ ; ১ম খন্ড ; পৃ ১৩৬-১৩৭, ১৫৮-১৬০।*

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার— *পূর্ববৎ ; পৃ. ৩৯-৪১।*

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত— *বাঙ্গলার ইতিহাস (কলকাতা, ১৩৮৩) ; পৃ ৯-১৩।*

*'সুবর্ণকুড্য' খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' অনুসারে সর্বোৎকৃষ্ট 'পত্রোর্ণা' এবং 'দুকূল' বস্ত্র পাওয়া যেত 'সুবর্ণকুড্য'-তে। অর্থশাস্ত্রে তিনটি জায়গায় 'সুবর্ণকুড্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই 'সুবর্ণকুড্য' কোথায় ছিল? প্রাচীন টীকাকার বলেছেন সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকটে ; আধুনিক ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ও বলেছেন যে সুবর্ণকুড্য কামরূপের নিকটবর্তী। মনে করার কারণ আছে যে কামরূপ অঞ্চলের জনজাতিদের মধ্যে 'মুগা' ও 'এন্ডি' নামক রেশমের দীর্ঘ ঐতিহ্যই 'সুবর্ণকুড্য'-কে কামরূপের নিকটবর্তী বলে সিদ্ধান্ত করার পিছনে কারণ হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু যাঁরা সুবর্ণকুড্যকে কামরূপের নিকটবর্তী বলে' সিদ্ধান্ত করেছেন তাঁরা বিহার ও পশ্চিম বাংলায় 'তসর' নামের আর একরকম রেশম উৎপাদনের ঐতিহ্যকে আপাতদৃষ্টিতে বিবেচনাই করেননি। এখনও পর্যন্ত সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী জনজাতিগুলির মধ্যে এই 'তসর' রেশমের ঐতিহ্য জোরালো ভাবেই বিদ্যমান। সুতরাং সুবর্ণ [illegible] অঞ্চলের সন্নিহিত কোন জায়গাই হতে পারে। এই ধরণের সিদ্ধান্তই করেছিলেন [illegible] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়: "আমি বলি, সুবর্ণকুড্যেরই নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণ ও মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া।" পরবর্তী কালে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ অতুল কৃষ্ণ সুর এই স্থিতি-নির্ণয় মেনে নিয়েছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে একটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হাজির করেছেন: অর্থশাস্ত্র অনুসারে যে-সকল গাছের পাতা খেয়ে বিশেষ ধরণের পলু পোকা সুবর্ণকুড্যে রেশম তৈরী করত তা এই মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেই বিশেষভাবে দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রে দ্বিতীয় একটি প্রমাণের ইংগিতও বিদ্যমান: মগধে তসর রেশমের ঐতিহ্য এখনও বহমান; মুর্শিদাবাদ -বীরভূম অঞ্চলেও 'তসর' রেশমের উৎকৃষ্ট ঐতিহ্য লক্ষ্যণীয়। পৌণ্ড্র ও মগধের পাশাপাশি সুবর্ণকুড্যে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে রেশমের প্রচলন তাই ছিল স্বাভাবিক। তৃতীয় আর একটি প্রমাণ হচ্ছে প্রাগার্যযুগে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষী জনজাতিগুলির মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে বসতি বিস্তার ও গ্রাম পত্তন করা— এই জন জাতিগুলির মধ্যেই আজও 'তসর' রেশমের প্রচলন। ডি ডি কোশাম্বীও অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত 'পত্রোর্ণা'-কে 'তসর' রেশম বলেই উল্লেখ করেছেন।*

*সিলভাঁ লেভীর মতে 'সুবর্ণকুড্য' ও 'সুবর্ণকূট' সমার্থক। 'কুড্য' এই দ্রাবিড়-ভাষা-গোষ্ঠীর শব্দটির অর্থ 'দেওয়াল' বা 'প্রলেপন' ; 'কূট' এই দ্রাবিড় শব্দটির অর্থ হচ্ছে পাহাড় বা নগর। উৎখণিত কর্ণসুবর্ণ নগরীর লোকেদের মতই এখনও ঐ অঞ্চলের লোক দেওয়ালে স্থানীয় রাঙামাটির প্রলেপ দিয়ে থাকে ; এখনও ভাগিরথী-বক্ষ থেকে রাঙামাটির পাড়ের উচ্চতা ৩৫/৪০ ফিট, অতীতে সম্ভবতঃ আরো বেশী ছিল।*

*শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় "এখানকার মাটি সোনার মত রাঙা"। নিকটেই দক্ষিণে ময়ূরাক্ষী*

*নদী জৈন শাস্ত্রীয ঐতিহ্যে 'সুবর্ণবালুকা' নামে পবিচিতি। এ-সব থেকে সহজেই বোঝা যায 'সুবর্ণকুড্য' বা 'সুবর্ণকূট' আখ্যাব কাবণ।*

*কিন্তু সুবর্ণকুড্যেব স্থিতি-সমস্যাব আব একটি জটিলতা বিদ্যমান। ডঃ বাধাগোবিন্দ বসাক সুবর্ণকুড্যেব স্থিতি নির্দ্দেশ কবেছেন ব্রহ্মদেশ বা মালয উপদ্বীপে; ডঃ বমেশচন্দ্র মজুমদাবও প্রায অনুরূপ বক্তব্য বেখেছেন। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অর্থশাস্ত্রে 'সুবর্ণকুড্য' উল্লিখিত হযেছে; পববর্তীকালে বামাযণে, হবিবংশে, ক্ষেমেন্দ্রেব বামাযণ-মঞ্জবীতে এবং বৌদ্ধসূত্র সদ্ধর্ম-স্মৃত্যুপস্থান-সূত্রে 'সুবর্ণকুড্যকদ্বীপম্' উল্লেখ লক্ষ্য কবা গেছে। যাঁবা সুবর্ণকুড্যকে ব্রহ্মদেশ বা মালয উপদ্বীপে অবস্থিত বলে নির্দেশ কবেছেন তাঁবা স্পষ্টতঃই অর্থশাস্ত্র-পববর্তী উপবোক্ত উল্লেখগুলিব উপবই নির্ভব কবেছেন। কিন্তু তাঁবা 'সুবর্ণকুড্য' ও 'সুবর্ণকুড্যকদ্বীপম্' এই দুটি উল্লেখেব মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তাকে উপেক্ষা কবেছেন। এই পার্থক্যেব বহস্য আমাদেব কাছে স্পষ্ট হযে ওঠে যদি আমবা ধবে' নিই যে 'সুবর্ণকুড্য' অঞ্চলেব লোকেবা যে দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন কবেছিল তাকেই আখ্যাযিত কবেছিল 'সুবর্ণকুড্যদ্বীপম্' নামে। খ্রীস্টীয পঞ্চম শতাব্দীতে বক্ত মৃত্তিকাব আবাসিক মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তেব যে শিলালেখ মালয উপদ্বীপে পাওযা গেছে তাব থেকেই এই ধবনেব উপনিবেশ স্থাপনেব ঐতিহ্যেব পবিচয মেলে। সাম্প্রতিক কালে কর্ণসুবর্ণ মহানগবী এবং তাব উপান্তে অবস্থিত বক্তমৃত্তিকা মহাবিহাবেব স্থিতি সঠিকভাবে নির্ধাবিত হওযাব ফলে এই অনুমান অধিকতব সুদৃঢ় হযেছে। অর্থাৎ বলা যায যে অর্থশাস্ত্রেব সুবর্ণকুড্যই পববর্তী কালে কর্ণসুবর্ণ আখ্যাযিত হযেছে। কিন্তু কর্ণসুবর্ণ তো ছিল মহানগবী, তাহলে, সুবর্ণকুড্য বলতে একটি জনপদকে বোঝাত, না, একটি নগবকেন্দ্রকে। আমাদেব অনুমান সুবর্ণকুড্য প্রথমত একটি নগবকেন্দ্রকেই বোঝাতো, কেননা, 'কুড্য' বা 'কূট' এই দ্রাবিড় গোষ্ঠীব শব্দটি নগব বোঝাতেও ব্যবহৃত হত। পববর্তী সমযে সুবর্ণকুড্য একটি অঞ্চল বা জনপদকেই বোঝাত। কোনও কোনও সূত্র থেকে অনুমান কবা যায যে খ্রীস্টীয চতুর্থ শতাব্দীব শেষদিকে বা পঞ্চম শতাব্দী থেকেই 'কর্ণসুবর্ণ' নামটি প্রচলিত হয এক বাজবংশেব নামানুসাবে।*

(হবপ্রসাদ শাস্ত্রী— *প্রাচীন বাংলাব গৌবব; কলকাতা, ১৩৫৩; পৃ. ১৩-১৮;* সুনীতি কুমাব চট্টোপাধ্যায— *ও.ডি.বি এল. পৃ. ৭০;* অতুল সুব— *বাংলা ও বাঙালীব বিবর্তন; পৃ. ১০১;* নীহাব বঞ্জন বায— *বাঙালীব ইতিহাস, ১ম খন্ড; পৃ. ১৮৬-১৮৭;* বাধাগোবিন্দ বসাক— *কৌটিলীয অর্থশাস্ত্র (১ম খন্ড); পৃ. ১১৪-১১৭-১১৮;* বমেশচন্দ্র মজুমদাব— *অ্যানশেন্ট ইন্ডিযান কলোনীজ ইন্ দি ফাব ইস্ট ভলুম ২, সুবর্ণদ্বীপ; পৃ. ৫৩-৬১, ৮২-৮৩;* ডি. ডি কোশাম্বী— *ইনট্রোডাকশন; পৃ. ২১২;* সুধীব বঞ্জন দাশ— *কর্ণসুবর্ণ-মহানগবী; পৃ. ৫০, ৬১-৬২;*

— *বাজবাডি ডাঙ্গা: ১৯৬২; পৃ. ৬;*

মৃণাল গুপ্ত— *বাজা শশাঙ্ক বিদ্যাপীঠ পত্রিকা, ১৯৬৩-৬৪; পৃ. ৭৬-৭৭;)*

২৫. বিনয় ঘোষ— *ভাবতজনকথা (কলকাতা, ১৯৭৪); পৃ. ৬৯।*

কে. এম. পানিক্কব— *এ সার্ভে অব্ ইন্ডিযান হিস্ট্রি (বোম্বাই, ১৯৫৭); পৃ. ৩৫-৩৯।*

ডি. ডি. কোশাম্বী— *পূর্ববৎ; পৃ. ১২৯-১৩০, ১৪৪-১৫৭।*

২৬. ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত— *পূর্ববৎ।*

ডঃ অতুল সুব— *বাঙ্গলা ও বাঙালীব বিবর্তন; পূর্ববৎ; পৃ. ৯৮-১০১।*
ডঃ অতুল সুব— *বাঙালাব সামাজিক ইতিহাস; পূর্ববৎ; পৃ. ৪৫-৪৮।*
তাপস বসু— *পূর্ববৎ; পৃ. ২২-৩৬।*
বণধীব চক্রবর্তী— *পূর্ববৎ; পৃ. ৬৮-১১৮।*

২৭. নীহাব বঞ্জন বায— *পূর্ববৎ। প্রথম খন্ড। পৃ. ২৭৬-২৮১।*
ডঃ অতুল সুব— *বাঙলা ও বাঙালীব বিবর্তন; পূর্ববৎ; পৃ. ৯০-৯৭।*
বিবেকানন্দ ঝা— *ফ্রম ট্রাইব টু আনটাচেবল: দি কেস অব্ নিষাদস্; ইন্ডিয়ান সোসাইটি, হিস্টোবিক্যাল প্রোবিংস ইন মেমাবি অব ডি. ডি. কোশাম্বী (নিউ দিল্লী, ১৯৭৭); পৃ. ৬৭-৮৪।*

২৮. ব্যাবী মবিসন— *পোলিটিক্যাল সেন্টাবস্ অ্যান্ড কালচাবাল বিজিওন্‌স্ ইন আর্লি বেঙ্গল (জযপুব, ১৯৮০); পৃ. ৯০-৯৫।*
বোমিলা থাপাব— *সোস্যাল মোবিলিটি ইন্ অ্যানশেন্ট ইন্ডিয়া'; 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি, হিস্টোবিক্যাল প্রোবিংস' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত (পূর্ববৎ); পৃ. ১১২-১১৪।*
ইবফান হাবিব— *ল্যান্ডেড প্রপার্টি ইন্ প্রি-বৃটিশ ইন্ডিযা; উপবোক্ত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃ. ২৭২-২৭৫।*

২৯. প্রবোধচন্দ্র বাগচী— *ভাবত ও ইন্দোচীন (কলকাতা, ১৩৫৭); পৃ. ৫-৬।*
বিনয ঘোষ— *পূর্ববৎ; পৃ. ৮৪-৮৯।*
বমেশচন্দ্র মজু [illegible]— *বাংলা দেশেব ইতিহাস (কলকাতা, ১৩৫৬); পৃ. ২২৬-২২৭।*
ডঃ আব. সি [illegible]দাব— *অ্যানশেন্ট ইন্ডিযান কলোনীজ ইন্ দি ফাব ইস্ট, ভল্যুম ২, সুবর্ণদ্বীপ, পার্ট ১ (ঢাকা, ১৯৩৭); পৃ. ৪-৫, ৬৯, ৮২-৮৩।*
সুকুমাবী ভট্টাচার্য— *প্রাচীন ভাবত: সমাজ ও সাহিত্য (কলকাতা, ১৩৯৪); পৃ. ১২১-১২৪।— বামচবিত্রেব পূর্ণমূল্যাযন (কলকাতা, ১৯৯২; পৃ. ২২- ২৬।*

৩০. সুকুমাব সেন— *পূর্ববৎ; পৃ. ৩৮, ৫৪-৫৫।*
কাজী দীন মুহম্মদ— *বাংলা ভাষা ও লিপিব ইতিহাস; বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাস, প্রথম খন্ড, (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৭) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃ. ৩৫৫-৩৬৬।*
শিশিব কুমাব দাশ— *বেঙ্গলি লিঙ্গুইস্টিক হিস্টোবিও-গ্রাফি; হিস্ট্রি অ্যান্ড সোসাইটি (পূর্ববৎ) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃ. ৩৮৬-৩৮৭।*
মুস্তাফা নূবউল ইসলাম— *বাংলাদেশ- প্রসঙ্গ উত্তবাধিকাব; বাংলাদেশ: বাঙালী আত্মপবিচযেব সন্ধানে (মুস্তাফা নূবউল ইসলাম সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৯০), পৃ. ৫৮-৭২।*

৩১. ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত— *পূর্ববৎ; পৃ. ৯-১২।*
ডঃ দীনেশ চন্দ্র সবকাব— *পূর্ববৎ; পৃ. ৩৯-৪১, ৬৯-৭০, ৭৪-৭৫, ৮৩, ৯১-৯৪, ১১২-১২৪।*
অজয বায— বাংলাদেশ: *পুবাবৃত্ত, ইতিবৃত্ত; মুস্তাফা নূবউল ইসলাম সম্পাদিত উপবোক্ত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃ. ২৮-৩২।*

৩২. বণবীব চক্রবর্তী— *পূর্ববৎ; পৃ. ১৫৪-১৭৮।*
ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায— *আস্পেক্টস্ অব্ রুবাল সেটলমেন্টস্ অ্যান্ড রুবাল সোসাইটি*

*ইন্ আর্লি মিডাইভাল ইন্ডিয়া (কলকাতা, ১৯৯০) ; পৃ. ১৮-৬২।*

৩৩. র‍্যাবী মরিসন— *পূর্ববৎ ; পৃ. ২৫-২৬, ৯৩-৯৫, ১৩৮-১৩৯।* অনিরুদ্ধ রায়— *মধ্যযুগের ভারত (অনিরুদ্ধ রায় সম্পাদিত) ; কলকাতা, ১৯৮৭ ; পৃ. ২৬-২৮।*
উৎসা পট্টনায়ক— *পিজান্ট ক্লাস ডিফারেনশিয়েশন (দিল্লী, ১৯৮৭) ; পৃ. ২৪-৩২, ৬০-৬৮।*
*প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে রাজা জয়নাগের বপ্পঘোষ বাট তাম্রশাসনে প্রথম 'সামন্ত' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সামন্ততন্ত্র বা feudalism সম্পর্কিত ঐতিহাসিক বিতর্ককে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই প্রবন্ধটিতে 'সামন্ত-ব্যবস্থা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই সামন্ত-ব্যবস্থার সমার্থক শব্দ হিসাবে 'জমিদার-তন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।*

৩৪. রমেশ চন্দ্র দত্ত— *দি পিজান্ট্রি অফ বেঙ্গল (বঙ্গানুবাদ) ; কলকাতা, ১৩৯২ ; পৃ. ১৭-১৮।*
সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়— *পূর্ববৎ ; পৃ. ১৮-৩৮।*
গৌতম ভদ্র— *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ (কলকাতা, ১৯৮৩) ; পৃ. ২৩-২৬।*

৩৫. নীহার রঞ্জন রায়— *পূর্ববৎ ; প্রথম খন্ড ; পৃ. ২৫৫-২৬৫।*
রণবীর চক্রবর্তী— *পূর্ববৎ ; পৃ. ১৭৯-২২০।*

৩৬. ট্রেভর লিং— *বুদ্ধিষ্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আফটার; হিস্ট্রি অ্যান্ড সোসাইটি (পূর্ববৎ) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ; পৃ. ৩১৭-৩২৪।*
নীহার রঞ্জন রায়— *পূর্ববৎ ; দ্বিতীয় খন্ড ; পৃ. ৬২৪-৬৪৫।*

৩৭. ডঃ আহমদ শরীফ— *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব (পূর্ববৎ) ; পৃ. ২৭-৩২, ৮১-৮৩।*
ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত— *পূর্ববৎ ; পৃ. ৩২-৩৭।* বিনয় কুমার সরকার— *বেঙ্গলিসিজম্ ভিস্ আ ভিস্ এরিয়ানাইজেশন, ইসলাম অ্যান্ড ইউর-আমেরিকা ; কৃষ্ণনগর কলেজ সেন্টিনারী কম্‌মেমোরেশন ভল্যুম, কৃষ্ণনগর ১৯৪৮ ; পৃ. ১৭-২৪।*

৩৮. রণবীর চক্রবর্তী— *পূর্ববৎ।*

৩৯. নীহার রঞ্জন রায়— *পূর্ববৎ ; প্রথম খন্ড ; পৃ. ২০৮-২১১।*

৪০. কাজী দীন মুহম্মদ— *পূর্ববৎ ; পৃ. ৩৪৯-৩৮৫।*
নীহার রঞ্জন রায়— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। পৃ. ৭২৯-৭৩৮।*
অতুল সুর— *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (পূর্ববৎ) ; পৃ. ১৬৫-১৬৭।*

৪১. ডব্লিউ. ডব্লিউ, হাণ্টার— *পূর্ববৎ ; পৃ. ১১-১৩, ৭১-৭৯।*
প্রবোধচন্দ্র বাগচী— *পূর্ববৎ ; পৃ. ৭৪-৮৪।*
রমেশচন্দ্র মজুমদার— *বাংলা দেশের ইতিহাস (কলকাতা, ১৩৫৬) ; পৃ. ৬৫-৭০।*
ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত— *পূর্ববৎ ; পৃ. ২৮-৩৮।*
নীহার রঞ্জন রায়— *পূর্ববৎ ; প্রথম খন্ড ; পৃ. ৫১৪-৫১৭।*
ক্যাথলীন গাফ্— *ইন্ডিয়ান পিজান্ট আপরাইজিংস্ ; এ. আর দেশাই সম্পাদিত 'পিজান্ট স্ট্রাগল্‌স্ ইন্ ইন্ডিয়া' (দিল্লী, ১৯৭৯) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ; পৃ. ৮৬-৮৯।*

৪২. তাপস বসু— *পূর্ববৎ ; পৃ. ৩৬-৫৩।*

সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়— *পূর্ববৎ; পৃ. ৪২-৫৬।*

রমেশচন্দ্র দত্ত— *পূর্ববৎ; পৃ. ১৭-২৬।*

৪৩. ৪১ নং নির্দেশিকার অনুরূপ।

অনিরুদ্ধ রায়— *মোগল আমলের জমিদার ও বাংলার তালুকদার : সংক্ষিপ্ত আলোচনা।*

অতুলচন্দ্র রায়— *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, মুঘল পিরিয়ড (১৫২৬-১৭৬৫); কলকাতা, ১৯৬৮; পৃ. ৩৪৯-৩৬৪।*

৪৪. স্যার যদুনাথ সরকার (সম্পাদিত)— *দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২; (ঢাকা, ১৯৪৮; পৃ. ৪১৭-৪২১।*

রমেশচন্দ্র দত্ত— *পূর্ববৎ।*

গৌতম ভদ্র— *পূর্ববৎ; পৃ. ৬-১৪, ৪৭-৫৫, ২৩০-২৩৫।*

৪৫. গৌতম ভদ্র— *পূর্ববৎ।*

রত্নলেখা রায়— *চেঞ্জ ইন্ বেঙ্গল অ্যাগ্রেরিয়ান সোসাইটি (দিল্লী, ১৯৭৯); পৃ. ১৩-৩৭, ২৮৪-২৯৪।*

৪৬. বীণা ভাদুড়ী— *মুসলিম শাসনের প্রারম্ভে ও সুলতানী আমলে বাংলায় নগর-বিন্যাস (১৩শ শতক থেকে ১৬শ শতক); ইতিহাস অনুসন্ধান (গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৬); পৃ. ৩৯-৪৫।*

— *মধ্যযুগের বাংলায় নগর-বিন্যাসের ধারা (সুলতানী আমল); (অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, কলকাতা, ১৯৯২); পৃ. ৩১-৫৯।*

অনিরুদ্ধ রায়— *ষোড়শ শতাব্দীর বাংলাদেশে নগরবিন্যাস ও সামাজিক পরিবর্তন (অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ); পৃ. ৬১-৮৬।*

৪৭. অসিত কুমার সেন— *সুলতানী যুগে নগর ও নাগরিক জীবন প্রসঙ্গে; (গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ইতিহাস অনুসন্ধান ২' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, কলকাতা, ১৯৮৭); পৃ. ৪০-৫০।*

কুমুদ রঞ্জন দাস— *সুলতানী আমলে বাংলার অভিজাত সম্প্রদায়; (গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ইতিহাস অনুসন্ধান ৩' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, কলিকাতা, ১৯৮৮); পৃ. ৮৯-৯৭।*

প্রভাত কুমার সাহা— *মধ্যযুগের রাঢ বঙ্গের নগর ও নগরায়ন; গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ইতিহাস অনুসন্ধান ৪' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, কলিকাতা, ১৯৮৮); পৃ. ৮৯-৯৭।*

প্রভাত কুমার সাহা— *মধ্যযুগের রাঢ় বঙ্গের নগর ও নগরায়ন; (গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ইতিহাস অনুসন্ধান ৫' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, কলিকাতা, ১৯৮৯); পৃ. ১২৯-১৩৮।*

৪৮. ডঃ এন. ডি. ভট্টাচার্য— *পূর্ববৎ; পৃ. ১৭০-১৭৫।*

এন. ডি. ভট্টাচার্য— *ইভোলিউশন অব দি টাউনস্কেপ অব মুর্শিদাবাদ (ডব্লিউ. বি.); সিংহী উচ্চতর বিদ্যালয় পত্রিকা 'শ্রী লেখা' লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, ভল্যুম ১ নাম্বার ১; ১৯৫৯; পৃ. ১-৩ (ইংরাজী)।*

খান মোহাম্মদ মোহসিন— *এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন ট্রানজিশন : মুর্শিদাবাদ ১৭৬৫-১৭৯৩ (ঢাকা, ১৯৭৩); পৃ. ১-১০, ১৯০-২৬৩।*

৪৯. ৪৩ নং ৪৬ নং নির্দেশিকার অনুরূপ।

৫০. অতুল সুর— *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন; পূর্ববৎ; পৃ. ১৭৯-১৯০।*
ডঃ আহমদ শরীফ— *বাংলার সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান (অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত); পৃ. ১৮৭- ২০৭।*
জগদীশ নারায়ণ সরকার— *ইসলাম ইন বেঙ্গল (থার্টিন্থ টু নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী; (কলকাতা, ১৯৭২); পৃ. ২০-৪২।*

৫১. সুকুমার সেন— *পূর্ববৎ; পৃ. ৭৮-৮১।*
অতুল সুর— *পূর্ববৎ; পৃ. ১৯১-২১৫।*
হিতেশ রঞ্জন সান্যাল— *শ্রীখণ্ডের দেব-দেবী—(গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ইতিহাস অনুসন্ধান ৩' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত); পৃ. ১৫৩-১৫৮।*
— *বাঙ্গালীর ধর্মীয় স্থাপত্য চর্চা (পঞ্চদশ-সপ্তদশ শতক); (অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ); পৃ. ২৬৫-২৯১।*
রীণা ভাদুড়ী— *হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন— আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত;.(ইতিহাস অনুসন্ধান ৩); পৃ. ১৩৭-১৫২।*
এডওয়ার্ড সি ডিমক— *হিন্দুইজম্ অ্যান্ড ইসলাম ইন মিডাইভাল বেঙ্গল; (রাচেল ভান এম. বামাব সম্পাদিত 'আসপেক্টস্ অব্ বেঙ্গল হিস্ট্রি অ্যান্ড সোসাইটি', নিউ দিল্লী, ১৯৭৬); পৃ. ১-১২।*

৫২. *৪৯ নং নির্দেশিকাব অনুরূপ।*

৫৩. হিতেশ রঞ্জন সান্যাল— *সোস্যাল মবিলিটি ইন্ বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৮১); পৃ. ৩৩-৬৪, ৮২-১১২।*
অতুল সুর— *পূর্ববৎ।*

৫৪. রীণা ভাদুড়ী— *পূর্ববৎ।*
কুমুদ রঞ্জন দাস— *পূর্ববৎ।*
ডঃ আহমদ শরীফ— *বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব; পূর্ববৎ; পৃ. ৮১-১০১, ১৪১-১৬৩।*

৫৫. ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়— *ইন্ডিয়ান লিটারেচার (ডি. কে গোকক্ সম্পাদিত 'লিটারেচারস্ ইন মর্ডান ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; দিল্লী, ১৯৫৭); পৃ. ৩৭-৪৬।*
ডঃ আহম্মদ শরীফ— *বাংলার সমাজে, সাহিত্যে সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান (পূর্ববৎ): পৃ. ২০৫-২১৫।*
মুহম্মদ আব্দুল জলিল— *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক (ঢাকা, ১৯৮৩); পৃ. ৩৭-৫৯।*

৫৬. কো. আন্তোনভা, গ্রি. বোন্গার্দ-লেভিন, গ্রি. কতোভ্স্কি— *ভারতবর্ষের ইতিহাস (মস্কো, ১৯৮২); পৃ. ২৯০।*
গৌতম ভদ্র— *পূর্ববৎ; পৃ. ১৩১-২৩৬।*
ক্যাথলীন গাফ্— *পূর্ববৎ।*

৫৭. স্যার যদুনাথ সরকার— *ইন্ডিয়া থ্রু দি এজেস্ (কলিকাতা, ১৯৫১); পৃ. ৫৪-৬৫।*

৫৮. রত্নলেখা রায়— *পূর্ববৎ; পৃ ২৮৪-২৯৪।*

বদরুদ্দীন ওমর— *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক; (কলকাতা, ১৯৭৮); পৃ. ২-৫৩।*

সব্যসাচী ভট্টাচার্য— *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি (কলকাতা, ১৩৯৬); পৃ. ৩৮-৬৫।*

৫৯. বিজয় বিহারী মুখার্জ্জী— *ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট অপারেশনস্ ইন্ দি ডিস্ট্রিক্ট অব্ মুর্শিদাবাদ, ১৯২৪ ১৯৩২ (কলিকাতা, ১৯৩৮); পৃ. ১২৮-১২৯, ৬৯-৭০।*

এইচ ভেঙ্কটসুব্বাইয়া— *দি স্ট্রাকচারাল বেসিস অব্ ইন্ডিয়ান ইকনমি, এ সার্ভে ইন্ ইন্টারপ্রিটেশন (লন্ডন, ১৯৪০); পৃ. ৯০-১০৫, ১২১-১২৪।*

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার— *এ স্ট্যাটিসটিক্যাল আকাউন্ট অব বেঙ্গল, মুর্শিদাবাদ (লন্ডন, ১৮৭৬); পৃ. ১৪১-১৭২।*

সব্যসাচী ভট্টাচার্য— *পূর্ববৎ; পৃ. ১১০-১২৮।*

শংখ গুপ্ত— *মুর্শিদাবাদের শিল্পায়ন : সমস্যা সম্ভাবনা; বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, তৃতীয় বর্ষ, ১৯৯২ ('মুর্শিদাবাদ জেলার অর্থনীতি' সংখ্যা); পৃ. ৫৭-৬৪।*

৬০. মার্কাস এফ. ফ্রান্ডা— *পোলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পোলিটিক্যাল ডিকে ইন্ বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৭১); পৃ. ৬ ৩০।*

ডঃ আহমদ শরীফ— *বাংলার গতরখাটা মানুষের ইতিকথা (পূর্ববৎ); পৃ. ৮১-৮৫।*

সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত— *শিক্ষায় মুর্শিদাবাদ : পটভূমি ও সমস্যা (পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, ৫৬তম বার্ষিক সম্মেলন স্মারক-পত্রিকা, ১৯৮২, জিয়াগঞ্জ)।*

## মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অর্থনৈতিক রূপান্তর (১৫৭৫-১৭৫৭) : একটি রেখাচিত্র

১. নীহার রঞ্জন রায়— *ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি; বিনয় ঘোষ-রচিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৯৫৭) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।*

২. *অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তীকে প্রদত্ত অধ্যাপক ইরফান হাবিবের সাক্ষাৎকার; দি টেলিগ্রাফ, ২২শে মে, ১৯৮৭।*

৩. ইরফান হাবিব— *পোটেনশিয়ালিটিস্ অব ক্যাপিটালিস্টিক ডেভেলপমেন্ট ইন দি ইকনমি অব মুঘল ইন্ডিয়া (এনকোয়ারি, উইন্টার, ১৯৭১);*

মমতাজুর রহমান তরফদার— *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন (ঢাকা, ১৯৯৩)।*

জগদীশ নারায়ণ সরকার— *মুঘল ইকনমি : অরগ্যানিজেশন অ্যান্ড ওয়ার্কিং (কলিকাতা, ১৯৮৭); পৃ. ২২৫-২৩৪।*

৪. ডঃ নীহার রঞ্জন রায়— *বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব (১৯৫০); পৃ. ১০০-১০৪।* ডঃ *রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা দেশের ইতিহাস (১৩৫৬); পৃ. ৩-৮।* ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার— *ভূমিকা, গৌড়ের কথা— অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৩৯০)।* এস. কে

ব্যানার্জী— *হুমায়ুন বাদশা (ইং, লন্ডন, ১৯৩৮) ; পৃ. ২১০-২১১, ২৬৫।* ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টার— *এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ (৯ম খন্ড) এবং নদীয়া (২য় খন্ড) ; লন্ডন, ১৮৭৬।* বি. মৈত্র— *হাইড্রোলজিক্যাল ক্যারাকটারিস্টিকস্ অব দি রিভার্স অব দি ভাগীরথী বেসিন,* সুভাষ রঞ্জন বসু ও সন্তোশ চন্দ্র চক্রবর্তী— *সাম কনসিডারেশন্‌স্ অন দি ডিকে অব দি ভাগীরথী ড্রেনেজ সিস্টেম,* কে. ডি. চ্যাটার্জী ও এন জি. মজুমদার— *ড্রেনেজ প্রব্লেম্‌স্ অব দি ভাগীরথী বেসিন : তিনটি প্রবন্ধই কানন গোপাল বাগচী সম্পাদিত 'দি ভাগীরথী-হুগলী বেসিন' গ্রন্থের (কলিকাতা, ১৯৭২) অন্তর্ভুক্ত।*

সনৎ কুমার মিত্র— *পশ্চিমবঙ্গের লোক-সংস্কৃতি বিচিত্রা (১৩৮২) ; পৃ. ১৮৪-১৮৭।*

ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়— *দি চেঞ্জিং ফেস অব বেঙ্গল (১৯৩৮) ; পৃ. ১১০-১৭৬।*

শিবরাম বেরা— *হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন কি অসম্ভব ? (জ্ঞান ও বিজ্ঞান— এপ্রিল, ১৯৮০), বাংলার নদনদীর কথা (ঐ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮০)।*

৫. বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত— *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্- মুর্শিদাবাদ (১৯৭৯) ; পৃ. ৫২-৫৪।*

*আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল-ভল্যুম ২ (ঢাকা, ১৯৪৮) ; পৃ. ২০০-২০৬।*

এন. ডি. ভট্টাচার্য— *এ স্টাডি ইন সেট্‌লমেন্ট জিওগ্রাফি ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব মুর্শিদাবাদ ; ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস হ্যান্ড বুক ; মুর্শিদাবাদ, ১৯৬১ ; পৃ. ১৫০-১৫২।*

আচার্য যদুনাথ সরকার— *ওল্ড মুর্শিদাবাদ-হিস্টোরিক্যাল মেমারিজ ; কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টিনারী কমমেমোরেশন ভল্যুম ১৮৫৩-১৯৫৩, (১৯৫৩)।*

সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— *বন্দর কাশিমবাজার (১৯৭৮) ; পৃ. ৫-৮।*

এন. ডি. ভট্টাচার্য— *এ স্টাডি ইন্ সেটলমেন্ট জিওগ্রাফি ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব মুর্শিদাবাদ ; বি. রায় সম্পাদিত সেন্সাস ১৯৬১ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ড বুক্‌স্- মুর্শিদাবাদ ; পৃ. ১৪০।*

অশোক মিত্র সম্পাদিত— *সেন্সাস ১৯৫১ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক্‌স্-মুর্শিদাবাদ ; পৃ. অ্যাপেনডিক্স-১, iii*

৬. অশোক মিত্র *সম্পাদিত— পূর্ববৎ ; পৃ. xxvii*

অতুল চন্দ্র রায়— *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল : মুঘল পিরিয়ড (১৫২৬-১৭৬৫) ; পৃঃ ১৩৮-১৩৯।*

জগদীশ নারায়ণ সরকার— *পূর্ববৎ ; পৃঃ ১৮৪-১৮৮, ৮২-৮৬।*

ডব্লু ফস্টার— *ফ্যাক্টরিজ্ ইন্ ইন্ডিয়া ১৬১৮-১৬২১ (অক্সফোর্ড, ১৯০৬) ; পৃঃ ১৫৩, ১৯৪, ২৩০।*

৭. ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন— *দি পর্টুগীজ ইন বেঙ্গল এবং* আচার্য যদুনাথ সরকার— *দি ট্রান্সফরমেশন অব বেঙ্গল আন্ডার মুঘল রুল ; দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল— ভল্যুম ২ (ঢাকা, ১৯৪৮)।*

অতুল চন্দ্র রায়— *পূর্ববৎ ; পৃ. ১৭১-২১৯।*

সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— *পূর্ববৎ।*

সুশীল চৌধুরী— *ট্রেড অ্যান্ড কর্মাশিয়াল অর্গানিজেশন ইন্ বেঙ্গল ১৬৫০-১৭২০ (কলকাতা, ১৯৭৫); পৃ. ৮-১০।*

৮. *মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের লোকসংখ্যা (১৬৫০ খ্রীস্টাব্দ) সম্পর্কিত অনুমান নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়েছে। এডওয়ার্ড সি. ডিমকে 'হিন্দুইজম্ অ্যান্ড ইসলাম ইন মিডাইভাল বেঙ্গল' প্রবন্ধে (র‍্যাচেন ডান এম. বাউমার সম্পাদিত 'আসপেক্টস্ অব বেঙ্গলি হিস্টরি অ্যান্ড সোসাইটি' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত) ও' কনেল-এর গণনার উপর নির্ভর করে ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে বাংলা দেশের জনসংখ্যা ১২৭ মিলিয়ন অনুমিত হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত বঙ্গের এবং মুর্শিদাবাদ জেলার দশ বৎসর অন্তর লোকসংখ্যার সম্পর্কের উপর নির্ভর করে ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের লোকসংখ্যা অনুমিত হয়েছে* by adopting the method of *least squares, a straight line has been fitted showing the linear relationship* between the population of Bengal and that of Murshidabad district *মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের এই জনসংখ্যা সম্পর্কিত অনুমানে পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রবন্ধকার বন্ধুবর অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ মালের নিকট ঋণী।* ইরফান হাবিব— *পপুলেশন— দি কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভল্যুম ১, (১৯৮২); পৃঃ ১৬৩-১৭১।*

কে. এস লাল— *গ্রোথ অব মুসলিম পপুলেশন ইন মেডাইভাল ইন্ডিয়া ১০০০-১৮০০ (দিল্লী, ১৯৭২) পৃঃ ১০-১২, ১২৭-১৫৬, ১৭৪-১৮৬।*

সৌমেন্দ্র কুমার গুপ্ত— *বাঙালী মুসলমান প্রসঙ্গে— প্রথম পর্যায়, অনীক, মার্চ, ১৯৬৬।*

অমিয় কুমার বাগচি— *অ্যান এসটিমেট অব দি গ্রস ডোমেস্টিক ম্যাটেরিয়াল প্রডাক্ট অব বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার ইন ১৭৯৪ ফ্রম কোল-ব্রুক্স্ ডাটা, নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরী স্টাডিজ, জুলাই, ১৯৭৩।*

৯. ডব্লু. এইচ. মোরল্যান্ড— *ইন্ডিয়া অ্যাট দি ডেথ অব আকবর— অ্যান ইকনমিক স্টাডি (লন্ডন, ১৯২০) পৃঃ ৬৩-৮৭, ২৫৩-২৮১।*

জগদীশ নারায়ণ সরকার— *পূর্ববৎ; পৃ. ২৩৫-২৬৬।*

১০. ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার— *গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ (কলিকাতা, ১৯৬১); পৃঃ ৪৪৪-৪৭২।*

রত্নলেখা রায়— *চেঞ্জ ইন্ বেঙ্গল অ্যাগ্রেরিয়ান সোসাইটি (দিল্লী, ১৯৭৯), পৃ. ১৩-২৪।*

ডঃ অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী— *দি অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব বেঙ্গল— ভল্যুম ১— ১৫৮২-১৭৯৩; পৃঃ ১-৪১।*

গৌতম ভদ্র— *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ (কলিকাতা, ১৯৮৩); পৃঃ ২৩-৬২।*

ইরফান হাবিব— *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬- ১৭০৭); পৃঃ ১২০-২০১।*

ইরফান হাবিব— *ব্যাঙ্কিং ইন্ মুঘল ইন্ডিয়া-কনট্রিবিউশন্স্ টু ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি— ১-এর অন্তর্ভুক্ত (কলিকাতা, ১৯৬০); পৃঃ ১-২০।*

১১. *১০ নং নির্দেশিকার অনুরূপ।*

১২. এন. ডি. ভট্টাচার্য— *পূর্ববৎ: পৃঃ ১৫০-১৫৮।*

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার— *পূর্ববৎ।*

আচার্য যদুনাথ [illegible] সম্পাদিত [illegible] দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২ ; পৃঃ ২৪-২৫, ১১, ১১৯।

ইরফান হাবিব— *তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত দি কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ভল্যুম ১ পৃঃ ৭৭-৭৯, ২১৭।*

শক্তিনাথ ঝা— *মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ি অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রেণী অবস্থানের রূপান্তর; গণকণ্ঠ, বিশেষ মুর্শিদাবাদ সংখ্যা, ১৯৮২।*

১৩ সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— *বন্দর কাশিমবাজার, পৃঃ ৫ ৯।*

তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত- *দি কেমব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ভল্যুম ১, পৃঃ [illegible]।*

অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী [illegible] *ভল্যুম ১, পৃঃ [illegible]।*

[illegible]— *[illegible]।*

[illegible] মুর্শিদাবাদ [illegible] কলেজ *[illegible]।*

জে. এইচ টি. ওয়ালশ— *এ হিস্ট্রী অব মুর্শিদাবাদ [illegible], ১৯০২); পৃঃ ১০২।*

১৪. সুশীল চৌধুরী— *ট্রেড অ্যান্ড কমার্শিয়াল অর্গানিজেশন ইন বেঙ্গল ১৬৫০-১৭২০ (কলিকাতা, ১৯৭৫), পৃঃ ১১-২৬, ২০৭ ২১৪।*

ডঃ অঞ্জলি চ্যাটার্জি— *বেঙ্গল ইন দি রেইন অব আওরঙ্গজেব, ১৬৫৮-১৭০৭ (কলিকাতা, [illegible]), পৃঃ [illegible] ১০৩, ১৮৬-১৯৮।*

১৫. সুশীল চৌধুরী— *পূর্ববৎ।*

ডঃ অঞ্জলি চ্যাটার্জী *পূর্ববৎ।*

তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ২১৭, ২২৩-২২৪, ২৭১-২৭৩, ২৮২ ২৮৩, ২৮১-২৮৭।*

ওম প্রকাশ— *দি ডচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অ্যান্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল, ১৬৩০-১৭২০ (দিল্লী, ১৯৮৮); পৃঃ ১১৩-১১৭।*

১৬. খান মোহাম্মদ মোহসিন— *এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন্ ট্রানজিশন: মুর্শিদাবাদ (১৭৬৫-১৭৯৩); ঢাকা, ১৯৭৩; পৃঃ ৪।*

ফিলিপ ক্যালকিনস্— *দি রোল অব মুর্শিদাবাদ অ্যাজ এ রিজিওন্যাল অ্যান্ড সাব-রিজিওন্যাল সেন্টার ইন বেঙ্গল; আর পার্ক সম্পাদিত 'আর্বান বেঙ্গল' (ইস্ট ল্যানসিং: মিশিগান স্টেট ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১৯৬৯)।* ব্যাচেল ভান এম. রমার-সম্পাদিত *আসপেক্টস অব বেঙ্গলি হিস্ট্রি অ্যান্ড সোসাইটি-গ্রন্থে প্রদত্ত সংক্ষিপ্তসার; পৃঃ ২২৭-২২৮।*

ডঃ অঞ্জলি চ্যাটার্জি— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৩০-৫২।*

১৭. *১৫ নং নির্দেশিকার অনুরূপ।*

১৮. *১৫ নং নির্দেশিকার অনুরূপ।*

১৯. *১৫ নং নির্দেশিকার অনুরূপ।*

২০. *৮ নং নির্দেশিকার অনুরূপ এবং* তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত—

*পূর্ববৎ; পৃঃ ৪৩৪-৪৫১।*
ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার— *পূর্ববৎ।*
জগদীশ নারায়ণ সরকার— *পূর্ববৎ। পৃঃ ২০১-২২৪।*
জগদীশ নারায়ণ সরকার— *দি লাইফ অব মীর জুমলা-দি জেনারেল অব আওরঙ্গজের (কলিকাতা, ১৯৫১)-পৃঃ ১৫৮-২১৯।*

২১. ডঃ অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৩২-৩৪।*
এফ. ডি,. অ্যাসকোলি— *আর্লি রেভেনিউ হিস্ট্রি অব বেঙ্গল অ্যান্ড দি ফিফ্থ রিপোর্ট, ১৮১২ (অক্সফোর্ড, ১৯১৭); পৃঃ ২৩-২৭।*
রমেশ চন্দ্র দত্ত— *দি পিজ্যান্ট্রি অব বেঙ্গল (প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৪; বাংলা সংস্করণ, ১৩৯২); পৃঃ ১৭-২৩।*
রত্নলেখা রায়— *পূর্ববৎ, পৃঃ ১৩-৩৭।*

২২. তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ২৭৯-২৮২।*
গৌতম ভদ্র— *মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ; পৃঃ ১১৭-১৩০।*
ডঃ কালিকিংকর দত্ত— *ইকনমিক কন্ডিশন অব দি বেঙ্গল সুবা— ইন ইয়ার্স্ অব ট্রানজিশন ১৭৪০-১৭৭২ (কলিকাতা, ১৯৮৪); পৃঃ ২০৪-২১৯।*
সন্দীপ বন্দোপাধ্যায়— *গ্রাম বাঙলার গড়ন ও ইতিহাস (১৯৮২); পৃঃ ৪২-৫৫।*
জগদীশ নারায়ণ সরকার— *মুঘল ইকনমি-অর্গানিজেশন অ্যান্ড ওয়ার্কিং; পৃঃ ৩২-৫৭।*

২৩. তপন কুমার রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৭০, ২৬২, ২৮০, ৪৪১-৪৪২।*
ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার— *পূর্ববৎ।*
শশাঙ্ক শেখর সিংহ— *শ্রীশ্রীবুধরি-বিলাস (ভগবানগোলা, ১৩৭৯); পৃঃ ১৫-১২৩।*
সুখময় মুখোপাধ্যায়— *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম (কলিকাতা— ১৯৭৪); পৃঃ ১১১-১৩২, ১৪৩-১৪৬।*
হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়— *বঙ্গীয় শব্দকোষ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৫৭১।*
*'কসবা বাহাদুরপুর' ও 'কসবা গোযাস' সম্পর্কে প্রবন্ধকার ব্যক্তিগত যোগাযোগসূত্রে আলোচ্য সিদ্ধান্তে উপনীত, তবে এ-সম্পর্কে ক্ষেত্র-সমীক্ষার একান্ত প্রয়োজন।*

২৪. জগদীশ নারায়ণ সরকার— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৭৬-১০৬।*
তপন রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত— *পূর্ববৎ। পৃঃ— ১৭ ২২ নং নির্দেশিকার অনুরূপ।*
সুশীল চৌধুরী— *পূর্ববৎ। পৃঃ ৬১-১৫৪।*

২৫. ইরফান হাবিব— *পোটেনশিয়ালিটিস্ অব ক্যাপিটালিস্টিক ডেভেলপমন্টে ইন দি ইকনমি অব মুঘল ইন্ডিয়া (এনকোয়ারি, উইন্টার, ১৯৭১)।*
ইরফান হাবিব— *ব্যাঙ্কিং ইন্ মুঘল ইন্ডিয়া— কন্ট্রিবিউশন্স্ টু ইন্ডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি— ১-এর (কলিকাতা, ১৯৬০) অন্তর্ভুক্ত।*
জগদীশ নারায়ণ সরকার— *পূর্ববৎ। পৃঃ ২২৫-২৩৪, ৩১৭-৩৩১।*
সুশীল চৌধুরী—পূর্ববৎ। পৃঃ ৯৬-৯৮, ১৫২-১৫৪, ২৩৭-২৪০।
সুনীতি কুমার ঘোষ— *দি ইন্ডিয়ান বিগ বুর্জোয়াসি (কলিকাতা, ১৯৮৫); পৃঃ-৪৮-৯০।*

বামকৃষ্ণ মুখার্জী— *দি বাইজ অ্যান্ড ফল অব দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (বার্লিন, ১৯৫৫); পৃঃ ৮৮-১১০।*

ওমপ্রকাশ— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১১৭।*

২৬. তাবাশংকব ব্যানার্জী— *ভেবিয়াস বেঙ্গল আস্পেক্টস্ অব মর্ডান হিস্ট্রি (কলিকাতা, ১৯৮৫); পৃঃ ৫৪-৫৮।*

সুকুমাব ভট্টাচার্য— *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অ্যান্ড দি ইকনমি অব বেঙ্গল ফ্রম ১৭০৪ টু ১৭৪০ (লন্ডন, ১৯৫৪); পৃঃ ৭-১৭, ২১৮-২২৫।*

প্রেমেন আড্ডি ও ইবনে আজাদ— *পলিটিক্স অ্যান্ড সোসাইটি ইন বেঙ্গল (ববিন ব্ল্যাকবার্ন সম্পাদিত 'এক্সপ্রসন ইন এ সাবকন্টিনেন্ট' ১৯৭৫, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। পৃঃ ৭৯-৮৪।*

সুবোধ কুমাব মুখোপাধ্যায— *প্রাক-পলাশী বাংলা (কলিকাতা, ১৯৮২); পৃঃ ২-৭, ১৫৯-১৬৯।*

২৭. এন. ডি ভট্টাচার্য— *পূর্ববৎ। পৃঃ ১৭১-১৭৪।*

আচার্য যদুনাথ সবকাব সম্পাদিত— *পূর্ববৎ। পৃঃ ৪০৪-৪০৫।*

আব্দুল কবিম— *মুর্শিদকুলি অ্যান্ড হিজ টাইম্স্ (ঢাকা, ১৯৬৩); পৃঃ ২১-২২, ২১১-২১৬।*

খান মোহাম্মদ মোহসিন— *পূর্ববৎ। পৃঃ ৫-১০।*

বীবেন্দ্র কুমাব ভট্টাচার্য সম্পাদিত— *পূর্ববৎ। পৃঃ ৫৭-৬২।*

২৮. বত্নলেখা বায— *পূর্ববৎ। পৃঃ ২৪-৩৭।*

আব্দুল কবিম— *পূর্ববৎ। পৃঃ ২১৮-২২০।*

আচার্য যদুনাথ সবকাব সম্পাদিত— *পূর্ববৎ। পৃঃ ৪০৮-৪২১।*

ডঃ অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী— *পূর্ববৎ। পৃঃ ৪২-৬৯।*

বীবেন্দ্র কুমাব ভট্টাচার্য সম্পাদিত— *পূর্ববৎ। পৃ ২৫১-২৫৪।*

সুবোধ কুমাব মুখোপাধ্যায— *বাংলাব আর্থিক ইতিহাস-অষ্টাদশ শতাব্দী (কলিকাতা, ১৯৮৫); পৃঃ ১-২৮।*

নবেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ— দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২ (কলিকাতা, ১৯৬২); পৃঃ ১-২২।

২৯. কালীকিংকব দত্ত— *সার্ভে অব ইন্ডিয়া'স সোস্যাল লাইফ অ্যান্ড ইকনমিক কন্ডিশন ইন দি এইটিন্থ্ সেঞ্চুবী (১৭০৭-১৮১৩), কলিকাতা, ১৯৬১; পৃঃ ৬৫-৭২।*

তাবাশংকব ব্যানার্জী— *পূর্ববৎ।*

সুকুমাব ভট্টাচার্য— *পূর্ববৎ। পৃঃ ১৮-৭৬, ১১৬-১৩১।*

সুবোধ কুমাব মুখোপাধ্যায— *প্রাক পলাশী বাংলা, পৃঃ ৪৪-৬৭; বাংলাব আর্থিক ইতিহাস, পৃঃ ৮০-১২১।*

প্রেমেন আড্ডি ও ইবনে আজাদ— *পলিটিক্স অ্যান্ড সোসাইটি ইন্ বেঙ্গল; ববিন ব্ল্যাকবার্ণ-সম্পাদিত এক্সপ্লসন ইন্ এ সাবকন্টিনেন্ট (লন্ডন, ১৯৭৫) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃঃ ৮০-৮৪।*

সুনীতি কুমাব ঘোষ— *দি ইন্ডিয়ান বুর্জোয়াসি (কলকাতা, ১৯৮৫); পৃঃ ৩৬-৪৫।*

রতন দাশগুপ্ত— *মার্সিনারীজ অ্যান্ড দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব্‌ বেঙ্গল · ১৭২৭-৬৩; সোস্যাল সায়েন্টিস্ট, এপ্রিল, ১৯৮৫; পৃঃ ১৮।*

৩০. মেজর টুল ওয়ালস— *এ হিস্ট্রি অব মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রীক্ট, লন্ডন, ১৯০২; 'ইন্ডাস্ট্রীজ' নামক অধ্যায়।*

জগদীশ নারায়ণ সরকার— *মুঘল ইকনমি; পৃঃ ৩৮-৫২।*

সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী — *পূর্ববৎ। পৃঃ ২৬-৪০।*

সুশীল চৌধুরী— *পূর্ববৎ। পৃঃ ২৬-৬০, ১৭৮-২০৫।*

ডঃ অঞ্জলি চ্যাটার্জী — *পূর্ববৎ। পৃঃ ৮৯-১০৩, ১৬৬-১৮৫।*

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়— *বাংলার আর্থিক ইতিহাস; পৃঃ ৬৮-৭৯, ৮০-১২১।*

কালীকিংকর দত্ত— *পূর্ববৎ।*

৩১. সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— *পূর্ববৎ। পৃঃ ৩১-৩৬।*

গৌতম ভদ্র— *সোস্যাল গ্রুপস্‌ অ্যান্ড রিলেশনস্‌ ইন দি টাউন অব মুর্শিদাবাদ, দি ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ, জানুয়ারী, ১৯৭৬।*

সুশীল চৌধুরী— *পূর্ববৎ। পৃঃ ৬১-৯৮।*

৩২. কালীকিংকর দত্ত— *ইকনমি কন্ডিশন অব দি বেঙ্গল সুবা ইন ইয়ার্স অব ট্রানজিশন ১৭৪০-১৭৭২ (কলিকাতা, ১৯৮৮), পৃঃ ১৯১-২৬২।*

৩৩. কালীকিংকর দত্ত — *পূর্ববৎ। পৃঃ ২১৭-২১৯।*

জগদীশ নারায়ণ সরকার— *পূর্ববৎ। পৃঃ ২৯৬-৩১৩।*

সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— *পূর্ববৎ। পৃঃ ৪১-৫৬।*

সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়— *প্রাক-পলাশী বাংলা; পৃঃ ৬-৭।*

৩৪. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার— *এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল— মুর্শিদাবাদ; পৃঃ ৩৫-৩৬, ৬৫-৬৭।*

খান মোহাম্মদ মোহসিন — *পূর্ববৎ। পৃঃ ২২৭।*

নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ— *দি ইকনমিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২, পৃঃ ২২৭-২২৯।*

তপন কুমার রায়চৌধুরী ও ইরফান হাবিব সম্পাদিত— *পূর্ববৎ। পৃঃ ১৭০-১৭১।*

কে. এস. লাল— *পূর্ববৎ। পৃঃ ২১৮-২৫২।*

বিজয় কুমার বন্দোপাধ্যায়— *একটি নগরের ইতিবৃত্ত, অপরাজিতা (শম্ভুনাথ সরকার সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ব. ঢ়পুর, মুর্শিদাবাদ), আশ্বিন, ১৩৯২।*

৩৫. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়— *বাংলার আর্থিক ইতিহাস; পৃঃ ১৩৫-১৪৬, ৫৫-৬৭।*

কালীকিংকর দত্ত— *সার্ভে অব ইন্ডিয়াস সোস্যাল লাইফ অ্যান্ড ইকনমিক কন্ডিশন ইন দি এইটিনথ সেনচুরি (১৭০৭-১৮১৩) পৃঃ ১২১-১৩৪।*

রত্নলেখা রায়— *পূর্ববৎ। পৃঃ ৩৭-৫১।*

রামকৃষ্ণ মুখার্জী— *পূর্ববৎ। পৃঃ ১৭০-২০৬।*

নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ— *পূর্ববৎ, ভল্যুম১। পৃঃ ২১০-২২৯। পূর্ববৎ, ভল্যুম, ২। পৃঃ ৪৮-৬৭।*

সুনীতি কুমার ঘোষ— *পূর্ববৎ। পৃঃ ১১৪-১৫১।*

নিখিল সুর— *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী— ফকির বিদ্রোহ (কলিকাতা, ১৯৮২)।*

## মুর্শিদাবাদ জেলায় নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ

১. মেসবাহুল হক— *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ (ঢাকা, ১৯৮২)*; পৃঃ ১১১-১৫৫।
এইচ. আর. ঘোষাল— *ইকনমিক ট্র্যানজিশন ইন দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী (১৭৯৩-১৮৩৩)*; কলকাতা, ১৯৬৬; পৃঃ ৭৩-৭৮।

২. বিনয় ঘোষ— *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (কলকাতা, ১৯৬৮)*; পৃঃ ৩১-৩২।
বিনয় ঘোষ সম্পাদিত— *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খন্ড (কলকাতা, ১৯৬২)*; পৃঃ ৪৮৯-৪৯০।

৩. ব্লেয়ার বি ক্লিং— *দি ব্লু মিউটিনি (কলকাতা, ১৯৭৭)*; পৃঃ ১৭-১৮।
বিনয় ঘোষ— *পূর্ববৎ*। পৃঃ ৩১-৩২।
সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়— *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী)*; কলকাতা, ১৯৮৫; পৃঃ ৭৮।
সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়— *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী)*; কলকাতা, ১৯৮৭; পৃঃ ৭৬-৭৮।

৪. প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত— *নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ (কলকাতা, ১৯৭৮)*; পৃঃ ১১-২১।

৫. বিনয় চৌধুরী— *গ্রোথ অব কমার্সিয়াল এগ্রিকালচার ইন বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০০)*; কলকাতা, ১৯৬৪; পৃঃ ১০৫-১২৪।
চিত্তব্রত পালিত— *টেনসনস্ ইন্ রুরাল বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৭২)*; পৃঃ ১২৩-১৩০।
স্বপন বসু— *গণ অসন্তোষ ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ (কলকাতা, ১৯৮৪)*; পৃঃ ১৮-২০।

৬. বিনয় চৌধুরী— *পূর্ববৎ*।

৭. প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ৫২।

৮. ব্লেয়ার বি ক্লিং— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ৬১-৬২।

৯. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ— *দি ইকনমিক হিস্ট্রী অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২ (কলকাতা, ১৯৬২)*; পৃঃ ৫৮-৬৫।

১০ নিখিল নাথ রায়— *মুর্শিদাবাদ কাহিনী (১৩০৪ সাল)*; পৃঃ ১৪৮-১৪৯।
সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— *লাইফ অ্যান্ড টাইম্‌স্ অব্ কান্তু বাবু, ভল্যুম ১ (কলকাতা, ১৯৭৮)*; পৃঃ ৪৭৬-৪৭৭।

১১. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়— *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী; পূর্ববৎ*; পৃঃ ৭৮।

১২. খান মোহাম্মদ মহসীন— *এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন্ ট্র্যানজিশন : মুর্শিদাবাদ ১৭৬৫- ১৭৯৩ (ঢাকা, ১৯৭৩)*; পৃঃ ৬৮-৭৮।

১৩. সনৎ কুমার বোস ও এ মিত্র সম্পাদিত— *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস, নিউসিরিজ,*

*মুর্শিদাবাদ, লের্টাস বিসীভূড় ১৭৭৯-১৮০৩ (কলকাতা, ১৯৫৮)*; পৃঃ ৩০৬-৩০৭।

১৪. সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ৪৩৬-৪৩৯।

১৫. সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— *বন্দর কাশিমবাজার (কলকাতা, ১৯৭৮)*; পৃঃ ১৫০।

১৬. অমলেন্দু দে— *ইন্ডিগো প্ল্যান্টেশন, ইট্‌স্ একসপানশন ইন্ ডিফারেন্ট এরিয়াস (জার্নাল অব হিস্ট্রী, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, ভল্যুম ২, ১৯৮১)*; পৃঃ ১৩১।

১৭. সনৎ কুমার বোস ও এ মিত্র সম্পাদিত— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ৫৭৭, ৫৭৯-৫৮১।

১৮. নৃপেন্দ্র নারায়ণ কুন্ডু— *ডোমকল কুঠিবাড়ি (বর্তিকা, ২৭ বর্ষ, জানুয়ারী- মার্চ সংখ্যা, ১৯৮৩)*; পৃঃ ১০।

১৯. জে. এইচ. টি. ওয়াল্‌স্— *এ হিস্ট্রী অব্ মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রীক্ট (লন্ডন, ১৯০২*; পৃঃ ১১৭।

২০. চিত্তব্রত পালিত— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ১২৩।

২১. সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— *লাইফ অ্যান্ড টাইম্‌স্ অব্ কানতু বাবু, ভল্যুম ২ (কলকাতা, ১৯৮১)*; পৃঃ ২৮১-২৮৩।

২২ সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী— *বন্দর কাশিমবাজার*; পৃঃ ১৪২-১৪৭।

২৩. সনৎ কুমার বোস এ মিত্র সম্পাদিত— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ৫৭৭-৫৮১।

২৪. এ.মিত্র সম্পাদিত— *সেন্সাস ১৯৫১, পশ্চিমবঙ্গ, ডিস্ট্রীক্ট হ্যান্ডবুকস মুর্শিদাবাদ (কলকাতা, ১৯৫৩)*; পৃঃ XXIV ও XXVV।

২৫. ডঃ রঞ্জন কুমার গুপ্ত— *দি ইকনমিক লাইফ অব্ এ বেঙ্গল ডিস্ট্রীক্ট বীরভূম ১৭৭০ ১৮৫৭*।(বর্ধমান, ১৯৮৪); পৃঃ ১১৬।

২৬. এ. মিত্র সম্পাদিত— *পূর্ববৎ*; পৃঃ *আ্যাপেনডিক্‌স্ সিক্‌স্*, CXXIV-CXXV।

২৭. রায় বিজয়বিহারী মুখার্জী বাহাদুর— *ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন্‌স্ ইন্ দি ডিস্ট্রীক্ট অব্ মুর্শিদাবাদ, ১৯২৪-১৯৩২ (কলকাতা, ১৯৩৮)*; পৃঃ ১২৭-১২৮।

২৮. ডঃ রাধাকমল মুখার্জী— *দি চেঞ্জিং ফেস অব্ বেঙ্গল, এ স্টাডি ইন্ রিভারীণ ইকনমি (কলকাতা, ১৯৩৮)*; পৃঃ ৭৩-১০৯।

২৯. এইচ. আর ঘোষাল— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ৮৬-৮৭।
*রিপোর্ট অব্ দি ল্যান্ড রেভেনিউ কমিশন্, বেঙ্গল, ভল্যুম ৪ (কলকাতা, ১৯৪০)*; পৃঃ ২৫৫।

৩০. ব্রেয়ার বি ক্লিং— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ৮৪-৮৫।
অশোক মিত্র— *দি ট্রাইব্‌স্ অ্যান্ড কাস্ট্‌স্ অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৫৩)*; পৃঃ ৩২-৩৩।

৩১. ব্রেয়ার বি ক্লিং— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ২৮-২৯।

৩২. সনৎ কুমার বোস ও এ. মিত্র সম্পাদিত— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ৩০৬, ৩০৮, ৫৭৭-৫৮১।

৩৩. পূর্ববৎ; পৃঃ ৫৮১।

৩৪. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার— *এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল, ভল্যুম, নাইন (লন্ডন, ১৮৭৬)*; পৃঃ ১৫২-১৫৩।

৩৫. মেসবাহুল হক— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ১২২-১২৩।

৩৬. *পূর্ববৎ।*

জে. এইচ. টি. ওলাল্স্— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১১৬-১১৭।*

৩৭. বঞ্চিত চক্রবর্তী— *দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঐতিহাসিক সমীক্ষা (কলকাতা, ১৯৮৩); পৃঃ ৩৫-৩৬।*

৩৮. *রিপোর্ট অব দি ইন্ডিগো কমিশন অ্যাপয়েন্টড আন্ডার অ্যাক্ট ইলেভেন অব্ ১৮৬০; কলকাতা, ১৮৬০; পৃঃ ২২।*

৩৯. সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত— *ভগবানগোলার, দু' অধ্যায় (ভগবানগোলা উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রভারতী, সন ১৩৬১)।*

৪০. এইচ. আর ঘোষাল—পূর্ববৎ; পৃঃ ২৯০ ২৯১।

চিত্তব্রত পালিত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১০০-১০১।*

৪১. এস. বি. সিং— *ইউরোপীয়ান এজেন্সী হাউসেস ইন্ বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৬৬); পৃঃ ২২৮।*

৪২. মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন— *নীলবিদ্রোহের নানা কথা (ঢাকা, ১৯৯০); পৃঃ ১০০-১০৪।*

৪৩. প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত— *পূর্ববৎ: পৃঃ ৪৩।*

৪৪. জে. এইচ. টি. ওয়াল্স্— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১১৬।*

চিত্তব্রত পালিত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১২৩-১৩০।*

৪৫. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ – *দি ইকনমিক হিস্ট্রী অব্ বেঙ্গল ১৭৯৩ ১৮৪৮, ভল্যুম থ্রি (কলকাতা, ১৯৭০; পৃঃ ১৯-২১।*

৪৬. এইচ. আর. ঘোষাল— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৫৭।*

কমল বন্দোপাধ্যায় *মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি, প্রথম খন্ড (কলকাতা, ১৩৮২); পৃঃ ১২৮-১২৯।*

সতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়— *বাঙালার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা (১১০০-১৯০০; কলকাতা, ১৯৭৪; পৃঃ ২৫৫।*

*১২৫ তম বার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৭১, গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন; পৃঃ-অধ্যায় ১ ও ২।*

৪৭. অশোক মিত্র সম্পাদিত – *পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা, দ্বিতীয় খন্ড (দিল্লী, ১৯৬৮); পৃঃ ৯৬।*

৪৮. আচার্য যদুনাথ সরকার— *ওল্ড মুর্শিদাবাদ- হিস্টোরিক্যাল মেমারিজ; কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টিনারী কমমেমোরেশন ভল্যুম (১৮৫৩- ১৯৫৩)- এ অন্তর্ভুক্ত (বহরমপুর, ১৯৫৩): পৃঃ ১৩২।*

৪৯. ব্লেয়ার বি ক্লিং— *পার্টনার ইন্ এমপায়ার- দ্বারকানাথ টেগোর অ্যান্ড দি এজ অব্ এন্টারপ্রাইজ ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (কলকাতা, ১৯৮১; পৃঃ ৮৪-৮৭।*

৫০. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত— *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তৃতীয় খন্ড (কলকাতা, ১৯৮০); পৃঃ ৬২।*

৫১. *রিপোর্ট অব দি ইন্ডিগো কমিশন; পূর্ববৎ; অ্যাপেনডিক্স ওয়ান অব জেনারেল অ্যাপেনডিক্স্ পার্ট ওয়ান; পৃঃ ২২-৩২।*

৫২. চিত্তব্রত পালিত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১২৪।*

৫৩. শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— *মুর্শিদাবাদ কথা ১; পৃঃ ২৫৮- ২৫৯।*

৫৪. চিত্তব্রত পালিত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১২৩।*

৫৫. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত— *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খন্ড; পূর্ববৎ; পৃঃ ১০৩।*

জীমূতবাহন চক্রবর্তী— *বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়— প্রথম বাঙালী ডেপুটীর ইতিবৃত্ত (কৃষ্ণনাথ কলেজ পত্রিকা, ১৯৯০); পৃঃ প্র- ১৫।*

৫৬. নৃপেন্দ্র নারায়ন কুন্ডু— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৭-১৪।*

জে. এইচ. টি. ওয়াল[illegible]— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৫-২১।*

চিত্তব্রত পালিত -- *পূর্ববৎ; পৃঃ ১২৪-১২৬।*

বলরাম রায় চৌধুরী — *উনিশ শতকে মুর্শিদাবাদের কৃষি ও শিল্প (শারদীয় জলসিড়ি, বহরমপুর, [illegible]), পৃঃ তিন*

[illegible] ১৮[illegible] *খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ১৮৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দে জে. ই. [illegible] এবং ১৮৬৭-৬৮ খ্রীস্টাব্দে লেফ্‌টেনান্ট জে. স্টিউয়ার্ট-কর্তৃক* [illegible] *ভিত্তিতে প্রস্তুত জেলার রেশম, ও নীলকুঠিগুলির মানচিত্র।*

৫৭. *রিপোর্ট অব দি ইন্ডিগো কমিশন; পূর্ববৎ; অ্যাপেনডিক্‌স্ ওয়ান পৃঃ XV*

৫৮. *পূর্ববৎ; অ্যাপেনডিক্‌স্ সেভেন্টিন, পৃঃ XCVIII*

৫৯. বিনয় চৌধুরী — *পূর্ববৎ; পৃঃ ১০৫-১২৪।*

৬০. এল. এস্. [illegible]লী — *ডিস্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার্স, মুর্শিদাবাদ (কলকাতা, ১৯১৪); পৃঃ ১০৫।*

৬১. বিনয় চৌধুরী — *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৩৫-১৩৬।*

৬২. প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৬১।*

৬৩. *রিপোর্ট অব দি ইন্ডিগো কমিশন; পূর্ববৎ; অ্যাপেনডিক্‌স্ টুয়েন্টিওয়ান, পৃঃ CII-CIX*

৬৪. তপোবিজয় ঘোষ— *নীলবিদ্রোহের চরিত্র ও বাঙালী বুদ্ধিজীবী (কলকাতা, ১৯৮৩); পৃঃ ৯৭-৯৮।*

৬৫. স্বপন বসু— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৮-১৯।*

৬৬. *কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টিনারী ভলিউম- ১৮৫৩-১৯৫৩ (বহরমপুর, ১৯৫৩); পৃঃ ১০৬-১০৯।*

৬৭. *শতবর্ষ স্মারক সংকলন, ১৮৮২ [illegible], চক ইসলামপুর এস সি এম উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৮২) পৃঃ ৩-৪।*

৬৮. তপোবিজয় ঘোষ— *পূর্ববৎ; [illegible] ১৬-২৭।*

৬৯. ব্লেযার বি ক্লিং— *দি ব্লু মিউটিনি; পূর্ববৎ; পৃঃ ৭৮-৮০।*

৭০. *পূর্ববৎ; পৃঃ ৮০-৮১।*

৭১. *পূর্ববৎ; পৃঃ ৯১-৯৫।*

প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৮৬।*

স্বপন বসু— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৬২-৬৩।*

পুলক চন্দ— *নীল বিদ্রোহ (কলকাতা, ১৯৮৩); পৃঃ ৮৪-৮৭।*

৭২. মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৪৮।*

৭৩. ব্রেযাব বি ক্লিং— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৯৩।*

ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায— *প্রসঙ্গ: মালদহে নীলচাষ, নীলকুঠি ও নীলবিদ্রোহ (মধুপর্ণী, বিশেষ মালদহ জেলা সংখ্যা- ১৯৮৫); পৃঃ ১২০ ১২৮।*

৭৪ *৭১ নং তথ্যসূত্রবৎ।*

৭৫ ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায— *পূর্ববৎ।*

৭৬ প্রমোদ বঞ্জন সেনগুপ্ত *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৪২-১৪৭।*

৭৭ *পূর্ববৎ, পৃঃ ৯৮।*

৭৮ অনিল কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায *দি অ্যাগ্রেবিযান সিস্টেম অফ্ বেঙ্গল, ভল্যুম ২ (কলকাতা, ১৯৮১)।*

৭৯ বিনয চৌধুবী *পূর্ববৎ, পৃঃ ১৭০।*

৮০ চি [illegible] পালিত *পূর্ববৎ।*

৮১ পুলক চন্দ — *পূর্ববৎ, পৃ [illegible]*

৮২ তপোবিজয ঘোষ — *পূর্ববৎ, পৃঃ ৬৯।*

৮৩ এল এস এস ও'ম্যালী *পূর্ববৎ, পৃ. ১০৪।*

৮৪ অমলেন্দু দে *বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ (কলকাতা, ১৯৭৪), পৃঃ ১০৯ ১১২।*

কাযেমুদ্দিন আহামদ — *দি ওহাবী মুভমেন্ট ইন ইন্ডিযা (কলকাতা, ১৯৬৬); পৃঃ ১৪৬ ১৪৭।*

প্রমোদ বঞ্জন সেনগুপ্ত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৯৪।*

এম এ খান সম্পাদিত— *সিলেকসন্‌স্ ফ্রম বেঙ্গল গর্ভণমেন্ট বেকর্ডস অন্ ওহাবী ট্রাযাল্‌স্ (১৮৬৩ ৭০), ঢাকা, ১৯৬১।*

৮৫ [illegible] *ব্রিটিশ পালিসি অ্যান্ড দি মুসলিম্‌স্ অব্ বেঙ্গল ১৭৫৭ ১৮৫৩ (ঢাকা, ১৯৭১), পৃঃ ১৬ ১০১।*

[illegible] *বেঙ্গল (নিউ দিল্লী, ১৯০২)।*

[illegible] *(কলকাতা, ১৯৮২), পৃঃ*

[illegible] ১০।

[illegible] চৌধুবী সম্পাদিত — *হিস্ট্রী অব দি সান্তাল হুল অব ১৮৫৫ (দিগম্বব চক্রবর্তী বচিত); কলকাতা, ১৯৮৯; পৃঃ ২৯ ৩৬।*

তাবাপদ বায সংগৃহীত— *সান্তাল বেবেলিযান ডকুমেন্টস্ (কলকাতা, ১৯৮৩); পৃঃ ৮৮।*

৮৮. প্রমোদ বঞ্জন সেনগুপ্ত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৫১-১৫২।*

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টাব— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৭৭।*

এল. এস. এস. ও'ম্যালী— *হিস্ট্রী অব বেঙ্গল, বিহাব অ্যান্ড ওড়িশা আন্ডাব ব্রিটিশ রুল (কলকাতা, ১৯২৫); পৃঃ ৩৯৫ ৩৯৮।*

৮৯. পূর্ববৎ।

আশীষ কুমাব মন্ডল— *সিপাহী বিদ্রোহে বহবমপুব (গণকণ্ঠ, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৯২); পৃঃ ঐ- ২৬-৩৬।*

৯০. এম. এ. খান সম্পাদিত— *সিলেকস্‌ন্‌স্ ফ্রম বেঙ্গল গর্ভণমেন্ট বেকর্ডস্ অন ওহাবী ট্রায়াল্‌স্ (১৮৬৩-৭০); ঢাকা, ১৯৬১।*

৯১. তপোবিজয় ঘোষ— *পূর্ব্ববৎ; পৃঃ ৫৬।*

৯২. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টাব— *পূর্ব্ববৎ; পৃঃ ১৫৩।*

৯৩. বিনয চৌধুবী— *অ্যাগ্রেবিযান বিলেশন্‌স্ ইন বেঙ্গল; নবেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ সম্পাদিত 'দি হিস্ট্রী অব বেঙ্গল (১৭৫৭- ১৯০৫); পৃঃ ২৫১।*

৯৪. মুহম্মদ ইউসুফ হোসেন— *পূর্ব্ববৎ; পৃঃ ৯৩-৯৪।*
বায বিজয বিহাবী মুখার্জী— *পূর্ব্ববৎ; পৃঃ ১৫২।*

৯৫. জে. এইচ. টি. ওযাল্‌স্— *পূর্ব্ববৎ; পৃঃ ১১৫-১২১।*

৯৬. *বিপোর্ট অব দি ল্যান্ড বেভেনিউ কমিশন, বেঙ্গল, ভলুম ৪ (১৯৪০); পৃঃ ২৫০।*

৯৭. নলিনাক্ষ সান্যাল— *বোজনামচা: ১ (সমতট, ৮৪; ১৯৯০); পৃঃ ৪১৭-৪২৬।*
কমলেন্দু বাগচী— *কুঠিযাল জমিদাব সাহেব ও স্বামী অখণ্ডানন্দজী (নমামি। পূজাসংখ্যা, ১৩৯২। ২৫ বর্ষ। বহবমপুব); পৃঃ ৩-৮।*
কৌশিকনাথ ভট্টাচার্য— *মাই বেমিনিসেন্সেস্ অব্ বেভ. ই. এম. হুইলাব; কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টিনাবী কমমেমোবেশন ভল্যুম (১৮৫৩-১৯৫৩)-এ অন্তর্ভুক্ত; পৃঃ ১৬১।*

৯৮. ডঃ সোমে[illegible] চৌধুবী— *নীলকব বিদ্রোহ (কলকাতা, ১৯৭২); ভূমিকা (বিবেকান[illegible]পাধ্যায বচিত)।*
নৃপেন্দ্র নাবাযণ কুণ্ডু— *পূর্ব্ববৎ; পৃঃ ১২-১৩।*

৯৯. বজতকান্ত বায— *সোস্যাল কনফ্লিক্ট অ্যান্ড পোলিটিক্যাল আনবেস্ট ইন্ বেঙ্গল (১৮৭৫-১৯২৭); দিল্লী, ১৯৮৪; পৃঃ ২৮৭-২৮৮।*
সুনীল সেন— *পিজান্ট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিযা (কলকাতা, ১৯৮২); পৃঃ ৬৯-৫১।*
ডঃ সোমেশ্বব প্রসাদ চৌধুবী— *পূর্ব্ববৎ; পৃঃ ৭৬- ৭৮।*

১০০. *পূর্ব্ববৎ।*

১০১. নৃপেন্দ্রনাবাযণ কুণ্ডু— *পূর্ব্ববৎ; পৃঃ ১৩।*

১০২. তপোবিজয় ঘোষ— *পূর্ব্ববৎ; পৃঃ ৪৪-৮৫।*

## চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে মুর্শিদাবাদের অর্থনীতি (১৭৫৭-১৯৫৫)

১. কার্ল মার্ক্স— *(১) দি ব্রিটিশ কল ইন্ ইন্ডিযা; (২) দি ইস্ট ইন্ডিযা কোম্পানী— ইট্‌স্ হিস্ট্রি অ্যান্ড বেজাল্টস্; (৩) দি ফিউচাব বেজাল্টস্ অব দি ব্রিটিশ কল ইন ইন্ডিয়া; কে. মার্ক্স ও এফ এঙ্গেল্‌স্ বচিত প্রবন্ধাবলীব সংকলন "দি ফার্স্ট ইন্ডিযান ওযাব অব ইন্ডিপেন্ডেন্স্ ১৮৫৭-১৮৫৯" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত (মস্কো, ১৯৫৯; তিনটি প্রবন্ধেবই বচনাকাল ১৮৫৩। পৃঃ ১৪-৪০।*
বমেশচন্দ্র দত্ত— *ভাবতেব অর্থনৈতিক ইতিহাস ১৭৫৭-১৮৩৭ (বঙ্গানুবাদ, কলকাতা,*

*১৯৭২)*; *পৃঃ ৫৫-৯৯, ২৬৬-২৮০।*

নবেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ— *ইকনমিক হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, ভল্যুম ১ (কলকাতা, ১৯৫৬); পৃঃ ১৪৬-১৮৮; ভল্যুম ৩ (কলকাতা, ১৯৭০); পৃঃ ১-২৫।*

ডঃ কালীকিংকব দত্ত— *সার্ভে অব ইন্ডিয়াজ্ সোস্যাল লাইফ অ্যান্ড ইকনমিক কন্ডিশন ইন দি এইটিন্থ্ সেঞ্চুরী (১৭০৭-১৮১৩); কলকাতা, ১৯৬১; পৃঃ ৭৯-১২০।*

সব্যসাচী ভট্টাচার্য— *ঔপনিবেশিক ভাবতেব অর্থনীতি (কলকাতা, ১৩৯৬); পৃঃ ৭৯-৮৬।*

বামকৃষ্ণ মুখার্জী— *দি বাইজ অ্যান্ড ফল অব দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (ব র্লিন, ১৯৫৫); পৃঃ ২২৬-২৪৮।*

২. নবেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ— *পূর্ববৎ; ভল্যুম ২ (কলকাতা, ১৯৬২); পৃঃ ৪৮-৬৭, ১৮৩-২৩২।*

মাঝাকল হক— *দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীজ্ ল্যান্ড পলিসি অ্যান্ড কমার্স ইন্ বেঙ্গল ১৬৯৮-১৭৮৪ (ঢাকা, ১৯৬৪); পৃঃ ১৭৪-২৫৫।*

৩. অমলেশ ত্রিপাঠী— *ট্রেড অ্যান্ড ফাইনান্স ইন্ দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী ১৭৯৩ ১৮৩৩ (কলকাতা, ১৯৭৯); পৃঃ ১-৩৬, ২০৮, ২২১।*

এইচ. আব. ঘোষাল— *ইকনমিক ট্রানজিশন ইন্ দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী (১৭৯৩-১৮৩৩); কলকাতা, ১৯৬৬; পৃঃ ১-৫৭, ২৮২-২৮৫।*

খান মোহাম্মদ মোহসিন্— *এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইন্ ট্রানজিশন: মুর্শিদাবাদ ১৭৬৫-১৭৯৩ (ঢাকা, ১৯৭৩); পৃঃ ৩৮-৭৮, ১৯০-২৬৩।*

৪. নবেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ— *পূর্ববৎ; ভল্যুম ১; পৃঃ ৬৮-১৮২।*

সিবাজুল ইসলাম — *দি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন বেঙ্গল, এ স্টাডি অব ইট্স্ অপাবেশন ১৭৯০ ১৮১৯ (ঢাকা, ১৯৭৯); পৃঃ ৭৬-১৯০।*

বত্নলেখা বায— *চেঞ্জ ইন্ বেঙ্গল আগ্রেবিয়ান সোসাইটি (দিল্লী, ১৯৭৯); পৃঃ ৭৩-৮৮।*

মাঝাকল হক— *পর্ববৎ; পৃঃ ১৪৪-১৭৩, ২৫৬-২৬৩।*

৫. বামকৃষ্ণ মুখার্জী— *পূর্ববৎ; পৃঃ ২৩৮।*

এল. এস. এস. ও'ম্যালী— *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, বিহাব অ্যান্ড ওড়িশা আন্ডাব ব্রিটিশ রুল (কলকাতা, ১৯২৫); পৃঃ ২৬৯-২৭২।*

৬. সিবাজুল ইসলাম— *বেঙ্গল ল্যান্ড টেনিউব (কলকাতা, ১৯৮৮); পৃঃ ১-৪৬।*

৭. বত্নলেখা বায— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৫২-৮৮, ২৪৯-২৮৩।*

সব্যসাচী ভট্টাচার্য— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৫০-৬৭।*

এ. ঘোষ ও কে. দত্ত— *ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিস্ট বিলেশন্স্ ইন্ এগবিকালচাব (নিউ দিল্লী, ১৯৭৭); পৃঃ ৫৯-৬৯।*

৮. সিবাজুল ইসলাম— *দি পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট ইন বেঙ্গল; পূর্ববৎ; পৃঃ ২২৮-২৫০।*

অমলেশ ত্রিপাঠী— *পূর্ববৎ; পৃঃ ২০৮-২২১।*

খান মোহাম্মদ মহসিন্— *পূর্ববৎ; পৃঃ, ১৯০-২৫৭।*

৯. কে. কে. দত্ত— *ইকনমিক কন্ডিশন অব দি বেঙ্গল সুবা (কলকাতা, ১৯৮৪); পৃঃ ২৪৪-২৬২।*

রামকৃষ্ণ মুখার্জী— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৭০-২০৬।*

শক্তিনাথ ঝা— *মুর্শিদাবাদ জেলায় সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ; মুর্শিদাবাদ সমীক্ষা— ৫ই-২০শে জানুয়ারী, ১৯৮৩।*

নিখিল সুর— *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ; (কলকাতা, ১৯৮২); পৃঃ ৪৫-৬৭।*

এ. এন. চন্দ্র— *দি সন্ন্যাসী রেবেলিয়ন (কলকাতা, ১৯৭৭); পৃঃ ১০৬ ১৭০।*

১০. ডঃ তারাশংকর ব্যানার্জী— *গ্রোথ অব্ দি ইন্টার্নাল মার্কেট : এ স্টাডি ইন্ ভিলেজ ইকনমি; এস. পি. সেন-সম্পাদিত 'মডার্ন বেঙ্গল. এ সোসিও ইকনমিক সার্ভে' (কলকাতা, ১৯৭৩) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃঃ, ৫৬-৬৭।*

ডঃ তারাশংকর ব্যানার্জী — *(ভোরিয়াস বেঙ্গল, আস্পেক্টস্ অব মডার্ন হিস্ট্রি (কলকাতা, ১৯৮৫); পৃঃ ৫৪ ৫৮।*

আচার্য যদুনাথ সরকার— *ওল্ড মুর্শিদাবাদ— হিস্টোরিক্যাল মেমারিজ; কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টিনারী কমমেমোরেশন ভল্যুম(১৮৫৩-১৯৫৩); পৃঃ ১৩১।*

১১. রেভারেন্ড জেম্স্ লঙ— *দি ব্যাঙ্কস্ অব্ দি ভাগিরথী; সিলেকশন্স্ ফ্রম দি ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৮১; পৃঃ ৩৬৫।*

সুনীল কুমার মুন্সী— *জিওগ্রাফি অব ট্রান্সপোর্টেশন ইন্ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া আন্ডার দি ব্রিটিশ রাজ (কলকাতা, ১৯৮০); পৃঃ ২৭-১১৮।*

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার— *এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টস্ অব বেঙ্গল— মুর্শিদাবাদ (লন্ডন, ১৮৭৬); পৃঃ ১৪১-১৪৮।*

১২. অশোক সেন— *অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার অ্যান্ড টেনান্সি লজ্ ইন্ বেঙ্গল, ১৯৫০-১৯০০; পার্সপেকটিভ্স্ ইন্ সোস্যাল সায়েন্সেস ২; কলকাতা, ১৯৮২; পৃঃ ১-৮৯।*

বিনয় চৌধুরী— *গ্রোথ অব কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার ইন্ বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০০); কলকাতা, ১৯৬৪; পৃঃ I-IV, ৭৩-১৯৪।*

১৩. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ— *পূর্ববৎ; ভল্যুম ১; পৃঃ ২১৫-২৩২।— পূর্ববৎ; ভল্যুম ৩; পৃঃ ১২৮-১৩৬।*

বিমল চন্দ্র সিংহ— *পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস (কলকাতা, ১৩৬২); পৃঃ. ৯-২৪।*

খান মোহাম্মদ মহসিন— *পূর্ববৎ; পৃঃ, ১৯০-২৫৭।*

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার— *পূর্ববৎ; পৃঃ. ৩৫-৮৭।*

সৌম্যেন্দ্র কুমার গুপ্ত— *বহরমপুর : একটি সামাজিক রূপরেখা; পুনশ্চ, শারদ সংকলন, ১৯৬৪।*

*একটি সংখ্যাতথ্য থেকে এই অবনগবায়ণের প্রবণতা খুবই সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে:*

| শহর | ১৮৭২ | ১৮৮১ | ১৮৯১ | ১৯০১ | ১৯১১ | ১৯২১ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মুর্শিদাবাদ | ২৪,৫৩৪ | ২০৮৪১ | ১৮৮৯৯ | ১৫১৬৮ | ১২৬৬৯ | ১০৬৬৯ |
| জিয়াগঞ্জ | ২১,৬৪৮ | ১৮৩৯০ | ১৬৬৭৭ | ১৩৩৮৫ | ১২৩২৭ | ১১২৩১ |

১৪. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৬২।*

১৫. মেজর টুল ওয়ালশ্— *এ হিস্ট্রি অব মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট (লন্ডন, ১৯০২); পৃঃ ২-১২-২৫৯।*

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— *মুর্শিদাবাদ কথা; পৃঃ ২৫৮ ২৬১।*

বিশ্বনাথ রায়— *এ পীপ্‌ থ্রু দি হাজারদুয়ারী প্যালেস অব মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর, ১৯৮১); পৃঃ ৩৮-৫৭।*

চিত্তব্রত পালিত— *টেনশন্‌স ইন বেঙ্গল রুরাল সোসাইটি (কলকাতা, ১৯৭৫), পৃঃ ১৭।*

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার — *পূর্ববৎ. পৃঃ ১১৮*

বিনয় ভূষণ চৌধুরী— *দি অ্যাগেরিয়ান [illegible] ইন [illegible] ১৮৫০-১৯০০; ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল জার্নাল, ভল [illegible] ১১।৬।*

১৬. সিরাজুল ইসলাম— *বেঙ্গল ল্যান্ড টেনিউর; পূর্ব [illegible]; পৃঃ ১ [illegible], ১১১ ১১৬।*

করুণাময় মুখার্জী— *দি ল্যান্ড ওনারশিপ স্ট্রাকচার ইন বেঙ্গল [illegible] (নিশীথ রঞ্জন রায় ও চিত্তব্রত পালিত সম্পাদিত 'অ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল আন্ডার দি রাজ' (কলকাতা, ১৯৮৬) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ১; পৃঃ ১-১৫।*

সিরাজুল ইসলাম— *বেঙ্গল অ্যাগ্রেরিয়ান সোসাইটি: কন্টিনিউইটি অ্যান্ড চেঞ্জ আন্ডার দি কলোনিয়াল রুল্‌ (নিশীথ রঞ্জন রায় ও চিত্তব্রত পালিত সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থ); পৃঃ ৪৪-৭০।*

অশোক সেন— *পূর্ববৎ।*

বিনয় ঘোষ— *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০ (কলকাতা, ১৯৬৮); পৃঃ ২৪-৩০।*

১৭. চিত্তব্রত পালিত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ২৬-৫৯।*

রাধাকমল মুখার্জী— *ল্যান্ড প্রব্লেম্‌স্‌ অব ইন্ডিয়া (কলিকাতা, ১৯৩৩); পৃঃ ১১০।*

বিজয় বিহারী মুখার্জী — *ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট অপারেশনস্‌ ইন দি ডিস্ট্রিক্ট অব মুর্শিদাবাদ ১৯২৪ ১৯৩২ (কলকাতা, ১৯৩৮); পৃঃ, ১২১-১২২।*

১৮. অশোক সেন— *পূর্ববৎ।*

বিনয় চৌধুরী— *অ্যাগ্রেরিয়ান ইকোনমি অ্যান্ড অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশন্‌স্‌ ইন্‌ বেঙ্গল ১৮৫৯-১৮৮৫ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ সম্পাদিত 'দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫)', কলকাতা, ১৯৬৭, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।*

বিনয় চৌধুরী— *বাংলার ভূমি-ব্যবস্থার রূপরেখা (কলকাতা, ১৯৭৭); পৃঃ ২০-২৪।*

১৯. *১৮ নং নির্দেশিকার অনুরূপ।*

আঁদ্রে বেতাই— *স্টাডিজ ইন্‌ অ্যাগ্রেরিয়ান সোস্যাল স্ট্রাকচার (দিল্লী, ১৯৭৪); পৃঃ, ১১৭-১৪১।*

এ ঘোষ ও কে দত্ত— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৫৯-৭৬।*

২০. অশোক সেন— *পূর্ববৎ।*

বিনয় চৌধুরী— *পূর্ববৎ।*

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১১৫-১২৩।*

বিনয় চৌধুরী— *পূর্ববৎ; পৃঃ ২০-২৬।*

২১. অশোক সেন— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৩৮।*

চিত্তব্রত পালিত— *পারস্‌পেক্‌টিভস্‌ অন্‌ অ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৮২);*

*পৃঃ ৪৬-৫৪, ৭৮-৮০।*

২২. ডব্লিউ .ডব্লিউ. হান্টাব— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১১৪-১১৫।*
বিনয় চৌধুবী— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৩২০-৩২১।*

২৩. ডব্লিউ .ডব্লিউ. হান্টাব— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৯৬-১০০,১০৭-১০৮, ১৫৬-১৬০।*
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায— *বঙ্কিম বচনাবলী (যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত সাহিত্য-সংসদ সংস্কবণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৩৭১); দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৮৭-২৯৫।*
কমা চট্টোপাধ্যায— *ব্রিটিশযুগে বাংলাদেশে বেশম বয়নশিল্পেব অবস্থা, ১৮৭২-১৯২১ (গৌতম চট্টোপাধ্যায সম্পাদিত "ইতিহাস অনুসন্ধান ৩", কলকাতা, ১৯৮৮, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত); পৃঃ ২৯২, ২৯৮।*

২৪. সৌম্যেন্দ্র কুমাব গুপ্ত— *মুর্শিদাবাদ জেলায নীল চাষ ও নীল বিক্ষোভ, শাবদীয জনমত, ১৩৯২।*
স্বামী অখন্ডানন্দ— *স্মৃতি কথা (কলকাতা, ১৩৭৯), পৃঃ ২১৭ ২২০।*
চিত্ত দাস— *ঈশ্বব মহান, তিনি সত্যিই আছেন?, মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, ১৬ই সেপ্টেম্বব, ১৯৮৪।*

২৫. ডঃ হেনা মুখার্জী— *ইম্প্যাক্ট অব বেলওযেজ্ অন্ দি ইকনমিক লাইফ অব বেঙ্গল (এস. পি. সেন- সম্পাদিত "মডার্ন বেঙ্গল, এ সোসিও-ইকনমিক সার্ভে" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত); পৃঃ ৩৬-৫৫।*
সুনীল কুমাব মুন্সী— *পূর্ববৎ; পৃঃ, ৮৫-১১৮, ১২৫-১৩২।*
সুগত বোস— *অ্যাগ্রেবিযান বেঙ্গল, ইকনমি, সোস্যাল স্ট্রাকচাব অ্যান্ড পলিটিক্স, ১৯১৯-১৯৪৭ (কেমব্রিজ, ১৯৮৬); পৃঃ, ৪৪-৫০।*
বিমলচন্দ্র সিংহ— *পূর্ববৎ; পৃঃ, ৩৬-৩৯।*
বিজযবিহাবী মুখার্জী— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৫-৮, ৬৯-৭০, ১২৮-১২৯।*
কমা চট্টোপাধ্যায— *পূর্ববৎ; পৃঃ ২৯৬।*

২৬. বিমলচন্দ্র সিংহ— *পূর্ববৎ।*
এ.মিত্র— *সেন্সাস ১৯৫১ ওযেস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকস্- মুর্শিদাবাদ; পৃঃ xxvii।*

২৭. *স্বাধীনতাব বজত জযন্তী। ১৯৭২। মুর্শিদাবাদ। স্মাবক পুস্তিকা (মুর্শিদাবাদ জেলাব তথ্য ও জনসংযোগ আধিকাবিক কর্তৃক প্রকাশিত); পৃঃ ১৯-৬২।*

২৮. সৌগত মুখার্জী— *সাম আসপেক্টস্ অব কমার্শিযালাইজেশন অব এগ্রিকালচাব ইন ইর্স্টান ইন্ডিযা, ১৮৯১-১৯৩৮ ('পার্সপেকটিভস ইন্ সোস্যাল সাযেন্সেস ২' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃঃ ২২৭-২২৮।*
পার্থ চ্যাটার্জী— *বেঙ্গল ১৯২০-৪৭, দি ল্যান্ড কোশ্চেন (কলকাতা, ১৯৮৪); পৃঃ ২৫-৪৬।*
সুগত বোস— *পূর্ববৎ; পৃঃ, ১৪৬-১৭০, ১২৫-১৩৪।*

২৯. ২৮ নং নির্দেশিকাব অনুরূপ।

৩০. পার্থ চ্যাটার্জী— *অ্যাগ্রেবিযান স্ট্রাকচাব ইন্ প্রি-পার্টিশান বেঙ্গল ("পার্সপেকটিভস্ ইন সোস্যাল সাযেন্সেস ২" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)।*
পার্থ চ্যাটার্জী— *বেঙ্গল ১৯২০-৪৭ (পূর্ববৎ); পৃঃ ৮১-৯৫।*

৩১. সুগত বোস— *পূর্ববৎ; পৃঃ ৯৮-১৭৭।*
মনোজ কুমার সান্যাল— *ঔপনিবেশিক বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে ঋণ ও জমি হস্তান্তরের সমস্যা: একটি জেলাওয়ারি সমীক্ষা (গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "ইতিহাস অনুসন্ধান-৪", কলকাতা, ১৯৮৯, গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত); পৃঃ ২৫১-২৬১।*
সৌগত মুখার্জী— *অ্যাগ্রেরিয়ান ক্লাস ফর্মেশন্ ইন্ মর্ডান বেঙ্গল ১৯৩১-১৯৫১ (কলকাতা, ১৯৮৫); পৃঃ ১-৩২।*
৩২. বিজয় বিহারী মুখার্জী— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৩৭-১৩৮।*
৩৩. সুগত বোস— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৪৬-১৭০।*
শীলা সেন— *মুসলিম পলিটিক্স ইন্ বেঙ্গল, ১৯৩৭-১৯৪৭ (নিউ দিল্লী, ১৯৭৬); পৃঃ ১০১-১০৮।*
রত্নতকান্ত রায়— *দি রিট্রীট অব দি জোতদারস্? (রিভিউ আর্টিকেল্; দি ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোস্যাল হিস্ট্রি রিভিউ, ভল্যুম XXV নাম্বার ২, এপ্রিল জুন, ১৯৮৮)।*
৩৪. সৌগত মুখার্জী— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৫।*
সৌগত মুখার্জী— *সাম আসপেক্টস্ অব্ কমার্শিয়লাইজেশন ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া (পূর্ববৎ); পৃঃ ২৩১ ২৬৯।*
পার্থ চ্যাটার্জী— *অ্যাগ্রেরিয়ান স্ট্রাকচার ইন্ প্রি- পার্টিশান বেঙ্গল (পূর্ববৎ); পৃঃ ১৯৯-২০০।*
এ. মিত্র— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১২৩-১২৫।*
বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য— *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারস্- মুর্শিদাবাদ (কলকাতা, ১৯৭৯); পৃঃ ২০৭।*
৩৫. সুগত বোস— *পূর্ববৎ; পৃঃ ১৭০, ২৫০-২৫১।*
মৈত্রেয় ঘটক— *কাকদ্বীপ (১৯৪৬-৫০); বর্তিকা, কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলন সংখ্যা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬; পৃঃ ২-৯।*
মৈত্রেয় ঘটক— *পশ্চিমবঙ্গের খেতমজুর; বর্তিকা, পূজাসংখ্যা, ১৩৮৭; পৃঃ ২৯-৩৭।*
বকিবুদ্দিন মিঞা— *ক্ষেতমজুর, সমস্যা; সংযুক্ত কিসান সভা, মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন, স্মারক গ্রন্থ, ১৯৮১।*
অশোক রুদ্র— *ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি (কলকাতা, ১৯৮৫); পৃঃ ১১৮-১২৫।*
৩৬. অশোক মিত্র— *দি নিউ ইন্ডিয়া ১৯৪৮-১৯৫৫ (বোম্বাই, ১৯৯১); পৃঃ ৫৩-৫৬, ১১৫-১১৬।*
বিনয় চৌধুরী— *পূর্ববৎ; পৃঃ ২৬-৩১।*
রত্নলেখা রায়— *পূর্ববৎ; পৃঃ ২৮৪-২৯৪।*
অশোক মিত্র— *অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে পড়া নেতাদের কাছ থেকে যতটুকু আশা করা যায়; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ ই অগাস্ট, ১৯৮০; পৃঃ ৪।*
অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী— *দি অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব্ বেঙ্গল, ভল্যুম ২ (কলকাতা, ১৯৮১); পৃঃ ৪১৫-৪৩৬।*
৩৭. রত্নতকান্ত রায়— *সোস্যাল কনফ্লিক্ট অ্যান্ড পোলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন বেঙ্গল (১৮৭৫-১৯২৭); দিল্লী, ১৯৮৪; পৃঃ ২৮৭-২৮৮।*

সুনীল সেন— *পিজান্ট মুভমেন্ট ইন্ ইন্ডিয়া (কলকাতা, ১৯৮২)*; পৃঃ ৪৯-৫১।
ডঃ সোমেশ্বর প্রসাদ চৌধুরী— *নীলকর বিদ্রোহ (কলকাতা, ১৯৭২)*; পৃঃ ৭৬-৭৮।
নৃপেন্দ্র নারায়ণ কুণ্ডু— *ডোমকল কুঠিবাড়ি (বর্তিকা, ২৭ বর্ষ, জানুয়ারী-মার্চ সংখ্যা, ১৯৮৩)*।
অম্বিকাচরণ রায়— *আমার ষাট বছরের ওকালিত (১৯০৫-১৯৬৫)*; বহরমপুর, ১৯৬৫।পৃঃ ১০-১১।
বিষাণ কুমার গুপ্ত— *ব্রজভূষণ গুপ্ত : মুর্শিদাবাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃত; প্রাকৃত, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭*; পৃঃ ৭৩।
শক্তিনাথ ঝা— *দেশ ও কালের প্রেক্ষিতে অনন্ত ভট্টাচার্য; "মুর্শিদাবাদ জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা ১৯২৫-১৯৭৫— বিপ্লবী অনন্ত ভট্টাচার্য স্মারকগ্রন্থ" অন্তর্ভুক্ত, বহরমপুর, ১৯৯৩*; পৃঃ ৩৬-৪৩।
বিষাণ কুমার গুপ্ত— *পোলিটিক্যাল মুভমেন্টস্ ইন মুর্শিদাবাদ, ১৯২০-১৯৪৭ (কলকাতা, ১৯৯২)*; পৃঃ ১০৫-১১৪।
অমিতাভ চন্দ্র— *মুর্শিদাবাদ জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগ: ১৯৩০-১৯৪৭; বার্ষিক মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, প্রথম বর্ষ, ১৯৯০*; পৃঃ ১৯।

৩৮. বিষাণ কুমার গুপ্ত— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ৯৮- ১১৮, ১৩৯-১৬৫।
অমিয় কুমার বাগচী— *প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন্ ইন্ডিয়া ১৯০০-১৯৩৯ (কলকাতা, ১৯৭৫)*; পৃঃ ৪২৮-৪৩৩।
অমর্ত্য সেন— *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি (কলকাতা, ১৩৯৭)*; পৃঃ ১৪৩-১৫৫।
সুগত বোস— *পূর্ববৎ*; পৃঃ ২৩৩-২৫১, ২৭৪-২৮০।

## বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক' অন্তর্দ্বন্দ্বের উৎস সন্ধানে

### এক

১. বিনয় ঘোষ— *'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র অর্থনৈতিক দৃষ্টি; পরিচয়, অগাস্ট, ১৯৬৩*। অলোক রায়— *প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ-মন (কলকাতা, ১৯৬৭)*, পৃঃ ৪৩-৫৭। অসিত কুমার ভট্টাচার্য— *বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা (কলকাতা, ১৯৬৪)*, পৃ ৪৪-৬৭। ভবতোষ দত্ত— *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র (কলকাতা, ১৯৬৪)*, পৃ ৫৩-৭৪, ৯১-১০৮। বিমান বিহারী মজুমদার— *হিস্ট্রি অব্ ইন্ডিয়া সোস্যাল অ্যান্ড পোলিটিক্যাল আইডিয়াজ ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ (কলকাতা, ১৯৬৭)*, পৃ ১৮৪-১৮৯। রেভারেন্ড জেমস্ লঙ— *৫০০ কোয়েশ্চান্‌স্ অন দি সাবজেক্টস্ রিকোয়্যারিং ইনভেস্টিগেশন ইন দি সোস্যাল কণ্ডিশন অব্ দি পিপল্ অব্ ইন্ডিয়া (মহাদেব সাহা-সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৬৬)*, পৃ ১৭।
২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য— *বঙ্কিম সাহিত্য (কলকাতা, ১৯৭৮)*, পৃ ১৯৯-২১৮।
৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস— *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ১৩৪৯ সাল)*, পৃ ৭৮।

৪. *বঙ্কিম বচনাবলী। যোগেশচন্দ্র বাগল-সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ (কলকাতা, ১৩৭১)। দ্বিতীয় খন্ড। পৃ ২৮৭।*

৫. *পূর্ববৎ।*

৬. *পূর্ববৎ, পৃ. ৩০৬।*
সঞ্জীব চন্দ্র চ্যাটার্জী— *বেঙ্গল বায়তস্— দেয়াব বাইটস্ অ্যান্ড লায়েবীলিটীজ্ (অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী ও বিমল কান্তি ঘোষ সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৭৭), পৃ. II-V ।*
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস— *পূর্ববৎ, পৃ ২২-২৩।*

৭. ভবতোষ দত্ত— *পূর্ববৎ, পৃ ৫৮-৫৯।*
বিমান বিহারী মজুমদার— *পূর্ববৎ, পৃ ১৭০-১৭১, ১৮১-১৮৪, ১৮৯, ১৯২-১৯৩।*
অ্যালবার্ট সি ব্যগ সম্পাদিত— *এ লিটারারী হিস্ট্রি অব্ ইংল্যান্ড (লন্ডন, ১৯৪৮), পৃ ১৩২৩, ১৩৩২।*
বঙ্কিম বচনাবলী— *পূর্ববৎ*।দ্বিতীয় খন্ড। পৃ ৩০৪।

৮. ভবতোষ দত্ত— *পূর্ববৎ; পৃ ৫৮-৫৯, ৯৩।*
বিমান বিহারী মজুমদার— *পূর্ববৎ*।পৃ ১০৪-১৯৩।
ঋবা বসু— *উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র (কলকাতা, ১৯৮০), পৃ ১২৫-১২৯।*
অলোক রায় সম্পাদিত— *নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরী স্টাডিজ, নং ৩, জুলাই, ১৯৭৩; পৃ ২৮৫-২৯৬, ৩০১-৩১০।*
বিনয় ঘোষ— *পূর্ববৎ।*
দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত— *রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান (কলকাতা, ১৯৮৭), পৃ ২২-২৩।*

৯. শিশির কুমার দাশ— *দি আর্টিস্ট ইন্ চেইন্স্ (নিউদিল্লী, ১৯৮৪), পৃ ৯৫।*

১০. শিশির কুমার দাশ— *পূর্ববৎ।*
বিমান বিহারী মজুমদার— *পূর্ববৎ, পৃ ১৯০।*

## দুই

১১. বঙ্কিম বচনাবলী— *পূর্ববৎ*।দ্বিতীয় খন্ড। পৃ ২৯৫।

১২. দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত— *পূর্ববৎ; পৃ ৩৪, ৩৭-৩৮।*

১৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস— *পূর্ববৎ, পৃ ২৯, ৪৯, ৯০।*

১৪. রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত— *রেভারেন্ড লালবিহারী ও বঙ্কিমচন্দ্র, মাসিক বাঙলাদেশ, বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৭৯।পৃ ৪৯৫-৫০০।* দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত— *পূর্ববৎ।* পৃ ৩৭-৩৮।
মৃদুল কান্তি বসু— *বঙ্কিম-বির্তক, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫।*পৃ ১৭৬-১৭৭।

১৫. মৃদুল কান্তি বসু— *পূর্ববৎ।*

১৬. দি রেভারেন্ড লালবিহারী দে— *গোবিন্দ সামন্ত, ভল্যুম ১ (লন্ডন, ১৮৭৪); প্রিফেস।*

১৭. *কৃষ্ণনাথ কলেজ সেন্টিনারী কোমেমোরেশন ভল্যুম ১৮৫৩-১৯৫৩ (বহরমপুর, ১৯৫৩); পৃ ৪০।*

সুকুমার সেন— *বঙ্কিমচন্দ্রোদয়, দেশ, সাহিত্য-সংখ্যা, ১৩৯৫।পৃ ২১।*

১৮. দি রেভারেন্ড লালবিহারী দে— *বেঙ্গল পিজান্ট লাইফ (লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৮৯২)।* নামপত্রের পরপৃষ্ঠাঃ First Edition Printed, 2 Vols, Crown 800 (under the title "Govinda Samanta", 1874), New Edition ("Bengal Peasant Life"), 1878, reprinted, 1879, 1880, 1884, 1888, 1892

১৯. দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত— *পূর্ববৎ, পৃ ৬৮-৭৬।*
মৃদুল কান্তি বসু— *পূর্ববৎ।*

২০. সুকুমার সেন— *পূর্ববৎ।*

২১. দি রেভারেন্ড লালবিহারী দে— *গোবিন্দ সামন্ত, ভল্যুম ১, পূর্ববৎ, পৃ ১-৬।*
দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত— *পূর্ববৎ, পৃ ২১-২৫, ৩৭-৪৪।*
রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত— *পূর্ববৎ।*

২২. দি রেভারেন্ড লালবিহারী দে— *পূর্ববৎ, পৃ ৪৬।*

২৩. বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত— *ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্— মুর্শিদাবাদ (কলকাতা, ১৯৭৯), পৃ ১০৯-১১০।*
অশোক মিত্র, আই. সি. এস— *দি ট্রাইব্স্ অ্যান্ড কাস্ট্স্ অব্ ওয়েস্ট বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৫৩); পৃ ৩২-৩৩।*জনগণনায় কৈবর্তদের মাহিষ্যে রূপান্তর সম্পর্কে।

## তিন

২৪. বঙ্কিম রচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড পৃ ২৯১।*

২৫. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার— *এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল, ভল্যুম ৯, ডিস্ট্রিক্ট্স্ অব্ মুর্শিদাবাদ অ্যান্ড পাবনা (লন্ডন, ১৮৭৬; রিপ্রিন্ট সংস্করণ, নিউদিল্লী, ১৯৭৪); পৃ ৩৬-৩৮।*

২৬. বঙ্কিম রচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড।*পৃ ২৯৫।

২৭. লাডলী মোহন রায়চৌধুরী— *বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরি জীবন, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃ ১৫৪।*

২৮. হান্টার— *পূর্ববৎ, পৃ ১৩৫।*

২৯. হান্টার— *পূর্ববৎ, পৃ ১৭ (পাদটীকা)।*

৩০. হান্টার— *পূর্ববৎ, পৃ ৩৬-৩৮।*

৩১. ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত— *এসেজ অ্যান্ড লেটার্স: বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী (কলকাতা, ১৯৪০); পৃ ১৯৮।*

৩২. হান্টার— *পূর্ববৎ। পৃ ১৭, ১১৫-১২৪।*

৩৩. হান্টার— *পূর্ববৎ। পৃ ১০৭-১০৮, ১০০-১০৭, ৪৮-৫৬, ৫৬-৬১।*

৩৪. হান্টার— *পূর্ববৎ। পৃ ১১৬-১১৮, ১১৯-১২০, ১০৮।*

৩৫. হান্টার— *পূর্ববৎ। পৃ ৯৭,৯৯।*

৩৬. হান্টার— *পূর্ববৎ। পৃ ৫০, ৫১, ৬০-৬১।*
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— *বঙ্কিম-জীবনী (অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত); কলকাতা, ১৯৮৮; পৃ ৮০-৮১।*

৩৭. এল. এস. এস. ও, ম্যালি, আই সি এস— *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়াবস্— মুর্শিদাবাদ (কলকাতা, ১৯১৪); পৃ ৭৬, ১৫৭-১৬৩।*

৩৮. অশোক মিত্র, আই সি এস— *সেন্সাস ১৯৫১, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুকস্ মুর্শিদাবাদ (কলকাতা, ১৯৫৩), 'ইনট্রোডিউসিং দি ডিস্ট্রিক্ট' নামক অধ্যাযেব 'ল্যান্ড টেনিউবস' অনুচ্ছেদ; পৃ xxxviii-xl।*

৩৯. বীবেন্দ্র কুমাব ভট্টাচার্য সম্পাদিত— *পূর্ববৎ।*

৪০. চিত্তবঞ্জন বন্দোপাধ্যায সম্পাদিত— *আনন্দমঠ (কলকাতা, ১৯৮৩); পৃ. ১৫।*
বিমান বিহাবী মজুমদাব— *দি আনন্দমঠ অ্যান্ড ফাড়কে, দি জার্নাল অব্ ইন্ডিযান হিস্ট্রি, XLIV, I, No 130, এপ্রিল, ১৯৬৬।*

৪১. বঙ্কিম বচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয খন্ড। চৈতন্যবাদ। পৃ ৮০৬।*

### চার

৪২. ইন্ডিযান অবজার্ভাব, অগাস্ট ৩১, ১৮৭২; পৃ ১৩১-১৩২।

৪৩. বঙ্কিম বচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয খন্ড।পৃ ২৯৫।*

৪৪. বঙ্গদর্শন *(দি ন্যাশনাল লিটাবেচাব কোম্পানী কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত সংস্কবণ, কলকাতা, ১৩৪৬), প্রথম খন্ড, চৈত্র, ১২৭৯; পৃ ৭৬০-৭৭৩।*

৪৫. বঙ্কিম বচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয খন্ড। ~সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব জীবনী (সঞ্জীবনা সুধা— ভূমিকা)।পৃ ৮৬৮।*

৪৬. হান্টাব— *পূর্ববৎ; পৃ ৩৬-৩৮।*

৪৭. বেলা দত্তগুপ্তা— *সোসিওলজি ইন্ ইন্ডিযা (কলকাতা, ১৯৭২); পৃ ১৫৬, ২৮০-২৯২।*
মন্মথ নাথ ঘোষ— *সেকালেব কৃতী বাঙালী (কলকাতা, ১৯৮৫); পৃ ৮১।*
এফ বি ব্র্যাড়লে বার্ট— *টুযেলভ্ মেন্ অব্ বেঙ্গল ইন্ দি নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুবি (কলকাতা, ১৯১০), পৃ ১২৯।*

৪৮. বঙ্গদর্শন। *পূর্ববৎ। পৌষ, ১২৮০। পৃ ৪৮১-৪৮২।*

৪৯. বঙ্গদর্শন। পূর্ববৎ। চৈত্র, ১২৭৯। পৃ ৭৬৬।
(৪৯ক) দি হিস্ট্রি অব্ প্রেস্ ইন্ বেঙ্গল— *অ্যান ওল্ড জার্নালিস্ট; নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুবী স্টাডিজ (জার্নাল্স্ আন্ড জার্নালিজম) নাম্বাব ৭, জুলাই, ১৯৭৪; পৃ ৩০৭-৩০৮।*

### পাঁচ

৫০. এস এন মুখার্জী ও ম্যাবিযান ম্যার্ডাণ অনুদিত ও সম্পাদিত— *বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী। সোসিওলজিক্যাল এসেজ (কলকাতা, ১৯৮৬); পৃ ১১-১২।*
গোপালচন্দ্র বায— *বঙ্কিমচন্দ্র (জীবন ও সাহিত্য), কলকাতা, ১৯৮১; পৃ ১৯০-১৯১।*
*গোপাল বাবু বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁব চাকবী জীবনে মুর্শিদাবাদেব বহবমপুব ছাড়া যে-সব জাযগায গেছেন, সে-সব স্থানই হিন্দু-প্রধান। গোপাল বাবুব এখানে একটু ভুল হযেছে। মুর্শিদাবাদ জেলা বঙ্কিমচন্দ্রেব সমযে বা তাব পবেও বহুদিন ছিল হিন্দু-প্রধান, মাত্র বর্তমান শতাব্দীব শুরু থেকেই এই জেলা হযেছে মুসলিম-প্রধান।*

৫১. হান্টাব— *পূর্ববৎ। পৃ ৪৩-৪৫, ৫০-৫১, ৫৯-৬১।*

৫২. সারোয়ার জাহান— *বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম-প্রসঙ্গ ও চরিত্র (ঢাকা, ১৯৮৪); পৃ ১৫৭।*
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্— *সাম্যবাদী বঙ্কিমচন্দ্র (ঢাকা, শতবার্ষিকী সভাতে পঠিত), উদ্ধৃত রেজাউল করীম— বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, "পরিশিষ্ট", পৃ ১৪১।*
বঙ্কিম রচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। পৃ ২৯১।*

৫৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী— *বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক (ঢাকা, ১৯৭৯), পৃ ১২০।*

৫৪. হান্টার— *পূর্ববৎ। পৃ ১১৮।*

৫৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস— *পূর্ববৎ, পৃ ৩২।* ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়— *বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন চেতনা: সংশয় ও প্রত্যয়, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫; পৃ ১২৪-১২৫।*
অমিত্র সূদন ভট্টাচার্য— *পূর্ববৎ, পৃ ১৯৯-২১৩।*

৫৬. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত— *বঙ্কিম-প্রসঙ্গ (নবপত্র প্রকাশন সংস্করণ, ১৯৮২), পৃ ১৩৩-১৩৫।* সারোয়ার জাহান— *পূর্ববৎ; পৃ ১-৩৯, ১১৮-১৬০।*
রাখাল চন্দ্র নাথ— *বঙ্কিমচন্দ্র- এ হিস্টরিক্যাল রিভিউ (কলকাতা, ১৯৮৫); পৃ ১৫৫-১৬৯।*
জে. সি. ঘোষ— *বেঙ্গলি লিটাবেচার (লন্ডন, ১৯৪৮); পৃ ১৫২-১৬১।*
শিশির কুমার দাশ— *পূর্ববৎ; পৃ ২৩০-২৩৯।*
ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস— *পূর্ববৎ; পৃ ৩-৪৮।*

৫৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনী কান্ত দাস— *পূর্ববৎ; পৃ ৪৯-৬৫।*
শিশির কুমাব দাস— *পূর্বৎ; পৃ ৪৩-১০৯।*
সাবোয়াব জাহান— *পূর্ববৎ; পৃ ৪০-৫৩।*
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য— *বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন (কলকাতা, ১৩৭৮); পৃ ১৪৪-১৭২।*
ডঃ সত্যনারায়ণ দাশ— *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন-সাধনা (কলকাতা, ১৯৭৪); পৃ ১-১৯, ২১২-২৩২।*
*বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অতীতে বা সাম্প্রতিক কালে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা বহরমপুরে বঙ্কিম জীবনের কেবলমাত্র বাহ্য ঘটনাবলীর উপরই আলোকপাত করেছেন— কিন্তু এই সকল ঘটনা ও অভিজ্ঞতা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা বা সাহিত্যসৃষ্টিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তা নির্ণয়ের বিশেষ চেষ্টা করেননি।*এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য :।
শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— *বঙ্কিম জীবনী (আলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৯৫)। 'বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র' অনুচ্ছেদ, পৃ ৭৫-৮৫।*অক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত— *বঙ্কিমচন্দ্র (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫)। অষ্টম পরিচ্ছেদ— 'বহরমপুর ও বঙ্গদর্শন'। পৃ ১২১-১৩৯।*
— *বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র; 'জনমত' সাপ্তাহিক (বহরমপুর); পুনর্মুদ্রিত, ১৫ই ও ২২ শে মে, ১৯৮৮।*
শ্যামল রায়— *সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও বহরমপুর; শারদীয় জলসিড়ি, ১৩৮৯ (বহরমপুর)।*
প্রতিভারঞ্জন মৈত্র— *সেকালে বহরমপুরে সাহিত্যচর্চা ও বঙ্কিমচন্দ্র; সময়, শারদ সংখ্যা,*

*১৩৯২ (বহরমপুর)।*

৫৮. গোপাল চন্দ্র রায়— *পূর্ববৎ; পৃ ১৮৮-১৯০। গোপাল বাবু লিখেছেন, "বঙ্কিম যতদিন নাস্তিক ছিলেন, ততদিন তিনি হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদাভেদ না করে উভয় সম্প্রদায়কেই সমান চোখে দেখেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে মুসলমান চরিত্রগুলিকে সুন্দর ভাবেই চিত্রিত করেছেন।" গোপাল বাবুর এই বক্তব্যের মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। কিন্তু, 'মৃণালিনী' উপন্যাস রচনার সময়কালে অর্থাৎ ১৮৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দে "নাস্তিক বঙ্কিমের মনে তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আসে" গোপাল বাবুর এই উক্তি মেনে নেওয়া শক্ত। ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-চেতনা: সংশয় ও প্রত্যয়, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫) দেখিয়েছেন যে দার্শনিক ভাবনার দিক থেকে নাস্তিক বা প্রায় নাস্তিক মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল প্রায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। আর "হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ" বঙ্কিমচন্দ্রেব শুরু হয়েছিল সঠিক ভাবে বলতে গেলে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে। সুতরাং বলা যায় যে মৃণালিনী রচনার সমকাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায় নাস্তিক মনোভাবের পাশাপাশি হিন্দু চেতনার একটি ধারা লক্ষ্য করা যায়, ১৮৭৫ থেকে নাস্তিক্য ভাব দুর্বল হলে এই হিন্দু চেতনা জোরালো হতে থাকে, এবং ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ থেকে এই হিন্দু চেতনার প্রবল প্রবাহ তাঁর মনোজগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। মানসিকতার এই রূপান্তর মুসলিমদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীকেও বদলে দিতে থাকে।*

৫৯. এ আর দেশাই— *সোস্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অব্ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্ (বোম্বাই, ১৯৪৮); পৃ ১২৬-১৩৪-১৩৫-১৬৫, ৩১১-৩১২।*

৬০. বঙ্গদর্শন। *পূর্ববৎ; প্রথম খন্ড। বৈশাখ, ১২৭৯। ভারত কলঙ্ক। পৃ ১৯।*

৬১. যোগেশচন্দ্র বাগল— *বঙ্কিম রচনাবলী— পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। সাহিত্য-প্রসঙ্গ; পৃ ১১।*

৬২. বেলা দত্তগুপ্ত— *পূর্ববৎ; পৃ ২৭৮-২৭৯।*

৬৩. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার— *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ (লন্ডন, ১৮৭১)।*

৬৪. *বঙ্গদর্শন। পূর্ববৎ। প্রথম খন্ড। বৈশাখ, ১২৭৯। পত্রসূচনা পৃ ৪।*

৬৫. *বঙ্গদর্শন। পূর্ববৎ। প্রথম খন্ড। চৈত্র, ১২৭৯। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা। পৃ ৭৬০-৭৭৩।*

৬৬. *বঙ্গদর্শন। পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। পৌষ, ১২৮০। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। পৃ ৪৮১-৪৮২।*

রত্নাবলী চ্যাটার্জি— *দি নভেলিস্ট অ্যাজ্ রিফর্মার; দি স্টেট্স্ম্যান, জুন ২৬, ১৯৯৩।*

৬৭. জন স্টুয়ার্ট মিল— *ইউটিলিটেরিয়ানিজম, লিবার্টি রিপ্রেজেন্টেটিভ গর্ভরমেন্ট (লন্ডন, ১৯১০); পৃ ৩৬০-৩৬১। মিলের 'রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্ণমেন্ট' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে; এই বইয়ের ষোড়শ অধ্যায়ে 'জাতীয়তা' (nationality)-এর প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তার সমস্যা সম্পর্কে মিলের এই উক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল ব'লে মনে হয়: " Among a People without fellow feeling, especially if they read and speak different languages, the united public opinion, necessary to the working of representative government, cannot exist. The influence which form opinions and decide political acts are different in the different sections*

*of the country An altogether differnt set of leaders have the confidence of one part of the country and of another The same books, newspapers, pamphlets, speeches, do not reach them One section does not know what opinions, or instigations, are circulating in another The same incidents, the same acts, the same system of government, affect them in different ways, and each fears more injury to itself from the other nationalities than from the commonarbiter, the state Their mutual antipathies are generally much stronger than jealousy of the gove-rnment*

৬৮. *বঙ্গদর্শন। পূর্ববৎ। প্রথম খন্ড। বৈশাখ, ১২৭৯। পৃ ৯-২২। বঙ্গদর্শন। পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। ভাদ্র, ১২৮০; পৃ ২৪৪-২৫৩। আশ্বিন, ১২৮০; পৃ ২৬৭-২৭৪।*

৬৯. টি ডব্লু ক্লার্ক— *দি বোল অব্ বঙ্কিমচন্দ্র ইন দি ডেভেলপমেন্ট অব্ ন্যাশনালিজম্; সি এইচ ফিলিপস্ সম্পাদিত "হিস্টোবিয়ানস্ অব ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড সিলোন" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত; পৃ ৪৩৯-৪৪০।*

৭০. শ্রীমতী অশ্রু কোলে— *বাজনাবাযণ বসু: জীবন ও সাহিত্য (কলকাতা, ১৯৭৫); পৃ ২৮৪-৩০৯।*

তপন বাযচৌধুবী— *থ্রি ভিউজ অব্ ইউবোপ ফ্রম নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুবি বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৮৭); পৃ ৭, ১১-১২।*

তপন বাযচৌধুবী— *ইউবোপ বিকন্‌সিডার্ড-পাবসেপ্‌শন্‌স্ অব্ দি ওযেস্ট ইন্ নাইনটিন্থ সেঞ্চুবী বেঙ্গল; (দিল্লী, ১৯৮৮); পৃ ১০-১২।*

৭১. বি বি মজুমদাব— *পূর্ববৎ; পৃ ১৬০-১৬৫।*

যোগেশচন্দ্র বাগল— *কেশবচন্দ্র সেন (কলকাতা, ১৩৬৫); পৃ ৩৬-৪৭।*

ঝবা বসু— *পূর্ববৎ।৬৫-৬৭, ১২৯-১৩১।*

অববিন্দ পোদ্দাব— *ঊনবিংশ শতাব্দীব পথিক (কলকাতা, ১৯৫৫); পৃ ৭৫-৮৯।*

৭২. টি ডব্লু ক্লার্ক— *পূবর্বৎ।*

৭৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস— *পূর্ববৎ; পৃ ৩৯-৪৮।*

এস্. এন মুখার্জী ও ম্যাবিযান ম্যাডার্ন— *পূর্ববৎ; পৃ ৮-১২।*

৭৪. তপন বাযচৌধুবী— *পূর্ববৎ; পৃ ৭, ১৯।*

৭৫. ভূদেব মুখোপাধ্যায— *সামাজিক প্রবন্ধ (সপ্তম সংস্কবণ, ১৩৫৫, চুঁচুড়া); পৃ ১৫।*

৭৬. *বঙ্গদর্শন। পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। পৌষ, ১২৮০। প্রাপ্ত গ্রন্থেব সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। পৃ ৪৮১-৪৮২।*

সাবোযাব জাহান— *পূর্ববৎ; পৃ ১৫৫-১৫৮।*

হান্টাব— *পূর্ববৎ। 'মুর্শিদাবাদ অ্যান্ড পাবনা' পৃ ৬১।*

*"Fanatics are to be found, if anywhere, in the higher classes of Muhammadan Society"*

৭৭. বঙ্কিম বচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। বঙ্গদেশেব কৃষক। পৃ ৩০৯-৩১০, ৩১৩-৩১৪।*

৭৮ *"জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওযা নিষ্প্রযোজন। আমবা পবামর্শ দিই যে, এ সময এ*

*গ্রন্থের বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা হউক।"— বঙ্গদর্শন। পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। ভাদ্র, ১২৮০। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। পৃ ২৬৩।*

৭৯. *বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেণী-চরিত্রের বিচারে আমাদের কতকগুলি বিষয়ের প্রতি নজর দেওয়া উচিত। জমিদার ও কৃষকদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ তাঁর পেশাজীবী মধ্যবিত্ত চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন, সরোজ বন্দোপাধ্যায়, তাঁর "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: একালের চোখে" প্রবন্ধে (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫; পৃ ৭৪)— "স্মরণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র জমিদার-শ্রেণীর মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত।... এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী চেতনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র জমিদার বিরোধী।" অথবা, অশীন দাশগুপ্ত, তাঁর "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণ চক্রবর্তী" প্রবন্ধে (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫; পৃ ৯১)— "শতাব্দীর শেষ কটি দশকে, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধানত পেশাদারী গোষ্ঠীর রূপ নিয়েছে। বড় ভূম্যাধিকারী গোষ্ঠীর ছাতাব তলা থেকে বাঙালি মধ্যবিত্ত বেরিয়ে এসেছে।... সেজন্য জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করার ক্ষমতা ও সুযোগ পেশাদারী মধ্যবিত্তের হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ চিন্তায় এই পরিবর্তনের ছাপ রয়েছে। ...জমিদার কুল থেকে সরে আসার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বাঙলাব কৃষকেব দিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।" এই ব্যাখ্যার সাহায্যে কেন বঙ্কিমচন্দ্র আপাত দৃষ্টিতে জমিদারী-বিরোধী এবং কৃষক-বন্ধু হওয়া সত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলুপ্তি চাননি তার সামাজিক-শ্রেণীগত কারণটি ধরা পড়েনি। আমাদের মনে হয়েছে এর কারণ দ্বিবিধ: প্রথমত জমিদার না হলেও মধ্যস্বত্বভোগী ভূমি স্বার্থের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রদের পারিবারিক যোগাযোগ। "২৪ পরগণা জেলার ডায়মন্ডহারবারের কাছে মুড়াগাছা পরগ নায় বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্রের একটা ছোট তালুক ছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রচুর ঋণ এবং জ্যোতিষচন্দ্রকেও বেকার দেখে যাদবচন্দ্র মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর ঐ মুড়াগাছা তালুকের একশ' বিঘা জমি জ্যোতিষকে পৃথকভাবে দিয়ে যান। যাদবচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাইযেই বাকি সম্পত্তির মালিক হযেছিলেন।" (গোপালচন্দ্র রায়— অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র, কলকাতা, ১৯৭৯; পৃ ২২৯)। উক্ত গ্রন্থ থেকেই আরো জানা যাচ্ছে যে জমি মুড়াগাছা ছাড়া অন্য পরগণাতেও ছিল (পৃ ৬০), জমিগুলি ছিল লাখরাজ ব্রহ্মোত্তর ও দেবত্র (পৃ ৬০, ২৩৮, ২৪০), জমিগুলিতে "গোমস্তা নাই, আদায় তহশীল হয় না" (পৃ ২৪৭-২৪৮)। জমির ইজারাদার ষড়যন্ত্র ক'রে জমি বিক্রীতে বাধা দেয় এবং জমি নীলামে উঠল, "ঘর হইতে টাকা দিয়া বিষয় রক্ষা করিতে হইবে।" (পৃ ২৪০, ২৪২, ২৪৭)। গোমস্তা দিয়ে আদায়— তহশীল করতে হয় এমন একটা তালুকের মালিকানা, সে তালুক যতই ছোট হোক না কেন, এবং এই বিষয় রক্ষার তাগিদ— ই দুইয়েরই কাঠামোগত পরিপ্রেক্ষিত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়তঃ, জমিদার ও মধ্য-স্বত্বভোগীদের পরস্পর-নির্ভরতা এবং জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর বাংলার পেশাজীবী শ্রেণীটির নির্ভরতা। এই সত্য সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ছিলেন বলেই 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধেই মন্তব্য করেছিলেন, "১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভব না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে।"*

৮০. ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়— *পূর্ববৎ; পৃ ১২৭-১২৮।*

শিশির কুমার দাশ— *পূর্ববৎ; পৃ ১১০-১১৪।*

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য— *বঙ্কিম সাহিত্য (পূর্ববৎ); পৃ ২০০, ২০৫, ২০৭, ২১৩।*

৮১. সুশোভন সরকার— *বেঙ্গল রেনোসাঁ অ্যান্ড আদার এসেজ (নিউ দিল্লী, ১৯৭০); পৃ ৩৮-৫২।*

শিশির কুমার দাশ— *পূর্ববৎ; পৃ ১২৯-১৮২।*

অসিত কুমার ভট্টাচার্য— *পূর্ববৎ; পৃ ৪৪-৬৭, ৮৩-১১৪।*

পার্থ চট্টোপাধ্যায়— *ন্যাশনালিস্ট থট অ্যান্ড দি কলোনিয়াল ওয়ার্ল্ড: এ ডিরাইভেটিভ ডিসকোর্স (লন্ডন, ১৯৮৬); পৃ ৭৯-৮০।*

তপন রায়চৌধুরী— *ইউরোপ রিকন্সিডার্ড (পূর্ববৎ); পৃ ১৩৭, ১৯৮।*

৮২. সারোয়ার জাহান— *পূর্ববৎ; পৃ ৯১-১১৭।*

শিশির কুমার দাশ— *পূর্ববৎ; পৃ ২৩৬-২৩৯।*

তপন রায়চৌধুরী— *পূর্ববৎ; পৃ ১২, ১৩৫, ১৩৬।*

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য— *বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী; কলকাতা, ১৯৯১; পৃ ৫২৭-৭০০ অমিয় পি. সেন— হিন্দু রিভাইভ্যালিজম্ ইন্ বেঙ্গল: ১৮৭২-১৯০৫; দিল্লী, ১৯৯৩; পৃ. ১২৪-১২৮।*

কমল কুমার ঘটক— *হিন্দু রিভাইভ্যালিজম্ ইন্ বেঙ্গল: রামমোহন টু রামকৃষ্ণ; কলকাতা, ১৯৯১; পৃ ৬৬-৬৯।*

৮৩. *বঙ্গবাণী,* ১৩২৯, *আশ্বিন। ইং ১৯২২। 'হরিলক্ষ্মী' গল্পগ্রন্থে ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত।*

## ছয়

৮৪. ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত— *এসেজ অ্যান্ড লেটার্স: বঙ্কিমচন্দ্র চাটার্জী (কলকাতা, ১৯৪০); পৃ ৪৭-৮১।*

*বঙ্গদর্শন— পূর্ববৎ। প্রথম খন্ড; পৃ ৫৬২-৫৬৮, ৬৩০-৬৩৪, ৬৮৭-৬৯১। দ্বিতীয় খন্ড; পৃ ৯-১২, ১২১-১২৮।*

বঙ্কিম রচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। জন স্টুয়ার্ট মিল। পৃ ৮৮০-৮৮৩।*

বঙ্গদর্শন— *পূর্ববৎ; তৃতীয় খন্ড পৃ ৫৩৬-৫৪৪।*

বঙ্কিম রচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে (বঙ্গদর্শন, ১২৮২, বৈশাখ। বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল "মিল, ডার্বিন এবং হিন্দু ধর্ম")*

৮৫. ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়— *পূর্ববৎ; পৃ ১২৬।*

৮৬. বঙ্কিম রচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। কতকাল মনুষ্য? পৃ ১৪৫।*

বঙ্গদর্শন— *পূর্ববৎ। প্রথম খন্ড। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা। পৃ ৩১৫।*

দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়— *বঙ্কিমচন্দ্র: বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব। দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৯৫। পৃ ১৬৬-১৭৩।*

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়— পূর্ববৎ। পৃ ১২২-১২৯।

৮৭. দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়— *পূর্ববৎ; পৃ ১৭১।*

৮৮. বঙ্কিম রচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। বঙ্গদেশের কৃষক। পৃ ২৮৮, ২৮৯, ৩১৩,*

২৮৭।

৮৯. দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও অর্চনা ভট্টাচার্য— *ইকনমিক রাইটিংস ইন বেঙ্গলি ১৮১৮—১৯৪৭ (কলকাতা, ১৯৮১)।*
    ভবতোষ দত্ত— *বাংলাভাষায় অর্থনীতির বইয়ের শতবার্ষিকী (কলকাতা, ১৩৮৪)।*
    শঙ্কর সেনগুপ্ত— *ইনট্রোডাকশন; কলকাতা থেকে ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে মহাদেব সাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত রেভারেন্ড জেম্স্ লঙের পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। পৃ ১৭-২৬।*
    বেলা দাশগুপ্ত— *পূর্ববৎ। চ্যাপ্টার— ৩,৪, ৫।*
৯০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস— *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পূর্ববৎ। পৃ ১৬।*
    অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত— *বঙ্কিমচন্দ্র (কলকাতা, ১৯৭৫); পৃ ২৬।*
৯১. ভবতোষ দত্ত— *পূর্ববৎ।*
৯২. ডঃ শোভনলাল মুখার্জী— *দি পলিটিক্যাল ফিলজফি অব্ জন স্টুয়ার্ট মিল (কলকাতা, ১৯৬৫); পৃ ১৮-৩০।*
৯৩. দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও অর্চনা ভট্টাচার্য— *পূর্ববৎ; পৃ ১৩।*
৯৪. ডঃ শোভনলাল মুখার্জী— *পূর্ববৎ। পৃ ৩০-৩৯।*
    বঙ্কিম রচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ ৮৮১।*
৯৫. বঙ্কিম রচনাবলী— *পূর্ববৎ।*
৯৬. বঙ্কিম রচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খণ্ড। ধর্মতত্ত্ব। পৃ ৬৩০।*
৯৭. জি এইচ ফোর্বস— *পজিটিভিজ্ম্ ইন বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৭৫); পৃ ১২৯-১৩৬।*
৯৮. *বঙ্গদর্শন। পূর্ববৎ। তৃতীয় খণ্ড। পৃ ৫৪৫।*
৯৯. যোগেশচন্দ্র বাগল— *বাংলার নব্য সংস্কৃতি (কলকাতা, ১১৫৮); পৃ ৭৭-৮১।*
    বেলা দত্তগুপ্ত— *পূর্ববৎ। পৃ ১১১-১২০।*
    অমর দত্ত— *পাদরি লঙ (কলকাতা, ১১৭৬); পৃ ৭৪-৯৪।*
১০০. অমর দত্ত— *পূর্ববৎ। পৃ ৭৭-৭৮।*
১০১. যোগেশ চন্দ্র বাগল— *পূর্ববৎ। পৃ ৭০, ৬৪-৬৫, ৬৮-৭১, ৭৭-৮১।*
১০২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস— *পূর্ববৎ। পৃ ৪২-৪৩।*
১০৩. পূর্ববৎ।
১০৪. ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত— *এসেজ অ্যান্ড লেটার্স (পূর্ববৎ); পৃ ৩-১৮।*
১০৫. অমর দত্ত— *পূর্ববৎ। পৃ ৭৫, ৮৩, ৮৭, ৯৬-৯৯।*
১০৬. যোগেশ চন্দ্র বাগল— *পূর্ববৎ। পৃ ৫৬-৫৭।*
    বেলা দত্তগুপ্ত— *পূর্ববৎ। পৃ ১২০-১২১।*
১০৭. ডঃ রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত— *রেভারেন্ড লালবিহারী দে ও বঙ্কিমচন্দ্র; মাসিক বাঙলা দেশ, বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৭৯। পৃ ৪৯৬।*
    বেলা দত্তগুপ্ত— *পূর্ববৎ। পৃ ১০২-১০৪।*
১০৮. অমর দত্ত— *পূর্ববৎ। পৃ ৪৮-৫০, ৫৬-৭৩, ৮৯।*
    বিমান বিহারী মজুমদার— *পূর্ববৎ। পৃ ১৭১, ১৯২-১৯৩।*
১০৯. অমর দত্ত— *পূর্ববৎ; পৃ ৭৬।*

১১০. ডঃ সত্যনারায়ণ দাশ— পূর্ববৎ; পৃ ১০২-১০৬।
ভবতোষ দত্ত— বঙ্কিম ভাবনালোক (কলকাতা, ১৯৮৮); পৃ ৬১-৬৫।
১১১. সারোয়ার জাহান— পূর্ববৎ; পৃ ১১৮-১৬০।
ভবতোষ দত্ত— চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র। পূর্ববৎ। পৃ ৯১-১০৮।
১১২. পার্থ চট্টোপাধ্যায়— পূর্ববৎ। পৃ ৫৮-৬৪।
১১৩. তপন রায় চৌধুরী— পূর্ববৎ। পৃ ১৯।

সাত

১১৪. বঙ্কিম রচনাবলী— পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। পৃ ২৮৭।
১১৫. ডঃ বিনয় চৌধুরী— অ্যাগ্রেরিয়ান রিলেশান্‌স্ ইন্ বেঙ্গল; ডঃ নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ সম্পাদিত (কলকাতা, ১৯৬৭), "দি হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল (১৭৫৭-১৯০৫)" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। পৃ ২৮৮-২৯০।
স্বপন বসু— ঠাকুর পরিবার ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহ; অনুষ্টুপ চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৮৭; পৃ ৪।
সুপ্রকাশ রায়— ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম খন্ড), কলিকাতা, ১৯৬৬; পৃ ৪২৬-৪২৮।
১১৬. শিশির কুমার দাশ— পূর্ববৎ; পৃ ৯৬।
বঙ্গদর্শন। পূর্ববৎ। দ্বিতীয় খন্ড। জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০। পৃ ৬৬-৭৩, আষাঢ়, ১২৮০। পৃ ১২৯-১৩০ ঐ, ১২৮২।
১১৭. চিত্তব্রত পালিত— পার্সপেকটিভ্‌স্ অন্ অ্যাগ্রেরিয়ান বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৮২); পৃ ৩৭-৪১।
স্বপন বসু— পূর্ববৎ; পৃ ১-৫।
হান্টার— পূর্ববৎ; পৃ ৩১৮-৩২২।
১১৮. অনিল চন্দ্র ব্যানার্জি— অ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম অব্ বেঙ্গল, দ্বিতীয় খন্ড (কলকাতা, ১৯৮১); পৃ ১৭২-১৭৯।
১১৯. প্রদীপ সিংহ— নাইনটিন্‌থ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল (কলকাতা, ১৯৬৫); পৃ ২১-২২।
১২০. অনিল চন্দ্র ব্যানার্জি— পূর্ববৎ; পৃ ১৭৭-১৭৯, ১৯৮।
এল. এস. এস ও, ম্যালি— হিস্ট্রি অব বেঙ্গল, বিহার অ্যান্ড ওড়িষ্যা আন্ডার ব্রিটিশ রুল (কলকাতা, ১৯২৫); পৃ ৭১৯-৭২৭।
১২১. ওম্যালি— পূর্ববৎ; পৃ ৪৫৬-৪৫৮।
১২২. অশোক চট্টোপাধ্যায— প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজ (কলকাতা, ১৯৮৮); পৃ ১১৮।
১২৩. অনিলচন্দ্র ব্যানার্জী— পূর্ববৎ; পৃ ১৯৮।
১২৪. হান্টার— পূর্ববৎ; পৃ ৩২০-৩২২।
১২৫. বিনয় ভূষণ চৌধুরী— পিজ্যান্ট মুভমেন্টস্ ইন বেঙ্গল, ১৮৫০-১৯০০; নাইনটিন্‌থ্ সেঞ্চুরি স্টাডিজ, জুলাই, ১৯৭৩ পৃ ৩৬৮।
১২৬. হান্টার— পূর্ববৎ; পৃ ৩২০-৩২১।
১২৭. চিত্তব্রত পালিত— পূর্ববৎ; পৃ ৪২।

১২৮. হার্ন্টাব— *পূর্ববৎ; পৃ ৩২০।*

১২৯. শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায— *বঙ্কিম-জীবনী (অলোক বায ও অশোক উপাধ্যায সম্পাদিত), চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৯৫; পৃ ৭৫।*
   কল্যাণ কুমাব সেনগুপ্ত— *পাবনা ডিসটাববান্সেস অ্যান্ড দি পলিটিক্স অব্ বেন্ট ১৮৭৩-১৮৮৫; নিউদিল্লী, ১৯৭৪; পৃ ৬১-৬২।*

১৩০. ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায ও সজনীকান্ত দাস— *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায— পূর্ববৎ; পৃ ২৯।*

১৩১. শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায— *পূর্ববৎ; পৃ ৮৩-৮৪।*

১৩২. শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায— *পূর্ববৎ; পৃ ৪১০ (প্রাসঙ্গিক তথ্য)।*

১৩৩. শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায— *পূর্ববৎ; পৃ ৮০।*
   কল্যাণ কুমাব সেনগুপ্ত— *পূর্ববৎ।*

১৩৪. বিনয চৌধুবী— *অ্যাগ্রেবিযান বিলেশান্স্ ইন বেঙ্গল (পূর্ববৎ); পৃ ২৯০ ২৯১।*
   চিত্তব্রত পালিত— *পূর্ববৎ; পৃ ৪২-৪৩।*

১৩৫. অক্ষয কুমাব দত্তগুপ্ত— *পূর্ববৎ; পৃ ৪২।*

১৩৬. বঙ্কিম বচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয খন্ড। বঙ্গদেশেব কৃষক পৃ ১৯৭।*

১৩৭. ব্রজেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি ও সজনীকান্ত দাস— *এসেজ অ্যান্ড লেটার্স; পূর্ববৎ পৃ ১৯৬, ১৯৮।*

১৩৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায ও সজনীকান্ত দাস— *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায; পূর্ববৎ; পৃ ২৯।*

১৩৯. বিনয চৌধুবী— *পূর্ববৎ; পৃ ৩০০।*
   অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী— *পূর্ববৎ; পৃ ১৯০।*
   কল্যাণ কুমাব দাশগুপ্ত— *পূর্ববৎ; পৃ ১২৪-১৩০।*

১৪০. হার্ন্টাব— *পূর্ববৎ; পৃ ৩২২।*

১৪১. বঙ্গদর্শন— *পূর্ববৎ; দ্বিতীয খন্ড। প্রাপ্তগ্রন্থেব সংক্ষিপ্ত সমালোচনা; পৃ ২৬৩।*

১৪২. ও'ম্যালি— *পূর্ববৎ; পৃ ৪৫৫-৪৫৮।*
   *বর্তমান প্রবন্ধেব 'তিন' আখ্যাত অনুচ্ছেদ এবং বর্তমান অনুচ্ছেদেব প্রথমাংশ।*

১৪৩. জযন্তী মৈত্র— *মুসলিম পলিটিক্স ইন বেঙ্গল ১৮৫৫-১৯০৬ (কলকাতা, ১৯৮৪); পৃ ১৩৩-১৩৪।*

১৪৪. *বর্তমান প্রবন্ধেব 'পাঁচ' আখ্যাত অনুচ্ছেদ।*

১৪৫. অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী— *পূর্ববৎ।পৃ ১৫৮, ১৮২।*

১৪৬. বঙ্কিম বচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয খন্ড। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব জীবনী। পৃ ৮৬৭।*

১৪৭. ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত— *এসেজ অ্যান্ড লেটার্স (পূর্ববৎ); পৃ ১৯৩-১৯৮।*

১৪৮. *পূর্ববৎ।*

১৪৯. অক্ষয় কুমাব দত্তগুপ্ত— *পূর্ববৎ।পৃ ১৩২।*

১৫০. বঙ্কিম বচনাবলী— *পূর্ববৎ। দ্বিতীয খন্ড। স্যব উইলিযাম গ্রে ও স্যব জর্জ ক্যাম্বেল। পৃ ৮৮৮-৮৯৩।*